রঈস আহমদ জাফরী

চার ইমামের জীবনকথা

ইমাম মালিক
ইমাম আবু হানিফা
ইমাম শাফেয়ী
ইমাম হাম্বল

অনুবাদ

মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান

রঈস আহমদ জাফরী

চার ইমামের

জীবনকথা

অনুবাদ

মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)

দোকান নং – ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০

ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২; মোবাইল ঃ ০১৭১২-১৮৫০০০

www.pathagar.com

চার ইমামের জীবনকথা
মূল ঃ রঈস আহমদ জাফরী
অনুবাদ ঃ মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান

প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ২০০৪ ইং
তৃতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং
জিলকদ ১৪৩৪ হিজরী
আশ্বিন - ১৪২০ বাংলা

অনুবাদস্বত্ব ঃ
খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা শহীদুল হক
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
৬৮, ইসলাম ভবন,
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

ISBN : 984-8455-23-9

www.pathagar.com

পূর্ব কথা

ইসলামী আদর্শের বিন্যাস সাধনে কুরআন ও হাদীসের পরই ফিকাহ্‌র ইমামদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে ইসলামের ব্যবহারিক আইন-বিধিগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেগুলোকে একটি সুবিন্যস্ত অবয়ব দান করেছেন। এরফলে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে ইসলামী আইন-বিধিগুলো উপলব্ধি করা এবং সে মুতাবেক নিজেদের জীবন ধারা গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে। এদিক থেকে ফিকাহ্‌র ইমামদের অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য 'চার ইমামের জীবনকথা' গ্রন্থে এই বিষয়টির উপরই কিঞ্চিৎ সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। আমাদের মহান ইমামগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় জীবন যাপন করেও কিভাবে কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামের ব্যবহারিক আইন-বিধিগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সাধারণ মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তুলেছেন, তা ভাবলে রীতিমতো অবাক হতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থটির ওপর চোখ বুলালেই তার কিঞ্চিত আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থকার রঈস আহমদ জাফরী এ গ্রন্থটি রচনা করে উর্দূভাষী পাঠকদের জন্যে এক বিরাট খেদমত করেছেন সন্দেহ নেই।

বিশেষ করে চার ইমামের বক্তব্যগুলোর তুলনামূলক পর্যলোচনা করে তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। বাংলা ভাষায় এ ধরনের কোনো গ্রন্থ এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। সেদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থখানি এক বিরাট শূণ্যতা পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অন্তত বাংলাভাষী পাঠকরা এই প্রথম বারের মতো আমাদের মহান ইমামদের বর্ণাঢ্য জীবনের সাথে পরিচিতি লাভের সুযোগ পেলেন এই গ্রন্থটির মাধ্যমে। গ্রন্থটির অনুবাদক মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান সাহিত্য জগতে নবাগত হলেও তার মধ্যে বিরাট প্রতিশ্রুতি নিহিত রয়েছে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের মহান রূপকার হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)-এর পুত্র হিসেবেও তার মধ্যে রয়েছে সাহিত্য সাধনার বিরাট সম্ভাবনা। সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখলে অদূর ভবিষ্যতে তার কলম থেকেও ভালো রচনা বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা যায় সঙ্গত ভাবেই। অন্তত তার এই প্রথম প্রয়াস সে রকম ইঙ্গিতই প্রদান করে।

আমি বাংলাভাষী পাঠকদেরকে চার ইমামের জীবনকথা উপহার দেয়ার জন্যে অনুবাদককে সাধুবাদ জানাই। আমার একান্ত প্রত্যাশা, আমাদের পাঠক মহলে গ্রন্থখানি যথোচিত সমাদর লাভ করবে।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

চেয়ারম্যান, মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

www.pathagar.com

আমার কথা

দুরু দুরু বক্ষে, কম্পিত পদক্ষেপে ভাষান্তরের বাগানে প্রবেশ। এমন একখানি বিষয়ই ভাগ্যে জুটালো যে, "পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে"। দ্বীন ইসলামের ব্যাখ্যাতাগণের 'চার স্তম্ভের জীবনকথা'– সেকি চারটিখানি কথা? কিন্তু শিশু সুলভ আচরণ চিরদিনই মুরুব্বীদের স্নেহময় শাসনে শুধরেছে।

রক্তচক্ষু তিরস্কার নয়, স্নেহময় শাসনের ছায়াতল নিজেকে শুধরে গড়ে তোলার আশা নিয়ে গুণীজনের হাতে আমার জীবনের প্রথম অথচ দুঃসাহসিক এই নিবেদন।

আরো রইল— যাদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় এ গ্রন্থখানি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি— তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

২০৮, পশ্চিম নাখাল পাড়া
ঢাকা-১২১৫

মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান

www.pathagar.com

নিবেদন

বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে যিনি নিজের জীবনের সকল শক্তি-সামর্থ উজাড় করে দিয়ে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আলোকিত জীবন ধারার সাথে পরিচয় করাতে চাইলেন, দয়াময়ের সেই একনিষ্ঠ আব্দ 'আবদুর রহীম'-এর প্রতি তাঁর নিতান্ত অযোগ্য সন্তানের নিবেদন।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

দক্ষিণ এশিয়ার এই বিশাল উপমহাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণ কোনোনা কোনোভাবে ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্র তথা ফিকাহ্‌র রচয়িতা চারজন মনীষীর অনুসারী। কিন্তু প্রধানত উর্দূ এবং বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের জন্য এমন কোনো গ্রহণযোগ্য পুস্তক ছিলনা যা বিতকির্ত মাসায়েল, ব্যক্তিগত মত-পার্থক্য সমূহ এবং দলীয় বিরোধিতা বা টানা পোড়ানের উর্দ্ধে উঠে মহান এই চারজন মনীষীর বিশ্লেষণ ধর্মী জীবন চরিত, ইজতিহাদ, জ্ঞানের বিশালতা, চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান-গবেষণার আকাশচুম্বী কীর্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রীক আলোচনা-পর্যালোচনার কাজ চলতে পারে। আলোচ্য পুস্তকে আমি এই অভাবটা পূরণ করার চেষ্টা করেছি। আমার এই চেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে বিদগ্ধ পাঠক বৃন্দই তা ভাল বলতে পারবেন। উর্দূ ভাষীরা আলাদা আলাদা ভাবে এই চার নেতার জীবনের বাস্তবতার সাথে ততটা গভীর ভাবে পরিচিত নয়। মওলানা শিবলী (রহ) 'সীরাতুন নোমান' লিখে সে ঘাটতি পূরণ করেছেন। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিক দিয়ে এই গ্রন্থটি নিজের তুলনা নিজেই। কিন্তু যেখানে ফুল আছে সেখানে কাঁটাও আছে। অনুরূপভাবে সেখানে তুলনামূলক আলোচনাও যেমন এসেছে তেমনি তিক্ততা এবং বৈরীতাও এসেছে। একজন অখ্যাত অথচ পরিচিত লেখক মওলানা খালেদ 'সীরাতে শাফেয়ী' লিখছেন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ের ওপর তা কালোত্তীর্ণ একখানি গ্রন্থ। কিন্তু গ্রন্থকার ইমাম শাফেয়ীর প্রশংসায় তার কলমের শক্তি ততটা ব্যয় করেননি যতটা অন্যের নিন্দায় ব্যয় করেছেন। অথচ ইমাম সাহেবের মান-মর্যাদা অনেকের চাইতে অনেক উঁচু এবং উন্নত ছিল। ইমাম সাহেবের প্রশংসনীয় গুণাবলির বিস্তারিত বর্ণনা অন্য কারো দোষ-ক্রটির আলোচনা না করেও করা যেতে পারত। কিন্তু বিজ্ঞ লেখক যা করেছেন তা একদিকে যেমন ইমাম সাহেবের মান-মর্যাদাকে খাটো করেছেন অপর দিকে তিনি নিজেও আলোকিত জ্ঞান চর্চাকারীর পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইমাম সাহেবের উন্নত প্রশংসার সাথে সাথে অন্য ইমামগণকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টাকে কোনো প্রশংসনীয় কর্ম হিসেবে আখ্যা দেয়া যায় না। তা সত্ত্বেও তত্ত্ব এবং তথ্যের সংগ্রহ এই গ্রন্থে বিপুল।

হযরত সোলাইমান নদভী (রহ)-এর রচনা শৈলী সম্বদ্ধ ইমাম মালিকের জীবন চরিত বহু পূর্বেই বেরিয়েছে। যদিও গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় তা একখানি গ্রহণযোগ্য কিতাব, সন্দেহ নেই। আলোচনার ধারাটা অনেকটা বিক্ষিপ্ত। অর্থের দিক থেকেও ততটা সমৃদ্ধ নয়। আলোচনার বিন্যাসও ততটা পরিচ্ছন্ন নয়। এসব কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত করার পরিণতি। তার পরও যথার্থ যা আছে

www.pathagar.com

তাকে গনীমত বলা যেতে পারে। মিশর থেকে আরবী ভাষায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের বিশাল বিস্তৃত একখানি জীবন চরিত আগেই বেরিয়েছে। কোনো মহাত্মন তার তরজমা করলে আমাদের অনেকটা প্রয়োজন পূরণ হতো। এবং একখানি গ্রহণযোগ্য কিতাব উর্দূ ভাষাভাষী মানুষ পেতে পারত।

বর্তমান গ্রন্থটি আয়েম্মায় আরবা'আ ওপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রচনা করা হয়েছে, কিন্তু এর বিন্যাস সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। বিষয় বিন্যাসও আমার নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও আমারই, অধ্যায়গুলোও আমি বিন্যাস করেছি। অপ্রয়োজনীয় আলোচনা সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে। বিতর্ক এবং মত-পার্থক্যের ব্যাপারে শুধু উল্লেখকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেখানে কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব হয়নি সেখানে মূল বিষয়কে সামনে রেখে নমনীয় এবং মার্জিত ভাষায় তাকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এভাবে এই গ্রন্থ তাৎপর্যগতভাবে এবং মূল্যমানের দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। কেননা অতিরিক্ত সবকিছু ছেটে ফেলার পর যা কিছুই বাকি রয়েছে তাকে নিংড়ানো পরিশোধিত নির্জাস বললে অতুক্তি হবে না।

নেহায়েত সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই গাবেষণা ধর্মী প্রয়াসকে আল্লাহ তা'আলা আমার আন্তরিকতার জন্য কবুল করবেন বলে বিশ্বাস রাখি এবং পাঠক বৃন্দ কিঞ্চিৎ উপকৃত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

রঈস আহমদ জাফরী
৮৯ টেগোর পার্ক
মিকলোড রোড, লাহোর

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ইমাম আবু হানিফা (রহ) ১৩
বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৫
নাম, বংশ তালিকা, জন্ম ১৬
যোতী গোলাম ছিল না ১৬
মূল জন্মস্থান কোথায় ছিল ১৮
ইমাম সাহেব সাহাবা'র সাক্ষা পেয়েছিলেন ১৮
কেন হাদীস বর্ণনা করেননি ১৯
তাবেয়ী হওয়া প্রসঙ্গে বিতর্ক ১৯
সাহাবা থেকে বর্ণনা করেননি ২১
ডাকনামের উৎস ২১
শিক্ষা অর্জন ও উস্তাদবৃন্দ ২২
উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহ)-এর পূন্যময় খিলাফতকাল ২২
বিদ্যার্জনের তৎপরতা ২৩
ফিকাহর ওপর আগ্রহের কারণ ২৫
ইমাম হাম্মাদ (রা)-এর ছাত্রত্ব গ্রহণ ২৫
ইমাম হাম্মাদ (রহ)-এর ব্যক্তিত্ব সম্মান ও মর্যাদা ২৬
হাদীস সংগ্রহ ২৭
ইল্‌মে হাদীস ও বর্ণনা দক্ষতার জটিলতা ২৯
মক্কা-মদীনা সফর ৩২
ইমাম আবু হানিফ (রা)-এর খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা ৩৬
হাদীস চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতি ৩৭
ইমাম সাহেবের হাদীসের শিক্ষকবৃন্দ ৩৯
ইমামের অনুসন্ধান ও সতর্কতা ৪০
শিক্ষকের আসন গ্রহণ ও কর্মজীবন ৪৩
উস্তাদের আদব ৪৩
শিক্ষকতার পরিধি ৪৪
ক্ষমতা গ্রহণে অস্বীকৃতি ৪৫
ইবরাহীমের প্রতি ইমামের সমর্থন ও সহযোগিতা ৪৭
বাগদাদে ইমামের তলব ৪৮
কারাগারে নিক্ষেপ ৪৯
ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর চিরবিদায় ৫০
নেতৃবৃন্দের অভিব্যক্তি ৫১
ইমাম সাহেবের সন্তান-সন্ততি ৫৩
চরিত্র ও গুণাবলী ৫৪
ইমাম আবু ইউসুফের জবানীতে ইমামের গুণ-বৈশিষ্ট্য ৫৪
ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গি ৫৫
পোষাক পরিধেয় ৫৫
দরবারী টুপি ৫৬
রাজকীয় ভাতা পরিহার ৫৬
স্বাধীনতা ও মুখাপেক্ষীহীনতা ৫৭
বিনিময়হীন সত্যের সাক্ষ্য ৫৭
ব্যবসা ও আমানতদারী ৫৮
ছাত্রদের সাথে আচরণ ৫৯
দান ও বদান্যতা ৫৯
উদারতা ৫৯
অন্যের ঋণ চুকিয়ে দিলেন ৫৯
ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ৬০
বেআদবীর জবাব সহনশীলতায় ৬০
অশোভন উক্তির জবাব ৬১
মায়ের সেবা ৬২
ইবাদত ৬৪
গায়েবী তাম্বীহ ৬৫
প্রতিদিনের নিয়মিত কাজ ৬৬
সত্যনিষ্ঠা ৬৬
দ্বীন ও দুনিয়া ৬৭
কাজী আবু ইউসুফের জন্য নির্দেশনামা ৬৭
একটি ভয়ঙ্কর ফয়সালা ৭২
একটা মজার ফতোয়া ৭৩
খলিফা মনসুর এবং ইমাম সাহেব ৭৩
খারেজীদের কবলে ইমাম ৭৪
আর একটি ঘটনা ৭৫
ইমাম সাহেবের রচনাবলী
মতামত, গবেষণা ও চিন্তাধারা ৭৮
ঈমান কম ও বেশি হয় না ৮৪
ঈমানের ব্যাপারে সবাই সমান ৮৫
কেবলা অনুযায়ী সবাই মুমিন ৮৭
হাদীস এবং উসূলে হাদীস বিষয়ে ইমামের কর্মপদ্ধতি ৮৮
মুজতাহিদ এবং মুহাদ্দিসের মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন ৮৮
চার খলিফার অপ্রতুল বর্ণনা ৮৯

www.pathagar.com

ইমাম বুখারীর বর্ণনা গ্রহণের মাপকাঠি ৮৯
আহলুর রায়-এর বিশ্লেষণ ৯১
ইজতিহাদের শর্ত এবং সে হিসেবে
ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর যোগ্যতা ৯৩
হাফেযে হাদীস হিসেবে গণ্য ৯৪
বর্ণনা পরম্পরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৯৬
হাদীসের সংরক্ষণ ৯৮
বর্ণনা পরম্পরা এবং হাদীস
সংরক্ষণে অসতর্কতার কারণ ৯৮
ত্রুটি গোপন করা ও অস্পষ্ট ১০০
ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য ১০২
বর্ণনার জন্য আবু হানিফা
(রহ)-এর নির্ধারিত শর্তসমূহ ১০২
'حدثنا' শব্দটির অর্থ ও ব্যবহার ১০৪
তাৎপর্যগত বর্ণনা ১০৫
ভাবব্যঞ্জক বর্ণনায় ইমাম
আবু হানিফা (রহ)-এর নীতি ১০৭
বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের নীতি ১০৯
প্রমাণিত হাদীসের বিপরীতে
কিয়াস মূল্যহীন ১১১
কিয়াসের আর একটি তাৎপর্য ১১২
অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের রীতি-প্রক্রিয়া ১১২
হাদীসসমূহের বিন্যাসে বৈপরীত্য ১১৪
আখবারে আহাদের মান ও মর্যাদা ১১৬
অনুমান ভিত্তিক দলিলের বিশ্লেষণ ১১৭
শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ ১১৮
সূত্র ধারায় বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ১১৯
ব্যক্তিত্বের যাচাই ১২০
বর্ণনাকারীদের দলিল ও প্রমাণের গড়মিল ১২০
ভাব প্রকাশ প্রসঙ্গে ১২১
খবরে ওয়াহেদ নিঃসন্দেহ নয় ১২২
ধর্মতত্ত্বে এই রীতির প্রভাব ১২৩
ফিকাহ্ এবং তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ১২৪
ফিকাহ্র ইতিহাস ১২৪
হযরত আলী (রা) ১২৫
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) ১২৫
ইবরাহীম নাখয়ী ১২৬
ফিকাহ্ সংকলনে সহায়তাকারী ছাত্রবৃন্দ ১২৮
নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া ১২৯
আফিয়া ১২৯
বিন্যাস পরম্পরা ১২৯
সেই সংকলনের বিলুপ্তি ১৩০
বেশিরভাগ সুলতান হানাফী
ফিকাহর অনুসারী ছিলেন ১৩২
হানাফী মাযহাবের ব্যাপক
গ্রহণযোগ্যতার কারণ ১৩৩
অন্যান্য মুজতাহিদগণের
মাযহাব প্রচলনের কারণসমূহ ১৩৪
মাসায়েলে ফিকাহ্র ব্যাখ্যা ১৩৫
নিয়ম-নীতির প্রথম অনুসন্ধান ১৩৫
ওয়াসেল বিন আতার কিছু বর্ণনা ১৩৯
দণ্ডবিধি ও রাষ্ট্রনীতির
ভূমিকায় 'হানাফী ফিকাহ্' ১৪১
অন্য দলের দৃষ্টিভঙ্গি ১৪১
ইমাম রাযীর (রহ)-এর যুক্তি ১৪২
যাকাত বিধান ও হানাফী ফিকাহ্ ১৪৪
হানাফী ফিকাহ্র সহজতা ১৪৪
হানাফী ফিকাহ্র নিয়ম অত্যন্ত ব্যাপক
ও সমাজ-সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যশীল ১৪৬
বিবাহের মাসায়েল ১৪৬
বৈবাহিক সম্পর্কে বেছে নেবার স্বাধীনতা ১৪৭
তৃতীয় আলোচনা বৈবাহিক সম্পর্কের
স্থিতি-স্থায়িত্বের কতোটা প্রয়োজন ১৪৮
বিবাহ সম্পাদনের নিয়ম ১৪৯
জিম্মীদের অধিকার ১৫০
সবচাইতে বড় মাসআলা কতল এবং
কেসাসের মাসআলা ১৫০
হানাফী ফিকাহ্ শরীয়তের
মূল সূত্রের সাথে সম্পৃক্ত ১৫৩
হানাফী ফিকাহ্ হাদীস বিরোধী ১৫৪
তায়াম্মুম প্রসঙ্গে ১৫৫
অপরাধ অধ্যায় ১৫৬
উত্তরাধিকার ১৫৮
ইমাম আবু হানিফা
(রহ)-এর বিশিষ্ট ছাত্রগণ ১৫৯
ইমাম সাহেবের সেই সব ছাত্র যারা
ছিলেন সময়ের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ১৬০
ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া
বিন আলী মায়েদাহ্ ১৬২
ইমাম সাহেবের সেই সব ছাত্রগণ
তাদের সময়ে ফিকাহ্র ইমাম ১৬৪
ইমাম মালিক (রহ) ১৭৩
বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৭৫
জন্ম, শৈশবকাল এবং বংশ পরিচয় ১৭৬

www.pathagar.com

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, ফিকাহ্ অধ্যয়ন,
হাদীস সংকলন সম্পন্নকরণ ১৭৭
মদীনার সাহাবী ফকীহ্গণ ১৭৭
ফকীহ্ সপ্তক ১৭৮
ইমাম মালিকের উস্তাদগণ ১৭৮
শায়খগণের সংখ্যা ১৮২
ইলমুল ফিকাহ্ ১৮২
ইমাম মালিকের শায়খ নির্বাচন ১৮৪
ইমাম মালিকের উস্তাদগণের বৈশিষ্ট্য ১৮৫
ইরাকবাসীর কাছ থেকে কেন
তিনি বর্ণনা গ্রহণ করেননি ১৮৬
শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উন্নত মর্যাদা ১৮৯
হযরত ইবনে উমর (রহ)-এর মজলিস ১৮৯
নাফে'র মাজলিস ১৮৯
ইমাম মালিক (রহ)-এর মাজলিস ১৮৯
দরসের মাজলিস ১৯১
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ১৯১
এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ১৯২
ইমাম সাহেবের ছাত্র এবং শিষ্যগণ ১৯৪
ছাত্রগণের বৈশিষ্ট্য ১৯৪
পরিমাণের আধিক্য ১৯৪
খ্যাতি এবং পরিচিতি ১৯৪
শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতা ১৯৫
বিভিন্ন শহরের প্রশাসকগণ ১৯৬
ইমামের তাবেয়ী শায়খগণ ১৯৬
হাদীসের ইমামগণ ১৯৬
মুজতাহিদ ইমামগণ ১৯৬
ফকীহ্গণ ১৯৬
বিচারপতিগণ (কাজী) ১৯৬
সূফী সাধকগণ ১৯৭
কবি ও সাহিত্যিক ১৯৭
ঐতিহাসিকবৃন্দ ১৯৭
ফকীহ্ ও মুফতি হিসেবে
ইমাম মালিক (রহ) ১৯৮
ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসের মধ্যে পার্থক্য ১৯৮
নবুয়তের সময়কাল ১৯৮
আসহাবে সুফ্ফা ১৯৮
ফকীহ্ সাহাবাগণের মান ও স্তর বিন্যাস ১৯৯
মদিনার স্থানীয় সাহাবী এবং
মদীনার বাইরের সাহাবী ১৯৯
মদীনার তাবেয়ী ফকীহ্গণ ১৯৯
রাষ্ট্রীয় ঘোষরাণা ২০১
রাষ্ট্রীয় প্রভাব উপেক্ষা ২০১
লা আদরী ২০১
দূর দেশের কোন প্রশ্নের
জবাব দিতে আপত্তি ২০১
ন্যায়পরায়ণতা ২০৩
ইমাম সাহেবের কৃতিত্ব
ও মর্যাদার স্বীকৃতি ২০৪
কাজ-কর্ম, ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব ২০৫
আব্বাসী খিলাফত ২০৫
ইমামের অস্বীকার ২০৬
মনসুরের অজ্ঞতা ও অনুশোচনা ২০৭
মুহাম্মদ আল মাহদী ২১১
হারুন আর-রশীদ ২১২
পরপারের যাত্রা ২১৫
আচরণ ও কর্ম এবং ব্যক্তি- জীবন ২১৮
আল্লাহ্র আনুগত্য ২১৮
রাসূল প্রেম ২১৮
উদারতা ২১৯
আতিথেয়তা ২১৯
আত্মনিয়ন্ত্রণ ২১৯
জ্ঞান ও ক্ষমাশীলতা ২২০
স্বাধীনতা ও সত্য ভাষণ ২২০
আত্মনির্ভরশীলতা ২২০
ন্যায়পরায়ণতা ২২১
আলেমগণের মর্যাদা ২২২
দেহাবয়ব ২২২
পোশাক ২২২
সুগন্ধীর ব্যবহার ২২২
ইমাম মালিকের রচনাবলীর
ওপরে সাধারণ আলোচনা ২২৪
মুয়াত্তা ইমাম মালিক ২২৬
মুয়াত্তা ২২৭
মুয়াত্তা এবং তার
সমকালীন কিতাবসমূহ ২৩০
হাদীসের কিতাবসমূহের
মধ্যে মুয়াত্তার স্তর ২৩১
ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা ২৩৬
ময়াত্তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পৃথকিকরণ
সনদ সূত্র ও বর্ণনাকারী ২৩৭
ইমাম শাফেয়ী (রহ) ২৪৩
বৈশিষ্ট্যসমূহ ২৪৫
জন্ম, বাল্যকাল এবং প্রতিপালন ২৪৬

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ ২৪৭
শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ২৪৭
শিক্ষা এবং বিভিন্ন বিষয়ের উস্তাদ ও শায়খগণ ২৪৯
ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর সূক্ষ্মদর্শিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা ২৫০
মক্কায় প্রত্যাবর্তন এবং অন্যান্য সফর ২৫১
ভাষা এবং সাহিত্য জ্ঞানে পরিপূর্ণতা ২৫১
ইতিহাস ২৫২
জ্যোতির্বিজ্ঞান ২৫২
চিকিৎসা বিজ্ঞান ২৫৩
মনোবিজ্ঞান ২৫৩
ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর নিজের মুখে বলা একটা ঘটনা ২৫৩
ইমাম শাফেয়ীর গ্রেফতারী এবং রেহাই ২৫৬
নবী বংশের ওপর আব্বাসীদের নির্যাতন ২৫৬
নাজরানের গভর্ণর ২৫৭
সন্তুষ্টি ২৫৮
উদারতা ২৫৯
বিনয় ২৬১
রাসূল (স)-এর অনুসরণ ২৬১
বড়দের সম্মান ২৬২
দরসের মাজলিস ২৬২
ইমাম শাফেয়ীর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি ২৬৫
একটি বিশেষ জবাব ২৬৫
মুফতি-এ-হারামের উচ্চ মর্যাদা ২৬৬
বহস-বিতর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর দক্ষতা ২৬৮
১. ইয়াতিমের সম্পদে যাকাত ২৬৮
২. ফিকাহ্ না তামাশা ? ২৬৯
৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের সাথে বিতর্ক ২৭০
৪. একটি তুচ্ছ বিতর্ক ২৭০
৫. ইমাম মুহাম্মদের সাথে আলোচনা ২৭০
৬. রাসূল (স)-এর কওল থেকে দলিল ২৭১
৭. আরও একটি বহস ২৭২
ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ২৭৪
ইমাম মুহাম্মদ (রহ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ) ২৭৪
ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর অবয়ব-আকৃতি এবং পরিবার-পরিজন ২৭৫
বড় ছেলে আবু ওসমানের পরিচয় ২৭৫
ইমাম শাফেয়ীর (রহ) ছাত্র-শিষ্যগণ ২৭৬
ইমাম সাহেবের আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থান ও মর্যাদা ২৭৯
তাঁর তপস্যা ও ইবাদাতের প্রকৃতি ২৮০
আল্লামা ইবনে জাওযীর বক্তব্য ২৮০
ইমাম সাহেবের কারামত ২৮০
ইমাম শাফেয়ী (রহ) কে রাসূল (স) সুপারিশ করেছেন ২৮১
ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর রচনাবলী ২৮২
ইমাম সাহেবের শায়খ ও উস্তাদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৮৪
কিছু অনুধাবন উপলব্ধি এবং দিক-দর্শন ২৯১
ফিকাহ্র পরিচয় ২৯১
নবুয়ত আমলে ফিকাহ্র তালিম ২৯২
ফকীহ্ সাহাবাগণের তিন স্তর ২৯২
মাসায়েলসমূহের নিবন্ধন ২৯৩
সাহাবাগণের মতপার্থক্য ২৯৪
২. দ্বিতীয় অবস্থা এ রকম ২৯৫
৩. ধরন অনুধাবনে পার্থক্য ২৯৫
৪. রাসূল (স)-এর কাজ দেখে বিভিন্ন ধারণা পোষণ ২৯৫
৫. অন্য মনস্কতা বা ভুলে যাওয়ার কারণে ভুল বোঝা ২৯৫
৬. আংশিক ভুলে যাওয়ার পরিণতি ২৯৬
৭ . মতপার্থক্যের আরো একটি কারণ ২৯৬
৮. পরস্পর বিরোধী বিধানের ক্ষেত্রে মতবৈষম্য ২৯৬
হযরত উমর (রা)-এর কর্ম পদ্ধতি ২৯৭
ইরাক বিজয়ের পর হযরত উমরের ইজতিহাদ ২৯৮
মদীনা মুনাওয়ারার ফকীহ্বৃন্দ ২৯৯
কুফা'র ফকীহ্গণ ২৯৯
শাম এবং দামেস্কের ফকীহ্গণ ২৯৯
তাবেয়ীন ও তবয়ে-তাবেয়ীনের যুগ ৩০০
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সাথে ওলামাদের সম্পর্কহীনতা ৩০০
ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর নীতি-দর্শনের ওপর এক নজর ৩০২
ইমাম শাফেয়ী (র)-এর চিন্তা-দর্শনের মূল্যায়ন ৩০৩
কুরআন, কুরআনের বুঝ, কুরআনের তাফসীর এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ) ৩০৫

www.pathagar.com

কুরআনের তাফসীরে ইমাম শাফেয়ীর অবস্থা ৩০৬
শরীয়তী লৌকিকতার বুনিয়াদ ৩০৬
রাসূল (স) বক্তব্যের তিনটি পর্যায় ৩১৪
হাদীসের আলোচনা, অনুসন্ধান পরিভাষা ও পর্যায় ৩১৬
মওকুফ, মুনকাতে' ও মুতাআল্লাক হাদীস ৩১৯
প্রতারণা ও প্রতারকের ব্যাখ্যা ৩২২
চতুর্থ শ্রেণীর বারজন বিখ্যাত প্রতারক ৩২৫
হাদীস পরস্পর বিরোধী পাওয় গেলে কি করতে হবে ? ৩২৮
হাদীসের বাহ্যিক অর্থকে উপেক্ষা করা যায় না ৩৩৩
সুফল অর্জন এবং ক্ষতি অপসারণ ৩৩৫
বিপরীতমুখী হাদীসসমূহের তদন্ত এবং তদবির ৩৩৮
হজ্ব প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর দলিল ৩৪১
হাদীস কুরআনের রহিতকারী (নাসেখ) হতে পারে না ৩৪৩
সব সামগ্রিকতায় ব্যতিক্রম অনিবার্য ৩৪৫
শুদ্ধ হাদীস এবং সাহাবাগণের উক্তি ৩৪৭
হাদীসের ওপর আমল করা জরুরী ৩৪৮
হাদীস গ্রহণে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর শর্তাবলী ৩৪৯
ফিকাহ্, উসূলে ফিকাহ্, ফিকহী মতামত ৩৫০
ফিকাহ্র পরিচয় ৩৫০
দার্শনীক ফকীহ্গণের ইজতিহাদের ধরন এবং শাস্ত্রজ্ঞান ৩৫২
মুহাদ্দিস ফকীহগণের চিন্তা-দর্শন ৩৫৩
হানাফী মাযহাব ৩৫৫
ফিকাহ্র মূল নীতি ৩৫৫
ইজতিহাদের শর্তসমূহ ৩৫৫
ইজমা ও কিয়াস ৩৫৬
কিয়াসের সংজ্ঞা ৩৫৭
মালিকী ফিকাহ্ ৩৫৯
ইমাম মালিকের চিন্তাধারা ৩৫৯
ইমাম শাফেয়ীর (রহ) নীতি-দর্শন ও ইজতিহাদের রীতি-নীতি ৩৬১
ইমাম শাফেয়ীর দৃষ্টিতে ইজমা ও কিয়াস ৩৬১
কিয়াসের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর রায় ৩৬২
কিয়াসে ইসতেহ্সানের বিরোধিতা ৩৬৩
মাসায়েলে হানাফিয়া ৩৬৫
মাসায়েলে শাফেয়ীয়া ৩৬৫
ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য ও বাণীসমূহ ৩৬৭
ইমাম সাহেবের চরম উৎকর্ষ পদ্য ও গদ্য রচনা ৩৬৯
শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ)-এর চোখে ইমাম শাফেয়ী (রহ) ৩৮২
ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দু'জন স্বনামধন্য ছাত্র ৩৮৭
ইমাম বায়হাকী (রহ) ৩৮৭
হাফেয ইবনে আসকালানী (র) ৩৮৭
মহাপ্রয়াণ ৩৮৯
বিভিন্ন বর্ণনা ৩৮৯
মরণ ব্যাধি ৩৯০
অন্তিম সময় ৩৯০
কিছু সুসংবাদ ৩৯২
ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল (রহ) ৩৯৫
বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩৯৭
জন্ম, লালন-পালন, পরিবার ও বংশাবলী ৩৯৮
শিক্ষা জীবন ৩৯৯
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের উস্তাদবৃন্দ ৪০১
ইমাম সাহেবের ছাত্র ও শিষ্যগণ ৪০২
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৪০৩
খাল্কে কুরআনের ফেত্না ৪০৮
ইসলামী জগতের মূল্যায়ন ৪১৬
রাজতন্ত্রের সাথে সংঘর্ষ এবং তার প্রতিক্রিয়া ৪১৮
ছেলে আবদুল্লাহ্র বর্ণনা ৪২২
ইমাম সাহেবের আকীদা-বিশ্বাস ৪২৩
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের রচনাবলী ৪২৮
যখন বিদায় নিলেন ৪৩০
একনজরে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ)-এর ব্যক্তিত্ব ৪৩৩
সু-সংবাদসমূহ ৪৩৮

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা (রহ)

জন্ম ৮০ হিজরী, ওফাত ১৫০ হিজরী

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- তাবেয়ী ছিলেন।
- আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, আবেদ, জাহেদ ছিলেন।
- আহলে বাইতের অনুরাগী ছিলেন। তাই তৎকালীন শাসকদের হাতে বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন।
- ইমাম মালিক (রহ)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কিছু জানার আশায় তাঁর ছাত্রদের সাথে ক্লাশে বসতেন।
- ইসলামী নীতি শাস্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন। তিনি না হলে 'ফিকাহ্' শাস্ত্রের জন্ম হতো না।
- সম্পদশালী ও ধনাঢ্য ছিলেন অথচ উদার দানশীল। সম্ভ্রান্ত সম্মানিত ছিলেন কিন্তু বিনয়ী। শক্তিশালী ক্ষমতাবান অথচ ন্যায়পরায়ণ, মহান।
- সত্যের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে শাসকদের শত্রু হয়ে যান। নিষ্ঠুরভাবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং সেখান থেকেই ইহকালের মেয়াদ শেষ করে মহান আল্লাহ্ তা'আলার ডাকে পরকালের পথে প্রত্যাবর্তন করেন।
- অধিকাংশ মুসলিম শাসক-প্রশাসক 'হানাফী' মতাবলম্বী ছিলেন এবং মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষই 'হানাফী' মাযহাবের অনুসারী।

www.pathagar.com

নাম, বংশ তালিকা, জন্ম

নাম— নোমান। ডাকনাম— আবু হানিফা। উপাধি ইমামে আযম। বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ নোমান বিন সাবেত, বিন যোতী বিন মাহ্। বংশ পরম্পরার ধারাবাহিক নামসমূহ প্রমাণ করে যে, তাদের অধিকাংশই মুসলিম। তবে ইমাম সাহেব আজমী (অনারব) বংশোদ্ভূত। যদিও এ ব্যাপারে মত-পার্থক্য রয়েছে যে, তাহলে তিনি কোন বংশের এবং আরবেই বা কেমন করে এলেন ? ইমাম সাহেবের প্রো-পৌত্র ইসমাঈলের বরাত দিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক খতিব বোগদাদী বর্ণনা করেন যে, আমি ইসমাঈল বিন হাম্মাদ, বিন নোমান, বিন ছাবেত বিন নো'মান বিন মার্‌যবান। আমরা পারস্য বংশোদ্ভূত এবং কখনো কারো দ্বারা দাসত্বের নিগড়ে বন্দী হইনি। আমার দাদা আবু হানিফা (রহ) ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছাবেত ছেলেবেলায় হযরত আলী (রা)-এর কাছে যাতায়াত করত এবং হযরত আলী (রা) তাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিশেষভাবে দো'আ-প্রার্থনা করতেন। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, সে দো'আ অবশ্যই প্রভাবহীন থাকেনি।[১] ইসমাঈল ইমাম সাহেবের দাদার নাম নোমান এবং তার দাদার নাম মারয্বান বলেছে। অথচ সাধারণভাবে এ স্থানে 'যোতী' এবং 'মাহ্'-এর কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হয়তো যোতী যখন ঈমান এনেছিলেন তখন তার নতুন নাম রাখা হয়েছিল নোমান। ইসমাঈল তাঁর বংশ পরম্পরা বর্ণনা করতে গিয়ে সেই নতুন ইসলামী নামই উল্লেখ করেছে। এ অনুসারে ইসলামী সমাজের মতামতও তাই ছিল। যোতীর পিতার আসল নাম হয়তো অন্য কিছু ছিল এবং মাহ্ ও মার্‌যবান ছিল তার উপাধি। কেননা ইসমাঈলের বর্ণনা এ রকমই এবং তা থেকে এটাও প্রমাণিত যে, পারস্যে তার পরিবার অত্যন্ত সম্মানিত ও বিশেষভাবে খ্যাত ছিল। পারস্য দেশে কোনো শহরের প্রশাসককে মার্‌যবান বলা হয়। যে কারণে এটা অনুমান করা খুব সহজ হয়ে যায় যে, 'মাহ্' এবং 'মার্‌যবান' আসলে উপাধি, নাম নয়। তদুপরি মাহ্ ও মার্‌যবানের মানেও একই। 'মাহ্' মূলত সেই 'মহ্'— যার অর্থ মুরুব্বী বা সরদার। বিখ্যাত কবিতার একটি লাইন—

আরবী বাচনভঙ্গি 'মহ্'কে মাহ্ বানিয়ে দিয়েছে।

যোতী গোলাম ছিল না

যোতী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কিছু ঐতিহাসিক বলেছেন যে, সে কাবুল থেকে বন্দী হয়ে আসে এবং বনী তাইমুল্লাহ গোত্রের এক মহিলা তাকে কিনে নেয়। কিছুদিন গোলামী করার পর মালিক তাকে মুক্ত করে দেয়। এ কারণেই ইমামের বংশকে 'মাওলা বনী তাইমুল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। প্রতিপক্ষ— যারা ইমামের মর্যাদায় কিছুটা ঘাটতি হলে আনন্দ পায় তারা এই বর্ণনাটা লুফে নিয়েছে। অথচ এই 'বাধ্য হয়ে গোলামী করার' ব্যাপারটি যদি প্রমাণিতও হয়

১. মুখতাসার তারিখ বাগদাদ লে ইবনে জায্‌লাহ্ ,তরজামা ইমাম আবু হানিফাহ ১২।

www.pathagar.com

তাহলে তাতে মর্যাদাহানীকর কিছু আছে বলে তো মনে হয় না! পারস্যের রাজবংশের ওপর কালের বিস্মৃতি এই কলংকিত উপাধির দাগ লাগিয়ে দিয়েছে।

আমাদের ওলামায়ে কেরাম হযরত হাজেরা (আ)-কে দাসী হিসেবেই গণ্য করেন (যদিও তাওরাত থেকে তা প্রমাণিত নয়)। ইসলাম পরবর্তী কাছাকাছি সময়ের হাদীসবেত্তা ও বর্ণনাকারীগণের অধিকাংশের ওপর এ ধরনের গোলামী আরোপিত হয়েছিল। ইমাম হাসান বসরী, ইবনে শিরীন, তাওস, আ'তা বিন লিয়ার নাফে, আকরামা মাকহুল, যিনি তাঁর সময়ে সর্বসাধারণের কাছে বরেণ্য ছিলেন। তাঁরা নিজে অথবা তার বাপ-দাদা কেউ না কেউ গোলাম ছিলেন। কাজেই 'যোতী'র গোলাম প্রমাণিত হলেও কিছুই যায়-আসে না। তদুপরি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এর বিরুদ্ধে। ইমামের বংশোৎপত্তির ব্যাপারে আরো অনেক বিতর্ক রয়েছে। আবু মুতী তাঁকে আরব বংশোদ্ভূত হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তিনি যে পরম্পরা বর্ণনা করেছেন তাহলো— নো'মান বিন ছাবেত বিন যোতী বিন ইয়াহ্ইয়া বিন জায়েদ ইবনে আসাদ বিন রাশেদ আল আনসারী। হাফেজ আবু ইসহাক বংশ পরম্পরা এভাবে বর্ণনা করেছেন— নো'মান বিন সাবেত বিন কাওস বিন হরমুয বিন বাহ্রাম।

'যোতীর' আবাস-নিবাস সম্পর্কে বিচিত্র মতামত পাওয়া যায়। আর এটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা সে যখন প্রথম আরবে এসেছিল তখন সবার কাছেই যেমন আগন্তুক ও অপরিচিত ছিল! তেমনি বিদেশী ও ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়ার কারণে স্থানীয় সমাজ তার সব অবস্থা ভাল করে বুঝতেও পারেনি। বা সেও ঠিক যেভাবে যতোটা বোঝান দরকার ততোটা বোঝাতে পারেনি। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে হয়ত একসময় তাকে বাধ্য করেছে স্থানীয় সমাজের সামনে একটু নিচু হয়ে একটা সম্পর্ক গড়ে নিতে। বহিরাগত লোকদের আরবে আগমন এবং স্থানীয় সমাজের সাথে সম্পর্ক স্থাপন— এটা আরবের মানুষের কাছে দূর-অতীত থেকেই পরিচিত। তাই এ ধরনের সম্পর্কের একটা নামও রয়েছে— 'ওলা', যার থেকে 'মাওলা' শব্দের উৎপত্তি। অপরদিকে গোলামকেও মাওলা বলা হয়। এই শব্দ বিভ্রাট কিছু লোকের কাছে 'যোতী'কে গোলাম বানিয়ে দিয়েছে। যা কালের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে একসময় বিশেষ বর্ণনা পরম্পরার মর্যাদা পেয়ে গেছে। যে কারণে ইসমাঈলকে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলতে হয়েছে, "আমাদের বংশের কেউ কখনো কোনভাবেই গোলামী করেনি।" ইসমাঈল অত্যন্ত উঁচুমানের গুরু-গম্ভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাই সূক্ষ্ম-দর্শী ঐতিহাসিকগণ এই বিতর্কে তাঁরই বর্ণনার ওপর ভর করে এই বলে ছেড়ে দিয়েছেন যে, "সাহেবুল বাইত আদরী বীমা ফী-হা" অর্থাৎ বাড়িওয়ালাই জানেন তার বাড়ির মধ্যে কি আছে।

কাজী 'সিমরী' একজন উঁচুমানের লেখক। তিনি পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, 'যোতী' বনী তাইমুল্লাহর সাথে সমপর্যায়ের মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন।[১] 'যোতী গোলাম ছিল এবং কাবুল থেকে বন্দী হয়ে আরবে আসে'— এই গোটা ব্যাপারটাই একটা ভ্রান্ত ধারণার ওপর দাঁড়ান গল্প। যোতীর বাপ-দাদাদের নাম পারস্যের প্রচলিত ফারসী ভাষার নাম। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা থেকেই একথা প্রমাণিত যে, তাঁরা বংশ পরম্পরায় ফার্সী ভাষা জানতেন। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কাবুলের ভাষা ফার্সী নয়।

১. উকূদুল আক্বইয়ান, প্রথম অধ্যায়। আল্লামা নূদী তাহযীবুল আস্মাআ ওয়াল্ লুগাতের ভূমিকায় লিখেছেন যে, মাওলা শব্দটি বেশির ভাগ মৈত্রী-চুক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

মূল জন্মস্থান কোথায় ছিল

'যোতী' সম্পর্কে আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না যে, আসলে তার জন্মস্থান কোন শহরে ছিল। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে কোনো একটিকেও অগ্রাধিকার দেয়া যায় না। নিশ্চিতভাবে শুধু এতোটুকু বলা যায় যে, পারস্য নিবাসী এবং পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। ইসলামের দিগন্তপ্লাবী জোয়ারে এইসব দেশগুলো তখন ডুবু ডুবু। রাজন্যবর্গ তথা গণ্য-মান্য-সম্ভ্রান্ত, বড় বড় নামীদামী পরিবারগুলো তখন নতুন এই মহান 'দ্বীনের' ছায়াতলে আশ্রয় নেবার জন্য কার আগে কে,এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আমাদের ধারণায় 'যোতী'ও ঠিক এই সময়ে ইসলাম কবুল করেছেন। অদম্য কৌতূহল ও আবেগ অথবা পরিবারের প্রাচীনপন্থী সদস্যদের সাথে মত-পার্থক্যের কারণে একাই আরবমুখী হয়েছেন। আমীর (রা) তখন খলিফা ছিলেন এবং 'কুফা' নগরী ছিল রাজধানী। 'যোতী' কুফাকেই তার লক্ষ্যস্থল নির্বাচিত করলেন এবং কার্যত সেখানে এসেই নিজের নিবাস রচনা করলেন। উৎসব আয়োজনে খলিফার দরবারে যাতায়াত করতেন এবং অচিরেই খলিফার দরবারে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজের আসন করে নিলেন। পারসীদের 'নওরোজ' অর্থাৎ তাদের ঈদের দিনে খলিফাকে নজরানা হিসাবে 'ফালুদা' পেশ করলে খলিফা মন্তব্য করলেন, "নওরোজানা কুল্লু ইয়াওম" অর্থাৎ আমাদের এখানে প্রতিদিনই ঈদের দিন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর পিতা সাবেত কুফাতেই জন্মগ্রহণ করেন। নবজাতককে পবিত্র স্পর্শদানের আশায় হযরত আলী (রা)-এর কাছে নিয়ে আসেন। হযরত আলী পরম স্নেহশীল মুরুব্বীর মতো অনেক আদর অনেক স্নেহ অনেক ভালবাসা দিয়ে সাবেত ও তার পিতা এবং তাদের আগামী বংশধরদের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন।

সাবেত এর জীবনাচরণ ও জীবন-যাপন সম্পর্কে কারো কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাঁর খুব কাছের বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেই জানা যায় যে, তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ তখন আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবাণীতে প্রথম পুত্র সন্তান লাভ করেন। পিতা-মাতার পরম কাঙ্ক্ষিত ধন প্রথম পুত্র সন্তানের নাম রাখেন 'নোমান'। যে ছেলের জন্য 'সময়' অপেক্ষা করছিল 'ইমামে আযমের' মুকুট পরাতে।

ইমাম সাহেব সাহাবা'র সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন

সেই সময় আবদুল মালিক বিন মারওয়ান— যাকে মারওয়ানী রাজত্বের দ্বিতীয় বাদশাহ্ হিসেবে গণ্য করা হয়— খিলাফতের উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। এটা তখনকার কথা যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বচক্ষে দেখেছেন এমন কয়েকজন সাহাবী বেঁচে ছিলেন। আবু হানিফা তখন নবীন যুবক। আনাস বিন মালিক— যিনি রাসূলুল্লাহ্র একান্ত সেবক ছিলেন— ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সহল বিন সউদ ৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং আবুল তোফায়েল আমের বিন ওয়াছাহ বেঁচে ছিলেন একশ' হিজরী পর্যন্ত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এঁদের কারও কাছ থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই একটু অবাক হওয়ার মতো। তবে ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে বেশ কিছু কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। কারো কারো মতে আবু হানিফা তখন পর্যন্ত

www.pathagar.com

কোনো ধরনের কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি। ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে তাই সেভাবেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। আরও একটু বড় হওয়ার পর ইমাম 'শা'বী' (রহ)-এর পরামর্শে শিক্ষাগ্রহণ এবং জ্ঞান চর্চার জগতে প্রবেশ করেন। ততোদিনে সরাসরি কোনো সাহাবার কাছ থেকে কোনো জ্ঞানসূত্র পাওয়া বা নেবার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। অর্থাৎ সাহাবাগণের কেউ তখন আর বেঁচে নেই।

কেন হাদীস বর্ণনা করেননি

হাদীস শেখার জন্য কমপক্ষে কতোটা বয়সের প্রয়োজন এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে। কুফা'র বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ন্যূনতম বিশ বছর বয়স না হলে কেউ হাদীস শেখার ক্লাশে যোগ দিতে পারত না।[১] হাদীসের অর্থ-তাৎপর্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সার্বিক দিক নিয়ে যেহেতু ক্লাশে আলোচনা হতো, সেহেতু পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হলে বুঝা এবং অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কোনো রকম ঘাটতি থাকার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এই সাবধানতা। হয়ত এই বাধাটাই ইমাম আবু হানিফাকে বিশেষ একটা বড় মান অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে।

তাহলে যাঁরা দশ-বারো বছর বয়সে সাহাবার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন তাদের বর্ণনা শুধু এ কারণে গ্রহণযোগ্য যে, আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁদের মাঝখানে মাত্র একটা স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে গভীর সন্দেহেরও অবকাশ থেকে যায়, কেননা বয়স কম হওয়ার ফলে হাদীসের মূল বিষয় এবং তার ব্যাখ্যার সবক'টা দিক হয়ত তার আয়ত্তের বাইরেই রয়ে গেছে। যে কারণে মূল বার্তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে অনেক বড় ভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

তাবেয়ী হওয়া প্রসঙ্গে বিতর্ক

গোটা ব্যাপার যাই হোক একটি ঘটনা এখানে পরিষ্কার যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ) কোনো সাহাবীর কাছ থেকে সরাসরি কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি। তবে এতোটুকু সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল যে, যেসব ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় রাসূল (স)-কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাদের মধ্যে কোনো কোনো জনকে দেখে ইমাম আবু হানিফা তাঁর বিশ্বাসী অন্তর এবং দৃষ্টিকে আলোকিত করেছিলেন। ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা তাবেয়ীর মর্যাদা অর্জিত হয় সেহেতু এটা মাযহাবী রীতি রেওয়াজের মধ্যে এসে গেছে এবং এর ওপর বিতর্কেরও অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। নিঃসন্দেহে ইমাম আবু হানিফার এই মর্যাদাবোধের ওপর একটা যথার্থ আত্মাভিমান ছিল যে, তিনি নিজের চোখে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন।

ভিন জাতির কাছে ব্যাপারটা হয়ত তেমন কোনো গুরুত্বই রাখে না। কিন্তু এই সব ঘটনাবলী থেকে সেই প্রেম ও পবিত্র ঈমানী চেতনার উচ্ছ্বসিত আবেগকে অনুমান করতে পারা যায়। যা মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর সাথে সম্পর্কের কারণে সাহাবাদের জন্য যে ভালবাসা ছিল— তা সত্য ছিল।

কতিপয় ব্যক্তিত্ব ইমামকে তাবেয়ী'র মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন, অস্বীকার করতে চান। ব্যাপারটা আদৌ নতুন কিছু নয়। প্রথম প্রথম সাধারণের মধ্যেও ব্যাপারটা নিয়ে সন্দেহ ছিল।

১. মুক্বাদ্দামাহ্ ইবনুস্ সলাহ্, লাখনাউ থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২৫৭।

www.pathagar.com

কিন্তু বরেণ্য মুহাদ্দিসীনগণের এইসব বিতর্কের সঠিক সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার সর্বজন মান্য। তারা ইমামের অবস্থানকে যথার্থ বলে নির্ণয় করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী হাদীস সংক্রান্ত একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছে ফাতোয়া চাওয়া হলে তিনি জবাবে লিখেছেন ঃ ইমাম আবু হানিফার সময়কালে কয়েকজন সাহাবী বর্তমান ছিলেন। ৮০ হিজরীতে 'কুফায়' ইমামের জন্ম এবং সেই সময় আবদুল্লাহ বিন আবী আদনা সেখানে বর্তমান ছিলেন। সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবী আদনা ৮৬ হিজরী অথবা তারও পরে ইন্তেকাল করেন এবং ইবনে সউদের বর্ণনা— যার বর্ণনায় কোনো ঘাটতি বা সন্দেহের অবকাশ নেই— তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা সাহাবী আনাস বিন মালিক (রা)-কে দেখেছিলেন। এই দু'জন সাহাবী ছাড়া তখন বিভিন্ন শহরে আরও সাহাবায়ে কিরাম বর্তমান ছিলেন।

কিছু লোক সেই হাদীসসমূহ একত্র করেছেন ইমাম সাহেব যা সাহাবার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই সব হাদীসের সনদ দুর্বলতা মুক্ত নয়। সর্বোপরি ইবনে সউদ যেভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাহেব কতিপয় আসহাবে রাসূলকে দেখেছেন এবং তিনি সেই সমসাময়িক কালেরই লোক, এটাই সত্যি। সুতরাং তাঁর অবস্থান তাবেয়ীদের পর্যায়ে গণ্য যা সমসাময়িক অন্যান্য ইমামগণ যেমন আওজায়ী শামে, হাম্মাদ বসরায়, সূরী কুফাতে, ইমাম মালিক মদীনা শরীফে, লাইস মিসরে— এঁদের বেলায় প্রমাণিত নয়। বাকী আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।[১]

ইবনে সউদের যে বর্ণনার বরাত হাফেজ ইবনে হাজার দিয়েছেন তা শুধুমাত্র একটি স্তর অর্থাৎ সাইফ বিন জাবেরের মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফার কাছে পৌছেছে। অর্থাৎ ইবনে সউদ সাইফ বিন জাবের থেকে শুনেছেন এবং সাইফ খোদ ইমাম আবু হানিফা থেকে।[২] আল্লামা নূদী তাহযীবুল আসমা'আতে ইবনে সউদ সম্পর্কে লিখেছেন যে, যদিও তার শায়েখ ততোটা নির্ভরযোগ্য নন কিন্তু তিনি নিজে অত্যন্ত আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য। সাইফ বিন জাবের বসরার প্রধান বিচারপতি ও সত্যবাদী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। সে কারণে এই বর্ণনা এতোটা সঠিক ও সত্যায়িত যে, শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতম হাদীসও এর থেকে বেশি সঠিক হতে পারে না।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে খতীব বোগদাদী, কিতাবুল আনসাবীর লেখক আল্লামা সাম'আনি, সহী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা নূদী, আল্লামা যুহবী, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, যয়নুদ্দীন ইরাকী, আবু মহাসীন দামেশকী প্রমুখ বড় বড় হাদীস বেত্তা এবং তা বর্ণনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসীনগণ সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে 'ফয়সালা' দিয়ে দিয়েছেন যে, ইমাম আবু হানীফা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছিলেন।[৩]

ইবনে খালকানও খতীব বোগদাদীর উক্তিকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেহেতু ওপরে উল্লেখিত কিছু ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা সরাসরি কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ এবং তাঁদের কাছ থেকে কোনো বর্ণনা পাননি। তাতে মানুষ দ্বিধায় পড়ে ভাবছে যে,

---

১. এই ফতোয়াটি হাফেয আবুল মাহাসিন উকুদুল জামানে মূল পাঠাংশ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এবং আমি তার শাব্দিক অর্থ করেছি।

২. আল্লামা যুহবীর তায্কেরাতুল হুফ্ফায়ে এই ব্যাখ্যা রয়েছে।

৩. খতীব বোগ্দাদীর মুখ্তাসার তারীখ, কিতাবুল আনসাব, তাহযীবুল আসমা'আ ওয়াল্লুগাত, তাযকেরাতুল হুফ্ফায, ইব্‌র ফী আখ্বার মিন গুবার, যুহ্বী, তাহ্যীব আহ্তাহযীব, ইত্যাদি গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফার জীবনী প্রসঙ্গে।

www.pathagar.com

হয়ত ইবনে খালকান ইমামের তাবেয়ী হওয়াটাও অস্বীকার করছেন। আসলে ইবনে খালকান বলেছেন যে, ইমাম কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ এবং তাঁর কাছ থেকে কোনো 'বর্ণনা' পাননি। কোনো সাহাবীকে চোখেও দেখেননি এমন কথা তার উল্লেখের মধ্যে নেই। আর যদি তার উল্লেখকে সার্বিক নেতিবাচক অর্থেই নেয়া হয় যে রকম অনেকেই নিয়েছেন তাহলে তাদের জবাবে শুধু এতোটুকু বলা যায় যে, এত বড় বড় মুহাদ্দিসীনগণের বিরপরীতে শুধু তার একার এই মন্তব্য কতোটুকু গুরুত্ব পেতে পারে ?

বর্ণনা-রীতির নীতি নির্ধারণ হয়েছে এভাবে যে— যদি কোনো ঘটনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক সাক্ষ্যদাতা সমান মর্যাদা ও সমান সংখ্যক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত যাবে ইতিবাচকের দিকে। বস্তুত আমাদের আলোচিত সমস্যার ইতিবাচক সাক্ষ্যের তুলনায় নেতিবাচক সাক্ষী খুবই সাধারণ মানের যা কোনোভাবে গণ্য করার মতো নয়।

সাহাবা থেকে বর্ণনা করেননি

কতিপয় হানাফী সমর্থক "শুধু দেখেছেন নয়, সাহাবার কাছ থেকে বর্ণনাও শুনেছেন" বলে দাবি করেন। অবাক ব্যাপার হলো, হেদায়ার ব্যাখ্যাকারী আল্লামা আইনীও এই রকম ভ্রান্তির শিকার। কিন্তু ন্যায় ও সত্যের মানদণ্ডে এই দাবি সঙ্গত অবস্থানে উঠে আসে না। অপরদিকে আবুল মুহাসিন তার 'উকুদ আল-জুমান'-এ সেইসব হাদীসসমূহের সনদসহ উল্লেখ করেছেন যে সব হাদীস সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, ইমাম সাহেব নিজে সাহাবার কাছ থেকে শুনেছেন। অতঃপর হাদীস সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী তাকে যাচাই-বাছাই করার পর প্রমাণিত হয় যে, তা মানোত্তীর্ণ নয়। হাদীস সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে বিতর্ক তো প্রেক্ষিত অনুযায়ী। তবে পরিষ্কার কথা হলো, ইমাম সাহেব কোনো সাহাবার কাছ থেকে সরাসরি একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকলেও তার সবচাইতে বড় সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াত তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রগণ। কিন্তু কাজী আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, হাফেজ আবদুর রাজ্জাক বিন হামাম, আবদুল্লাহ বিন আল মুবারক, আবু নঈম, ফজল বিন অকীহ, মক্কী বিন ইবরাহীম, আবু আসেম আল জাবিল (রহ) প্রমুখ যারা ইমামের একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন এবং সত্যি কথা বলতে এঁরাই তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠার বড় বড় প্রবক্তা— কিন্তু কোনো ঘটনার ব্যাপারে বাড়তি একটি অক্ষরও তাঁরা লিখেননি।

ডাকনামের উৎস

তিনি যে নামে বেশি পরিচিত তা তাঁর আসল ডাকনাম নয়। হানিফা নামে তার কোনো ছেলেও ছিল না। এই ডাকনাম তার গুণগত অর্থে ও তাৎপর্য অনুযায়ী। অর্থাৎ আবুল মিল্লাহ আল হানিফা। কুরআন মজীদে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন ঃ

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا -

তোমরা সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্য ধর্মের অনুসারী। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৫)

ইমামের আবু হানিফা নাম গ্রহণের পেছনে এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

www.pathagar.com

শিক্ষা অর্জন ও উস্তাদবৃন্দ

অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ ও অশান্ত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ইমামের শৈশবকাল কেটেছে। সে সময় খলিফা আবদুল মালিকের নিয়োগকৃত ইরাকের গভর্ণর ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। চারিদিকে এক ত্রাসের রাজত্ব। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরোধিতার কারণে আরব ও ইরাকে মারওয়ানী শাসন তখনো শক্ত অবস্থানে পৌছাতে পারেনি। হাজ্জাজী নির্যাতনের পাগলা ঘোড়াগুলো লাগামহীনভাবে ছুটে চলেছে বিশ্ববরেণ্য মর্যাদাবান আলেম ও প্রাণপ্রিয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দুয়ারে দুয়ারে হানা দিয়ে দিয়ে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহ্) যথার্থই বলেছেন যে, "যদি অন্যান্য পয়গাম্বরদের উম্মতরা সবাই মিলে যার যার সময়ের বদকার শাসকদের একত্রিত করে আর আমরা শুধুমাত্র হাজ্জাজকে তাদের মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দেই, তাহলে আল্লাহ্র কসম করে বলতে পারি আমাদের পাল্লা ভারী হবে"

৮৬ হিজরীতে আবদুল মালিকের ওফাতের পর তার ছেলে অলীদ ক্ষমতার মসনদে আরোহন করে। এসময় সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রভূত অগ্রগতি সার্ধিত হয়। সিন্ধু ও স্পেনের মতো বড় বড় দুটি রাজ্য এ সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিনে চলে আসে। খাওরিজিম ও সমরকন্দ থেকে নিয়ে কাবুল ও ফারগানায় ইসলামী পতাকা উড্ডীন। স্পেনের দিকে দুটি দ্বীপ মনুরেকা ও মেওয়ারাকায় বিজয় অর্জিত কিন্তু ইসলামের আত্মিক চেতনার বিকাশ তথা তওহীদের আলোকিত প্রভাব কোথাও ছিলনা। শাসকদের মধ্য যে যতটা সাম্মিনত ও অহংকারী ছিল, ততটাই ছিল জালিম ও নির্যাতক। ওমর ইবনে আবদুল আজীজের ভাষায় সেই সময়ের মূল্যায়নে শামে অলীদ, ইরাকে হাজ্জাজ, হেজাজে ওসমান, মিসরে কুাররাহ— আল্লাহ্র কসম গোটা পৃথিবী জুলুমে ভরে গেছে।

ত্রাস, সন্ত্রাস, জুলুম, নির্যাতনে সেই মহা প্লাবনের মধ্যেই জ্ঞানচর্চার দরস ও তালীমের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়নি। এখানেও হাদীস ও তার বর্ণনা-বিজ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র, শিক্ষা-কেন্দ্র চালু ছিল। ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ, হাদীস বিশেষজ্ঞগণ, মুহাদ্দিসীন সীমাহীন অশান্ত ও অস্থীর পরিবেশের মধ্যেও তাদের শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত সম্পূর্ণ আল্লাহ নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমগণের ক্ষেত্রে যতটুকু থাকা উচিত ছিল, সেতুলনায় কমই ছিল!

উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহ)-এর পূন্যময় খিলাফতকাল

মুসলমানদের ভাগ্যাকাশ থেকে একটি দুষ্টগ্রহ খশে যাবার মতো ৯৫ হিজরীতে হাজ্জাজ মৃত্যু বরণ করে। মাত্র এক বছরের মাথায় খলীফা অলীদও ৯৬ হিজরীতে পরলোক গমন করে। অলীদের পর মুসলিম বিন আবদুল মালিক খিলাফতের মসনদে আসীন হন। যাকে উমাইয়াহ্ বংশের খলীফাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম খলীফা হিসেবে ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন। ইসলামী সমাজ ও সাম্রাজ্যের সবচাইতে বড় কল্যাণ, যা সুলাইমান করেছেন তা

www.pathagar.com

হলো শাহী উপদষ্টা হিসেবে উমর ইবনে আবদুল আজীজকে নির্বাচন ও নিয়োগ দান এবং মৃত্যুকালে লিখিত অসিয়ত রেখে যান যে, তার পরে খিলাফতের উত্তরাধিকারী হবেন উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহ)।

৯৯ হিজরীতে সুলাইমান পরোলোকে গমন করলে অসিয়ত মোতাবেক উমর ইবনে আবদুল আজীজ খিলাফতের মসনদে বসেন। তাঁর খিলাফত আকস্মিকভাবে মারওয়ানী খেলাফতের চেহারা বদলে দেয় এবং গোটা সাম্রাজ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, মানবতার সর্বোচ্চ বিকাশে ঐশী বিধানের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহারের ফলে সামাজিক শিষ্টাচার ও পারস্পরিক কল্যাণ কামনার সুন্দর এক সুবাতাস বইতে শুরু করে।

জুম'আ ও ঈদের খোৎবাসমূহে হযরত আলী কাররামাল্লাহ'র ওপরে বদ-দো'আ ও অভিশাপ বর্ষণের দীর্ঘদিনের রেওয়াজকে রাষ্ট্রীয় ফরমানে বন্ধ করে দেন। বনু উমাইয়ার শাহজাদা-শাহজাদীদের কাছ থেকে জমিদারী কেড়ে নেয়া হয়। যেখানে যেখানে অত্যাচারী, বিলাসী, নির্যাতক শাসক-প্রশাসকদের সন্ধান পেয়েছেন বরখাস্ত করেছেন। সর্বোপরি ইলমে-দ্বীন অর্থাৎ ইসলামী জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রটিকে তিনি এতোটাই উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন যার ফলস্বরূপ ঘরে ঘরে তার চর্চা শুরু হয়ে যায়। তিনি সংগৃহীত হাদীসকে একত্রিত করে সংকলন করার জন্য ইমাম জুহরীকে অনুরোধ করেন এবং সেই সংকলনের অনুলিপি করিয়ে তা সাম্রাজ্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেন।

হাজ্জাজ ও সুলাইমানের রাজত্বকালে ইমাম আবু হানিফা শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেও ব্যবসায়ী করনে তা হয়ে উঠেনি। ব্যবসায়ী বাপ-দাদার উত্তরসূরী, রেশমী সুতার কারখানা করেছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তা অনেক বড় করে গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সুলাইমানের আমলে শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা যখন ব্যাপকভাবে শুরু হলো, তখন তাঁর মনেও জ্ঞানের প্রতি আগ্রহের সেই বীজ আবার অংকুরিত হয়েছিল। সৌভাগ্যের সুভ ইঙ্গিত নিয়ে ঠিক এই সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা তাঁর অংকুরিত আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেবার পথ তৈরী করে দিল।

বিদ্যার্জনের তৎপরতা

একদিন বাজারে যাবার সময় 'কুফা'র বিখ্যাত ইমাম শা'বী (রহ)-এর বাড়ির সম্মুখের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইমাম সাহেব নবীন যুবককে দেখে ভেবেছিলেন, বোধহয় তাঁর কাছেই ছাত্র হওয়ার জন্য আসছে। তিনি কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ ? আবু হানিফা একজন সওদাগরের নাম বললেন। তিনি আবার বললেন, আসলে আমি জানতে চেয়েছি, তুমি কার কাছে লেখাপড়া করছ ? আবু হানিফা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন, কারো কাছেই নয়। ইমাম শা'বী আরো কাছে ডেকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বললেন, আমি তোমার মধ্যে প্রতিভার এক চাপা আলো দেখতে পাচ্ছি, তুমি জ্ঞানী-গুণীজনদের সাথে উঠা-বসা কর। এই উপদেশ তাঁর অন্তরে গভীর দাগ কেটেছিল এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সত্যি সত্যিই এই পথে চলতে শুরু করে দিলেন। শিক্ষার বিষয় বলতে তখন পর্যন্ত যা ছিল তা আরবী সাহিত্য, বংশ পরম্পরা, আরবের ইতিহাস, ফিকাহ্, হাদীস, কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি। কালাম শাস্ত্র বলতে আজকের ইলমে কালাম নয়, কেননা তখন পর্যন্ত ইসলামী বিষয়াদির ওপর দর্শনের প্রভাব পড়েনি। তাছাড়া এসব বিষয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনা এবং এর মাধ্যমে প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের এর

www.pathagar.com

চাইতে প্রশস্ততর ক্ষেত্র ছিল না। যতোদিন ইসলাম শুধু আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তার বিষয়াদিও ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল এবং পরিচ্ছন্ন। কিন্তু পারস্য ও মিশর এবং শামে এসেই এর গায়ে বিভিন্ন রং চড়তে শুরু করল। এসব দেশে যদিও প্রজ্ঞা ও দর্শন চর্চা ততোটা শক্তিশালী ছিল না। তবে ভাঙাচোরা, বিকৃত যেভাবেই যা ছিল সাধারণের মধ্যে তার প্রভাব ছিল এবং সাধারণের মানসিকতা ছিল সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং ধারণা-অনুমানে অভ্যস্ত।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাগুণ, সৃষ্টিজগতের শুরু এবং শেষ ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত আছে আরবের লোকেরা তাকে সরল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছে এবং একনিষ্ঠ বিশ্বাসের জন্য তা-ই যথেষ্ট ছিল। অপরদিকে পারস্য ও শামে তা নিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে গেল। উন্নত সভ্যতা-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যা খুবই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। রূপকালঙ্কার, উপমা, গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচিতি-অপরিচিতি, আগমন সংঘটন ও মোটকথা এই ধরণের প্রচুর বিষয়াদি বেরিয়ে আসে যেগুলো বিতর্ক বিশ্লেষণের বিস্তৃতির ফলে আলাদা একটা শিল্পে পরিণত হয়েছিল। ধীরে ধীরে ঈমান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদিতে উল্লেখিত সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। অপরদিকে বর্ণনাকারীগণের (হাদীস) মতপার্থক্যে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি শুরু হয়ে যায়। যেমন কুদুরী, মুরজী, মুতাযেলী, জাহমী, খারেজী, রাফেজী ইত্যাদি ফেরকাসমূহ। এই ফেত্না এতোটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে যে, সত্য সন্ধানী দল যারা এ পর্যন্ত এসব বিতর্ক এড়িয়ে চলত, তাদেরকেও ঐসবের বিরোধিতার প্রয়োজনে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এভাবেই ইল্মে কালামের উদ্ভব ঘটে। যাকে আবার সংগ্রহ বিন্যাসের ব্যাপকতা এমন অবস্থানে তুলে দেয় যে, ইমাম শু'রী ও আবু মনসুর মাতুরীদির মতো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দও এর প্রভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েন।

ইলমে কালাম ইতিমধ্যে সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত হয়ে মোটামুটি নতুন এক ধরনের বিজ্ঞানের মর্যাদা নিয়ে জ্ঞান-জগতে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তা অর্জনের জন্য তখন পর্যন্ত শুধুমাত্র জন্মগত প্রতিভা এবং ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন ছিল। সেসবের সমন্বয় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম আবু হানিফার মধ্যে নিজেই যেন করে দিয়েছিলেন। শিরা-উপশিরায় ইরানী রক্ত, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং কোন কিছু অর্জনে একনিষ্ট একাগ্রতা নিয়ে জ্ঞান-জগতে ইমামের প্রবেশ। ধর্মীয় নিয়ম-নীতি (মাসায়েল) ও মূল থেকে বর্ণনা পরম্পরা (রেওয়ায়েত) কুফা নগরীতে (এর চর্চা) এতোটাই ব্যাপক ছিল যে, একজন সাধারণ লোকও জ্ঞানী-গুণীজনের সাথে উঠা-বসার মাধ্যমে তা জেন নিতে পারত। তর্কশাস্ত্রে ইমাম নিজেকে এমন পর্যায়ে তুলে আনেন যে, বড় বড় উস্তাদগণ এ ব্যাপারে তার সাথে মুখোমুখি হতে ভয় পেতেন।

তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি ও ফেরকাবাজদের এবং বিশেষ করে খারেজীদের কেন্দ্র ছিল তখন বসরা। ব্যবসা উপলক্ষে আবু হানিফা (রহ)-এর প্রায়শই এখানে যাতায়াত করতে হতো। আবাদিয়া, ছোগারিয়া, খোশীয়া ইত্যাদির সাথে প্রতিবারই 'বহস' হতো এবং সবসময় 'জয়' ইমামেরই হতো। শেষ পর্যন্ত একসময় এসব থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামের ফিকাহ্র (নীতিশাস্ত্র) প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং আমৃত্যু এই সাধনায় নিজেকে উজাড় করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু যেহেতু তর্কশাস্ত্রই ছিল তার জ্ঞান-জগতে প্রবেশের প্রথম তোরণ, তাই তাকে একেবারেই ভুলে যেতে পারেননি। খারেজী ও অন্যান্যদের সাথে মাঝে মাঝে তিনি রসিকতা করতেন। যে 'কথোপকথন' ইল্মে কালামের ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে তার কিছু ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে সম্মুখে আসবে।

www.pathagar.com

ফিকাহ্‌র ওপর আগ্রহের কারণ

প্রথম প্রথম বিষয়টি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে চর্চা করতেন, কিন্তু বয়স এবং অভিজ্ঞতা যতোই বাড়তে লাগল ততোই তিথিয়ে যাচ্ছিলেন। কেমন যেন ভেতর থেকেই গরজ হারিয়ে ফেলছিলেন। তাঁর একটা উক্তি এখানে উল্লেখ্য, "প্রথম বয়সে আমি এ বিষয়ক জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠতম মনে করতাম, কেননা আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ঈমান ও দ্বীনের বুনিয়াদ এই বিষয়টির ওপরে দাঁড়ানো। কিন্তু পরে মনে পড়ল বরেণ্য সাহাবাগণ এই ধরনের বিতর্ক থেকে সবসময়ই নিজেকে দূরে রাখতেন। অথচ এসব ব্যাপারে তাঁদের চাইতে বেশি কার পক্ষেই বা জানা সম্ভব ?"

তাঁর গবেষণা ও চর্চা প্রধানত নীতি বিষয়ক অর্থাৎ ফিক্‌হী মাসায়েল এবং শিক্ষার্থীদেরকেও তা-ই শিখাতেন। হঠাৎ মনে হলো, যারা এই তর্কশাস্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন তাদের বাস্তব জীবনচরণ কি রকম ? গোটা ব্যাপারটা যখন তার মনের পটে ভেসে উঠল, একেবারে চুপসে গেলেন তিনি। কেননা তাদের মধ্যে চারিত্রিক পবিত্রতা এবং আত্মিক শক্তি ও আলোর বিচ্ছুরণ কোথায়? যা অতীতে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের ছিল। দ্বিধা-দ্বন্দের কালো কালো মেঘে মনের আকাশটা ঢেকে যাচ্ছিল দিন দিন।[১]

এ সময়ে একদিন এক মহিলা এসে একটি মাসলা জানতে চাইল : 'এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর সঠিক সুন্নতি কায়দায় তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়'— কেমন করে তা দিতে হবে। ইমাম মহিলাকে তা বলতে পারলেন না। তবে কাছেই ইমাম হাম্মাদের শিক্ষাশ্রম ছিল, সেদিকটা দেখিয়ে মহিলাকে তার কাছেই প্রশ্নটা করতে বললেন এবং বললেন, তিনি কি উত্তর করেন তা যেন সে অবশ্যই তাকে জানিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর মহিলা ফিরে এল এবং বলল, হাম্মাদ 'এই উত্তর দিয়েছে'।

ইমামের যেন টনক নড়ে উঠল! ঠিক তক্ষণি উঠে দাঁড়ালেন এবং ইমাম হাম্মাদের শিক্ষাশ্রমে গিয়ে বসলেন।

ইমাম হাম্মাদ (রহ)-এর ছাত্রত্ব গ্রহণ

ইমামের প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে আরও একটি বর্ণনা রয়েছে। 'খতীব' যার বর্ণনা পরম্পরা ইমাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন— ইমাম নিজে বলেছেন : যখন শিক্ষা অর্জন করবো বলে স্থির করলাম তখন দেখলাম শেখার মতো অনেক বিষয় রয়েছে, একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম— কোনটা নেব ? প্রথমেই মনে হলো তর্কশাস্ত্রের কথা, সাথেই সাথেই মনে হলো সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। একটা দীর্ঘ সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন যোগ্যতা অর্জিত হবে তখন তা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করা যাবে না শুধু এই ভয়ে যে, মানুষ বলবে 'সন্দেহপ্রবণ ধর্মত্যাগী'। সাহিত্য ও শুদ্ধ পাঠ (ক্বিরাত)! প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা আছে এতোটুকুই প্রাপ্তি। শে'র ও শায়েরী অর্থাৎ কাব্য চর্চা— অহেতুক পরচর্চা আর মিথ্যা খোষামোদী ছাড়া এর মধ্যে আর কি আছে ? হাদীসের ব্যাপার! প্রথম তো একটা সময় তার প্রয়োজন ছিল এবং সবসময় একটা ভয় আর দুশ্চিন্তা লেগে থাকত যে, মানুষ 'জটিল প্রশ্ন এবং তার সঠিক উত্তর দাতা'র কেন্দ্র বানিয়ে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত 'ফিকাহ্'র ওপর দৃষ্টি পড়ল এবং দুনিয়া ও দ্বীনের যাবতীয় প্রয়োজন এখানেই রয়েছে বলে মনে হলো।

১. উকুদুল জুম্‌আন, ষষ্ট অধ্যায়।

www.pathagar.com

কিন্তু এই বর্ণনা নিছক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্ভরযোগ্য অন্যান্য সকল বর্ণনাসমূহ এর বিরুদ্ধে। বিষয়সমূহ সম্পর্কে ইমাম সাহেব যে ধরনের মন্তব্য করেছেন বলে বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে তা কোনো মূর্খের পক্ষেও করা সম্ভব নয়। ইমাম সাহেব ইল্‌মে কালাম এবং হাদীস সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন এমন কথা ভাবনারও অতীত। এ বর্ণনাকে সঠিক ধরে নিলে মনে করতে হবে যে, ইমাম সাহেব বিষয় দু'টিকে তার জন্য যোগ্যই মনে করেননি, তুচ্ছ মনে করেছেন। অথচ এই দু'টি বিষয়ের ওপর তাঁর জ্ঞান গবেষণা এবং দক্ষতার কথা গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে 'বিস্ময়' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের ধারণায় ইমাম সাহেব তাঁর শিক্ষা সমাপনান্তে সাধনার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি 'ফিকাহ্'কে বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বের পক্ষে ইসলামী সমাজের বিন্যাস ও বিকাশের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যতে কি প্রয়োজন পড়তে পারে তা অনুধাবন করতে পারা স্বাভাবিক ও সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু ওপরে ইমাম সাহেবের নিজের কথা বলে উল্লেখিত কথাটা বর্ণনাভঙ্গির নাটকীয়তার জোরে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এতো দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালের বেশ ক'জন লোক তাদের বই-পুস্তকে ওটা উল্লেখ করেছেন।

'উকূদুল জামান'-এর লেখক তাঁর বইতে বর্ণনাটি উল্লেখ করায় যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হন। 'ইবনে জাযলা' বাগদাদের ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত সংকলন করেছেন তাতে ঐ বর্ণনাটি রয়েছে। তবে পার্থক্য এতোটুকু যে, বিষয়সমূহ সম্পর্কে মন্তব্য ইমাম সাহেবও তা স্বীকার করেছেন।

ইমাম হাম্মাদ (রহ)-এর ব্যক্তিত্ব, সম্মান ও মর্যাদা

ইমাম হাম্মাদ তৎকালীন কুফা'র বিখ্যাত ইমাম এবং সবচাইতে বড় উস্তাদ হিসেবে গণ্য হতেন। রাসূল (স)-এর একান্ত সেবক হযরত আনাস (রা)-এর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন, এছাড়া অন্যান্য বড় বড় তাবেয়ীগণের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভে ধন্য ছিলেন। তাঁর মাদরাসাকে তৎকালীন কুফা'র প্রধান জ্ঞান-কেন্দ্র হিসেবে মানা হতো। মুস'আর ও শো'বা ফিকাহ্ শাস্ত্রের নেতৃস্থানীয় এই দু'জনও তাঁর এখানেই শিক্ষা লাভ করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ থেকে ফিকাহ্'র যে পরম্পরা চলে এসেছে, সেই ধারাবাহিকতার সেই সময়কার ধারক তিনিই ছিলেন। জ্ঞান-গবেষণা এবং ছাত্রদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কাজে সদা ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকতেন। রুটি-রুজির কোন ভাবনা-চিন্তা ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা বৈষয়িক দিক থেকে তাঁর প্রতি মেহেরবাণীর দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সচ্ছল ছিলেন, ধনাঢ্য ছিলেন। আবু হানিফা তাঁর কাছেই ইল্‌মে ফিকাহ্'র তা'লিম নেবেন বলে মনস্থির করলেন।

উস্তাদ যখন কোনো একটি বিশেষ 'মাসলা' বা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন ছাত্ররা তা মুখে মুখে শিখে নিত। কখনো কোন বিশেষ বিষয় লেখার প্রয়োজন হলে লিখে নিত। এই ছিল শিক্ষা পদ্ধতি।

নতুন ছাত্র হিসেবে প্রথম দিন আবু হানিফার স্থান হয় প্রশিক্ষকের বাঁ দিকের কাতারে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মেধা, যোগ্যতা ও স্মরণশক্তির গুণে ক্লাসের সবার সামনে উস্তাদের কাছে এসে বসার সুযোগ করে দিল।[১] অন্য উস্তাদের কাছে ইতিমধ্যে হাদীসের তালিম নিতে শুরু করলেও হাম্মাদের ক্লাসে কখনই গরহাজির থাকেননি। তার নিজের একটি বর্ণনা এখানে

১. উকূদুল জুমআন, ষষ্ঠ অধ্যায়।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য ঃ দুই বছর ইমাম হাম্মাদের কাছে তালিম নেবার পর মনে হচ্ছিল নিজেই এখন শেখাতে পারব। কিন্তু উস্তাদের অনুমতি ছাড়া কি করে সম্ভব ? আল্লাহ্ তা'আল সে ব্যবস্থাও করে দিলেন।

উস্তাদ হাম্মাদের বসরা নিবাসী একজন নিকটাত্মীয় মারা গেলে একমাত্র উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে তাঁকে সেখানে চলে যেতে হলো। যাবার সময় উস্তাদজী আমাকে তাঁর জায়গায় বসিয়ে গেলেন। বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আসা লোকজন এবং ছাত্রদের সব দায়িত্ব তখন আমার ওপর। এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকলাম যার অনেকগুলোই আমি উস্তাদের কাছে শিখিনি। তাই নিজেই বিচার-বিবেচনা করে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম এবং সাবধানতার জন্য সে সব প্রশ্ন ও উত্তর লিখে রাখতে লাগলাম। দুই মাস পরে উস্তাদজী বসরা থেকে ফিরে এলেন। লিখে রাখা প্রশ্ন-উত্তরগুলো তাঁকে দেখালাম। সর্বমোট ষাটটি প্রশ্নের মধ্যে বিশটির ভুল-ভ্রান্তি পাওয়া গেল যা তিনি শুধরে দিলেন, বাকীগুলো সম্পর্কে বললেন ঃ তোমার উত্তর সঠিক ছিল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, যে ক'দিন উস্তাদজী বেঁচে আছেন ইনশাআল্লাহ্ সে ক'দিন আমি তাঁর ছাত্র হয়েই থাকব। ইল্‌মে ফিকাহ্'র সমসাময়িক অন্যান্য উস্তাদদের কাছেও আবু হানিফার যাতায়াত এবং জ্ঞানার্জন অব্যাহত ছিল কিন্তু ইমাম হাম্মাদের কাছেই ছিল তাঁর সবচাইতে বড় ঋণ। তাই তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা এবং সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধও ছিল সীমাহীন।

হাদীস সংগ্রহ

ছাত্রাবস্থা থেকেই আবু হানিফা (রহ)-এর হাদীস সংগ্রহের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। কেননা ইসলামের বিধি-বিধান ও নীতি শাস্ত্রীয় বিষয়সমূহে (ফিক্‌হী মাসায়েল) বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্তের বেলায় হাদীসের ভূমিকা অনস্বীকার্য, একথা তিনি জানতেন।

সেকালের ইসলামী দেশগুলোতে ইল্‌মে হাদীসের চর্চা ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এতোটা ব্যাপক আকারে ছিল যে, প্রায় সব জায়গাতেই সনদ ও বর্ণনা পরম্পরার সঠিক তথ্যসূত্র পাওয়ার তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। কমপক্ষে দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্ এবং রাসূলের দাওয়াত নিয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে উন্মুক্ত পৃথিবীর দিকে দিকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ঐসব কেন্দ্রগুলো তাঁদের কারণেই গড়ে উঠেছিল। যেখানেই কোন সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যেতো হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে আসতো তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর কাছ থেকে মানবতার জন্য দেয়া আল্লাহ্পাকের সর্বশেষ মেহেরবাণী, রাসূলে পাকের চোখে দেখা জীবনী শোনার জন্য, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় রীতি-নীতি জেনে নেবার জন্য। এভাবে তাবেয়ীগণ যারা কোন সাহাবীর সরাসরি ছাত্র ছিলেন তাদেরকে ঘিরেও এই একই রকম কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকলো। প্রতিটি কেন্দ্রকে ঘিরে সারাদেশে সাথে সাথে গড়ে উঠতে থাকলো ছোট ছোট দল। যেসব শহরে সাহাবা ও তাবেয়ীদের সমাগম বেশি ছিল সেইসব শহর 'দারুল ইল্‌ম' বা জ্ঞানের নগরী হিসেবে পরিচিত ছিল। মক্কা মুয়াজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা, ইয়ামান, বসরা, কুফা ইত্যাদি শহরগুলো স্বয়ং রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগিদের প্রত্যক্ষ প্রভাবধন্য এবং ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে শ্রেষ্ঠ।

কুফা ঃ ইমাম আবু হানিফার জন্ম ও বাসস্থান। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির পাদপীঠ। আরববাসীর প্রতিনিয়ত শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির জন্য আরবের সীমিত আবাদী ভূমি তাঁর বাসিন্দাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না— এই অনুভূতি ব্যক্ত করে মাদায়েনে অবস্থানরত পারস্য

www.pathagar.com

বিজয়ী সমর নায়ক সো'দ বিন আবি ওক্কাসকে খলিফা হযরত উমর (রা) চিঠি লিখলেন। তাতে লিখেছিলেন, মুসলমানদের জন্য নতুন এক নগরীর গোড়াপত্তন করো। যেটা হবে তাদের দ্বিতীয় আবাসভূমি 'দারুল হিজরাত'। সো'দ (রা) কুফা'র মাটিকে পছন্দ করলেন। ১৮ হিজরীতে প্রথম এ নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো এবং মাটি পাথরের সামান্য কিছু দালান-কোঠা তৈরী হলো। সাথে সাথে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের আগমনে এবং তাদের আবাস-নিবাস কৃষি জমি, সেচ, চাষ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কর্মের প্রাণচাঞ্চল্যে অচিরেই এক সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হলো এবং আরবের মূল ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে গণ্য হতে লাগল।

হযরত উমর (রা) প্রথমদিকে ওখানে আগত ইয়ামেনের ১২ হাজার ও নাজ্জারের ৮ হাজার লোকের জন্য দৈনিক ভাতা'র ব্যবস্থা করেছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সম্মিলিত মুহাজিরগণ কুফাকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে গেলেন যে, খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা) আল্লাহ্‌র জ্ঞান, ঈমানের খনি, আরবের শির (মাথা) ইত্যাদি নামে সম্বোধন করতে বাধ্য হলেন। সেখানে কোনো চিঠিপত্র লিখলে এর কোনো একটি সম্বোধন করে লিখতেন— ইলা রা'সুল ইসলাম বা ইলা রা'সুল আরব ইত্যাদি। হযরত আলী কাররামুল্লাহ এই শহরকে 'দারুল খোলাফা' নামে অভিহিত করলেন। সাহাবাদের মধ্যে এক হাজার পঞ্চাশ জন তাদের মধ্যে আবার চব্বিশ জন সাহাবী যাঁরা আল্লাহ্‌র রাসূলর (স)-এর সাথে বদর যুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তাঁরা ওখানে গিয়েছেন। অনেকেই তাঁদের স্থায়ী নিবাস সেখানেই তৈরী করে নিয়েছিলেন। সেই সব মহান ব্যক্তিত্বের অবস্থানের কারণে হাদীস এবং তার বর্ণনার চর্চাই সেখানকার সংস্কৃতি হয়ে উঠল। আর কুফা নগরীর প্রতিটি ঘর পরিণত হলো ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষা কেন্দ্রে।[১]

বসরা ঃ বসরাও সেই মহান খলিফার শাসনামলে বিকশিত হয়েছিল। জ্ঞানচর্চা এবং বিশেষ করে ইল্‌মে হাদীস চর্চার প্রাণ কেন্দ্র। বসরাও কুফার সমকক্ষ ছিল। এই দু'টি শহরকে মক্কা মুয়াজ্জামা এবং মদীনা মুনাওয়ারার মতো ইসলামী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র মনে করা হয়। ইসলামী স্বর্ণযুগের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সময়কালের মনীষীবৃন্দ আল্লামা 'যুহুরী' যাঁদের হাদীসের ধারক-বাহক হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি যাদের স্বতন্ত্র জিবনীও লিখেছেন তাঁদের বেশিরভাগ, অর্থাৎ মাসরূক বিন আল আজদা'আ, ওবায়েদ বিন উমর, আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ, আবুল ওমর আননাখ্‌র, যারবিন জাইশ, রাবী' বিন খাসীম, আবদুর রাহমান বিন আবি লায়লা, আবু আবদুর রহমান আসলামী, সারীহ বিন আল হারস, সারীহ বিন হানী, আবু ওয়ায়েল শাক্বীফ ইবনে সালমা, কায়েস বিন হাযেম, মুহাম্মাদ বিন শিরীন, হাসান বসরী, শুউবা বিন হাজ্জাজ, ক্বাতাদাহ বিন ওয়াআমা প্রমুখ এই দুই নগরীর সম্মানিত নাগরিক ছিলেন।[২] ইল্‌মে হাদীসের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে গণ্য সুফিয়ান বিন আইনিয়া সবসময় বলতেন, দ্বীন পালনের জন্য মক্কা, শুদ্ধ পাঠের জন্য মদীনা, শাস্ত্র (ফেকাহ্) অধ্যয়ন, অনুধাবন ও পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য কুফা নগরী।[৩]

১. এই সব বিস্তারিত বর্ণনা বালাযুরীর ফুতুহুল বুল্‌দানে কূফার ঐতিহ্য প্রসঙ্গে। মুজিমুল বুলাদান ও ফাত্‌হুল মুগীসের ৩৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত।
২. এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে আল্লামা যুহ্‌বীর তায্‌কেরাতুল হুফ্‌ফাযে।
৩. মু'জিমুল বুলদান, কূফা প্রসঙ্গ।

www.pathagar.com

আবু হানিফা (রহ) ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুধাবনের জন্য ইমাম হাম্মাদের দার্‌সগাহকে যথেষ্ট মনে করেছেন কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে এই সন্তুষ্টি বা প্রত্যয় সম্ভব ছিল না। এখানে শুধু প্রতিভা, যোগ্যতা এবং বিচক্ষণ বিশ্লেষণে কাজ হয় না; বরং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বর্ণনা দক্ষতারও প্রয়োজন রয়েছে।

ইল্‌মে হাদীস ও বর্ণনা দক্ষতার জটিলতা

হাদীসসমূহ তখন অত্যন্ত অগোছালো এবং ভয়ংকর বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। বড় বড় উস্তাদগণ দু'-চার শ'র বেশি হাদীস স্মরণে রাখতে পারতেন না, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েলের জন্যও যথেষ্ট ছিল না। এছাড়া বর্ণনা পদ্ধতিতে এমন মতপার্থক্য সৃষ্টি হলো যে, একটি হাদীস যতোক্ষণ পর্যন্ত (যতোগুলো বর্ণনা পদ্ধতি ও তথ্যসূত্র রয়েছে) তার সবসহ না জানা যাবে ততোক্ষণ তার সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। আবু হানিফা (রহ)-কে ইমাম হাম্মাদের সান্নিধ্য এবং বয়সের পরিপক্কতা ঐসব প্রয়োজনের সাথে খুব ভালভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এই জন্য নেহায়েত যত্নশীল কষ্টসাধ্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও একনিষ্ঠ মনোযোগের সাথে হাদীসসমূহের সম্যক পরিচয় নির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। তাই কুফা নগরীতে এমন কোন মুহাদ্দিস বাকী ছিল না যার সম্মুখে তিনি নতজানু শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ কুফায় যাঁর কাছেই যে হাদীসের সন্ধান পেয়েছেন তিনি তারই দ্বারস্থ হয়েছেন এবং নিতান্ত অনুগত শিষ্যের মতো তা শিখে নিয়েছেন। আবুল মুহাসিন শাফেয়ী (রহ) তাঁর হাদীসের শিক্ষকবৃন্দের পরিসংখ্যান দিয়েছেন এবং সর্বমোট তিরানব্বই (৯৩) জন ব্যক্তিত্বের নাম লিখেছেন— যাদের মধ্যে কুফার স্থায়ী বাসিন্দাও ছিল এবং স্বল্প সময়ের জন্য আগত মুসাফিরও। তাহ্‌যীবুত্তাহ্‌যীব এবং তাহ্‌যীবুল আসমা'আ ও তাযকেরাতুল হুফ্‌ফায ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে (যা এসব গ্রন্থের সাধারণ রীতি) আবু হানিফার (রহ) উস্তাদগণের কোনো পরিসংখ্যান করা হয়নি। তবে ঐসব গ্রন্থ অধ্যয়নে জানা যায় যে, তিনি অনেক বেশি পরিমাণের লোকের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে ২৯ জনই কুফার বাসিন্দা ছিলেন এবং তাদের অধিকাংশই তাবেয়ী।

কুফার উস্তাদগণের মধ্যে বিশেষ করে ইমাম শা'বী, সালমা বিন কাহিল, মুহারেব বিন ওয়াসার, আবুল ইসহাক সাবঈ, আউন বিন আবদুল্লাহ, ছামাক বিন হারব, উমর বিন মাররাহ মনসুরুল উমার, আ'মাশ, ইবনে আছিম বিন মুহাম্মদ, আদী বিন সাবেত আল-আনসারী, আতাআ বিন আল সায়েব, মুসা বিন আবি আয়েশ, আলকামা বিন মারছাদ (রহ) প্রমুখ ছিলেন অনেক বড় মুহাদ্দিস এবং সনদ ও বর্ণনার সর্বজনবিদিত নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম হাম্বলের বর্ণনায় সনদ পরম্পরা এইসব মহানদের পর্যন্ত পৌঁছায়।

হযরত ইমাম শা'বী (রহ) ঃ সেই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি আবু হানিফা (রহ)-এর প্রথম জীবনে শিক্ষাগ্রহণ ও জ্ঞানার্জনের উৎসাহ দিয়েছিলেন।[১] অনেক সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কথিত আছে যে, তিনি অন্ততঃ পাঁচশত সাহাবাকে স্বচক্ষে দেখেছেন। ইরাক, আরব ও শামে যে চারজন ব্যক্তিত্ব 'উস্তাদে কামেল' অর্থাৎ শিক্ষকগণের শিক্ষক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত, ইমাম শা'বী তাঁদের অন্যতম। ইমাম জুহরী (রহ) প্রায়ই বলতেন, মুসলিম বিশ্বে

---

১. ইমামের হাদীসের উস্তাদগণের বিস্তারিত বর্ণনা তাহযীব আত্ তাহযীব, মা'আরেফ ইবনে কুতাইবাহ্। সোরাতাল জেনান ইয়াকায়ী থেকে সংগৃহিত।

www.pathagar.com

আলেম বলতে যে চারজনকে বুঝায় তাঁরা হলেন মদীনায় ইবনুল মুসাইয়্যিব, বসরায় হাসান, শামে মাকহোল এবং কুফায় শা'বী। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) একবার তাঁকে মাগাযীর দারস দিতে দেখে বলেছেন, আল্লাহ্র কসম এই ব্যক্তি এ বিষয়ে আমার চাইতে বেশি এবং ভাল জানেন। বেশ কিছুকাল বিচারপতির পদে আসীন ছিলেন। খলিফা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন। হিজরী ১০৪ অথবা ১০৬ সনে ইন্তেকাল করেন।

সনামধন্য মুহাদ্দিস এবং তাবেয়ী সলেমাহ্ বিন কাহিল, জুনদুব বিন আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা), আবুল তোফায়েল (রা) প্রমুখ সাহাবী এবং আরও অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে সউদ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন 'কাছীরুল হাদীস'। সুফিয়ান বিন আইনিয়া (ইমাম শাফেয়ীর উস্তাদ) বলতেন— সালমাহ্ বিন কাহিল স্তম্ভগুলোর একটি স্তম্ভ। ইবনে মাহদী বলতেন ঃ কুফায় চার ব্যক্তি সবচাইতে শুদ্ধ বর্ণনাকারী— মনসুর, সালেমাহ, আমরুদ বিন মাররাহ ও আবু হাসিম (রহ)।

হযরত আবু ইসহাক সাবয়ী ঃ আবু ইসহাক সাবয়ী উচুঁ মানের তাবেয়ী ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন উমর, ইবনে যুবায়ের, নো'মান বিন বশীর, যায়েদ বিন আরকাম (রা) প্রমুখ এবং আরও অনেক সাহাবী যাঁদের নাম আল্লামা নূদী 'তাহযীবুল আসমা'আ'তে সবিস্তারে লিখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। আজ্‌লী বলছেন যে, ৩৭ জন সাহাবা (রা) থেকে তিনি মুখোমুখী বর্ণনা শুনেছেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী বিন আল-মাদীনির বক্তব্য ঃ আবু ইসহাকের হাদীসের শিক্ষক আমি নিজে গুণে দেখেছি কমবেশী তিনশ' জনে গিয়ে পৌছেছে। তাঁর বিস্তারিত জীবনী হাফেয ইবনে হাজার তার 'তাহযীব'-এ লিখেছেন।

হযরত সামাক (রহ) ঃ সামাক বিন হারব প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ী এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম সুফিয়ান সওরী বলতেন, 'সামাক কখনও হাদীসে ভুল করেনি'। স্বয়ং সামাক বলেছেন, ৮০ জন সাহাবার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

হযরত মুহারেব বিন ওছার (রহ) ঃ মুহারেব বিন ওছার (রহ) আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) ও যাবের (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলতেন— 'আমি এমন কোনো সংসার ত্যাগী তাপস দেখিনি যাকে মুহারেবের উপরে স্থান দেব'। আল্লামা যুহরী লিখেছেন, 'মুহারেব এক সাধারণ দলিল'। ইমাম আহম্মাদ ইবনে মূয়ীন, আবু যার'আ, দারে কুত্‌নী, আবু হাতেম, ইয়াকুব, ইবনে সুফিয়ান, নাসায়ী (রহ) প্রমুখ তাঁকে 'নির্ভরযোগ্য আস্থাশীল' হিসেবে স্বীকার করেছেন। কুফার বিচার বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। ১১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আউন বিন আবদুল্লাহ বিন উৎবা বিন মাসউদ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) এবং আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, দুনিয়াত্যাগী জ্ঞান তাপস ছিলেন।

ইমামে হাদীস হিশাম বিন উরওয়াহ্ (রহ) ঃ হিশাম বিন উরওয়াহ্ বিখ্যাত এবং সম্মানিত তাবেয়ী ছিলেন। অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, সুফিয়ান ইবনে আইনিয়াহ্ (রহ) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় হাদীস বিশারদগণের উস্তাদ ছিলেন। খলিফা মনসুরের সময়ে ইমাম আবু হানিফা তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। খলিফা তাঁকে আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন। সম্মাননা হিসেবে এক লাখ দেরহামের একটি অনুদান তাঁকে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন এমনকি তাঁর জানাযা খলিফাই পড়িয়েছেন। ইবনে সউদ লিখেছেন, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আস্থাশীল, হাদীসের ভাণ্ডার ছিলেন। আবু হাতেম তাঁকে 'ইমামে হাদীস' আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম সুলাইমান বিন মেহ্রান (রহ) ঃ সুলাইমান বিন মেহ্রান কুফার সনামধন্য বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। সাহাবাগণের মধ্যে আনাস বিন মালিক (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা'র কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও শো'বা তাঁর ছাত্র। ইমামের হাদীস শিক্ষার দ্বিতীয় মাদ্রাসা ছিল বসরায় যা ছিল ইমাম হাসান বসরী, শো'বা এবং কাতাদাহ্ (রহ) প্রমুখের মতো ব্যক্তিদের শিক্ষা-দীক্ষার দানে ধন্য। এখানে একটু অবাক হবার মতো ব্যাপার হলো, হাসান বসরী (রহ) ১৪০ হিজরী পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন কিন্তু আবু হানিফা (রহ) তাঁর কাছ থেকে কিছু শিখতে পেরেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ কাতাদাহ্র ছাত্র ছিলেন একথা সাধারণভাবে সকল মুহাদ্দিসীন উল্লেখ করেছেন। এবং 'উকুদুল জামান'-এর বিভিন্ন পর্যায় থেকে জানা যায় যে, ইমাম সাহেব সুলাইমান বিন মেহরাম শো'বার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতিও দিয়েছিলেন।

মুহাদ্দিস ও তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ্ (রহ) ঃ বিখ্যাত তাবেয়ী এবং অনেক বড় মানের মুহাদ্দিস ছিলেন। হযরত আনাস বিন মালিক, আবদুল্লাহ্ ইবনে সারখাস (রা) ও আবুল তোফায়েল (রা) এবং অন্যান্য সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা)-এর দুইজন বিখ্যাত ছাত্রের মধ্যে তিনি একজন। হাদীসের সচ্ছল, প্রাণবন্ত আবৃত্তির জন্য তাঁর একটি বিশেষ খ্যাতি ছিল। তার কথন ও তাৎপর্যের মধ্যে কোন পার্থক্য হতো না। স্মরণশক্তি সম্পর্কে একটি ঘটনা লিখিত আছে— আমরুদ বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন যে, কাতাদাহ্ মদীনায় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের কাছে ফিকাহ্ ও হাদীস শিখতেন। একদিন তিনি বললেন, তুমি প্রতিদিন অনেক অনেক প্রশ্ন করো, জবাবে আমি যা বলি তার কিছু মনে আছে কি ? কাতাদাহ্ জবাব দিলেন, এক একটি শব্দও সংরক্ষিত আছে। অতঃপর যেভাবে যেদিন যা শুনেছিলেন দিন-তারিখসহ বলতে শুরু করলেন। তিনি অবাক হয়ে রইলেন। পরে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তোমার মতো মানুষও সৃষ্টি করেছেন! এ কারণে লোকেরা তাকে 'আহফাযুন্নাস' বলতো। ইমাম হাম্বল (রহ) তাঁর অবস্থান, অবগতি, বিতর্ক এবং ব্যাখ্যা করার দক্ষতা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ঐসব ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ কেউ হলেও হতে পারে কিন্তু তার চাইতে অগ্রগামী কেউ হতে পারে না। হাফেয ইবনে হাজার 'তাহ্যীবুত্তাহ্যীব' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন— যা থেকে তাঁর মর্যাদা ও বড়ত্বের কিছুটা অনুমান করা যায়।

আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস হযরত শো'বা (রহ) ঃ প্রথম শ্রেণীর মুহাদ্দিস ছিলেন। দুই হাজার হাদীস ছিল তাঁর স্মরণের ভাণ্ডারে। তাঁকে সুফিয়ান সাওরী হাদীস বিষয়ের 'আমীরুল মুমিনীন' আখ্যায়িত করেছেন ।

ইমাম শাফেয়ী সবসময় বলতেন, শো'বা না হলে ইরাকে হাদীসের প্রচলন হতো না। ১৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে সুফিয়ান সাওরী মন্তব্য করেন, 'আজ হাদীস বিজ্ঞানেরও মৃত্যু হলো'। আবু হানিফার সাথে হযরত শো'বার একটা বিশেষ সম্পর্কের

www.pathagar.com

বন্ধন ছিল। সবসময় ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর পেছনে তাঁর উন্নত উপলব্ধি, প্রশস্ত বুঝ ও প্রতিভার প্রশংসা করতেন। একবার প্রসঙ্গক্রমে বললেন ঃ আমি যেমন জানি সূর্য আলোকিত, ঠিক ঐ একই রকম স্পষ্ট বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি জ্ঞান এবং আবু হানিফা একে অপরের। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈনের কাছে কেউ একজন প্রশ্ন করলো ঃ আবু হানিফা সম্পর্কে আপনি কি রকম মনোভাব পোষণ করেন। বললেন ঃ "এ প্রসঙ্গে এটা বলাই যথেষ্ট হবে যে, শো'বা তাকে হাদীস এবং তা বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন, আর শো'বা! তার তুলনা সে নিজেই।"[১] ইমাম আবু হানিফা বসরায় যাঁদের কাছ থেকে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা নিয়েছেন সেই সব উস্তাদগণের মধ্যে আবদুল করীম বিন উমাইয়াহ্ (রহ) এবং আসেম বিন সুলাইমান আল-আহোল (রহ) প্রথম শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

মক্কা-মদীনা সফর

ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের মাধ্যমে যদিও এক বিশাল হাদীসের ভাণ্ডার ইমাম আবু হানিফার দখলে এসেছে, তদুপরি তার পূর্ণাঙ্গতার সনদ হাসিলের জন্য 'হারামাঈন' সফরের প্রয়োজন ছিল। কেননা এই দুই পুণ্যভূমিই দ্বীনি ইল্মের আসল মারকাজ (মূল কেন্দ্র)। ইমামের প্রথম সফর ঠিক কখন কোন সনে হয়েছিল ইতিহাস থেকে তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে আমাদের ধারণায় তা তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রথমদিকে। ঐতিহাসিক ইবনে খালকান লিখেছেন[২] যে, ওয়াকী খোদ ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি হজ্বের সময় একজন লোককে দিয়ে চুল কাটিয়েছিলাম, কিছু কথা নিয়ে সে আমাকে পাকড়াও করলো। প্রশ্ন করলাম ভাই কতো দিতে হবে ? উত্তরে বললো ঃ 'হজ্বের কর্মকাণ্ডে বিনিময় ঢুকানো হয় না'। চুপ করে বসে আছি, সে কাটছে। সে আবার বললো ঃ 'হজ্বের সময় চুপ করে থাকে না, তাকবীর বলতে থাকো।' কাজ শেষ হলে যখন ঘরমুখী পা বাড়ালাম তখন সে আবার বললো, 'প্রথমে দুই রাকাত নামায আদায় করে নাও তারপর কোথাও যেও'। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এসব মাসায়েল তুমি কার কাছে শিখেছ ? বললো ঃ আত্তার বিন আবী রাবাহ-এর শিক্ষা। এ ঘটনা থেকে যা প্রতীয়মান হয় তাতে এসকল সেই প্রথম জীবনের কথা বলেই বেশি মনে হয়।

আত্তার বিন আবী রাবাহ্ (রহ)-এর দরসগাহ্ ঃ যে সময়কালে ইমাম আবু হানিফা (রহ) মক্কায় গিয়েছিলেন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের একটা জোয়ার। সেখানে তখন বহু সংখ্যক উস্তাদবৃন্দ যাঁরা হাদীস বিদ্যায় দক্ষ এবং পারদর্শী ছিলেন। উপরন্তু তাঁদের অধিকাংশই সরাসরি সাহাবাগণের সঙ্গ ও শিক্ষা-দীক্ষায় ধন্য। তাঁরা প্রায় সবাই আলাদা আলাদা শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদের মধ্যে আত্তার বিন আবীর রাবাহ্র প্রতিষ্ঠানটি সবচাইতে বড় ও ব্যাপক স্বীকৃত ছিল। আত্তার নিজে বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। জীবনের অনেকটা সময় সাহাবাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে গবেষণামূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টা অর্থাৎ ইজতেহাদ করার শিক্ষা-দীক্ষা এবং মান তাদের কাছ থেকেই প্রাপ্ত। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা), ইবনে উমর (রা), ইবনে যুবায়ের (রা), উসামা বিন যায়দ (রা), জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) প্রমুখ

১. উকুদুল জম্আন, দ্বিতীয় অধ্যায়

২. তারীখ ইবনে খালকানের আ'তা বিন আবী রাবাহার জীবনী।

www.pathagar.com

সাহাবাগণ এবং আরো অনেক সাহাবার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। খোদ নিজে বর্ণনা করেছেন যে, আমি এমন দুইশত ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ ও সঙ্গ পেয়েছি যাঁরা স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর খুব কাছাকাছি ছিলেন। ইজতিহাদকারী সাহাবাগণ তার স্থান ও মানের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর ছেলে আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) যিনি আবার ফতোয়া দেবার স্বীকৃত যোগ্যতার অধিকারী, প্রায়ই বলতেন ঃ আত্তার বিন আবী রাবাহ্ থাকতে লোকেরা আমার কাছে আসে কেন ? হজ্বের মৌসুমে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবছর একজন ঘোষক বা আহ্বানকারী নির্বাচন করা হয়— এ ব্যাপারে 'অত্তার' ছাড়া ফতোয়া দেবার অধিকারী অন্য কেউ নয়।[১]

উস্তাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 'হাদীস-বিজ্ঞানের'র বড় বড় যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ যেমন ইমাম আওযায়ী, জুহরী, আমরুদ বিন দীনার (রহ) প্রমুখ তাঁরই ছাত্র এবং শিষ্য।

জ্ঞানপিপাসু আবু হানিফা (রহ) আরও কিছু অর্জনের আশায় আত্তার (রহ)-এর দরসগাহে হাজির। নবাগতের আত্মপরিচয় জানতে চাইলে আবু হানিফা (রহ) জবাবে বললেন, "আমি পূর্ব পুরুষদের মন্দ বলি না, গুনাহগারকে কাফির বলি না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী সৌভাগ্যের প্রত্যাশী।" হযরত আত্তার (রহ) নিয়মিত তাঁর দরসে যোগ দেবার জন্য অনুমতি দিলেন।[২] প্রতিদিন প্রতি ক্লাশে আবু হানিফার প্রতিভার স্ফুরণ প্রকাশ পেতে থাকলো আর অপরদিকে উস্তাদের চোখে তার স্নেহ-মমতা ও সম্মানও বাড়তে লাগলো। কিছুদিন পরে অবস্থা এমন হলো যে, দরস শুরু করার আগে আত্তার (রহ) অন্যদের সরিয়ে আবু হানিফা (রহ)-কে তাঁর একান্ত কাছে বসিয়ে দরস শুরু করতেন।[৩]

হযরত আত্তার (রহ) ১১৫ হিজরী পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে ইমাম আবু হানিফা যখনই মক্কায় আসতেন উস্তাদের সান্নিধ্যে থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই নিয়ে যেতেন।

হযরত আকরামাহ্ (রহ) ঃ মক্কার মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে আত্তার ভিন্ন অন্য যাদের কাছ থেকে আবু হানিফা (রহ) হাদীসের সনদ নিয়েছেন তাদের মধ্যে আকরামাহ্ (রহ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। আকরামাহ্ (রহ) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ও ছাত্র ছিলেন। আব্বাস (রা) অত্যন্ত যত্নের সাথে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে তাকে গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি তিনি বেঁচে থাকতেই তাকে ইজতিহাদ ও ফতোয়া দেবার যোগ্য অধিকারী করে দিয়েছিলেন। হযরত আকরামাহ্ (রহ) হযরত আলী (রা), আবু হোরায়রাহ্ (রা), আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা), ওক্ববা বিন উমর (রা), সাফ্‌ওয়ান (রা), জাবের (রা), আবু ক্বাতাদাহ্ (রা) প্রমুখ সাহাবাগণের কাছ থেকেও হাদীস শিখেছেন এবং ফিক্‌হী মাসায়েলের পর্যালোচনা করেছেন। কম-বেশি সত্তরজন তাবেয়ী হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে তাঁর ছাত্র এবং শিষ্য। ইমাম শা'বী বলতেন, কুরআন সম্পর্কে আকরামাহ্‌র চাইতে বেশি জানে এমন কেউ আর বেঁচে নেই। তাবেয়ীন শিরোমনি সাঈদ বিন জুবায়েরকে একজন প্রশ্ন করলো, পৃথিবীতে আপনার চাইতে বড় আলেম আর কেউ আছে ? বললেন ঃ 'আকরামাহ্' (রহ)।

১. ইবনে খালকান এবং অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ
২. মুখতাসার তারীখে বাগদাদ, ইবনে জাযলাহ্
৩. উকূদুল জমআন, দশম অধ্যায়

www.pathagar.com

সাতজন ফকীহ্‌ ঃ সেই সময়কালে অর্থাৎ হিজরী ১০২-এর আগে আবু হানিফা (রহ) নবুয়তের সর্বশেষ অবস্থান এবং হাদীসের খনি মদীনা মুনাওয়ারার পথে পা বাড়ালেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর প্রিয় সঙ্গী-সাথী সাহাবাগণের পরে তাবেয়ীনদের যুগ। ইসলামের নীতি শাস্ত্র, ফিকাহ্‌ এবং দ্বিতীয় উৎস হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় সাতজন ব্যক্তিত্ব (তাবেয়ীন) কেন্দ্রবিন্দু পর্যায়ে উঠে এলেন। যাবতীয় মাসলা এবং নীতি নির্ধারণী বিষয়ে তাঁরাই ছিলেন সমাধানদাতা। সাহাবাগণের মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শিখরে যারা ছিলেন এঁরা তাদের উত্তরসূরী। কাজেই গোটা ইসলামী সাম্রাজ্যে জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতার মূল কেন্দ্র এঁরাই ছিলেন। এঁরা সমসাময়িক এবং একটি সম্মিলিত 'মাজলিসে ইফতা' অর্থাৎ 'সমাধানকারী পরিষদের' মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা করতেন।[১] মদীনার ফিকাহ্‌ যা ইমাম মালিক (রহ) সংগ্রহ ও সংকলিত করেছেন তার বুনিয়াদী উপাদান এঁদেরই সমাধান বা ফতোয়াসমূহ।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) যখন মদীনায় পৌছালেন সে সময় এই মাহাত্মনদের মধ্যে যে দু'জন বেঁচে ছিলেন তাঁরা হলেন সুলাইমান ও সালেম বিন আবদুল্লাহ (রহ)। সুলাইমান রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্রা স্ত্রী হযরত মাইমুনা (রা)-এর গোলাম ছিলেন অথচ প্রতিভা যোগ্যতায় সাতজন ফকীহ্‌র দ্বিতীয়জন হিসেবে গণ্য হতেন। সালেম হযরত উমর ফারুক (রা)-এর পৌত্র। পিতার কাছেই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা। আবু হানিফা (রহ) এতদুভয়ের কাছ থেকেই জ্ঞানের মুক্তা আহরণ করেছেন এবং তাঁদের সূত্র পরম্পরায় হাদীস বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানার্জনের জন্য আবু হানিফা (রহ)-এর পথপরিক্রমা যদিও মদীনার সীমানা পর্যন্ত, কিন্তু এই পথচলা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। হজ্বের মৌসুমে ইসলামী সাম্রাজ্যের সব অঞ্চল থেকেই জ্ঞানী-গুণী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসে মক্কা-মদীনায় জড়ো হতেন। তাঁদের কাছ থেকে নতুন কিছু পাওয়ার আশায় আবু হানিফা (রহ) প্রায় প্রতি বছরই এই দুই পবিত্র ভূমির জিয়ারতে আসতেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) হাদীসের সনদ নিলেন ঃ ইমাম আওযায়ী ও মাকহোল শামী (রহ)-কে শাম দেশে 'ইমামুল মাযহাব' বলা হতো। এই দু'জনার সাথে মক্কায় আবু হানিফা (রহ)-এর পরিচয় হয় এবং তাঁদের কাছ থেকে তিনি হাদীসের সনদ নিলেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন আবু হানিফা (রহ)-এর প্রতিভা ও ইজতিহাদের কথা দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। এমনকি অতি উৎসাহীরা তাঁকে 'কাইয়াস' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। সেই সময়ে ইমাম আবু হানিফার বিখ্যাত শিষ্য আবদুল্লাহ বিন মুবারক 'বৈরুত' সফরে যান এবং সেখানে ইমাম আওযায়ীর (রহ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কুশল বিনিময়ান্তে ইমাম প্রশ্ন করেন, "কুফায় আবু হানিফা নামের এমন কোন লোক গজিয়ে উঠেছে যে 'দ্বীন'-এর মধ্যে নতুন নতুন কথা উদ্ভাবন করে? মোবারক একথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। দু' তিন দিন পরে আবার যখন ইমামের কাছে গেলেন তখন হাতে করে কিছু নমুনা নিয়ে গেলেন। ইমাম সেগুলো হাতে নিয়ে দেখলেন শিরোনামে লেখা আছে "ক্বালা নো'মান বিন সাবেত" অর্থাৎ নো'মান বিন সাবেত বলছে। বেশ কিছুক্ষণ গভীর দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, এই নো'মান কোন মহাত্মন (বুজুর্গ)? উত্তরে আবদুল্লাহ বললেন, ইরাকের

১. ফাত্‌হুল মুগীস, ৩৯৯ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

একজন লোক যার সান্নিধ্যে আমি ছিলাম। বললেন, অনেক উঁচুমানের লোক! আবদুল্লাহ বিনয়ের সাথে আরো বললেন, 'এ সেই আবু হানিফা যাকে আপনি 'বেদ'আতকারী' বলেছিলেন।[১] ইমাম আওযায়ী নিজের ভুলে লজ্জিত হলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করলেন।

হজ্জের মৌসুম কাছেই ছিল। দু'জনেই হজ্জে এলে পরস্পরের পরিচয় হয়। আবদুল্লাহ্ও সেখানে উপস্থিত। বিভিন্ন আলোচনার এক পর্যায়ে ইমাম আওযায়ীর দেখা সেই লিখিত মাসয়ালাগুলো নিয়ে কথা উঠে। আবু হানিফা (রহ) সেগুলোকে এমনভাবে বুঝিয়ে দেন যাতে ইমাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো হতবাক হয়ে থাকেন। এরপর আবু হানিফা বিদায় নিলে ইমাম আবদুল্লাহ্র কাছে মন্তব্য করেন, "এই লোকটির যাদুকরী প্রতিভা তাকে মানুষের 'কল্পনার আদর্শ পুরুষ' বানিয়ে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে আমার ধারণা ভুল ছিল। আমি সে জন্য অনুতপ্ত। ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ) ইমাম আওযায়ীর কাছেও হাদীস বিষয়ের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হযরত ইমাম বাকের (রহ)-এর সাথে ঃ হযরত ইমাম বাকের (রহ)-এর সাথেও ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর পরিচয় অত্যন্ত নাটকীয়ভাবেই হয়েছে। আবু হানিফা (রহ) দ্বিতীয়বার যখন মদীনায় গিয়েছিলেন তখন ইমাম বাকেরের সাক্ষাৎ প্রার্থী হন। সঙ্গী পরিচয় করিয়ে দিলে ইমাম বাকের (রহ) সরাসরি আবু হানিফাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তাহলে তুমিই সেই ব্যক্তি যে বিচার বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে আমার নানার হাদীসের সাথে বিরোধিতা করো ? আবু হানিফা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, "আল্লাহ্র আশ্রয় নিয়ে বলছি, হাদীসের বিরোধিতা কে করতে পারে ? আপনি মেহেরবাণী করে একটু সুযোগ দিলে আমি বুঝিয়ে বলতে পারতাম। এরপর তাদের কথোপকথন ঃ

আবু হানিফা ঃ পুরুষ দুর্বল না স্ত্রী লোক ?

ইমাম বাকের ঃ স্ত্রী লোক!

আবু হানিফা ঃ উত্তরাধিকারে পুরুষের অংশ বেশি না স্ত্রীলোকের ?

ইমাম বাকের ঃ পুরুষের!

আবু হানিফা ঃ আমি যদি বিচার-বিশ্লেষণ করতাম তাহলে বলতাম, স্ত্রীলোকদের বেশি অংশ দেয়া হোক। কেননা প্রকাশ্য বিবেচনায় দুর্বলেরই বেশি পাওয়া উচিত।

আবার প্রশ্ন করলেন ঃ নামায উত্তম না রোযা ?

ইমাম বাকের ঃ নামায!

আবু হানিফা ঃ সে হিসেবে ঋতুবতী মহিলাদের নামাযের কাযা ওয়াজিব হওয়া উচিত! রোযার নয়। অথচ আমি রোযার কাযা আদায়ের ফতোয়া দেই। ইমাম বাকের উচ্ছ্বসিত আনন্দে উঠে এসে আবু হানিফার কপালে চুমু খেলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) জ্ঞান লাভের আশায় বেশ কিছুকাল ইমাম বাকের (রহ)-এর সান্নিধ্যে কাটান। ফিকাহ্ ও হাদীসের অনেক অজানা তত্ত্ব ও তথ্য এখানে অর্জন করেন। শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ একথা স্বীকার করেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ) জ্ঞান ভাণ্ডারের বিশাল একটি অংশ ইমাম বাকেরের সঙ্গে থেকে অর্জিত হয়। ইমামের সাহেবজাদা হযরত জাফর সাদেক (রহ)-এর সুসঙ্গও আবু হানিফার জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে। যা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য।

১. মুখতাসার তারীখে বাগদাদ।

www.pathagar.com

ইবনে তাইমিয়া এটা অস্বীকার করেন। তাঁর ধারণা আবু হানিফা (রহ) হযরত জাফর সাদেক (রহ)-এর সমসাময়িক ও সমমানের ছিলেন। তিনি কেন তাঁর ছাত্র হতে যাবেন ? ইমাম আবু হানিফা যতোবড় ফকীহ্ ও মুজতাহিদ হোন না কেন! মান ও মর্যাদায় হযরত জাফর সাদেক (রহ)-এর সাথে তার কি তুলনা ? হাদীস, ফিকাহ তথা যাবতীয় 'দ্বীনি ইল্‌ম' অর্থাৎ ইসলামের যাবতীয় যা কিছু তার সব কিছুরই উৎস 'আহলে বাইত' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাসূলের ঘরের সদস্যগণ। وصاحب البيت ادرى بما فيها —"ঘরের মালিকই অধিক জানে ঘরের মধ্যে কি আছে।"

ইমাম আবু হানিফ (রহ)-এর খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা

তখনও তিনি জ্ঞান পিপাসু বিনীত ছাত্রের মতো মক্কা-মদীনা সফরে যেতেন। অথচ তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, সফরের ইচ্ছা বা আয়োজন করলেই চারিদিকে সাড়া পড়ে যেতো— ইরাকের ফকীহ্ আরব যাচ্ছেন। চলার পথে কোন শহর অথবা গ্রাম অতিক্রম করার সময় হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে যেতো। একবার মক্কা সফরে যাবার সময় সেই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। আহলে ফিকাহ্ এবং আহলে হাদীস দুই দলেরই লোকের ভীড়, তিল ধারণের ঠাঁই নেই। একজন আর একজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এসব দেখে ইমাম জোরে জোরে বললেন ঃ যদি কেউ আমাদের মেজবানকে গিয়ে বলতো এই হট্টগোল থামিয়ে একটু বসার ব্যবস্থা করতে! আবু আছেম নাবিল উঠে বললো ঃ আমি যাচ্ছি, কিন্তু কিছু প্রশ্ন যে এখনো আমার বাকী রয়ে গেছে ?

ইমাম তাকে কাছে ডাকলেন। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলেন। উত্তর দিলেন যাবতীয় প্রশ্নের। এর মধ্যে মেজবানকে খবর দেবার কথাটা বেমালুম ভুলে গেলেন। আবু আসেমের পরে আর একজন। তারপর আর একজন। এভাবে চলতে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে আবার যখন মনে পড়ল! জোরে জোরে বললেন ঃ কে যেন মেজবানের কাছে যাবার কথা বলেছিল ? কোথায় গেল সে ?

আবু আসেম বললো, আমি বলেছিলাম।

ইমাম বললেন, তাহলে গেলে না কেন ?

আবু আসেম কৌতুক করে বললো ঃ 'আমি তো এটা বলিনি যে, এক্ষুণি যাচ্ছি! যখন সুযোগ হবে যাবো'!

ইমাম বললেন ঃ 'সাধারণ কথাবার্তায় এই ধরনের সম্ভাবনামূলক কথার সুযোগ নেই। এসব কথার অর্থ তাই নেয়া হবে যা জনগণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।' এক হিসেবে এটাও একটা নীতিগত কথা (ফিকহী মাসয়ালা) ছিল যা ইমাম কথা প্রসঙ্গে সমাধান করে দিলেন।

ইমামের শিক্ষক ও উস্তাদবৃন্দও তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। মুহাম্মদ বিন ফজল বলেছেন, একবার আমাকে নিয়ে তাঁর উস্তাদ খুদাইব (রহ)-এর কাছে গেলেন। তাঁকে আসতে দেখে উস্তাদজী উঠে এসে অত্যন্ত আদরের সাথে নিজের কাছে নিয়ে বসালেন।

ইমাম প্রশ্ন করলেন ঃ উট পাখির ডিম সম্পর্কে কি হাদীস এসেছে ?

খুদাইব জবাবে বললেন ঃ

www.pathagar.com

اخبرنی ابوعبیدة عن عبد الله ابن مسعود فی بیضة النعام یصیبها المحرم ان فیه قیمته -

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) হতে উট পাখির ডিম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কোনো মুহরিম যদি উট পাখির ডিম নষ্ট করে তাহলে তাকে এর মূল্য দিতে হবে।

উমরুদ বিন দীনার, মক্কার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং শিক্ষক। শ্রেণীকক্ষে আবু হানিফা থাকলে তিনি তাঁর দিকে লক্ষ্য করেই সব আলোচনা করতেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) এবং ইমাম মালিক (রহ) ঃ 'যেখানেই কিছু জানার আছে সেখানেই আবু হানিফা আছে', শিখার ব্যাপারে কারো কাছে যেতেই তিনি লজ্জিত হতেন না। ইমাম মালিক (রহ) তাঁর চাইতে তের বছরের ছোট, তাতে তাঁর ক্লাশে বসে হাদীস শিখতে আবু হানিফার বাধেনি। আল্লামা যুহরী তার 'তাযকেরাতুল হুফ্‌ফায' এ লিখেছেন ঃ ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিকের সামনে এমন আদবের সাথে বসতেন, ঠিক যেমন সম্মানিত উস্তাদের সম্মুখে অনুগত ছাত্র। অনেকেই এই বিনয়কে তাঁর মর্যাদার খেলাফ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমরা এটাকে উন্নত মানসিকতা, জ্ঞানের প্রতি সম্মানবোধ এবং উদারতা বলবো।

অপরদিকে ইমাম মালিক (রহ)-ও তাঁকে আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন। আবদুল্লাহ্ বিন আল্-মুবারকের জবানীতে উল্লেখ্য ঃ "আমি ইমাম মালিকের দরসে উপস্থিত ছিলাম। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এলেন, ইমাম তাঁকে আন্তরিক সম্মান জানালেন এবং নিজের পাশে একই আসনে বসালেন। কিছুক্ষণ পরে আগন্তুক চলে গেল। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে ইমাম বললেন ঃ তোমরা জানো ইনি কে ? ছাত্ররা না সূচক মাথা নাড়ালে, বললেন, এই সেই আবু হানিফা ইরাকী, যে এই খুঁটিগুলোকে সোনার প্রমাণ করতে চাইলে তা করতে পারেন!

কিছুক্ষণ পরে আরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এলেন। তাঁকেও যথেষ্ট সম্মানের সাথে বসালেন। কিন্তু ঠিক ততোটা নয় যতোটা আবু হানিফা (রহ)-কে করা হয়েছিল। তিনি চলে গেলে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, এবার যিনি এসেছিলেন তিনি 'সুফিয়ান সওরী'।

হাদীস চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতি

হিজাজ ও ইরাকে নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ ভিন্ন ভিন্ন রীতি অনুসরণ করতেন। শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পদ্ধতিও ছিল আলাদা। কারো কারো কাছে লেখালেখির ততোটা গুরুত্ব ছিল না। যেমন ইবরাহীম শা'বী শুধুমাত্র 'হাফেয'কে সনদ মনে করতেন। অর্থ ও তাৎপর্যে পার্থক্য না হলে হাদীস বর্ণনার সময় শব্দ বা বাক্যাংশ ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। অনেকেই এ পদ্ধতি জায়েয মনে করতেন। কেউ আবার এই রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। একদল বলতেন, বর্ণনাকারী সম্মুখে না হলে তার থেকে বর্ণনা করা যাবে না। ইমামের উস্তাদ শো'বা (রহ) এই রীতি অনুসরণ করতেন। অন্য দল পর্দার আড়াল থেকে লেখার উপর ভিত্তি করে বর্ণনা করাকে জায়েয মনে করতেন। ইমাম জুহরীর পদ্ধতি ছিল, তিনি বর্ণনার সাথে সাথে মূল কথার অর্থ ও তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যা করে যেতেন। কিছু লোক এ পদ্ধতির ঘোরতর বিরোধী ছিল। এমনকি এক লোক খোদ ইমাম জুহরীকে কঠিন ভাষায় বলে উঠলো, "রাসূলের হাদীসের সাথে আপনি আপনার কোন কথা বা শব্দ মেলাবেন না।" ইমাম মালিকের একটা পদ্ধতি খুব পছন্দনীয়

www.pathagar.com

ছিল— ছাত্র পড়তে থাকবে এবং তিনি শুনে যাবেন। এ পদ্ধতিও বিতর্কের বাইরে ছিল না। ইয়াহ্ইয়া বিন সালেম একদিন দরসের ক্লাশ থেকে রাগ করে উঠে চলে গেলো। গজগজ করতে করতে বলতে থাকলো "নিজে পড়ে না! ছাত্রদের দিয়ে পড়ায়" হুহ্। 'ফাত্হুল মুগীসে' আরও অনেক বিতর্কের কথা সবিস্তারে লেখা আছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর বহু উস্তাদের কাছে শিক্ষা এবং জ্ঞান সাগরের ঝিনুক কুড়ানোর মধ্যে সবচাইতে বড় যে উদ্দেশ্যটি ছিল তাহলো— বিচিত্র পদ্ধতি ও রীতির সাথে সম্যক পরিচয় লাভ করা। যেন এইসব পদ্ধতির বিপরীতে নিজে একটি স্বতন্ত্র এবং সুবিবেচিত রায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। ইমাম সাহেব এ বিষয়ের রীতি-পদ্ধতির ওপর যেসব সংস্কার এনেছেন তার আলোচনা সম্মুখে আসবে।

শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি ঃ সৌভাগ্যবশত ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর শিক্ষা জীবনের শুরুটা ঠিক তখনই হয়েছিল যখন হাদীস বিষয়ের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকভাবে সাজানো এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছিল। এর আগে সাধারণভাবে মৌখিক বর্ণনার রেওয়াজ ছিল। নেতৃস্থানীয় কোন কোন হাদীসবেত্তা লেখালেখিকে প্রায় নাজায়েয মনে করতেন।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ) আনুমানিক ১০১ হিজরীতে মদীনাবাসীর উদ্দেশ্যে একটি ফরমান জারী করেন। যার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

انظروا بماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فانى خشيت دروس العلم وذهاب العلماء

রাসূল (স)-এর হাদিসের প্রতি তোমরা দৃষ্টি দাও এবং তা লিখে রাখ, কেননা আমি ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলপ্তির আশংকা বোধ করছি।

আল্লাহ্র রাসূলের হাদীসসমূহ যেভাবে রয়েছে তাকে অচিরেই লিপিবদ্ধ করে নেয়া হোক নইলে তা হারিয়ে কিংবা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রশাসনিক নগর ও কেন্দ্রগুলোতেও একই ফরমান যথাসময়ে পৌছানো হয়। সুতরাং মদীনায় ইমাম জুহরী (রহ) সংগৃহীত হাদীসের একটি বিন্যস্ত সংকলন করলেন। যার অনুলিপি রাষ্ট্রীয়ভাবে ফরমানপ্রাপ্ত প্রতিটি কেন্দ্রে পৌছে দেয়া হলো।[১] এরপর থেকেই হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করা বা সংকলনের রীতি চালু হয়ে গেল। বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে যেখানে 'হাদীসের সংগ্রহ' যার কাছে যা ছিল তারা সব একই নিয়ম অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে নিতে লাগল। ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ ইমাম শা'বী যদিও মৌখিক বর্ণনা পদ্ধতির প্রতি দুর্বল ছিলেন তদুপরি কিতাব সঙ্গে রাখতেন।

শিক্ষা পদ্ধতিতেও এসময় পরিবর্তনের হাওয়া লাগলো। উস্তাদ একটা উঁচু জায়গায় বসতেন, হাতে থাকতো হাদীসের অনুলিপিসমূহ। ছাত্ররা বসতো দোয়াত-কলম নিয়ে। উস্তাদ যা কিছু বর্ণনা করতেন, হুবহু একই ভাষায় ছাত্ররা যার যার খাতায় তা লিখে নিতো। ছাত্র সংখ্যা বেশি হলে মাঝখানে একজন অনুঘোষক দাঁড়িয়ে যেতো, সে পৌছে দিতো শেষ কাতারের ছাত্রটি পর্যন্ত। কিন্তু এখানে একটা বাধ্যবাধকতা ছিল— মানে-মতলবে যা-ই হোক, মূল উক্তিতে যেন

১. ফাতহুল মুগীস, পৃষ্ঠা ২৩৯। মুকাদ্দাসা কিস্তালানী,শরহে বুখারী, পৃষ্ঠা-৬

www.pathagar.com

কোন রকম হেরফের না হয়। কাজেই অনুঘোষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটা গুণাগুণ পরীক্ষা করে নেয়া হতো— যেমন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা, সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও দরাজ কণ্ঠস্বর। সমন্বিত এইসব গুণের অধিকারী আদম বিন আবী আইয়াস ছিলেন ইমাম শো'বার মজলিসে এবং ইমাম মালিকের জালসায় এই দায়িত্ব পালন করতেন ইবনে আতিয়া।

ইমাম সাহেবের হাদীসের শিক্ষকবৃন্দ

একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে ইমাম আবু হানিফা (রহ) বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। বৈশিষ্ট্যটি ছিল তাঁর হাদীসের শিক্ষক অসংখ্য ও বেশুমার। আবু হাফ্স কবীর দাবি করেছেন— কমপক্ষে চার হাজার সংরক্ষকের কাছ থেকে ইমাম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা আর যাই থাক হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করার জন্য যে শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সহনশীলতা সেকালের মুসলমানগণ দেখিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা যেমন বিরল, তেমনি অন্যান্য জাতির কাছে তা কল্পনারও অতীত।

আমরা এমন কিছু মনীষীর নাম বলতে পারি যাঁদের হাদীসের শিক্ষাগুরু চার হাজারের কম ছিল না। এক হাজারের অধিক উস্তাদের কাছে হাদীস শিখেছেন এমন আলেমের সংখ্যাও কম নয়। আল্লামা সাখাবী তাঁর 'ফাতহুল মুগীস'-এ এঁদের সংখ্যাও গণনায় আনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ ধরনের কোন দাবি যদিও ইমাম আবু হানিফার বেলায় ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করা যাবে না। তবে তিনিও যে একটা বিরাট সংখ্যক বর্ণনাকারীর কাছ থেকে বর্ণনা শুনেছেন এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই এবং একথা মাননীয় সব মুহাদ্দিসীনগণ স্বীকারও করেছেন। আল্লামা জুহরী তাঁর "তাযকেরাতুল হুফ্ফায" গ্রন্থে ইমামের শিক্ষাগুরুগণের একটা সংখ্যা নির্ণয় করার চেষ্টা পেয়েছেন। তবে শেষকালে خلق كثير অর্থাৎ অনেক মানুষ বলে ছেড়ে দিয়েছেন। হাফেয আবুল মুহাসিন শাফেয়ী তাঁর "উকুদুল জুমান"-এ তিনশ' উনিশ জনের নাম-পরিচয়সহ উল্লেখ করেছেন এবং শেষে লিখেছেন, আমি আর একখানি বই যার নাম "তাহ্সীলুস্সাবী ইলা মা'রেফাতুল ছাক্বাত ওয়াল মজাহীল"-এ ঐসব ব্যক্তিবর্গের অবস্থা-অবস্থান সম্পর্কেও বিস্তারিত লিখেছি। কিন্তু যেহেতু তাঁদের তালিকা বেশিরভাগ 'হানাফী ফকীহ্'দের কাছ থেকে নেয়া তাই মুহাদ্দিসীনগণ সম্পূর্ণটার ব্যাপারে একমত নাও হতে পারেন।

ইমাম সাহেবের শিক্ষাগুরুগণের আংশিক বিবরণ ঃ মুহাদ্দিসীনগণ ইমাম সাহেবের সার্বিক অবস্থা অবস্থিতি নিয়ে যেসব বই-পুস্তক লিখেছেন যার মধ্যে তাঁর শিক্ষাগুরুগণের ওপর পূর্ণ অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা আমাদের চোখে পড়েনি। মনীষীদের দলিল প্রমাণ ভিত্তিক বইগুলো যার মধ্যে ইমামের উল্লেখ রয়েছে তা আমাদের সামনেই আছে। যার মধ্যে লাখ লাখ মানুষের কথা লেখা আছে। এর মধ্যে থেকে বিশেষ কোন একজনের পরিপূর্ণ বিবরণ খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। মুখতাসার তারিখে বাগদাদ, তাহযীবুল কামাল, তাহযীবুল আসমা'আ, ওয়াল্লুগাত, তাযকেরাতুল হুফ্ফায, মুলাখ্খাছ তবক্বাতুল হুফ্ফায, তাহযীবুত্তাহযীব, আনসাব ছাম্আনী, মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আসাব এবং ইমাম

www.pathagar.com

মুহাম্মদের[১] অনুসৃত পন্থা থেকে যেভাবে তাঁর শিক্ষাগুরুগণের নাম নির্বাচন করা যায় তাদের নাম নীচে বর্ণিত হলো। যাদের অধিকাংশের মোটামুটি অবস্থা আমরা উপরে লিখে এসেছি। আত্তা বিন আবী রাবাহ মাক্কী, আসেম বিন আবীন নুজুদ কুফী, আলক্বামা মারছাদ কুফী, হাকাম বিন উৎবা কুফী, সালমাহ্ বিন কাহীল কুফী, হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের মাদানী, আ'লা বিন আল-আকরাম আল কুফী, যিয়াদ বিন আলাক্বা কুফী, সাঈদ বিন মাসরূক কুফী, আদি বিন ছাবেত আনসারী কুফী, আতিয়া বিন সাঈদ মাদানী, হিশাম বিন উরওয়াহ মাদানী, হাফেয ইবনে হাজার, আসক্বালানী, আবু ইসহাক আসসাবঈ কুফী, নাফে বিন উমর মাদানী, আবদুর রহমান বিন হারমায আল আ'রাজ মাদানী, কাতাদাহ্ বাসরী, আমরুদ বিন দীনার মাক্কী, মহারেব বিন অসার কুফী, হাশীম বিন হাবীব আস্‌সরাফ কুফী, কায়েস বিন মুসলিম কুফী, মুহাম্মাদ আবুল মুনকাদার আল মাদানী, ইয়াযীদ আল ফাকীর কুফী, ছামাক বিন হারব কুফী, আবদুল আযীয বিন রাফী মাক্কী, মাকাহোল শামী, আমরূদ বিন মাররাহ আল কুফী, আবু আয়্যুবের মুহাম্মাদ বিন মুসলিম মাক্কী, আবদুল মালিক বিন উমর কুফী, মনসুর জাযান, মানসুর আল মু'তামার, আতা বিন আস্‌সায়েব আস্ সাকাফী, আতা বিন আবী মুসলিম আল খুরাসানী, আসেম বিন সুলাইমান আল আহোল বসরী, 'আমাশ কুফী, আবদুল্লাহ বিন উমর বিন হাফ্‌স আল মাদানী, ইমাম আওযায়ী, জুহরী, ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ কুফী, ইস্‌মাঈল বিন আবদুল মালিক মাক্কী, হারেস বিন আবদুর রহমান মাক্কী, খালেদ বিন আলকামাহ্ আলওদায়ী, রবিয়া আররায়ে, শাদ্দাদ বিন আবদুর রহমান বসরী, শাইবান বিন আবদুর রহমান বস্‌রী, তাউস বিন কীসাল ইয়ামানী, আবদুর রহমান বিন দীনার আল মাদানী, আকরামাহ্ মাওলা, ইবনে আব্বাস মক্কী, আউন বিন আবদুল্লাহ্ কুফী, কাবুস বিন আবী যুরিয়ান কুফী, মুহাম্মদ বিন আস সায়েব আল কালবী কুফী, মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আয্‌যুহরী, আবু সাঈদ মাওলা (রহ্) (তাহযীবুল কামাল)

মূসা বিন আবী আয়েশাহ্ কুফী, সালাত্ বিন বাহরাম, ওসমান বিন আবদুল্লাহ বিন হোশাব বেলাল, হাছীম বিন আবী আল হাছীম, হাছীন বিন আবদুর রহমান, মা'আন, মাইমুন বিন সিয়াহ, জাওয়াব আল তাইমী সালেম, আল আফ্‌তাস, ইয়াহ্ইয়া বিন আমরূদ বিন সালমা, আমরূদ বিন জাবীর, ওবায়েদুল্লাহ্ বিন উমর, মুহাম্মদ বিন মালিক হামদানী আবুস্ সাওয়ার, খারেজাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ বিন আবী যিয়াদ, হাকাম বিন যিয়াদ, কাছীর আল আসেম, হামীদ আল আ'রাজ আবু আল উতুফ, আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান, সুলাইমান আশ্ শাইবানী, সাঈদ আল মারয্‌বান, উসমান বিন আবদুল্লাহ (রহ্)। (কিতাবুল আসার ইমাম মুহাম্মদ)

ইমামের অনুসন্ধান ও সতর্কতা

একটা উড়ন্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখা নামসমূহ ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে খুঁজলে হয়তো উকুদ আল জুমআনে দেয়া তালিকার বরাবর হয়ে যেতো। বস্তুত ইমাম আবু হানিফার বিচার-বিশ্লেষণ, গবেষণা এবং বিষয় নির্বাচনে সিদ্ধান্তের বেলায় যে সতর্কতার পরিচয়

১. তাহযীবুল কামাল, মৌলভী আবদুল হাই

www.pathagar.com

আমরা পাই সেখানে অনেক অনেক উস্তাদের বিশাল তালিকা এমন কোনো অহংকারের ব্যাপার নয়।

একটা ব্যাপার তাঁর খুব ভাল করেই জানা ছিল যে, বর্ণনা পরম্পরায় যেভাবে যতো বেশি সূত্র মাধ্যম হবে, সেভাবেই তার মধ্যে গড়মিল, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে। তাঁর উস্তাদগণের অধিকাংশই তাবেয়ীন। রাসূলুল্লাহ্ (স) পর্যন্ত তাঁদের ব্যবধান মাত্র একজন বা একটি সূত্র মাধ্যম। কিছু আছেন যারা তাঁদের জীবনের বেশিরভাগ সময় বড় বড় তাবেয়ীনগণের সাথে অতিবাহিত করেছেন। জ্ঞান-গরীমা, দ্বীনদারী, দুনিয়া ত্যাগী এবং কৃচ্ছ্রতায় যাঁরা সমাজে আদর্শ পুরুষ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই দুই ধরনের ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর যাঁরা আছেন তারা নেহাত ব্যতিক্রম। তাঁর শেখার ধরন অন্যান্য ছাত্রদের থেকে আলাদা ছিল। আলোচনা-পর্যালোচনা এবং সত্য নির্ণয়ে প্রাণপাত চেষ্টা-প্রচেষ্টা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কোন ব্যাপারে উস্তাদগণের সাথে বিতর্ক বেধে গেলে কখনও পিছিয়ে যেতেন না বরং বিনীত অথচ নির্ভীকভাবে নিজের মতামত জানিয়ে দিতেন।

একবার ইমাম হাম্মাদ (রহ) কিছুদূর এগিয়ে দেবার জন্য তাঁর সাথে পথে বেরুলেন। পথে মাগরিবের সময় হয়ে গেল, অযুর জন্য পানির সন্ধান হলো, পাওয়া গেল না— হাম্মাদ তায়াম্মুমের ফতোয়া দিলেন। আবু হানিফা (রহ) প্রতিবাদ করলেন, বললেন, পানির জন্য ওয়াক্তের শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। কিছুদূর আরো চলার পরে পানি পাওয়া গেল এবং যথারীতি অযু করে নামায আদায় হলো। বলা হয়ে থাকে, এটাই তাঁর উস্তাদের সঙ্গে প্রথম বিতর্ক এবং তা সম্ভবত তার শিক্ষা জীবনের গোড়ার দিকে।

তাঁর উস্তাদ ইমাম শা'বী "গুনাহের কাফ্ফারা নেই" এই মত পোষণ করতেন। একবার উস্তাদ-শাগরেদ নৌকাযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। কথায় কথায় ঐ মাসয়ালার প্রসঙ্গ উঠে এলে আবু হানিফা বললেন ঃ অবশ্যই "গুনাহের কাফ্ফারা আছে"। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যেহার-এ কাফ্ফারা নির্ধারণ করেছেন এবং এই আয়াতে

وَانَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا -

তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। (সূরা মুজাদালাহ ঃ ২)

ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন— যেহার গুনাহ্।

ইমাম শা'বী কোন জবাব দিলেন না, শুধু রাগ করে বললে ঃ قياس انت এটা তোমার যুক্তি।[১]

আত্তা বিন আবী রাবাহ্-এর কাছে কেউ একজন এই আয়াতের অর্থ জানতে চাইলেবললেনঃ وَآتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ...... আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইয়ুবের সন্তান-সন্ততি, বংশধর ও অনুসারী যারা মরে গিয়েছিল তাদেরকে জীবিত করে দিলেন এবং তাদের সাথে আরও নতুন জন্ম দিয়ে দিলেন। আবু হানিফা (রা) বললেন, যে ব্যক্তি কারো ঔরশে জন্ম নেয়নি সে তার বংশধর হয় কেমন করে ?

১. উকূদুল বাহমাস অষ্টম অধ্যায়

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফার এতোটা জানা বা অবহিতির পেছনে সবচাইতে বড় যে কারণ তাহলো বড় বড় জ্ঞান তাপসগণের স্নেহময় সঙ্গ লাভ করেছেন এবং তাঁদের সাথে প্রচুর সময় কাটিয়েছেন। যেসব শহরে তার থাকতে হয়েছে অর্থাৎ কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা— এসব স্থানের আলো-বাতাস, মাটি-পাথর তথা গোটা পরিবেশের মধ্যে দ্বীনের মৌলিক রীতি-নীতি, বর্ণনা ও বচন, সব মিলেমিশে একাকার হয়েছিল। প্রচণ্ড কৌতুহল এবং জ্ঞানের প্রতি অতৃপ্ত পিপাসা তাঁর জন্মগত স্বভাব ও প্রকৃতি, সর্বোপরি মহান আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কৃপা ও মেহেরবাণী।[১]

২. মুখতাসার তারীখে বাগদাদ

www.pathagar.com

শিক্ষকের আসন গ্রহণ ও কর্মজীবন

উস্তাদের আদব

ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে গবেষণামূলক প্রয়াস অর্থাৎ 'ইজতিহাদ' করার যোগ্যতা, মান এবং স্বীকৃতি— উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ (রহ) বেঁচে থাকতেই ঐসবের অধিকারী হয়েছিলেন ইমাম আবু হানিফা। বয়সও এমন কিছু কম ছিল না। উস্তাদের ইন্তেকালের সময় কমবেশি চল্লিশের কোঠায় দাঁড়ানো।

উস্তাদের জীবদ্দশায় নিজে একটা দরসের আসন খুলে বসবেন, এটা ছিল নীতি ও রীতি বিরুদ্ধ কাজ। সেকালে উস্তাদ-সাগরেদ সম্পর্ক যে শ্রদ্ধা-সম্মান এবং স্নেহ-ভালবাসার ওপর দাঁড়ানো ছিল আজকের দিনে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। ইমামের নিজের মুখের কথা— "উস্তাদ হাম্মাদ (রহ) যতোদিন বেঁচে ছিলেন কখনো তাঁর বাড়ির দিকে আমার পা ছড়িয়ে দেইনি।" ১২০ হিজরীতে হাম্মাদ (রহ) ইন্তেকাল করেন। যেহেতু ইবরহীম নখঈ'র পরে ফিকাহ্ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তিনিই ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর কুফা নগরী আক্ষরিক অর্থেই যেন 'চেরাগহীন' হয়ে গেল। উস্তাদের ছেলেকে দরসের শূন্য মসনদে বসানো হলো, কিন্তু তিনি ছিলেন ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের অনুরাগী। অতঃপর ছাত্রদের মধ্যে বয়স এবং অভিজ্ঞতা মানানসই মূসা বিন কাছীর (রহ)-কে সে আসনে বসানো হলো। যদিও ফিক্হী বিষয়ের ওপর পূর্ণ দক্ষতা তার ছিল না কিন্তু তবু বড় বড় উস্তাদগণের সাহচর্য তাকে মোটামুটি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তুলেছিল। দরস-তাদরীস তাকে কেন্দ্র করেই চলছিল, কিন্তু তিনিও যখন হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন তখন গণ্যমান্য সর্বজনের সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর কাছে শূন্য মসনদ অলংকৃত করার প্রস্তাব রাখা হলো।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির দাবিই এমন! হয়তো যৌবনেই উস্তাদের আসনে বসার তীব্র বাসনা মনের কোণায় লুকানো ছিল! আজ লোকেরাই সেজন্য তাকে অনুরোধ করছে। আর বাস্তবতার নিরিখে সার্বিক দায়িত্বের আসল রূপ যখন চোখের সামনে ভেসে উঠলো তখন পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন— "আমি এ দায়িত্বের যোগ্য নই"। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনভাবে ঘিরে দাঁড়ালো যে, অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকল না। রাজি তাকে হতেই হলো। কিন্তু মনের ভয় ? তা তো দূর হচ্ছে না! আবুল মুহাসিন লিখেছেন, ঠিক এই সময়ই তিনি স্বপ্ন দেখেন— 'আল্লাহ্র রাসূলের কবর খুঁড়ছেন'। ভয়ে শিউরে উঠলেন, বুঝে নিলেন 'এ স্বপ্ন তাঁর অযোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করছে'। ইমাম ইবনে শিরিন (রহ) স্বপ্ন-বিশ্লেষণে সর্বজনমান্য ছিলেন। তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, "একটি মৃত জ্ঞানকে পুনর্জীবিত করার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে"। ভয় কেটে গেল, মন শান্ত হলো। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং প্রশান্ত মন নিয়ে 'দরস' দিতে শুরু করলেন।

সকল মুহাদ্দিসীন এবং ঐতিহাসিকগণ স্বপ্নের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। হয়তো স্বপ্নের

www.pathagar.com

ঘটনাটি সত্য তবে ইবনে শিরিনের স্বপ্ন ব্যাখ্যার যোগটি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়, কেননা তিনি তার বহু আগে ১১০ হিজরীতে পরলোক গমন করেছিলেন। সে যাই হোক, ইমাম আবু হানিফা (রহ) স্বাধীনভাবে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথম প্রথম মরহুম উস্তাদের প্রাক্তন ছাত্ররাই দরসে অংশ নিতো, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুনাম সুখ্যাতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, সমগ্র কুফার অন্যান্য সকল 'দরসগাহ্' থেকে ছাত্ররা এসে তাঁর জলসায় ভীড় জমাতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে. সেইসব হালকায়ে দরসের উস্তাদগণ যেমন মাসআর বিন কেদাম, ইমাম আ'মাশ প্রমুখ এসে তাঁর আলোচনায় অংশ নিতেন অন্যদেরকেও এখানেই আসার উৎসাহ দিতেন।

শিক্ষকতার পরিধি

শুধুমাত্র স্পেন ছাড়া ইসলামী জগতের এমন কোন অঞ্চল অবশিষ্ট ছিল না যা তার শিষ্যত্বের প্রভাব বা সম্পর্ক থেকে মুক্ত ছিল। গ্রাম-গঞ্জের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় তবে যেসব জেলা বা প্রশাসনিক রাজ্যগুলোর নাম বিশেষভাবে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন তা উদ্ধৃত করা হলো— মক্কা, মদীনা, দামেস্ক, বসরা, ওয়াসে, মোসুল, জাযীরাহ, রাক্কাহ, নাসীবাইন, রমলাহ, মিশর, ইয়ামন, ইয়ামামাহ্, বাহরাইন, বাগদাদ, আহওয়াজ, কিরমান, ইস্ফাহান, হালাওয়ান, ইসতেরাবাদ, হামাদান, নাহত্তেওয়ান্দ, রে, কুমাস, তিবরিস্তান, জুরজান, নিশাপুর, সারখাস্, নিসা, বুখারা, সরমকন্দ, ফিস, ছানআন, তিরমিয, হেরাত, নেহিসতার, আলযাম, খাওয়ারিযিম, সীস্তান, মাদারেস, মাছিছাহ, হামাস্ ইত্যাদি।[১] অর্থাৎ ইসলামী খেলাফতের পরিধি এবং বিস্তৃতি যতোটা ইমাম আবু হানিফার শিক্ষকতার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি ঠিক ততোটাই।

ধীরে ধীরে সমগ্র ইরাকে তাঁর প্রভাব এতোটা গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, 'খিলাফতে রাজতন্ত্রে'র বিরুদ্ধে যেসব আন্দোলন বা বিদ্রোহের আয়োজন হতো তারা সবাই তাঁর সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করতো। 'তোহ্ফা'তে শাহ্ আবদুল আজীজ লিখেছেন— উমাইয়া রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যায়েদ বিন আলী যে বিদ্রোহ করেছিলেন তাতে 'ইমাম' শরীক ছিলেন। 'নামায়ে দানেশওয়ারাঁ'র রচয়িতাবৃন্দও এরকমই মনে করেন। কিন্তু আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। যে সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কিতাবাদি আমাদের সম্মুখে রয়েছে তার কোথাও একথার উল্লেখ নেই। অথচ এরকম কোন ঘটনা যদি সত্যিই হতো তাহলে তা এসব গ্রন্থে অনুল্লেখ থাকার কথা নয়।

হযরত যায়েদ বিন আলী (রহ) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ) ঃ ১৩৫ হিজরীতে হিশাম পরলোক গমন করেন। তারপর অলিদ বিন ইয়াযিদ, ইয়াযিদ আননাক্বেস, ইবরাহীম বিন আল ওয়ালিদ, মারওয়ান আল হিমারী-এর পরেও অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা একের পর এক সিংহাসনে আসীন হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে আব্বাসী খেলাফতের নড়বড়ে অবস্থা পরম্পরা চলে আসছিল। এই টালমাটাল অবস্থা মারওয়ানের সময়ে এসে আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। আবু মুসলিম খুরাসানী গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে এমন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলো যা মারওয়ানী শাসনের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিলো। দাঙ্গা-ফাসাদের কেন্দ্র ছিল ইরাক আর কুফা ছিল কেন্দ্রবিন্দু।

---

১. উকুদুল জুমান, ৫ম অধ্যায়।

www.pathagar.com

ক্ষমতা গ্রহণে অস্বীকৃতি

মারওয়ান— দূরদর্শী, বীর, উদার এবং অত্যন্ত উচ্চবংশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইয়াযিদ বিন উমর বিন হাবীরাহ্‌কে ইরাকের গভর্ণর করে পাঠান। ইয়াযিদ মারওয়ানী শাসনের অবকাঠামো এবং প্রকৃতি সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানত এবং বুঝতে পারত যে, এই কাঠামোর মধ্যে সবই আছে, নেই শুধু ধর্মীয় অংশ। তাই শাসন প্রণালী ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় নতুন করে ঢেলে সাজাবার জন্য সংস্কারে মনোযোগী হন এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজী ইবনে আবী লায়লা, ইবনে শিব্‌রামাহ, দাঊদ বিন হিন্‌দ (রহ) প্রমুখসহ আরো অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিয়োগদান করে। ইমাম আবু হানিফাকে স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করা হয় যা তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন। ইয়াযিদ কসম খেয়ে বলে, 'আপনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য'! ইমামের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-স্বজন সবাই নানানভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং ভয় দেখায়। কিন্তু জবাবে ইমাম বলেন ঃ ইয়াযিদ কোন মুসলমানের হত্যার আদেশ দেবে আর আমি তা কার্যকর করার অনুমোদন দেবো?[১] এতো অনেক দূরের ব্যাপার, সে যদি বলে আপনি মসজিদের দরজাগুলো গুণে দিন! তাও আমি ঠিক এভাবেই অত্যন্ত ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করবো। ইয়াযিদ রাগে অন্ধ হয়ে প্রতিদিন ইমামকে দশটি করে দোর্‌রা মারার আদেশ দেয়। আদেশ যথারীতি কার্যকর হতে থাকে এবং ইমামও নীরবে তা সহ্য করে যান। এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের পরেও ইমামের স্বীকৃতি আদায় করতে না পেরে ইয়াযিদ শাস্তি-আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর তিনি মক্কায় চলে যান এবং ১৩৬ হিজরীর শেষ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

ইবনে কুতাইবাহ্ প্রমুখ লিখেছেন যে, কাজীর পদ গ্রহণ নিয়ে এই ঝগড়া বাধে, হতে পারে উল্লেখিত পদওতার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, যা গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন।

১৩২ হিজরীতে সাম্রাজ্যের পটপরিবর্তন হয়। উমাইয়া বংশের তখ্‌ত ও তাজের নতুন মালিক এখন আব্বাসের বংশধররা। মুকুট পরে প্রথম যে সিংহাসনে বসে তার নাম আবুল আব্বাস সুফফাহ্। চার বছর রাজ্য-শাসন পরিচালনা করে ১৩৬ হিজরীতে মারা যায়। তারপর সিংহাসনে বসে তার ভাই মনসুর।

সফাহ্ ও মনসুরের অত্যাচার ঃ আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের শুধু সিংহাসন থেকে উৎখাত করেই ক্ষান্ত হয়নি, গোটা সাম্রাজ্যের যেখানে যাকে পেয়েছে হত্যা করেছে। এমনকি মৃত উমাইয়া খলিফাদের কবরগুলো খুঁড়ে তার ভেতর থেকে হাঁড়গোড় তুলে জ্বালিয়ে ফেলেছে। নতুন রাজা নতুন রাজত্ব। সামগ্রিক প্রশাসন তখনও সংহত হয়নি। এখানে-ওখানে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সে সব বিদ্রোহ দমনে সাফাহ ও মনসুর ইনসাফের সকল সীমা অতিক্রম করে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে লাগলো যা মানুষকে উমাইয়াদের নির্যাতনের কথা ভুলিয়ে দিলো। নতুন আশা নতুন আগ্রহ নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের মানুষ নতুন সম্রাটদের দিকে তাকিয়ে ছিল কিন্তু ঐসব নিষ্ঠুর রক্তপাত তাদের সে আশাকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করে দিলো।

১. ইকুদুস জুমান, বিংশতী অধ্যায়

www.pathagar.com

একদিন সম্রাট মনসুর বাল্যবন্ধু আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের সালতানাতের সাথে মারওয়ানী সালতানাতের পার্থক্য কি ? আবদুর রহমান বলল ঃ আমার তো কোন পার্থক্যই চোখে পড়ে না! মনসুর বলল ঃ "কি করব কাজের মানুষতো পাওয়া যাচ্ছে না।" আবদুর রহমান বলল ঃ বাজারে যে জাতের চাহিদা বেশি, সেই জাতের আমদানীও হয় বেশি।

মনসুর সবচাইতে বেশি বাড়াবাড়ি যেটা করেছে, তাহলো হযরত আলী (রা) এবং হযরত ফাতেমার (রা)-এর বংশধরদের খুঁজে খুঁজে বের করে নির্যাতন করা। এটা পরিষ্কার যে, তারা দীর্ঘদিন যাবত খেলাফত অধিকার করার পরিকল্পনা করে আসছিল। এক হিসেবে যেটা তাদের ন্যায্য অধিকারও বটে। তবে সাফা'র মৃত্যু পর্যন্ত তাদের এ পরিকল্পনার কোন ধরনের কোন প্রকাশ ঘটেনি। শুধু সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে মনসুর তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে দিলো। যারা নেতৃস্থানীয় তাদের ওপর নির্যাতনের নিষ্ঠুরতা ছিল নির্মম! মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম সে সময়ের সুন্দরতম পুরুষ অদ্বিতীয় তার তুলনা সে নিজেই তাই লোকে তাকে দীবাজ (রেশমী কাপড়) নাম দিয়েছিল। মনসুর তাকে দাঁড় করিয়ে চারিদিকে দেয়াল তুলে জীবন্ত কবর দিয়েছে।

এইসব নির্দয়-নির্মম কাহিনী বর্ণনা করতে ও শুনতে অত্যন্ত কঠিন হৃদয়ের প্রয়োজন। যা একসময় তাদেরকে মরণপণ বিদ্রোহে বাধ্য করে ছিলো। তাই এদেরই এক মজলুম 'মুহাম্মদ' 'নফসে যাকীয়াহ' মাত্র কয়েকজন লোক নিয়ে মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এক বিশাল জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ে সমর্থ হলো। বড় বড় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, এমনকি ইমাম মালিক (রহ) ফতোয়া দিলেন— মনসুরের 'বাইয়াত' নির্যাতনমূলক, জোর করে আদায় করা। খেলাফতের আসল হকদার নফ্‌সে যাকিয়াহ।

নফ্‌সে যাকিয়াহ্ ও ইবরাহীমের বিদ্রোহ ঃ শক্তিশালী দু' খানি বাহু, যুদ্ধ কৌশলে পারদর্শী, বীর নফ্‌সে যাকিয়াহ ১৪৫ হিজরীর রমযান মাসে সরকারী বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর ময়দানে শহীদ হন। এরপর তার ভাই ইবরাহীম খিলাফতের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন এবং একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকেন। ইবরাহীমের শক্তিমত্তায় মনসুর দিশাহারা হয়ে পড়ে। কথিত আছে যে, এই বিপর্যয়ের সময় দীর্ঘ দু' মাস মনসুর তার পরিধেয় কাপড় বদলায়নি। মাথার বালিশ হাতে নিয়ে বলতো, 'আমি জানি না এই আরামের বালিশ আমার না ইবরাহীমের'। বিচলিত রাজার মনোরঞ্জনের জন্য অপরূপ দুই দাসী 'শাহী হেরেমে' আনা হয়। মনসুর তাদের সাথে কোন কথাও বলেনি। খাদেম প্রশ্ন করলে খলিফা উত্তরে বলল, "এসব অবসরের কাজ, এখনতো শুধু একটাই ভাবনা— ইবরাহীমের মাথা আমার সামনে না আমার মাথা ইবরাহীমের সম্মুখে রাখা হবে"।

ইবরাহীম একাধারে মুসলিম, বিশাল হৃদয়ের অধিকারী শ্রদ্ধাভাজন জননেতা এবং বীর সেনাপতি। উপরন্তু আলী-ফাতেমা (রা)-এর বংশধর। তাঁর খেলাফতের অধিকার ও দাবির ওপর চারিদিক থেকে শুধু 'লাব্বায়েক' 'লাব্বায়েক' ধ্বনি শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। শুধুমাত্র 'কুফাতেই' কমপক্ষে এক লাখ লোক তার পেছনে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে বিশিষ্ট ওলামা ও ফকীহ্‌গণ তার সমর্থনে কাজ করতে লাগলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) প্রথম থেকেই আব্বাসীয়দের ভারসাম্যহীন শাসন ও বে-ইনসাফীর নমুনা দেখে আসছিলেন। সাফাহ-এর সময় থেকেই তাঁর রায় জনগণের মধ্যে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, "এরা খিলাফতের আসনে বসার যোগ্য লোক নয়"। ইবরাহীম বিন মাইমুন একনিষ্ঠ দ্বীনদার এবং বড় আলেম ছিলেন। ইমাম আবু হানিফার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। সব সময়ই বলতেন, এতো জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে আমরা কি চুপ করে থাকবো? ইমাম সাহেব বলতেন, আমর বিল মা'রূফ নিঃসন্দেহে কর্তব্য কাজ কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত উপকরণ পূর্বশর্ত, কিন্তু তিনি তাঁর চেতনায় প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয়গিরীকে 'সবরের' নিয়ন্ত্রণে দাবিয়ে রাখতে পারেননি। জালিমদের অন্যতম শিখণ্ডি আবু মুসলিম খোরাসানীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে নিজের খিলাফতের দাবি প্রসঙ্গে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। জালিমের সম্মুখে এসব কথা গোস্তাখী এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হয়। সাথে সাথে উস্কানীদাতার অভিযোগ এনে তাঁকে হত্যার আদেশ দেয়, হত্যা করা হয় নির্মমভাবে এবং তিনি শহীদ হন।

ইমাম আবু হানিফা বন্ধুর শাহাদাতের কথা শুনে আকুল হয়ে কাঁদেন।[১] অসহায় খাঁচাবন্দী সিংহের মতো ছটফট করেন। এতোবড় আঘাতের প্রতিঘাত করার মতো শক্তি-সামর্থ্য তাঁর নেই। এ ঘটনা ১৩১ হিজরীর। ১৪৫ হিজরী সালে যখন ইবরাহীম খিলাফতের পতাকা উত্তোলন করেন তখন অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ইমামও তার প্রতি সমর্থন জানান। নিজে স্বশরীরে এই যুদ্ধে অংশ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু বিশেষ সমস্যার কারণে তা আর হয়ে উঠেনি। বাকী জীবন এই ব্যর্থতার ব্যথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেননি, শুধু আফসোস করে কাটিয়েছেন।

ইবরাহীমের প্রতি ইমামের সমর্থন ও সহযোগিতা

নামায়ে দানেশওয়ারাঁতে ইমামের একটি চিঠি উদ্ধৃত করা হয়েছে যা তিনি ইবরাহীমকে লিখেছিলেন ঃ

اما بعد فانی قد جهزت اليك اربعة الاف درهم ولم يكن عندی غيرها ولولا امانات عندی للحقت بك فاذا لقيت القوم وظفرت بهم فافعل كمافعل ابوك فی احل صفين اقتل مدبرهم واجهز علی جر يحهم ولاتفعل كما فعل ابوك فی احل الجمل فان القوم لهم فئة -

আমি আপনার কাছে চার হাজার দেরহাম পাঠালাম। এসময় আমার কাছে যা ছিল। আমার কাছে মানুষের আমানত গচ্ছিত না থাকলে আমি অবশ্যই আপনার সঙ্গে থাকতাম। আপনি যখন বিজয়ী হবেন তখন শত্রুর সাথে সেই আচরণই করবেন যা আপনার পিতা 'সিফ্‌ফীনের' পরাজিতদের সাথে করেছিলেন। 'পলাতক ও আহতদের মেরে ফেলো' এ পদ্ধতি আপনি গ্রহণ করবেন না। আপনার পিতা 'উষ্ট্রের যুদ্ধে' (জঙ্গে জামাল) এ পথ খোলা রেখেছিলেন। কেননা প্রতিপক্ষ অত্যন্ত সংঘবদ্ধ এবং সংখ্যায় অনেক।

১. আল জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ ও তরজমাহ্ ইবরাহীম বিন সাইমুন।

www.pathagar.com

নামায়ে দানেশওয়ারাঁ এ চিঠির প্রাপ্তি সূত্র হিসাবে "বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহে" উল্লেখিত রয়েছে। বলেই দায়ীত্ব শেষ করেছে কিন্তু বিশেষ কোন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেনি। এ কারণে আমরা এর সত্যতা সম্পর্কে আস্থা রাখতে পারছি না।

এ চিঠি সত্য হোক বা মিথ্যা! একটি ব্যাপার ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ইমাম ইবরাহীমের প্রকাশ্য সমর্থক এবং সহযোগী ছিলেন। স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়া অন্য সব রকমের সহযোগিতা তিনি করেছেন। ইবরাহীম নিজের পরিকল্পনার ভুলে মার খেয়ে গেছেন এবং বসরার যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন।

বাগদাদে ইমামের তলব

বিদ্রোহী ইবরাহীমকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করার পর মনসুর ইবরাহীমের সহযোগিদের দিকে ফিরে তাকালো। ইবরাহীমের অন্যতম সমর্থনকারী ইমাম আবু হানিফাকে চিনতে ভুল হলো না। মনসুরের রাজধানী তখন কুফা থেকে কয়েক মাইল দূরে 'হাশেমিয়ায়'। কিন্তু কুফাবাসী যেহেতু আলী-ফাতেমা (রা)-এর বংশধর ছাড়া অন্য কাউকে খিলাফতের 'হকদার' মনে করে না! তাই মনসুর এবার ভিন্ন পথ ধরলো। সে রাজধানীর জন্য দ্বিতীয় স্থান বাগদাদকে নির্বাচন করল। ১৪২ হিজরীতে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করার পর ইমাম আবু হানিফাকে রাজধানীতে হাজির হবার জন্য রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করা হলো। উমাইয়া শাসনের উৎখাতের পর মক্কা থেকে ফিরে ইমাম আবু হানিফা (রহ) কুফাতেই অবস্থান করছিলেন। তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা মনসুরের আগে থেকেই ছিল শুধু বাহানা খুঁজছিল। যাই হোক, রাষ্ট্রীয় আদেশ, বাধ্য হয়েই ইমাম আবু হানিফা রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। দরবারী 'রবী' বাদশাহের সাথে ইমামের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "আজকের পৃথিবীর সবচাইতে বড় আলেম"। বাদশাহ মনসুর ইমামকে প্রশ্ন করলো ঃ তার উস্তাদ কে ? কার কাছ থেকে শিখেছেন ? ইমাম তাঁর উস্তাদগণের নাম বললেন ঃ যাঁদের পরম্পরা উর্ধ্বে উঠে বড় বড় সাহাবা পর্যন্ত পৌছায়। মনসুর বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব রাখলো। ইমাম দ্বিধাহীন চিত্তে অস্বীকার করলেন। বললেন ঃ "আমি এ পদের যোগ্যতা রাখি না"। মনসুর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল ঃ তুমি মিথ্যাবাদী। ইমাম সাথে সাথে বললেন ঃ যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার দাবি অবশ্যই সত্য যে, আমি কাজী হবার যোগ্য নই। আর মিথ্যাবাদী কিছুতেই বিচারক নির্বাচিত হতে পারে না!

এটা একটা কৌতুকপূর্ণ বিতর্ক। আসলেই তিনি বিচারকের সার্বিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিলেন না। মনসুরকে বোঝাতে গিয়ে তিনি যেসব সমস্যাগুলো দেখিয়েছিলেন তার সবগুলোই সঠিক ছিল। অর্থাৎ মানসিকভাবে আমি প্রশান্ত নই, আরবের বংশোদ্ভূত নই, যার ফলে আরবের মানুষ আমার বিচারে সন্তুষ্ট নাও হতে পারে। দরবারী আমলাদের তোয়াজ করতে হবে, যা আমার দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়! এসব অজুহাত অগ্রাহ্য করে মনসুর কসম খেয়ে বললো ঃ তোমাকে আমার প্রস্তাব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। ইমামও সাথে সাথে কসম খেয়েই বললেন ঃ কিছুতেই আমি তা করবো না।

দরবারে উপস্থিত সবাই এই ভয়হীন স্পষ্ট কথার উচ্চারণ শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলো। 'রবী' প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে বললো ঃ "আবু হানিফা! তুমি আমীরুল মু'মিনীনের মতো পাল্টা

www.pathagar.com

কসম খাচ্ছ ? ইমামের নির্ভীক জবাব, কেন করবো না! আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষে কসমের কাফ্ফারা আদায় করা আমার চাইতে সহজ।

কারাগারে নিক্ষেপ

খতীবের বর্ণনা একটু অন্য রকম ঃ মনসুরের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইমাম কাজীর কুর্সীতে বসতে রাজী হলেন। একটা মামলা উপস্থিত হলো— বাদী ঋণদাতা দাবি করছে বটে, কিন্তু কোন সাক্ষী নেই। বিবাদী সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। ইমাম সাহেব প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিবাদীকে বললেন ঃ তুমি কসম খেয়ে বলো যে, তোমার ওপর এই লোকের কোন ঋণের দায় নেই। বিবাদী যেই বললো, "আল্লাহ্র কসম, সঙ্গে সঙ্গে! ইমাম সাহেব থামিয়ে দিলেন তাকে। তড়িঘড়ি নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে বাদীর হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার ঋণের টাকা, একজন মুসলমানকে দিয়ে কেন কসম খাওয়াচ্ছ ?

আদালত থেকে ফিরে সোজা মনসুরের কাছে গিয়ে বললেন, কিছুতেই আমার দ্বারা একাজ সম্ভব নয়। এরপর আমৃত্যু কারাবাসের আদেশ দেয়া হলো। মনসুর মাঝে মাঝে কারাগার থেকে ইমামকে বের করে এনে 'ইল্মী বহস' করতো।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর চিরবিদায়

১৪২ হিজরীতে মনসুর ইমামকে গৃহবন্দী করে। কিন্তু এ অবস্থায় কিছুতেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। বাগদাদ রাজধানী হবার ফলে যেমন প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। একইভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্রগুলোও বাগদাদে গড়ে উঠেছিল। তাই গোটা সাম্রাজ্যের প্রতিভাবান ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাগদাদমুখী হলো।

ইমামের পরিচিতি সাম্রাজ্যের সর্বত্র সমান। বন্দী অবস্থায় ইমামের জনপ্রিয়তা কমে যাবার পরিবর্তে ভয়ঙ্করভাবে আরো বেড়ে গেলো। বাগদাদ শহরে অত্যন্ত প্রভাবশালী শিক্ষাবীদ ও আলেম সম্প্রদায়ের সাথে ইমামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠলো। মনসুর ইমামকে একটা বাড়িতে নজরবন্দী করে রেখেছিল বটে কিন্তু এর চাইতে বেশি কিছু করার ধৃষ্টতা তার ছিল না। তাই শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান চর্চার কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে চলছিল। হানাফী ফিকাহ্র হাত ও বাহু হিসেবে খ্যাত ইমাম মুহাম্মদ উস্তাদের বন্দীদশার মধ্যেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইমামের প্রভাব সম্পর্কে মনসুরের যে আশংকা ছিল তা তাকে বন্দী করে দূর হয়নি বরং আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাই বোধকরি তার সর্বশেষ চরম আঘাত হেনেছিল খাদ্যে বিষ মিশিয়ে। ইমাম যখন বিষক্রিয়া অনুভব করতে পারছিলেন তখন পরম করুণাময়ের দরবারে সেজদায় অবনত হলেন। বিধাতার বিধানের একনিষ্ঠ খাদেম জীবন-মৃত্যুর মালিকের সামনে সিজদাবনত। হয়তো বিধাতা সে সিজদা গ্রহণ করেছিলেন তাই সেই অবস্থা থেকেই তাঁর রূহ পরপারের পারাপারের খেয়ায় আরোহণ করতে পেরেছিল।

মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গোটা বাগদাদের মানুষ ইমামের বন্দীখানার দিকে ছুটে এলো। শোকাহত জনস্রোত! প্রধান বিচারপতি গোসল দিচ্ছিলেন, কাঁদছিলেন আর পাগলের মতো বলছিলেন— আল্লাহ্র কসম! তুমিই সবচাইতে বড় ফকীহ্, বড় আবেদ, বড় জাহেদ, আল্লাহ্র প্রিয় সকল গুণ তোমাতে জড়ো হয়েছিল, তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের হতাশ করে দিয়ে গেছো, তারা তোমার মর্যাদার অবস্থানে পৌঁছুবার আর কোন বাহন পাবে না।

কাফন পরিয়ে জানাযার আয়োজন করতে করতে ইমামের বন্দীনিবাস জনসমুদ্রে পরিণত হয়েগেছে। প্রথম জানাযায় মানুষের সংখ্যা ঐতিহাসিকগণের মতে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার। প্রথম জানাযা অর্থাৎ জনদাবীর প্রেক্ষিতে এক এক করে ছয়বার জানাযার নামায হয়েছে। আসরের নামাযের কাছাকাছি সময়ে কবরে সমাহিত করা হয়। ইমাম ওসীয়ত করেছিলেন তিনি মারা গেলে 'খীযরানের' কবরস্তানে তাকে যেন দাফন করা হয়। ওসীয়ত অনুযায়ী কবরস্তানের পূর্ব পার্শ্বে তাঁর 'মাক্ববারাহ' তৈরী করা হয়। ঐতিহাসিক খতীব লিখেছেন, এরপর একটানা বিশদিন পর্যন্ত দফায় দফায় মানুষ এসেছে আর তারা তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেছে। মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এর চাইতে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দের অভিব্যক্তি

বড় বড় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং তার উস্তাদগণ যাঁরা তখনও বেঁচে আছেন। তাঁরা কেঁদেছেন, দুঃখ করেছেন, অনেক বড় বড় মন্তব্য করেছেন। কয়েকটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য ইবনে জারীহ মক্কায় ছিলেন। মৃত্যু সংবাদ শুনে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম অনেক বড় আলেম চলে গেলো! শো'বা বিন আল হিজাজ আবু হানিফার উস্তাদ এবং বসরার প্রধান ইমাম তিনি বলেন, "কুফায় অন্ধকার ছেয়ে গেলো"। আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক কর্ম ব্যাপদেশে বাগদাদে এসেছিলেন, কবরস্তানে গিয়ে অনেক কাঁদলেন এবং কেঁদে কেঁদে বললেন, "আবু হানিফা! আল্লাহ্ তোমার ওপর রহম করুন, ইবরাহীম মরে গেছে, সে তার উত্তরসূরী রেখে গেছে, আফসোস তুমি সারা পৃথিবীতে তোমার কোন উত্তরসূরী রেখে যাওনি।[১]

ইমামের মাযার সেই থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত মানুষের ভালবাসার 'চুম্বন-স্থান'!

দানশীল ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আলেপ আরসালান সেলজুতী ৪৫৯ হিজরীতে আবু হানিফা (রহ)-এর কবরে একটি স্মৃতিসৌধ এবং পাশেই একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। ধারণা করা হয়, বাগদাদে এটাই প্রথম মাদ্রাসা।

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা। এবং এই মাদ্রাসাসমূহের আদি, প্রথম মাদ্রাসা 'নিজামীয়া' এ বছরই নির্মিত হয়েছে, কিন্তু ঐ মাজার মাদ্রাসার পরে। সৌন্দর্য নির্মাণশৈলীর দিক দিয়ে অপূর্ব। আলেপ আরসালানের কোষাগারের প্রধান হিসাব রক্ষক আবু সাঈদ শারফুল মালিকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাগদাদের সকল ওলামায়ে কেরাম এবং রাজন্যবর্গসহ গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত কবি আবু জাফর মাসউদ উপস্থিত ভাবে কবিতার একটি রচণ রচনা করেন।

الم تران العلم كان مبدرا - فجمعه هذا المغيب فى اللحد

كذالك كانت هذه الارض ميتة - فانشرها فعل الحميد ابى سعد

তুমি কি দেখনা! জ্ঞান বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। আর এই কবরে শায়িত ব্যক্তি একে একত্রিত করেছেন। আর এরূপে দুনিয়া ছিল মৃত। অতপর সৌভাগ্যের পিতা প্রশংসিত কাজ দ্বারা একে সঞ্জীবিত করেছেন।

ইমাম আবু হানিফার (রহ) নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসায় বড় বড় শিক্ষাবিদ গভীর অনুভূতি নিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন।

"আল জাওয়াহের আল মুদিয়া ফি তবকাতে হানাফিয়ায়" ঐসব মহান শিক্ষকদের পূর্ণ পরিচয় উদ্ধৃত রয়েছে। খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ্‌র দরবারের হাকিম ইবনে হাজলা তার সারা জীবনের সংগ্রহ বহু মূল্যবান কিতাবাদির সমুদয় এই মাদ্রাসায় ওয়াক্‌ফ করে দেন।[২] মাদ্রাসা

১. উকুদুল জুমান
২. ইবনে খালকান, তরজমাহ্ ইয়াহইয়া বিন ঈসা বিন হাজশহ্ আত্‌তবীব

www.pathagar.com

সংলগ্ন একটি মুসাফিরখানা তৈরী করা হয়, বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে যারা কয়েকদিনের জন্য বাগদাদে আসতো তাদের থাকা-খাওয়ার জন্য।

ভূবন-বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা যখন বাগদাদে এসে পৌছান তখন আব্বাসী খেলাফতের শেষ সময়। তিনি লিখেছেন ঃ ঐ সময় আবু হানিফার স্মৃতিসৌধ ছাড়া আর এমন কোন জায়গা বাগদাদে ছিল না যেখানে মুসাফিরদের জন্য খাবার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় দেড় সহস্র অব্দ পরের কথা— আজও বাগদাদে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মাযার অন্যতম। উনিশ শতকের প্রথমদিকে ইরানের শাহ্ সুলতান নাসিরুদ্দিন তার ভ্রমণ কাহিনীর একপর্যায়ে এই সৌধ দর্শন করে লিখেছে, "আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মাযারে ফাতেহা পড়েছি কিছু সাদকা আদায় করেছি", জ্ঞানের মর্যাদা দেখ! যার সাধনা করে কুফার এক কাপড়ের ব্যবসায়ী এতো উচ্চে উঠেছে যে, আজ তেরশ' বছর পরেও তার মাযারে বড় বড় শাহানশাহ্দের মাথানত হয়ে আসে।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের সন্তান-সন্ততি

ইমাম সাহেবের সন্তানদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর মৃত্যুর সময় হামাদ ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। হামাদ পিতার মতো উন্নত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ছোটবেলায় অত্যন্ত যত্নের সাথে শিক্ষা জীবন শুরু হয়। যেদিন সূরা ফাতিহা শেখা হয়েছে সেদিন আনন্দানুষ্ঠান করে তার উস্তাদকে পাঁচশ দেরহাম উপহার দিয়েছেন পিতা আবু হানিফা। একটু বড় হলে নিজেই পর্যায়ক্রমিকভাবে শিক্ষা দিয়েছেন পুত্রকে। শিক্ষা ও জ্ঞানের সাথে সাথে মানুষের কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে পিতার একনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে উঠেছিলেন।

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর সময় মানুষের অনেক ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখা ছিল। শহরের 'কাজীর' কাছে তা নিয়ে গিয়ে বললো ঃ যাদের আমানত তাদের কাছে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করুন। কাজী সাহেব ছেলেকে বললেন ঃ এখন এসব তোমার কাছেই রেখে দাও, আশা করি পিতার চাইতে তুমিও কম আমানতদার হবে না। ছেলে বললো ঃ আপনি এগুলো ভালো করে দেখে নিন, আমি ভাবছি আমার বাবার আমানতদারী কোনক্রমেই যেন নষ্ট না হয়ে যায়। যাই হোক কাজী সাহেবের কাছে যাবতীয় মাল-সম্পদ বুঝিয়ে দিয়ে নিজে সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলেন এবং সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, গাচ্ছিত মাল-সম্পদ এখন অমুকের কাছে রেখে দেয়া হয়েছে।

ইমাম সারাজীবন কোথাও কারো চাকুরী করেননি। শাহী দরবারের সাথেও তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সহজ-সরল অতি সাধারণ জীবন কাটিয়ে ১৮২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে উমর, ইসমাঈল, আবু হারান, ওসমান এই চারজন পুত্র সন্তান রেখে যান। এদের মধ্যে জ্ঞানে-গুণে পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন 'ইসমাঈল'। খলিফা মামুনুর রশীদ তাকে বসরার কাজী হিসাবে নিয়োগ করে। অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। কর্ম সম্পাদনান্তে অবসরে যাবার সময় গোটা শহরের লোকেরা তাকে প্রাণঢালা বিদায় সম্বর্ধনা জানায় এবং প্রতিটি মানুষ তার সার্বিক কল্যাণের জন্য দো'আ করে।[১]

ازاماالناس يوما قايسونا - بايدة من الفيتا طريقة

اتيناهم بمقياس صحيح - قلا ومن طرازابى حنيفه

اذاسمع الفقيه بحلو علما - واثبتها محير فى صحيفه [২]

ইমাম আবু হানিফার অসংখ্য, অগণিত মানসপুত্র সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে তাঁর ঔরশজাত পুত্র অর্থাৎ বংশধারাও বেঁচে আছে। ভারতবর্ষে বেশ কিছু পরিবার আছে যারা নিজেদের ইমাম আবু হানিফার বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় এই বংশধারার প্রতিটি পর্যায়ে কেউ না কেউ আল্লাহ্ তা'আলার এই অসীম কৃপাকে ধরে রেখেছেন।

---

১. ইবনে খালখান, হামাদের জীবনী প্রসঙ্গে।
২. মা আরেফ ইবনে কুতাইবাহ্, ইমাম আবু হানীফার জীবনী প্রসঙ্গে।

www.pathagar.com

চরিত্র ও গুণাবলী

ইমাম সাহেবের প্রশংসনীয় চরিত্র, উন্নত গুণাবলী এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত অভ্যাস ও মর্যাদাসম্পন্ন সৌখিনতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের 'জীবন চরিত' লেখকগণ তাঁর স্বভাব-চরিত্র আদত-অভ্যাস নিয়ে এমন এক ছবি এঁকেছেন যা অতিভক্তি ও অতিরঞ্জনের রঙে এমনভাবে লেপ্টে আছে যার মধ্যে থেকে আসল আবু হানিফা (রহ)-এর মানবীয় মুখখানী খুঁজে পাওয়া যায় না।

চল্লিশ বছর এশা'র নামাযের অজু নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন, তিরিশ বছর লাগাতার রোযা রেখেছেন, যেখানে মারা গেছেন সেখানে সাত হাজারবার কুরআন খতম করা হয়েছে। কুফার নদীতে সন্দেহযুক্ত গোশতের টুকরা পড়ে গিয়েছিল, ভেবেছেন হয়তো মাছে খেয়ে ফেলেছে। আর মাছ তো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে! এজন্য তিনিও দীর্ঘদিন মাছ খাননি। এভাবেই আর এক সন্দেহের কারণে ছাগলের গোশত খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। এক মাসের ব্যক্তিগত খরচ মাত্র দশ আনা (.৬৫ পয়সা) ইত্যাদি এবং এরকম আরো অনেক চমৎকার সব গল্প তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রচিত হয়েছে। সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো, আমাদের আবেগতাড়িত ঐতিহাসিকগণও কাল্পনিক ঐসব গল্পে মোড়ানো অতিমানব আবু হানিফার জীবন কথা তাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিখে রেখেছেন। অথচ ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরীখে ঐসব গল্পের সত্যতার যেমন কোন ভিত্তি দেয়া যায় না, ঠিক সেভাবেই ওসব দিয়ে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে তার যৌক্তিক অবস্থানেও স্থাপন করা যায় না।

একথা অনস্বীকার্য, আমরা ইমাম সাহেবের আসল যে অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করছি তার প্রধান অবলম্বন ও উৎস্য-সূত্র ঐ কাল্পনিক গল্পপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থগুলোই। কিন্তু আমরা মনে করি প্রত্যেকটি ঘটনার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলাদা হয়ে থাকে এবং সে হিসেবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণের মানও বদলে যায়। সাধারণ ঘটনাবলীতে সাধারণ সাক্ষ্য-প্রমাণই যথেষ্ট কিন্তু যেখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতির সামাজিক রীতি-নীতি এবং মৌলিক বিধি-বিধান নির্ধারণকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম এক ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন, সেখানে সঙ্গত কারণেই এমন সব সনদ বা দলিলের প্রয়োজন যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এখানে বলা যেতে পারে হাদীসের শুদ্ধতা নির্ণয়ে যেমন সর্বোচ্চ বিশ্বস্ত ধারাবাহিকতার নীতি-নির্ধারণ করা আছে! এখানে বরং তার চাইতেও বেশি কিছু, অর্থাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সার্বিক বিবেচনার বিধিসম্মত ভিত্তি থাকা উচিত। কেননা ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হাজার জটিলতায় অতি সূক্ষ্ম, সত্য সন্ধানী, যৌক্তিক ভিত্তি নির্ণয়ের যে যোগ্যতা তাঁর ছিল। তার ওপর যখন দৃষ্টি পড়ে— যার প্রমাণ শোনা কথায় নয় বরং হাজার হাজার পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত চিরভাস্বর হয়ে আছে। সেই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ঐসব কাল্পনিক গল্প-গুজব বিশ্বাসের আওতায় আনা বেশ কষ্টকর। যা অতি কাল্পনিক বৈরাগ্যতা এবং সামঞ্জস্যহীনতারও সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়।

ইমাম আবু ইউসুফের জবানীতে ইমামের গুণ-বৈশিষ্ট্য

ইমাম সাহেবের সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবনাচরণের সঠিক অথচ মোটামুটি সাধারণ ছবি দেখতে

www.pathagar.com

হলে ইমাম আবু ইউসুফের বর্ণনাকে সম্মুখে রাখা যেতে পারে, যা তিনি খলিফা হারুনূর রশীদের দরবারে করেছিলেন। খলিফা হারুনের প্রধান বিচারপতি আবু ইউসুফকে একদিন তার দরবারে ইমাম আবু হানিফার গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে বললে তিনি বলেন ঃ যতোদূর আমি জানি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধের মাঝখানে অত্যন্ত সতর্ক সজাগ এবং সচেতন এক মানুষ— অথচ সহজ-সরল সাধারণ। বেশিরভাগ সময় চুপ-চাপ থাকতেন, ভাবতেন। কোন মানুষ কোন প্রশ্ন বা মাসলা জানতে চাইলে— জানা থাকলে বলতেন নইলে নিঃশব্দে মাথা দোলাতেন। অত্যন্ত উদার ও মহান, কারো কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করতেন না, দুনিয়াদার লোকদের এড়িয়ে চলতেন। দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি অত্যন্ত হীন এবং নীচ আকাঙ্ক্ষা বলে বিশ্বাস করতেন। পরনিন্দা এবং পেছনে কথা বলা ঘৃণা করতেন। অনুপস্থিত কারো প্রসঙ্গ এলে তার ভালো দিকটা জড়িয়ে বলতেন, অনেক বড় জ্ঞানী এবং আলেম ছিলেন এবং নিজের মাল-সম্পদের মতো জ্ঞানকেও উদার হাতে ব্যয় করতেন। হারুনুর রশীদ শুনে বললেন, 'সালেহীনদের চরিত্র এরকমই হয়'।

সাধারণ দৃষ্টিতে এসব কথা অর্থাৎ গুণাবলীর গুরুত্ব কতোটা বোঝা যাবে জানি না, তবে অন্তর্দৃষ্টির উপলব্ধি অনুধাবন করতে পারে বা বুঝতে পারে যে, এই ধরণের চরিত্র বা জীবনাচরণ বাইরে থেকে যতোটা সাধারণ ও সহজ মনে হয় আসলে তা অত্যন্ত কঠিন— তাই সম্মানের যোগ্য।

ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গি

আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম আবু হানিফা (রহ)-কে সুন্দর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সুন্দর অবয়বও দিয়েছিলেন। মধ্যম গড়ন, সুন্দর চেহারা, সুস্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, বাচনভঙ্গি আকর্ষণীয়, স্পষ্ট উচ্চারণ, জোরালো কণ্ঠ, বিষয় যতোই জটিল হোক অত্যন্ত সহজ এবং পরিষ্কারভাবে তা উপস্থাপন করতে পারতেন।

পোষাক পরিধেয়

সব সময় সুন্দর পোষাকে থাকতেন। মাঝে মাঝে পশমী চামড়ার জোব্বাও ব্যবহার করতেন। তাঁর ছাত্র আবু মুতী' বল্খী বলেছেন, একদিন উস্তাদের গায়ে এমন একটা চাদর দেখেছি যার দাম কমপক্ষে চারশ (দীনার অথবা দেরহাম) হবে!

নসর বিন মুহাম্মদ একদিন তার সাথে দেখা করতে এলেন, ইমাম সাহেব বাইরে কোথাও যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ দেখি তোমার চাদরটা একটু দাও তো! ফিরে এসে খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, দূর তোমার চাদর পরে অহেতুক লজ্জিত হতে হলো! নসর একটু অবাক হয়ে বললো, কেন?

বললেন ঃ অত্যন্ত নিম্নমানের!

বেচারা নসর, পাঁচ দিনারে কেনা তার চাদরখানা, পরলে মনে মনে একটু অহংকারও বোধ করতেন, ইমাম সাহেবের তাচ্ছিল্য দেখে সে একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু আর একদিন সে যখন ইমামের ওখানে গেলেন, প্রথমেই চোখে পড়লো ইমাম একখানা চাদর পরে আছেন, মনে মনে অনুমান করলো চাদরখানার দাম কমপক্ষে তিরিশ দিনার। এবারও সে অবাক না হয়ে পারলো না।

www.pathagar.com

খলিফা মনসুর দরবারের সভাসদগণের জন্য বিশেষ এক ধরনের টুপি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তার ওপর কালো কাপড় দিয়ে জড়ানো থাকতো কেননা ওটা খুব লম্বা হতো।

কবি আবু দামা রসিকতা করে বলেছেন:

وكنانرجى من امام زيادة -
فزادالا مام المرتضى فى القلا نس

খলিফার কাছ থেকে আমাদের বাড়তি কিছু পাওয়ার আশা ছিল!

বাড়তি তিনি করে দিয়েছেন, তবে তা টুপির মধ্যে।

দরবারী টুপি

যদিও ইমাম শাহী দরবার ও দরবারীদের থেকে দূরে থাকতেন এবং সবসময় এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু কখনো কখনো 'দরবারী আমীর-ওমরাওদের জন্য নির্দিষ্ট' টুপিও পরতেন। দুনিয়াদার ধনীক শ্রেণীর জন্য এ ব্যাপারটা এমন কিছু নয় কিন্তু আলেম সমাজের কাছে এ ব্যাপারটি যথেষ্ট কৌতুহল উদ্দীপক যে, ইমাম সাহেবের ঘরে ঐ ধরনের সাত-আটটা টুপি সবসময় মজুদ থাকতো!

অন্যান্য অনেক সামাজিক আচার-আচরণ ও চাল-চলনে তিনি প্রচলিত আলেম সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্যরা শাহী দরবার, রাজকীয় মন্ত্রীবর্গ এবং ধনীক শ্রেণীর কাছ থেকে রীতিমতো ভাতা পেতো এবং এটাকে তারা কিছুমাত্র দোষণীয় মনে করতো না। কাজী ইবনে আবদুল বার'কে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল ঃ আপনি আমীর-ওমরাওদের থেকে ভাতা গ্রহণ করেন— এটা কি আপত্তিকর নয় ? আবদুল বার্ তার জবাবে কয়েকজন সাহাবা (রহ), বেশ ক'জন তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, এরাওতো রাজা, রাজন্যবর্গ ও আমীরদের ভাতার ওপর তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

রাজকীয় ভাতা পরিহার

যদিও এই প্রেক্ষিতে ব্যাপারটাকে আমরা প্রগতিশীল মানসিকতার লোকদের মতো সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল পরজীবী বা চান্দাখোরী মনে করি না, কেননা সেকালে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কার্যক্রম আজকের মতো এমন বেতন বা বিনিময়ের পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আলেমগণ স্বেচ্ছায় স্বউদ্যোগে নিজেদের ঘর-আঙ্গিনা অথবা মসজিদে কোন বিনিময় ছাড়াই শিক্ষাদান করতেন। এই পদ্ধতি শিক্ষা ক্ষেত্রে মূলতই এতোটা ব্যাপক প্রভাবশালী ও কার্যকর যা আজকের উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাওয়া বিজ্ঞানময় পৃথিবী তার দুয়ারে আসা শিক্ষার্থীদের দিতে পারছে না। আমীর-ওমরাওদের তরফ থেকে যে ভাতাটা আসতো অথবা মাঝে মধ্যে উপহার বা নজর-মানত হিসেবে যা কিছু আসতো তার সাথে আমরা আজকের "অনারারী প্রফেসরদের সম্মাননা"কে তুলনা করতে পারি। তবে এটাও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ধীরে ধীরে ঐসব দৃষ্টান্তের ওপর ভর করেই আজকের পীরতন্ত্র, ফকিরতন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র অত্যন্ত শক্ত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যা জাতির একটা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ অলস, অচল, অথর্ব, পরজীবী, পরগাছায় পরিণত করেছে।

www.pathagar.com

এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, ইমাম আবু হানিফা এই প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিরোধিতা যথার্থ ছিল। ওসব থেকে মুক্ত থাকার সবচাইতে বড় যে প্রাপ্তি তাহলো, সত্য বলতে এবং সত্য প্রকাশে ইমামের কাউকে তোয়াজ করতে হয়নি এবং কোন দ্বিধা তাঁকে আক্রান্ত করেনি। মানুষ যতোই স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টভাষী হোক না কেন দান-খয়রাত এমন এক গোপন যাদুর মন্ত্র যার প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব না হলেও প্রায় অসম্ভব!

ইমাম সাহেব সারা জীবনে কারো উপকারের ঋণ-বন্ধনে বন্দী হননি এবং শুধু এই কারণেই তাঁর স্বাধীনতার ওপর কোন কিছুই প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার ওপর নির্ভরশীল মানুষের সত্যিকারের এই স্বাধীনতার স্বাদ সব সময়ই তিনি ব্যক্ত করতেন, প্রকাশ করতেন, বোঝাতে চাইতেন।

স্বাধীনতা ও মুখাপেক্ষীহীনতা

কুফার বিখ্যাত গভর্ণর ইবনে হাবীরাহ্ একবার ইমাম সাহেবকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলেন— মাঝে মধ্যে একটু আমার দরবারে পদার্পণ করলে বড়ই উপকৃত হতাম, আনন্দিত হতাম। ইমাম বললেন ঃ আমি তোমার কাছে এসে কি করবো!— যদি খুব ভালো আচরণ করো, তাহলে ভয় আছে তোমার জ্বালে আটকা পড়ে যাবো; যদি দুর্ব্যবহার করো তাহলে অপমানিত হবো। তোমার কাছে যা কিছু আছে আমার তার প্রয়োজন নেই— আমার কাছে যে সম্পদ আছে তা কারো পক্ষে ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। ঈসা বিন মূসার সাথেও এ ধরনের একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিনিময়হীন সত্যের সাক্ষ্য

খলিফা মনসুরের স্ত্রী 'হুররা খাতুন'-এর সাথে খলিফার ঝগড়া হলো— তার দাবি, খলিফা স্ত্রীর সাথে ন্যায় আচরণ করেন না। খলিফা বললেন বেশ, তুমি তাহলে এমন এক ব্যক্তির নাম করো যে আমাদের বিচার করতে পারে! বেগম ইমাম আবু হানিফার নাম উচ্চারণ করলো। সাথে সাথে খলিফার ফরমান বাহক ছুটলো ইমামের কাছে। ইমাম এলেন দরবারে। বেগম এমনভাবে বসেছিলেন যেন পর্দার আড়াল থেকে ইমামের সব কথা শুনতে পারেন। বিচার শুরু! মনসুর প্রশ্ন করলেন ঃ শরীয়তের বিধান মুতাবিক পুরুষ ক'জনকে বিবাহ্ করতে পারে ? ইমাম বললেন— চার।

মনসুর জোরগলায় স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন— শুনতে পাচ্ছো!

পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ এলো— হ্যাঁ শুনেছি।

ইমাম সাহেব এবার মনসুরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কিন্তু এ অনুমতি শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে বলে প্রমাণিত! নইলে একটার বেশি করা ভালো নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً -

আর যদি আশংকা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবেনা, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক। (সূরা আন-সিনা ঃ ৩)

www.pathagar.com

মনসুর চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম সাহেব ঘরে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক ব্যক্তি একটা পোটলা নিয়ে হাজির— বললো, বেগম সাহেবা নজর হিসেবে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন— দাসী তার কাছে সালাম পাঠিয়েছেন এবং আপনার সত্য ভাষণের জন্য চিরদিন ঋণী হয়ে থাকবেন।

ইমাম সাহেব খাদেমকে কাছে ডেকে বললেন ঃ বেগম সাহেবাকে বলবে আমি যা করেছি তা কোন বিনিময়ের আশায় নয়। ওটা আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য, তা আদায় করেছি মাত্র।

ব্যবসা ও আমানতদারী

বিশাল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন ছিল সেখানে। অধিকাংশ শহরেই তাঁর বিক্রয় কেন্দ্র ছিল। বড় বড় সওদাগরদের সাথে কায়-কারবার। এই বিশাল ব্যবসায়ী লেনদেনের মধ্যে একটি পয়সা বা একটি দানার হেরফের হবার উপায় নেই— এতোটা সতর্ক তিনি। মানুষের 'হক' রক্ষা করতে বড় বড় লোকসানের মুখে পড়তে হতো তাঁকে কিন্তু তিনি তার পরোয়া করতেন না।

একবার হাফস বিন আবদুর রহমানের কাছে রেশমী কাপড়ের চালান পাঠালেন। কিছু থানের মধ্যে একটু-আধটু দোষ ছিল, সেগুলোকে চিহ্নিত করে বলে পাঠিয়েছিলেন— ঐ ত্রুটি সম্পর্কে আগেভাগেই যেন ক্রেতাকে জানিয়ে দেয়া হয়। হাফস সে কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। থান বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু সেই খুঁতের কথা ক্রেতাকে বলা হয়নি, এখন!

ইমাম যখন জানতে পারলেন— অত্যন্ত দুঃখ পেলেন এবং খুঁতওয়ালা থানগুলোর মোট দাম হিসেব করলেন— তিরিশ হাজার দেরহাম। পুরো টাকাটা দান-খয়রাত করে দিলেন।

একদিন এক মহিলা রেশমী কাপড়ের একটা থান নিয়ে এসে ইমাম সাহেবকে বললো, দয়া করে আমার এই কাপড়টা বিক্রি করে দিন।

ইমাম সাহেব দাম জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বললো ঃ একশ' টাকা। ইমাম সাহেব বললেন ঃ অনেক কম বলেছো! মহিলা বললো, তাহলে দু'শ' টাকা দিন।

ইমাম সাহেব বললেন ঃ এই থানটার দাম কমপক্ষে পাঁচশ' টাকা।

মহিলা অবাক হয়ে বললো ঃ আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন।

ইমাম সাহেব নিজেই পাঁচশ' টাকা দিয়ে থানটা রেখে দিলেন।

এই ধরণের সততা এবং মানুষের আমানতদারী তাঁর ব্যবসায় লোকসান হবার পরিবর্তে লাভের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যেতে থাকলো।

তাঁর এই ব্যবসা এবং অর্থ উপার্জন ভোগ বা বিলাস কামনার জন্য নয়; বরং অধিকাংশই ব্যয় হতো জনকল্যাণে। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী বা পরিচিত অভাবী যারা তাদের প্রত্যেকের জন্যই ভাতা বরাদ্দ করা ছিল। উস্তাদ এবং মুহাদ্দিসীনদের জন্য ব্যবসায়ের একটি অংশ প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই আলাদা করা ছিল।[১] সে অংশের লভ্যাংশ প্রতিবছর হিসেব করে তাঁদের

১. তাহযীবুল আস্‌মাআ, আল্লামা নূদী।

www.pathagar.com

কাছে পৌঁছে দেয়া হতো। নিজের অথবা পরিবারের কারো জন্য কোন কিছু কিনতে গেলে একই জিনিস মুহাদ্দিসীন এবং তাঁর শিক্ষকদের জন্যও কিনে তা তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী এলে প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পরে তার অবস্থার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। অভাবী হলে কোনভাবেই খালি হাতে ফিরতে পারতো না।

ছাত্রদের সাথে আচরণ

অভাবী ছাত্রদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিতেন, যেন সে নিশ্চিন্ত মনে শিক্ষার্জন করতে পারে। এমন অনেক দরিদ্র ছেলে যারা অভাবের তাড়নায় শিক্ষার্জনের কথা ভাবতেও পারতো না, ইমাম সাহেবের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় পরবর্তীকালে বড় বড় শিক্ষাবিদ ও আলেম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কাজী আবু ইউসুফ এদেরই একজন।

দান ও বদান্যতা

একবার কিছু লোক তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন লোক অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় বসেছিল। বিদায় নিয়ে সবাই চলে যেতে চাইলে সেই লোকটিকে বসার কথা বলে অন্য সবাইকে সালাম করলেন। বিছানো জায়নামাযের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ ওটা উঠাও, লোকটি তাই করলো ঃ একটা পুটলি দেখে সেটা হাতে নিয়ে দেখলো তাতে অন্ততঃ হাজার দেরহাম রাখা আছে। লোকটি লজ্জিত হয়ে বললো আমি অর্থের অভাবী নই! ইমাম সাহেব মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, তাহলে বেশভূষায় এমন থাকবে যেন কেউ সে রকম কিছু ভাবতে না পারে!

উদারতা

একবার একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাচ্ছিলেন। পথে এমন একজনের সাথে দেখা, যে তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। একটু দূরে থাকতেই লোকটি অন্য পথ ধরে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। ইমাম সাহেব জোরগলায় ডাক দিলেন— আরে এই! কোথায় যাচ্ছো ? লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। ইমাম সাহেব কাছে এসে বললেন, আমাকে দেখে তুমি পথ বদলাচ্ছিলে কেন ? কাঁচুমাচু করে লোকটি বললো, আপনার কাছে আমি দশ হাজার দেরহামের দেনা আছি। একটি পয়সাও এ পর্যন্ত দিতে পারি নাই, তাই লজ্জায়! আপনার মুখোমুখী হই না। ইমাম সাহেব লোকটির অভিব্যক্তিতে সত্যি সত্যিই লজ্জা এবং কুণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। হেসে বললেন, যাও আমি সব মাফ করে দিয়েছি।

অন্যের ঋণ চুকিয়ে দিলেন

একবার হজ্বের সফরে রওয়ানা। আবদুল্লাহ্ সাহমী তাঁর সাথে। পথিমধ্যে এক বেদুঈন আবদুল্লাহ্কে পাকড়াও করলো। বেদুঈন ইমাম সাহেবের কাছে নালিশ জানালো ঃ জনাব আমি এই ব্যক্তির কাছে টাকা পাই, সে তা দিচ্ছে না। ইমাম সাহেব আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করলেন। কতো টাকা পায় ? আবদুল্লাহ্ সরাসরি অস্বীকার করলো। ইমাম সাহেব এবার বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ভাই কতো টাকার ঝগড়া ? সে বললো ঃ চল্লিশ দিরহাম। ইমাম সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ মানুষের ভেতর থেকে অহংবোধ কি উঠে গেছে ? এই কয়টা টাকার জন্য এতো লাঞ্ছনা ? অতঃপর নিজেই টাকাটা দিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

ইবরাহীম বিন উৎবা চার হাজার দেরহাম দেনার দায়ে প্রায় গৃহবন্দী অবস্থা। পাওনাদারের ভয় এবং লোক-লজ্জায় সে নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রেখেছে। এক বন্ধু চাঁদা করে ঋণের টাকাটা দেবার ব্যবস্থা করলো। সামর্থ্য অনুযায়ী যে যা পারছে দিচ্ছে! এক পর্যায়ে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির। তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'মোট কতো টাকা' ? বললো চার হাজার। এই ক'টা টাকার জন্য এতো মানুষকে কেন কষ্ট দিচ্ছো— এই নাও। বলে নিজেই টাকাটা দিয়ে দিলেন।

ইতিহাসের পাতায় তাঁর বদান্যতার অসংখ্য কাহিনী ছড়িয়ে আছে, আমরা তা থেকে গুটিকয় এখানে উল্লেখ করলাম।

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা

উচ্চ মানসিকতা, বিশাল হৃদয়, সম্ভ্রান্ত, সম্পদশালী, উদারদাতা, ক্ষমাশীল, পরোপকারী, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, বিনয়ী এবং পরমুখাপেক্ষিহীন সম্মানিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার মসজিদে হাইফে ছাত্র ও জানতে আসা জনতার নির্ধারিত অনুষ্ঠান। নবাগত একজন একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করলো, ইমাম সাহেব তার যথাযথ উত্তর দিলেন। প্রশ্নকারী আবার উঠে বললো ঃ কিন্তু হাসান বসরী তো অন্য কথা বলেছেন। ইমাম সাহেব বললেন, 'হাসান ভুল করেছে'। উপস্থিতির ভেতর থেকে হঠাৎ অন্য একজন প্রচণ্ড রাগে উন্মাদের মতো চিৎকার করে বলে উঠলো, "এই হারামীর বাচ্চা তুই হাসানকে ভ্রান্ত বললি" ? বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো গোটা মজলিস স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে গোটা মজলিস যেই লোকটির ওপর আক্রমণে উদ্ধ্যত হলো। ইমাম সাহেব সবাইকে থামিয়ে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকার পর উত্তেজনা অনেকটা কমে এলো। এবার ইমাম সাহেব শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সেই লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ হ্যাঁ, হাসান ভুল করেছে, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) এ এ বিষয়ে যে বর্ণনা করেছেন সেটাই ঠিক।

বেআদবীর জবাব সহনশীলতায়

ইয়াযিদ বিন কামীতের বর্ণনা একবার আমি ইমামের জলসায় উপস্থিত ছিলাম। এক লোক তাঁর সাথে খুব বেয়াদবের মতো কথাবার্তা শুরু করে দিলো। ইমাম সাহেব শান্তভাবে তার প্রতিটি কথার জবাব দিচ্ছিলেন। লোকটি যেন আসকারা পেয়ে মাথায় উঠার মতো, যা-তা বলা শুরু করে দিলো। এক পর্যায়ে গালি দেবার মতো করে বললো ঃ আপনি নাস্তিক। ইমাম সাহেব এতোটুকু উত্তেজিত না হয়ে আগের মতো শান্তভাবেই বললেন, "আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করুন, তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে, আমাকে উদ্দেশ্য করে তুমি যে শব্দটি উচ্চারণ করেছো তা সঠিক নয়।"

ইমাম সাহেব সচরাচর বলতেন ঃ আমি কখনো কাউকে অভিশাপ দেইনি, কারো সাথে প্রতিশোধ নেইনি, কোন মুসলিম অথবা জিম্মীকে কষ্ট দেইনি, কারো সাথে কোন প্রতারণা বা মিথ্যা ওয়াদা করিনি।

www.pathagar.com

ইমাম সুফিয়ান সওরী ও ইমাম আবু হানিফার মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ এবং মনোমালিন্য ছিল। একদিন এক লোক বললো ঃ সুফিয়ান আপনার সম্পর্কে খুব আজেবাজে বলছিল! ইমাম আবু হানিফা বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এবং সুফিয়ানকে ক্ষমা করুন! সত্য কথা কি জানো! ইবরাহীম নখঈ থাকা সত্ত্বেও যদি সুফিয়ান পৃথিবী থেকে চলে যায় তাহলে মুসলমানদের সুফিয়ানের মৃত্যু শোকে মাতম করতে হবে।

অশোভন উক্তির জবাব

একবার মসজিদে দরস দিচ্ছিলেন। তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন এক লোক তাঁকে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু অশোভন উক্তি করে বসলো। ইমাম সাহেব সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দরস দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটু থেমে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, ওর দিকে মনোযোগ না দিয়ে দরসে মনোযোগী হও। দরস শেষ করে যখন বাসায় ফিরছেন, লোকটি তার সাথে সাথে হাঁটছিল আর যা-তা বলছিল। বাড়ির সামনে এসে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকটিকে বললেন। ভাই! আপনার আর কিছু বাকী আছে বলার ? আমি ঘরে ঢুকে গেলে আরতো বলার সুযোগ থাকবে না!

একদিন মজলিসে দরস চলছিল। এক নবীন যুবক মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। ইমাম সাহেব যথাযথ জবাব দিলেন। যুবকটি বললো ঃ আবু হানিফা তুমি ভুল করেছো! আবুল খেতাব জুরজানী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তার খুব রাগ হলো। উঠে দাঁড়িয়ে মজলিসের সবাইকে খুব বকাঝকা করলেন, বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন রাগ-ঝাল নেই ? কোথাকার কোন ইঁচড়েপাকা এসে ইমাম সাহেবকে যা-তা বলবে আর তোমরা চুপ করে বসে থাকবে ?

ইমাম সাহেব আবুল খেতাবকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ ওদেরকে দোষ দিও না, আমিতো এখানে বসে আছি! আর বসে তো আছি এজন্যই যে, লোকেরা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে আমার রায়কে ভুল প্রমাণ করুক আর আমি ধৈর্যের সাথে তা শুনি!

ইমাম সাহেবের মহল্লায় এক মুচী থাকতো, লোকটি ছিল খুব রসিক। তার দৈনন্দিন জীবনটাও ছিল বেশ মজার। সারাদিন কাজ করে সে যা রোজগার করতো, সন্ধ্যাবেলা বাজারে গিয়ে গোশত আর মদ কিনে বাড়ি ফিরতো। একটু রাত হলে ইয়ার দোস্তরা এসে জুটতো। নিজেই শিককাবাব বানিয়ে বানিয়ে দোস্তদের দিতো আর তার সাথে চলতো মদের পেয়ালা। একটু যখন নেশা চড়ে উঠতো তখন সুর করে করে কবিতার দু'টি চরণ গাইতো ঃ

اضاعونی دای فتی اضاعوا　　الیوم کریهة وسدد ثغر

লোকেরা আমাকে হাতে পেয়েও হারিয়ে ফেলল। আর এমন বড় মানুষকেই তারা হারালো যে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ঝগড়া-ফ্যাসাদের দিনে কাজে লাগে।

আল্লাহ্র স্মরণ ও কাজে-কর্মেই অধিকাংশ সময় কেটে যেতো। ফলে রাতের বেলা ইমাম সাহেবের ঘুমের সময় খুব কমই ছিল। সুতরাং মুচীর প্রতিরাতের প্রোগ্রাম তার কানে আসতোই। কিন্তু স্বভাব ও অভ্যাসের দাসত্বে বন্দী মানুষটাকে কখনো তিনি কিছু বলতেন না। শহরের কোতওয়াল একরাতে এই দিকটায় ডিউটিতে এসে মাতাল অবস্থায় মুচীকে ধরে চালান দেয়। পরদিন সকালে প্রতিবেশী বন্ধুদের সাথে কথা প্রসঙ্গে ইমাম সাহেব বলছিলেন, কাল

রাতে আমার প্রতিবেশীর গান শুনতে পেলাম না! তারা ইমামকে রাতের কাহিনী শোনালো। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। সাওয়ারী তৈরী করার আদেশ দিয়ে নিজে কাপড় বদলাতে ভেতরে গেলেন। যেন অনেক দেরী হয়ে গেছে, এভাবে হন্তদন্ত হয়ে বাহনে চড়ে সোজা দরবারের দিকে ছুটলেন। আব্বাসী খিলাফতের শাসনকাল। খলিফা মনসুরের ভ্রাতুষ্পুত্র, বংশের সবচাইতে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ জ্ঞানী, সৌর্যেবীর্যে চৌকস ঈসা বিন মূসা তখন কুফার গভর্ণর। ভেতরে খবর পৌঁছলো ইমাম সাহেব আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। মূসা সাথে সাথে দরবারী আমলাদের ইমামকে অভ্যর্থনার জন্য পাঠালো এবং বিশেষভাবে বলে দিলো— ইমামের বাহন যেন খাস দরবারের দরজা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। দরজায় সওয়ারী আসতেই ঈসা নিজে গিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে ইমাম সাহেবকে ভেতরে নিয়ে এসে বসালো। অত্যন্ত বি..য়ের সাথে বললো, আপনি কেন কষ্ট করে এতোদূর এলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেই হতো। ইমাম সাহেব বললেন ঃ আমাদের পাড়ায় এক মুচী থাকতো, কোতওয়াল তাকে ধরে এনেছে, আমি চাই তাকে ছেড়ে দেয়া হোক। ঈসা সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আদেশ দিয়ে জেলখানায় লোক পাঠালো। ঈসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুচীকে নিজের সাথে বাহনে নিয়ে ফেরার পথে রওয়ানা হলেন। পথে মুচীকে বললেন ঃ জানো, আমি তোমাকে কেন ছাড়িয়ে আনলাম ? মুচী না সূচক মাথা নাড়ালো। বললেন, তোমার এই কবিতার লাইন দু'টোর জন্য। মুচী এবার মুখ খুললো, বললো ঃ না তা নয়! আপনি প্রতিবেশীর কর্তব্য আদায় করেছেন।[১]

এর পরের কাহিনী একটু চমৎকার। মুচী তার আগের জীবনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে ইমাম সাহেবের একনিষ্ঠ ছাত্রের জীবন গ্রহণ করলো। ধীরে ধীরে ইল্‌মে ফিকাহ্‌র ওপর এতোটা দক্ষতা অর্জন করলো যে, পরবর্তীকালে একজন যোগ্য ফকীহ হিসেবে সমাজ তাকে বরণ করে নিয়েছিল।

মায়ের সেবা

ইমাম সাহেবের বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তাঁর মা-জননী দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। তাই মাতৃ-সেবার প্রচুর সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। মা ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। তার ওপর সাধারণ মহিলাদের মতো সুর করে আবেগময় কিস্‌সা কাহিনী বলা ওয়ায়েযীনদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তৎকালীন কুফা'র বিখ্যাত ওয়ায়েয ছিলেন আমরুদ বিন যারকা। মা ছিলেন তার একনিষ্ঠ ভক্ত। কোন মাসআলা জানার ইচ্ছা হলে পুত্র আবু হানিফাকে আদেশ করতেন যাও তার কাছ থেকে এটা জিজ্ঞেস করে এসো। ইমাম সাহেব নিঃশব্দে মাতৃ আদেশ পালন করতে যেতেন। আমরুদ অনুযোগ করে বলতেন ঃ আপনার সামনে আমি মুখ খুলবো ? ইমাম সাহেব বললেন, এটাই মায়ের আদেশ। অনেক সময় এমনও হয়েছে, যে মাসআলা মা জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন তা আমরুদ জানে না, তখন ইমাম সাহেবকে বলতেন, আপনি আমাকে উত্তরটা বলে দিন, আমি সেটা আপনাকে শুনিয়ে দেবো।

কখনও জিদ করতেন, চলো, আমরুদের কাছে আমি নিজেই গিয়ে শুনে আসবো– খচ্চরের পিঠে মাকে বসিয়ে ইমাম সাহেব লাগাম ধরে হেঁটে চলেছেন, পর্দার আড়াল থেকে নিজে তার প্রশ্ন করতেন এবং নিজ কানে তার জবান শুনে সন্তুষ্ট হতেন। একবার মা একটা প্রশ্ন করলেন। ইমাম সাহেব তার জবাব দিলেন। মা বললেন, তোমার উত্তরের সনদ নেই। ওয়ায়েয 'যারকা'

১. কিতাবুল আগানী, ইবনে খালক্বান, উকুদুল জুমান।

www.pathagar.com

যদি বলে যে, তোমার উত্তর ঠিক, তাহলে আমি মানবো। ইমাম সাহেব মা'কে সাথে নিয়ে চললেন। যারকার ওখানে পৌছে মা সবিস্তারে মাসআলা বর্ণনা করলেন। যারকা এবার কোন রাখঢাক না করে মাকে শুনিয়েই ইমাম সাহেবকে বললেন, আপনি আমার থেকে অনেক বেশি জানেন, আপনি নিজে কেন বলে দেন না। ইমাম সাহেব বললেন, আমি এই রকম ফতোয়া দিয়েছিলাম। যারকা সাথে সাথে বললেন, এটাই তো সঠিক উত্তর। মা নিজ কানে শুনে তারপর বললেন, খুশী হলাম, এবার চলো বাড়ী ফেরা যাক।

ইবনে হাবীরাহ যখন ইমাম সাহেবকে এটর্নী জেনালে পদে নিয়োগ দিতে চাইলো এবং ইমাম সাহেব তা প্রত্যাখ্যান করে বেত্রাঘাতের শাস্তি ভোগ করছিলেন, মা তখনও বেঁচে আছেন এবং ছেলের ওপর এই রকম দণ্ডাদেশ শুনে মা খুব ভেঙ্গে পড়েছিলেন। ইমাম সাহেব বলতেন, বেত্রাঘাতের যন্ত্রণা আমায় কোনো কষ্ট দিতে পারেনি, আমার কষ্ট শুধু এক জায়গায়— আমার এই শাস্তির কথা শুনে মায়ের বুকটা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

ইমাম সাহেব অত্যন্ত স্পর্শকাতর মনের মানুষ ছিলেন, কারো কোনো দুঃ-কষ্ট দেখলে ভেতর থেকেই তিনি উতলা হয়ে উঠতেন। একবার মসজিদে দরস দিচ্ছিলেন, কেউ একজন এসে বললো, অমুকে দানালের ওপর থেকে পড়ে গেছে! এতো জোরে একটা আর্তচিৎকার তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এলো, মসজিদে উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেলো। হন্তদন্ত হয়ে খালি পায়েই ছুটলেন সেই লোকের বাড়ির দিকে। অনেক সহানুভূতি, অনেক সমবেদনা জানিয়ে সাধ্যমতো সেবা-সুশ্রূষা করে পরে ফিরে এলেন। এরপর থেকে প্রতিদিন সকালে এই কাজ জারী থাকলো যতোদিন না রোগী ভালো হয়েছে।

অথচ নিজের ওপর কোন বিপদ মুসিবত এলে তা এমন নীরবে একা একাই সয়ে যেতেন যে, মানুষ তা দেখে বিস্মিত হতো। শাসকগোষ্ঠী ও তার পাইক-পেয়াদা কতোভাবে কতো রকম তাকে কষ্ট দিয়েছে তার হিসাব নাই। কিন্তু কোনভাবেই তাঁর মর্যাদার মাথাটিকে নত করতে পারেনি। পারেনি তাকে তারা তাদের দরবারী মোল্লা বানাতে। আকাশের মতো উদার হৃদয়, পর্বতের মতো সিদ্ধান্তে অটল-অবিচল এবং আত্মনির্ভরশীলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি।

একদিন জামে মসজিদে আলোচনা সভা হচ্ছিলো। হঠাৎ ছাদের ওপর থেকে একটা বিষাক্ত সাপ তাঁর পাশেই পড়লো। উপস্থিত জনতা ভয়ে আঁতকে উঠলো। ইমাম সাহেব বসেই আছেন। সাপ চলতে চলতে তাঁর কোলের উপর দিয়ে যাচ্ছে, তিনি বসে আছেন স্থির-অবিচল।

অপ্রয়োজনীয় কথা বলা বা তাতে যোগ দিতে কেউ কখনো তাকে দেখেনি। এমনিতেই তিনি খুব কম কথা বলতেন। দরসের অনুষ্ঠানগুলোতে ছাত্ররা মুক্ত-স্বাধীনভাবে আলোচনা ও বিতর্ক করতো, তিনি চুপ করে বসে শুনতেন। কোন বিষয় নিয়ে ছাত্ররা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে নিজে সমাধান করে দিতেন।

পরচর্চা, পরনিন্দা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সবসময় আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করে বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার মুখটাকে এই ভ্রষ্টাচার থেকে মুক্ত রেখেছেন। একজন বললো ঃ জনাব, লোকেরা আপনার সম্পর্কে কতো কিছু বলে! অথচ আপনার মুখ থেকে তাদের সম্পর্কে কোনদিন কিছু শুনলাম না! বললেন ঃ

ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ –

এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান শুধু তাকেই দান করেন।

www.pathagar.com

ইমাম সুফিয়ান সাওরীকে কেউ একজন বললো ঃ আবু হানিফাকে আমি কোনদিন কারো গীবত করতে শুনিনি। জবাবে তিনি বললেন, আবু হানিফা এতোটা বোকা নন যে নিজের করা সব ভালো কাজকে (আমালুস্ সালেহ) নিজেই ধ্বংস করে দেবেন।

ইমাম কসম খাওয়াকে খুব ঘৃণা করতেন। তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিজে নিজেই শপথ করে নিয়েছিলেন যে, ভুলেও যদি কখনো কসম খেয়ে ফেলি তাহলে এক দেরহাম কাফ্ফারা দেবো। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কসম করে ফেললেন। এবার নিজের সাথে নিজের করা শপথের জরিমানার পরিমাণ বাড়ালেন। আর যদি করি তাহলে এক দেরহাম নয়, এক দীনার দেবো।

ইবাদত

আল্লাহ্র ইবাদতে কঠোর পরিশ্রমী এবং নেহায়েত তাপস ছিলেন। আল্লাহ্র স্মরণে নামায এবং তেলাওয়াতে সবচাইতে বেশি আনন্দ পেতেন। তাই অত্যন্ত যত্নের সাথে তা সব আদায় করতেন। ইবাদতে তাঁর যত্নশীলতা সর্বমহলে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা যুহরী লিখেছেন, "তাঁর ইবাদত আত্মনিয়োগের মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছিল।"

নামায এবং কুরআন তেলাওয়াতে প্রায় সময়ই তিনি এতোটা অনুভূতিশীল ও আবেগ প্রবণ হয়ে যেতেন যে, বার বার শিউরে উঠতেন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদতে থাকতেন।

ইবরাহীম বসরী বলেছেন, আমি একবার ইমামের সাথে ফজরের জামা'আতে শামিল ছিলাম, ক্বেরাতের একপর্যায়ে যখন পড়লেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ –

তোমরা ভেবো না যে, আল্লাহ্ জালিমদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর রয়েছেন।

কি জানি ইমামের কি হলো!— থর থর করে কাঁপছিলেন!

যায়েদাহ এক বর্ণনায় বলেছেন, একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করবো ভেবে তাঁর সাথে এশা'র জামা'আতে শরীক হলাম। ভাবলাম, একটু অপেক্ষা করি! নফলসমূহ শেষ হলে তখন বলবো— কেরাতের এক পর্যায়ে যখন এই আয়াতে পৌছুলেন ঃ وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ এরপর থেকে শুধু এই আয়াতই পুনঃ পুনঃ তেলাওয়াত করছিলেন। কখন সকাল হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম যখন ফজরের আযান হলো।

আর একরাতে নামাযের কেরাতের মধ্যে যখন তিলাওয়াত করলেন ঃ

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ –

কেয়ামত গুনাহগারদের প্রতিশ্রুত জায়গা এবং কেয়ামত অত্যন্ত কঠিন ও অসহ্য জিনিস।

ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন আর এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন। এভাবেই রাত শেষ হয়ে গেলো।

ইয়াযিদ বিন কামীত ইবাদতে তাপস এবং ইমাম সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি এক বর্ণনায় বলেন ঃ আমি ইমামের সাথে এক এশার জামা'আতে শরীক ছিলাম। কেরাতে اِذَا زُلْزِلَتْ তেলাওয়াত করছিলেন। লোকেরা নামায আদায় করে চলে গেলো। আমি একটু

অপেক্ষায় ছিলাম দেখলাম ইমাম গভীর ধ্যানে মগ্ন, মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। আমি উঠে চলে এলাম, যেন তার ভাবনায় ব্যাঘাত না হয়। সকালে মসজিদে গিয়ে দেখি ইমাম গুম্ হয়ে বসে আছেন। দু'হাতের তালুতে থুতনি ঠেকিয়ে অত্যন্ত আকুল হয়ে বলছেন ঃ ও-হে! যে তিল পরিমাণ পুণ্য আর তিল পরিমাণ পাপ দু'টোরই বিনিময় দেবে, সে যেন তার গোলাম নো'মানকে আগুন থেকে রক্ষা করে।

একদিন বাজারে যাবার সময় একটা ছেলের পায়ের ওপর তাঁর পা পড়ে গেলো। ছেলেটি তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে বললো ঃ আরে এই! আল্লাহ্কে ভয় করো না ? ইমাম সাহেব কেমন যেন চেতনা হারিয়ে ফেলছিলেন। মাছআর বিন ফিদাম সঙ্গে ছিল, সে ঝট্ করে ধরে ফেললো। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে এলে মাছ'আর জিজ্ঞেস করলো ঃ একটা ত্যাঁদর ছেলের কথায় এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাবার কি কারণ ছিল ? জবাব দিলেন ঃ কি জানি, ওর আওয়াজে গায়েবী নির্দেশ ছিল কি না ?

একদিন যথানিয়মে দোকানে গিয়ে বসেছেন। কর্মচারী কাপড়ের থান বের করে রাখলো আর শুভ কামনার মতো বললো ঃ "আল্লাহ্ আমাদের জান্নাত দান করুন"। শোনার সাথে সাথে ইমাম সাহেব আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন এবং হঠাৎ করেই আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কর্মচারীকে বললেন ঃ দোকান বন্ধ করে দাও। রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে চট করে বেরিয়ে গেলেন। পরের দিন দোকানে গেলেন। কর্মচারীকে বললেন ঃ "ভাই আমাদের এতোটা যোগ্যতা কোথায় যে আমরা জান্নাতের আশা করবো ? সেটাই তো অনেক যদি আল্লাহ্র আযাবের আওতায় না পড়ে যাই।"

হযরত উমর ফারুক (রা) সচরাচর বলতেন ঃ কিয়ামতের দিন যদি কোন পুরস্কার না পাই তাতেই আমি খুশী, শুধু যদি আমার কাছে জবাবদিহি না চাওয়া হয়।

গায়েবী তাম্বীহ

একবার জনৈক ব্যক্তিকে একটা মাসআলার উত্তর দিচ্ছিলেন। পাশে থেকে আর একজন বলে উঠলো 'আবু হানিফা', মনে আল্লাহ্র ভয় রেখে যে কোন মাসআলার উত্তর দিও। কথাটা ইমাম সাহেবের ভেতর সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো, তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেলো। লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ভাই, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, যদি আমার এটা স্থির বিশ্বাস না হতো যে, জানা এবং বোঝা সত্ত্বেও আমি ঐশী জ্ঞানকে লুকিয়েছি আর সে জন্য আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে, তাহলে কখনোই আমি কোন ফতোয়া দিতাম না।

কখনো কোন কঠিন মাসআলা সম্মুখে এলে এবং তার সঠিক সমাধান বুঝে না আসলে মারাত্মকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। ধরে নিতেন নিশ্চয়ই আমি কোন গুনাহের মধ্যে লিপ্ত এবং আমার এ অক্ষমতা তারই তাৎক্ষণিক শাস্তিস্বরূপ। তাড়াতাড়ি অজু করে মহান সৃষ্টিকর্তা বিধাতা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। প্রচুর ইস্তেগফার করতেন। বিখ্যাত সাধক 'সুফী ফাদীল বিন ইয়াদ'কে কেউ একজন ইমাম সাহেবের আল্লাহ্র প্রতি এই ভয় ও বিনয়ের কথা বলছিল, শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন, বললেন ঃ আবু হানিফার গুনাহ খুব কমই ছিল, তাই তাঁর ঐ রকম মনে হতো। যারা গুনাহের মধ্যে ডুবে আছে তাদের

www.pathagar.com

ওপর বিপদ-মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লেও তাদের চেতনা হয় না যে, এসব আল্লাহ্‌র দেয়া বিপদ সংকেত— 'গায়েবী তামবীহ'।

প্রতিদিনের নিয়মিত কাজ

মসজিদে প্রতিদিন ফজরের পরে দরস দিতেন। দূর দূর থেকে জ্ঞানান্বেষী, শিক্ষার্থী এবং ফতোয়া নিতে আসা লোকজনে ভরা থাকতো। মৌখিক, লিখিত, যেভাবে যার উত্তর প্রয়োজন সেভাবেই দেয়া হতো। এরপরে বড় বড় নামকরা ছাত্ররা জমা হতো এবং তাঁর উপস্থিতিতে শুরু হতো ফিকাহ্ সংকলনের গবেষণামূলক কার্যক্রম। সর্বসম্মতিক্রমে যে মাসআলা উত্তীর্ণ হতো, তাকে কলমবন্দী করে রাখা হতো। যোহর পর্যন্ত চলতো এই আলোচনা-পর্যালোচনা। যোহর আদায় করে ঘরে ফিরতেন। গরমের দিনে দুপুরের পরে একটু ঘুমাতেন। আসরের পরে অল্প কিছু আলোচনা বা ছোটখাট প্রশ্নোত্তর। তারপরে বেরিয়ে পড়তেন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাত, পরিচিত রোগীদের খোঁজ-খবর, দুঃস্থ, অভাবী লোকদের প্রত্যক্ষ দেখাশোনা, তদারকী ইত্যাদি। এভাবেই মাগরিব এবং মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত আবার দরসের কার্যক্রম। এশার জামা'আতের পরে শুরু হতো ব্যক্তিগত ইবাদতের সাধনা। অধিকাংশ রাত এভাবেই কাটতো। শীতের দিনে কখনো কখনো মসজিদেই শুয়ে থাকতেন, একটু দেরী করে এশার নামায পড়তেন এবং তারপর রাতের তাহাজ্জুদ। যতটুকু সময় দোকানে থাকতে হতো, আল্লাহ্‌র স্মরণের ধানমগ্নতার মধ্যেই থাকতেন এবং তার ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় কাজকর্মও করতেন।

সত্যনিষ্ঠা

একদিন বাড়িতে ছিলেন পরিবারকে সময় দেবার জন্য। মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, আব্বাজান, আমি রোযা রেখেছি, কিন্তু আমার দাঁত থেকে রক্ত বেরিয়ে মুখের লালার সাথে তা পেটে চলে গেছে। আমার রোযা কি আছে, না ভেঙ্গে গেছে। বললেন ঃ মা মনি, তুমি তোমার ভাই হামাদকে জিজ্ঞেস করো, আমার ফতোয়া সরকারীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক ইবনে খালকান এই একান্ত ঘরোয়া ঘটনাটি উল্লেখ করে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য এবং আইনের আমানতদারীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। কিছুদিন পরেই স্বয়ং গভর্ণর রাষ্ট্রীয়ভাবে এক ফিকহী মাসআলায় ফেসে গেলে বাধ্য হয়ে ইমাম আবু হানিফার স্মরণাপন্ন হতে হলো। ইমাম তার সমাধান করে দিলেন। পুরষ্কার হিসেবে তার ওপর থেকে ফতোয়া দানের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলো।

কোন এক অনুষ্ঠানে ইমাম সুফিয়ান সাওরী, কাজী ইবনে আবী লায়লা এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ) একই মজলিসে উপস্থিত। জ্ঞানান্বেষী মানুষের কাছে এর চাইতে শুভক্ষণ আর কি হতে পারে। এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে একটা প্রশ্ন করলো— "কিছু লোক এক জায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলো। সবার অলক্ষ্যে একটা সাপ একজনের গা বেয়ে উঠতে লাগলো। আঁতকে উঠে এক ঝটকায় সে সাপটা ফেলে দিলো। পড়লো গিয়ে তার পাশের জনের গায়ে। সেও একইভাবে হাতের এক ঝটকায় ওটাকে সরালো। এবার ওটা তৃতীয় ব্যক্তির গায়ের ওপর পড়লো। এভাবে সবাইকে অতিক্রম করে সর্বশেষ ব্যক্তির ওপর গিয়ে যখন পড়লো তখন সে ছোবল মারলো। ফলে এই ব্যক্তির মৃত্যু হলো। প্রশ্ন হলো 'দিয়াত' অর্থাৎ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ এখন কার উপর ধার্য হবে?"

www.pathagar.com

ফিকাহ্ শাস্ত্রের সূক্ষ্ম এবং জটিল মাসআলার মধ্যে এটি একটি বলে মনে হলো সবার। উপস্থিত উত্তর দাতাদের মধ্যে কেউ বললেন, বেঁচে থাকা সবার ওপরে দিয়াতের দায় আসবে। কেউ বললেন, না শুধুমাত্র প্রথম ব্যক্তির ওপরেই তা ধার্য হবে। এজন্য সে-ই আসলে দায়ী। পর্যালোচনা হচ্ছিল, বিতর্ক চলছিল, কিন্তু সমাধান আসছিল না। আবু হানিফা (রহ) চুপ করে বসে মিটিমিটি হাসছিলেন। এবার সবার লক্ষ্য তাঁর ওপর গিয়ে পড়লো, সবাই বললো ঃ এবার আপনি আপনার মতামত ব্যক্ত করুন! বললেন ঃ যখন প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়জনের ওপর ফেললো এবং সে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো তখন প্রথম ব্যক্তি 'দিয়াতের' দায় থেকে বেঁচে গেলো। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পরবর্তী সবাই। প্রশ্ন যাকে নিয়ে উঠতে পারে সে হলো সর্বশেষ নিক্ষেপকারী। সেখানেও আবার দু'টি বিষয় বিবেচ্য— যদি তার নিক্ষেপ করার সাথে সাথে মৃত ব্যক্তিকে ছোবল মেরে থাকে, তাহলে দিয়াতের দায় তার ওপর অবশ্যই বর্তাবে। আর যদি সেখানে মুহূর্ত সময়ের অবকাশও থাকে, তাহলে সেও ঐ দায় থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কেননা সাপ যদি কেটেই থাকে তা তার নিজের অসতর্কতার জন্যই কেটেছে। আত্মরক্ষার জন্য যে ত্বড়িৎ ক্ষীপ্রতার প্রয়োজন ছিল তা সে অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মতটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলো এবং ইমাম সাহেব বরিত হলেন শ্রেষ্ঠ বিবেচক হিসেবে।

দ্বীন ও দুনিয়া

এটা নিশ্চিত যে, রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সাথে দ্বীন ও নৈতিক কর্তব্যসমূহের ভারসাম্য রক্ষা করে চলা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ইমাম সাহেব ব্যাপারটা খুব ভালভাবেই জানতেন। তাই তাঁর ছাত্রদেরকে তিনি যেভাবে যা শিক্ষা দিতেন, তার একনিষ্ঠ অনুশীলনী দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই অর্জনের পথ তৈরী করতো। যা এই আয়াতের আসল তাৎপর্য ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً –

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দাও এই পৃথিবীতে তোমার পছন্দনীয় যাবতীয় কল্যাণ আর পরবর্তী জীবনের যা কিছু ভালো এবং সুন্দর।

ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় কাজী আবু ইউসুফের দরবারের সাথে তেমন কোন সম্পর্ক গড়ে উঠার সুযোগ হয়নি। তবে তাঁর প্রতিভা ইমাম সাহেবের শিক্ষায় এমনভাবে শাণিত হচ্ছিল যার ধারালো প্রকাশ সুস্পষ্ট দেখা যেতো। তাই ইমাম সাহেব তাকে দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কে এমন কিছু নির্দেশনা লিখে দিয়েছিলেন যা চিরদিনের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে আছে। এসব বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে লেখা রয়েছে।[১] দুঃখের সাথে বলতে হয়, তার পরিধি এতো বিরাট যে, আমাদের গ্রন্থের কলেবরের দিকে তাকিয়ে তার হুবহু বর্ণনা সম্ভব নয়। তবে বাছাই করা নির্বাচিত কিছু এখানে অবশ্যই বিধৃত হবে।

কাজী আবু ইউসুফের জন্য নির্দেশনামা

এই নির্দেশনামায় তার সমসাময়িক বাদশাহর কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "রাজা-বাদশাহদের কাছে খুব কম যাতায়াত করবে। তাদের সাথে সম্পর্ককে ঠিক ততোটাই ভয় পাবে যতোটা মানুষ আগুনকে ভয় পায়। আর না গিয়েই যখন পারা যাবে না, এ অবস্থা ছাড়া দরবারে যাবে না। নিজের আত্মসম্মান ও মর্যাদা যেন বজায় থাকে। দরবারে যদি এমন

১. আশবাহ্ ওয়ান্নাযায়ের

www.pathagar.com

লোকেরা থাকে যাদের সাথে তোমার পরিচয় নেই তাহলে আরো সতর্ক হয়ে যাবে। কেননা কার কি মর্যাদা এটা যখন তোমার জানা নেই তখন এমনো হতে পারে যে, তুমি তাদের সাথে কথাবার্তায় ও সম্বোধনে এমন আচরণ করে বসবে যা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী হবে না। সে যদি তোমার চাইতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় আর তুমি সে অনুযায়ী আচরণ করতে পারলে না— তাহলে অভদ্র, বেআদব মনে করবে। যদি অতিসাধারণ কাউকে খুব বেশি সম্মান দেখিয়ে ফেলো তাহলে বাদশাহর চোখে অত্যন্ত হীন ও নীচ বলে গণ্য হবে। বাদশাহ্ যদি তোমাকে কোন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ দিতে চায় তাহলে ভালো করে আলোচনা করে দেখে নেবে যে, তা তোমার বিচার-বিবেচনা (ইজতিহাদ) এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীন ক্ষেত্র কি না। এমন যেন না হয়, ক্ষমতাসীনদের চাপে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে। যে কাজ এবং পদের যোগ্যতা তোমার নেই তা কোন অবস্থায় গ্রহণ করবে না।"

এসব নির্দেশের মধ্যে যদিও বাদশাহকে খুব বেশি সম্মান ও মর্যাদা দেবার তাকিদ করা হয়েছে কিন্তু সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রভাবহীন অনড়-অবিচল থাকতেও বলা হয়েছে।

শেষদিকে লিখেছেন, যদি কোন লোক 'শরীয়তে' বেদআতের অনুপ্রবেশ ঘটায় তাহলে খোলাখুলি তার ভুল চিহ্নিত করে সাধারণ্যে প্রকাশ করে দেবে, যেন আর কেউ সেরকম ধৃষ্টতা করতে সাহস না পায়। এক্ষেত্রে কোন শক্তি বা ক্ষমতার পরোয়া করবে না। জানবে, সত্য প্রকাশে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সাহায্যকারী অভিভাবক এবং তিনিই তাঁর দ্বীনের ধারক ও সংরক্ষক।

খোদ বাদশাহর সাথে তার রীতিবিরুদ্ধ কোন পদক্ষেপ নিতে হলে সরাসরি বলে দেবে— পদমর্যাদায় আমি আপনার অধীনস্ত কিন্তু আপনার ভুল আপনাকে জানিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য। যদি সে না মানে তাহলে একান্তে বোঝাবে, আপনার কাজটি কুরআন এবং রাসূল (স)-এর হাদীস অনুযায়ী সঠিক নয়। যদি মেনে নিলো! সে তো কল্যাণ। আর যদি সে না মানে তাহলে আল্লাহ্র আশ্রয় নিয়ে প্রার্থনা করতে থাকো যেন তিনি তার ক্ষতি থেকে তোমাকে রক্ষা করেন।

দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কেও অত্যন্ত মূল্যবান কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন ঃ "জ্ঞানার্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে সবার ওপরে স্থান দেবে। তার পরে যে অবকাশ পাবে তার মধ্যে আল্লাহ্র অনুমোদিত বৈধ উপায়ে উপার্জনের চেষ্টা করবে। কেননা একই সময়ে জ্ঞানার্জন ও উপার্জন সম্ভব হতে পারে না। এরপরে বিবাহ করবে। কিন্তু ঠিক তখন, যখন নিজের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা থাকবে যে, এখন পরিবারের ভরণ-পোষণ আমি করতে পারবো। এমন স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে না, যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল এবং সন্তান আছে। সাধারণ মানুষ এবং টাকাওয়ালা লোকদের সাথে কম মেলামেশা করবে। নইলে তারা ভেবে বসবে যে, তুমি তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করো। আর এই ধারণায় তারা তোমায় ঘুষও দিতে চাইবে। বাজারে যাবে, প্রয়োজন হলে দোকানে বসবে। পথে কোথাও বসে অথবা মসজিদে বসে কিছু খেয়ে নেবে। কূপের পানি অথবা তা থেকে যারা পানি তোলে তাদের কাছে চেয়ে পানি খেয়ে নেবে। একটা ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবে, কেহ কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করলে শুধু প্রশ্নের উত্তরটুকু দেবে, নিজে বাড়িয়ে কিছু বলবে না। ঈমান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত (আকায়েদ) কথাবার্তা সাধারণ মানুষের সাথে করা উচিত নয়। ছাত্র-শিষ্যদের সাথে এতোটা আন্তরিক আচরণ করবে যেন মানুষ দেখে মনে করে তারা তোমারই সন্তান। সাধারণ এবং নিম্নমানের লোকেরা তর্ক করতে

www.pathagar.com

চাইলে সুন্দরভাবে এড়িয়ে যাবে। কোন শহরে গেলে সেখানকার আলেম ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সাথে এমনভাবে মেলামেশা করো যেন তারা তোমায় পর্যবেক্ষণের কথা না ভাবে। জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় তোমার প্রতি কোন প্রশ্ন আসলে খুব ভেবে-চিন্তে তার জবাব দিও। জবাবটা এমন হওয়া চাই যার বেশ কিছু দলিল তুমি দিতে পারো। বিতর্কের সময় অত্যন্ত সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী থাকবে। কারণ মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভয় থাকলে তোমার ভাবনা-চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং মুখের ভাষাও যাবে এলোমেলো হয়ে। বিতর্কে ভব্যতা যারা জানে না এবং শুধুমাত্র জয়-পরাজয়ের তর্ক করে, তাদের সাথে কিছুতেই কথা বাড়াবে না। বিতর্কের সময় রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, কিছুতেই রেগে যাবে না। বেশি হাসা ভালো নয়। অতিরিক্ত হাসি হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করে দেয়। যে কাজই করো প্রশান্ত মন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে করো। কোন লোক যতোক্ষণ সামনে এসে না ডাকবে জবাব দেবে না। কেননা পেছন থেকে ডাকা পশুদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পথে চলতে ডানে-বায়ে দেখবে না। গোসল করতে হাম্মামে গেলে সাধারণের চাইতে বেশি পয়সা দেবে। সকালে ও দুপুরের সময় হাম্মামে যাবে না। কথাবার্তায় যেন কাঠিন্য প্রকাশ না পায়। কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত রাখবে। কিছু কিনতে হলে নিজে বাজারে না গিয়ে কাজের লোককে পাঠাবে। বিশ্বস্ত কাজের লোকের কাছে সাংসারিক কাজকর্ম ছেড়ে দেয়া উচিত যেন তোমার নিজের কাজকর্মের সময় বেরিয়ে আসে। বাদশাহর কাছাকাছি নিজের বাসস্থান নির্ধারণ করো না। প্রতি কথায় যেন দ্বিধাহীন আত্মনির্ভরশীলতা প্রকাশ পায়। নিতান্ত দারিদ্রতায়ও যেন সেই অহংকার বজায় থাকে। সাধারণ মানুষের সামনে বসে ওয়াজ করো না। কেননা এ রকম অবস্থায় ওয়ায়েজ অনেক সময় মিথ্যা বলতে বাধ্য করে। ছাত্রদের মধ্যে কাউকে ফিকাহ্ বিষয়ের ওপর দরস দেবার অনুমতি দিলে নিজে সেখানে উপস্থিত থাকবে, যেন তার ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারো। কোন ভুল করলে সাথে সাথে সুধরে দেবে। তুমি চুপ করে থাকলে শ্রোতারা বুঝে নেবে যে সে ঠিকই বলছে। ফিকাহ্ ছাড়া অন্য বিষয়ের কোন আলোচনা সভা হলে সেখানে নিজে যাবে না বরং তোমার এমন আস্থাভাজন বন্ধু অথবা শিষ্যদের পাঠাবে যেন তারা ফিরে এসে সম্পূর্ণ অবস্থাটা ভালো করে বর্ণনা করতে পারে।

প্রতিটি কথায় আল্লাহ্র ভয় এবং তোমার ওপর তাঁর দেয়া দায়িত্বের কথা মনে রেখো। আল্লাহ্র সাথে আন্তরিকভাবে সেই সম্পর্ক বজায় রেখো, যে রকম সম্পর্ক তোমার তাঁর সাথে আছে বলে মানুষের সামনে প্রকাশ করো। আযানের শব্দ শোনার সাথে সাথে নামাযের জন্য তৈরী হয়ে যাও। প্রতিমাসে দু'চারদিন রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নাও। প্রতিদিন নামাযের পরে কিছু না কিছু তসবীহ্ করো। কুরআন তেলাওয়াতের নিয়ম কিছুতেই যেন ভঙ্গ না হয়। দুনিয়ার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ো না। মাঝে মাঝে কবরস্তানে যাবে। খেল-তামাশা থেকে দূরে থাকো। প্রতিবেশীর মন্দ কিছু দেখলে তাকে ঢাকো, আড়াল করো, যেন অন্যে না দেখতে পায়। যারা বেদআতে অভ্যস্ত তাদের থেকে দূরে থাকো। নামাযে লোকেরা তোমাকে ইমাম না বানালে নিজে সেধে ইমাম হতে যেও না। তোমার সাথে যারা দেখা করতে আসে তাদের সামনে ইল্মী আলোচনা করো যদি তারা জ্ঞান-পিপাসু হয় তাহলে উপকৃত হবে। আর যদি নাও হয় তাহলে অন্তত তোমাকে তারা সম্মান করবে, ভালবাসবে।

ইমাম সাহেবের ছাত্র আবদুল আজীজ বিন রেদাদকে খলিফা দরবারে তলব করেছেন। পরামর্শের জন্য ইমাম সাহেবের কাছে এসে বললো ঃ খলিফা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন,

ভাবছি, সুযোগ হলে ভালো কিছু উপদেশ দিয়ে আসবো। কিন্তু কি বলবো আর কেমন করে বলবো, আপনি আমাকে বলে দিন! ইমাম সাহেব বললেন ঃ বলরে আমীরুল মু'মিনীন দুনিয়াতে চাওয়া এবং পাওয়ার তিনটি আকাঙ্ক্ষা সব চাইতে বড়— ধন, মান, রাজত্ব। এর সবই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দিয়েছেন। এবার তাকওয়া ও আমালুস্ সালেহ্ এই দুটোকেও অর্জন করার চেষ্টা করুন তাহলে তো এই অস্থায়ী পৃথিবী এবং পরবর্তী স্থায়ী পৃথিবী— দুই জাহানের সকল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে যেতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবের আরো কিছু মূল্যবান কথাকে আমরা দিক-নির্দেশনামূলক বাণী হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলতেন ঃ

যে ব্যক্তিকে ইল্‌ম বা জ্ঞানের ধনও পাপ এবং নির্লজ্জতা থেকে দূরে রাখতে পারেনি তার চাইতে হতভাগা আর কে হতে পারে ?

যে লোক ইল্‌মে দ্বীনের কথাবার্তা বলে অথচ সে মনে রাখে না যে তার দু'খানি হাতের কাছেও আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে দ্বীন এবং স্বয়ং নিজ সত্ত্বার মূল্য জানে না।

আলেমগণ যদি আল্লাহ্‌র বন্ধু হিসেবে প্রমাণিত না হয় তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আর কোন বন্ধু নেই।

যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ের আগেই ক্ষমতার মসনদে বসতে চায়, তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

যে ব্যক্তি ইল্‌মকে দুনিয়ার জন্য শেখে ইল্‌ম তার অন্তরে আসন পেতে বসে না।

সবচাইতে বড় ইবাদত ঈমান এবং সবচাইতে বড় গুনাহ কুফর।

তাই যে লোক উত্তমতম ইবাদতের অনুসারী এবং নিকৃষ্ট পাপের দূরত্বে অবস্থানকারী, তার বেলায় মাগফিরাত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা-ভিক্ষা পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

যে লোক হাদীস শেখে এবং সেখান থেকে মাসায়েল খুঁজে বের করে না সে এমন এক ওষুধের ব্যবসায়ী যার কাছে ওষুধ আছে বটে, কিন্তু সে জানে না কোন ওষুধটা কোন রোগের জন্য।

যে লোক ইল্‌মের প্রতি কোনো আগ্রহবোধ করে না তার সামনে ইল্‌মের আলোচনা, তাকে কষ্ট দেবার শামিল।

নিজের পরম বন্ধুর (নিজ সত্তা) জন্য গুনাহের আয়োজন এবং শত্রুর (উত্তরাধিকারী) জন্য সম্পদ অর্জন— এর চাইতে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে ?

এক লোক প্রশ্ন করলো— নীতি শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্থাৎ ইল্‌মে ফিকাহ্ অর্জন করতে হলে সবচাইতে বেশি কি প্রয়োজন? বললেন ঃ মনের একাগ্রতা।

প্রশ্ন ঃ মনের একাগ্রতা কিভাবে অর্জন করা যাবে ?

বললেন ঃ সার্বিক সম্পর্ক কমিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সার্বিক সম্পর্ক কিভাবে কমানো যাবে ?

বললেন ঃ মানুষ তার নিতান্ত প্রয়োজনটুকু গ্রহণ করুক আর সব অপ্রয়োজনকে ছেড়ে দিক।

একবার একজন প্রশ্ন করলো— হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) এদের মধ্যে লড়াইয়ের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি ?

www.pathagar.com

বললেন ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যেসব কথা জিজ্ঞেস করবেন সেসবের জবাব আমি কেমন করে দেবো এই চিন্তা করতে করতেই আমার দিনরাত কেটে যায়। আর ঐসব ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না তাই ওসব নিয়ে আমার কিছু ভাবনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

একথার মানে এটা নয় যে, আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর বিরোধিতা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত কোন মতামত ছিল না। বরং এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট কথা হলো— হযরত আলী (রা)-এর উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত যদি আমাদের সম্মুখে না থাকতো তাহলে হয়তো আমি বলতে পারতাম না যে, বিদ্রোহীদের সাথে কি রকম আচরণ করা উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মানসিকতাও একই রকম। ঐসব ব্যাপারগুলোকে দ্বীন ইসলামের একটা বড় সমস্যা হিসেবে দাঁড় করিয়ে তারপর তাকে নিয়ে বাক-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, মারামারি এসব অর্থহীন কাজ। যা নিরুৎসাহিত করার জন্যই ইমাম সাহেব ওভাবে বলেছেন।

একবার এক লোক ইমাম সাহেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসে জনৈকের সুপারিস করা চিঠি পেশ করলো। তিনি বললেন, জ্ঞানের জগতে অনুরোধ সুপারিসের কোন কাজ নেই বরং ওলামাদের ওপরেই এটা ফরয হয়ে আছে যে, সে যতোটুকু জানে ততোটুকু অন্যকেও জানাবে। ইল্মের দরবারে 'আম ও খাস্ অর্থাৎ সাধারণ ও বিশিষ্টের কোন বিভাজন নেই।

একদিন কুফার গভর্ণর অনুযোগ করে বললো, আমাদের থেকে এতোটা দূরে থাকেন কেন? ইমাম সাহেব বললেন ঃ দুটো রুটি আর দুটো কাপড়ে যদি সন্তুষ্ট থাকা যায় তাহলে তা সেই আরাম-আয়েশ থেকে অনেক ভালো যার পরে অনুশোচনার আগুনে পুড়ে ছাই হতে হয়।

বিষয়টাকে একজন কবি খুব সুন্দরভাবে তার ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

دوقرس زن اگراز گندم ست یاازجو - سه تائے جامه اگر کهن است یاازنو
بچارگوشة ویور خودبخاطسزجمع - که کس نگویرازین جاخجیزواں حارد
بزاریا خزدں تر ذه نروابن یس - ذفر مملکت کیقباد دکیخرد

ইমাম সাহেব কখনো কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন। কিন্তু তা প্রেমের কবিতা বা গজল নয় বরং উপদেশ ও নসীহতমূলক। যেমন—

ومن المروة للفتى ماعاش دارفاخرة
فاشكراذا اوتيتها واعمل لدارالاخره

মানুষ যতোদিন বেঁচে থাকে ততোদিন তার ইজ্জত ও আবরুর জন্য একটি ভালো বাসা প্রয়োজন। যদি তা সে পেয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং পরবর্তী স্থায়ী জীবনে ভালো একটি বাসা পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

ইমাম সাহেবের মেধা এবং প্রকৃতি অতুলনীয়। তাঁর সম্পর্কিত যে কোন আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা এসেই যাবে। আল্লামা যুহরী عبر فى اخبار من غبر-এ তাঁর জীবনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছেন কিন্তু তাঁর মেধা-যোগ্যতার কথা বাদ দিতে পারেননি।

www.pathagar.com

كان من اذكياء نبى ادم অর্থাৎ আদম সন্তানের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিভার অধিকারী যারা ছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। কঠিন থেকে কঠিনতর মাসআলায় তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা এতো দ্রুত কাজ করতো, যা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে যেতো। তাঁর সহপাঠী বন্ধু-বান্ধব যারা শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর সমমানেরও বটে ফিকহী আলোচনায় বেশিরভাগ সময় একসাথেই বসতেন, মৌলিক মাসআলাসমূহ তারাও জানতেন, কিন্তু উপস্থিত প্রেক্ষাপটে মৌলিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন সমাধান তাৎক্ষণিক বের করে দেয়া— এটা শুধুমাত্র তাঁরই কাজ।

খুব সাধারণ একটা ব্যাপার নিয়ে এক লোকের বউয়ের সাথে ঝগড়া বেধে গেলে একপর্যায়ে সে কসম খেয়ে বসলো। বেশ, যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে কথা না বলবে, আমি কখনো কথা বলবো না। স্ত্রীর মেজাজও তখন উত্তপ্ত। রাগের মাথায় সেও একই রকম কসম খেয়ে একই কথা বলে ফেললো। দু'জনেই যখন ঠাণ্ডা হয়ে গেলো তখন আফসোস করতে লাগলো, ছিঃ এ আমরা কি করেছি! স্বামী ইমাম সুফিয়ান সাওরীর কাছে ছুটে গেলো এবং বিত্তান্ত খুলে বললো। তিনি বললেন ঃ কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। এছাড়া ওপায় নেই। লোকটি হতাশ হয়ে ফিরে এলো। কি মনে হতে ইমাম আবু হানিফার কাছে গেল এবং অত্যন্ত মিনতির সাথে বিত্তান্ত বর্ণনা করে বললো ঃ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনি কোন ওপায় বলে দিন! ইমাম সাহেব স্মীত হেসে বললেন ঃ যাও, আনন্দের সাথে কথাবার্তা বলো, কারো ওপরেই কাফ্‌ফারা নেই। ইমাম সুফিয়ান সাওরী বেশ উত্তেজিত হয়ে আবু হানিফার কাছে এসে বললেন ঃ আপনি মানুষকে এই রকম ভুল মাসআলা দেন ? ইমাম আবু হানিফা লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি এসে বললেন ঃ তুমি পুরো ঘটনাটা ঠিক ঠিক বলে যাও। সে তাই করলো। ইমাম সাহেব এবার সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমি যা বলেছি ঠিক বলেছি। সুফিয়ান বললেন ঃ কেমন করে তা ঠিক হলো ? ইমাম সাহেব বললেন ঃ স্ত্রী যখন স্বামীকে উদ্দেশ্য করে ঐ কথাগুলোই বললো তখন স্ত্রীর তরফ থেকেই তো কথা বলা শুরু হলো। তাহলে কসম আর বাকী থাকলো কেমন করে ?[১] সুফিয়ান বললেন ঃ আপনার যে কথা যে সময়ের মধ্যে বুঝে এসে যায়, আমাদের ধারণাও সেখানে পৌঁছাতে পারে না।

একটি ভয়ঙ্কর ফয়সালা

কুফার একজন সম্মানিত নাগরিক খুব ধুমধাম করে তার দুই মেয়েকে একসাথে বিবাহ দিলো। অলিমার দাওয়াতে শহরের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত। মা'সার বিন ফিদাম, হাসান বিন সালেহ, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানিফ (রহ) প্রমুখগণও আছেন। সবাই খাচ্ছিলেন। হঠাৎ কন্যার পিতা পাগলের মতো অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলো— হায় হায় সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখন কি হবে ? হে আল্লাহ্! এখন কি উপায়। লোকজন ঘিরে ধরলো— কি হয়েছে ভাই, কি হয়েছে ? বাবা পাগলের মতো বললো ঃ মহিলাদের ভুলে বাসররাতে কন্যা বদল হয়ে গেছে। যে মেয়ে যার কাছে ছিল সে তো তার স্বামী নয়! হায় হায়! এখন কি হবে ? আমি এখন কি করবো ?

সুফিয়ান সাওরী বললেন ঃ আমীর মুয়াবিয়ার সময়ে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একারণে বিবাহ নষ্ট হবে না। তবে উভয়ের জন্যই মোহরানা আদায় করা শর্ত হয়ে গেলো। মা'সার বিন কিদাম ইমাম আবু হানিফার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ এ ব্যাপারে আপনার রায়

১. তাফসীরুল কাবীর, ইমাম রাযী।

www.pathagar.com

কি হবে ? আপনি কিছু বলুন! তিনি বললেন ঃ স্বামী দু'জন আমার কাছে এলে আমি জবাব দেবো। লোকেরা তাদেরকে ডেকে আনলো। ইমাম সাহেব আলাদাভাবে উভয়কে প্রশ্ন করলেনঃ রাতে যে মেয়েটি তোমার সাথে ছিল সে যদি তোমার বিয়ে করা বউ হয় তুমি কি তাতে খুশী থাকবে ? দু'জনেরই জবাব 'হ্যাঁ'। তাহলে এখন তোমরা দু'জনেই তোমাদের বউকে তালাক দিয়ে দাও। অর্থাৎ যার সাথে যার নিকাহ্ পড়ানো হয়েছিল! তারপরে যে যার সাথে রাত কাটিয়েছ তার সাথে নতুন করে নিকাহ্ পড়ে নাও।

সুফিয়ান সাওরী যে জবাব দিয়েছিলেন ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে তা শুদ্ধই ছিল। কেননা তা ছিল 'সন্দেহপূর্ণ সহবাস' যাতে নিকাহ্ ভাঙ্গে না। কিন্তু ইমাম সাহেব সার্বিক কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানতেন যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে পূর্বের নিকাহ্ বজায় থাকলে আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধের অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। একটা বাধ্যবাধকতায় পড়ে দু'জনে তা মেনে নিলেও পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা ও প্রেমময় শ্রদ্ধাবোধ জন্মাবে না। যা মূলতঃই দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি এবং বিবাহ নামক সামাজিক কর্মটির আসল উদ্দেশ্য। তদুপরি মোহরানার পরিমাণও কম হয়ে যাবে! কারণ শুদ্ধ সহবাসের পূর্বেই তালাক দিতে হলে নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক আদায় করতে হয়।

একটা মজার ফতোয়া

মিশরের বিখ্যাত ইমাম লাইস বিন সউদ (রহ)-এর বর্ণনা— "আমি আবু হানিফার কথা অনেক শুনেছি। ফলে তাকে দেখার খুব আগ্রহ অনুভব করছিলাম। হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় যাওয়া হলো। সেখানে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে দেখি, বেশ অনেক লোকের সমাগম। একজন লোক সভাপতির পাশে বসে আছেন আর লোকেরা তার কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করছে। একজন লোক সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো ঃ হে আবু হানিফা! এই প্রথম আমি তাকে চিনতে পারলাম। ইমাম আবু হানিফা প্রশ্নকারীর দিকে তাকালেন। সে বললো, আমার একটা বদমেজাজী ছেলে আছে, তাকে বিবাহ করিয়ে দিলে সে বউকে তালাক দিয়ে দেয়। আবার দাসী কিনে দিলে তাকে সে মুক্ত করে দেয়। এই সমস্যার একটা সমাধান আপনি বলে দিন! ইমাম আবু হানিফা সাথে সাথেই খুব সাবলীলভাবে বললেন ঃ তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে বাজারে যেখানে দাসী বিক্রি হয় সেখানে যাও এবং যে দাসী পছন্দ হয় তাকে কিনে এনে নিকাহ্ পড়িয়ে দাও। এখন যদি সে তাকে মুক্ত করে দিতে চায় তা সে পারবে না, কারণ দাসী তার মালিকানায় নয়। আর যদি তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তোমার কোন ক্ষতি নেই। তোমার কেনা দাসী তোমারই থাকলো। সউদ বলছেন, আমি এই চমৎকার জবাবের চাইতে এরকম তাৎক্ষণিক জবাবদাতাকে দেখে আশ্চর্য হয়েছি।

খলিফা মনসুর এবং ইমাম সাহেব

খলিফা মনসুরের দরবারী পেশকার রবী। ইমাম আবু হানিফার সাথে তার বৈরীতা ছিল। একদিন খলিফার আমন্ত্রণে ইমাম সাহেব দরবারে এসেছেন। রবী সেখানে উপস্থিত। মনসুর বললেন ঃ জনাব, এই ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীনের দাদা আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের বিরোধিতা করে। তাঁর কথা ছিল, যদি কোনো লোক কোনো কথার ওপর কসম খায় এবং দু'-একদিন পরে ইনশাআল্লাহ্ বলে নেয় তাহলে সেই কসম হালকা হয়ে যাবে এবং তা পূর্ণ করার ততোটা

www.pathagar.com

প্রয়োজন আর থাকবে না। ইমাম আবু হানিফা এর বিপক্ষে ফতোয়া দিয়ে বলেছেন ঃ 'ইনশাআল্লাহ্' কথাটি যদি কসমের সাথে থাকে তাহলে তা কসমের অংশই ধরে নিতে হবে। আর তা না হলে তা অকার্যকর এবং নিছক তামাশা।

ইমাম সাহেব বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! রবী'র ধারণা এই যে, মানুষের ওপর আপনার 'বাইয়াতের' কোন কার্যকারিতা নেই।

মনসুর বললেন ঃ তা কেমন করে ?

ইমাম সাহেব বললেন ঃ ওর এরকমই মনে হয় যে, যেসব লোক দরবারে এসে আপনার হাত ধরে খলিফা হিসেবে আপনাকে মেনে নেবার (বাইয়াত) কথা স্বীকার করে এবং কসম খায়, তারা তাদের বাড়িতে গিয়ে ইনশাআল্লাহ্ বলে নেয়; যার ফলে কসম অকার্যকর হয়ে যায় এবং তাদের ওপর শরীয়তের কোন বন্ধন আর বাকী থাকে না।

মনসুর হেসে ফেললেন। রবী'র দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ শোনঃ তুমি আবু হানিফাকে খোঁচা দিও না। ওঁর ওপরে তোমার কোন চালাকী চলবে না।

ইমাম সাহেব দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন। রবীও সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে এলো। বললো ঃ আজকে তো আপনি আমার জীবনটাই শেষ করে দিয়েছিলেন।

ইমাম সাহেব বললেন ঃ এটাই তোমার ইচ্ছা ছিল! আমি তো শুধু থামিয়ে দিলাম।

খারেজীদের কবলে ইমাম

খারেজী সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক একবার ইমাম সাহেবের বাড়িতে এসে চড়াও হলো। বললো ঃ আপনি কুফর থেকে তওবা করুন। তিনি বললেন, "হ্যাঁ আমি তোমাদের কুফর থেকে তওবা করছি।" খারেজীদের বিশ্বাস যে, মানুষ গুনাহ করলেই কাফের হয়ে যায়। অর্থাৎ গুনাহ এবং কুফর একই জিনিস। অপরদিকে ইমাম সাহেবের বলা কথাটির মর্ম ছিল এই যে, তোমরা যেটাকে কুফর মনে করো আমি তা থেকে তওবা করছি।

কেউ একজন গিয়ে ওদেরকে বললো ঃ আবু হানিফা তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। ওঁর ওকথা বলার মানে ছিল অন্য কিছু।

খারেজীরা আবার এসে ইমাম সাহেবকে বললো ঃ আপনি আমাদেরকে একটা বলে অন্যটা কেন বুঝিয়েছেন ?

ইমাম সাহেব বললেন ঃ তোমাদের কি এটা স্থির বিশ্বাস যে, আমি এরকম কিছু করেছি ? না কি শুধু সন্দেহ করছো ?

ওরা বললো ঃ না, ব্যাস সন্দেহ করছি।

ইমাম সাহেব বললেন ঃ তাহলে তো তোমাদেরই তওবা করা উচিত! কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

ان بعض الظن اثم –

নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপের পর্যায়ে পড়ে যায়।

একদিন মসজিদে ছাত্রদের দরস দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একদল খারেজী আক্রমণাত্মকভাবে

www.pathagar.com

মসজিদে ঢুকে পড়লো। ভয়ে ছাত্ররা ছুটে পালাতে যাচ্ছিল। ইমাম সাহেব ধমক দিয়ে ছাত্রদের থামিয়ে দিলেন। বললেন, শান্ত হয়ে বসো, কিছু হবে না। খারেজীদের নেতা যে ইমাম সাহেবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল তাকে বললেন ঃ আমরা সবাই আল্লাহ্‌র আশ্রয়প্রার্থী এবং আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهٗ -

মুশরিকদের কেউ যদি আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে তুমি আশ্রয় দাও, যেন সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পারে! তারপর তাকে তার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দাও।

খারেজীরা নিজেদের ছাড়া মুসলমানদের অন্যান্য সব দল-উপদলকে মুশরিক অথবা কাফের মনে করে এবং তাদের কতল করা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করে। এবার ওরা দল বেঁধে সেই রকম একটা প্ল্যান করেই এসেছিল। ইমাম সাহেবের সাথে তর্ক করবে, জানতে চাইবে তার আকীদাহ (অর্থাৎ বিশ্বাসের ধরন-ধারণ)। তারপর যখন ওদের সাথে মিলবে না, তখন 'কাফের' অভিযুক্ত করে হত্যা করবে ওরা ইমাম সাহেবকে। কিন্তু ইমাম সাহেবের এই কুশলী জবাব ওদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিলো। নেতা বেচারা এক্কেবারে নেতিয়ে গিয়ে সাথীদের দিকে ফিরে বললো ঃ এখন ওনাদের কুরআন পড়ে শোনাও, তারপর যার যার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসো।

আর একটি ঘটনা

খলিফা মনসুরের একজন বিশিষ্ট দরবারী আবুল আব্বাস। মনে মনে ইমাম আবু হানিফার চরম বিদ্বেষী। কেমন করে তার একটু ক্ষতি করা যায় এটাই ছিল তার ফন্দি-ফিকির।

কি এক উপলক্ষ্যে ইমাম সাহেব দরবারে এসেছেন। আবুল আব্বাস আগে থেকেই অন্যান্য দরবারীদের বলে রেখেছিল— দেখবো আজ, আবু হানিফা কেমন করে আমার হাত থেকে বেঁচে যায়!

নিঃশব্দ, শান্ত দরবারে আবুল আব্বাস ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্যে বললো ঃ আবু হানিফা! আমীরুল মু'মিনীন কখনো কখনো আমাদের ডেকে আদেশ করেন, "এই ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দাও" অথচ আমরা লোকটির অপরাধ কি তা জানি না। এমতাবস্থায় খলিফার আদেশ পালন করবো না করবো না ? ইমাম সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের কাছে খলিফার আদেশগুলো ন্যায় মনে হয় না অন্যায় ?

এখন! কার ঘাড়ে কয়টা মাথা, কে সে যে খোদ খলিফা মনসুরের দরবারে দাঁড়িয়ে বলবে যে, খলিফার আদেশগুলো ন্যায়সঙ্গত নয় ! আবুল আব্বাস নিজের চালে নিজেই ধরা পড়ে গেলো। তখন কাঁচুমাঁচু করে বললো— না! তা তো নয়!

ইমাম সাহেব হেসে বললেন ঃ তাহলে! ন্যায়ের আদেশ পালন করতে আর দ্বিধা কিসের ?

এক লোক কসম খেয়ে বললো ঃ আজ যদি আমি ফরয গোসল করি তাহলে আমার বিবিকে তিন তালাক দেয়া হবে। একটু পরেই আবার বললো ঃ আজ যদি আমার কোন নামায 'কাযা' হয় তাহলে আমার বউকে তালাক দেয়া হয়ে যাবে। আবার কিছুক্ষণ পরে বললো ঃ আজ যদি

আমার বউয়ের সাথে সহবাস না করি তাহলে সে তালাক হয়ে যাবে। বন্ধুরা এসে এই পাগলের কি উপায় হবে, ইমাম সাহেবের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করলো ঃ ইমাম সাহেব বললেন ঃ আসরের নামায পড়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে, সূর্যাস্তের পরেই গোসল করে মাগরিবের নামায আদায় করে নেবে। তাহলে সবগুলো শর্তই পূরণ হয়ে গেলো। কোন নামায কাযা হলো না, স্ত্রীর সাথে সহবাসও করা হলো এবং ফরয গোসল করা হলো ঠিক তখন যখন আজকের দিনটি অতীত হয়ে গেছে।

একদিন এক লোক এসে বললো ঃ নিরাপত্তার জন্য আমি আমার টাকা এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু এখন কিছুতেই মনে পড়ছে না কোথায় রেখেছি, অথচ টাকার খুব প্রয়োজন। ইমাম সাহেব মেহেরবাণী করে একটা পরামর্শ দিন এখন আমি কি করবো? তিনি বললেন, ভাই এরকম কোন মাসআলা তো 'ফিকাহ্‌র' মধ্যে নেই! আমার কাছে কি জিজ্ঞেস করো! লোকটি নাছোড়বান্দা— আমাকে এমন একটা উপায় বলে দিন যাতে আমি টাকা খুঁজে পাই। বললেন ঃ তুমি আজ সারারাত খুব গভীর মনোযোগে নামায পড়বে, দেখবে কাল সকালে পেয়ে যাবে। লোকটি সোজা বাড়ি গিয়ে পাক-পবিত্র হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরেই নামাযের মধ্যে তার মনে পড়ে গেলো টাকা কোন জায়গায় রেখেছে। সোজা দৌড়ে গিয়ে ইমাম সাহেবকে সুসংবাদ দিলো, জনাব, আপনার তদবীর কাজে লেগেছে। আমার মনে পড়েছে কোথায় রেখেছিলাম। ইমাম সাহেব বললেন ঃ হ্যাঁ শয়তান এটা কেমন করে সহ্য করবে যে, তুমি সারারত নামায পড়তে থাকো! তাই খুব তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিয়েছে। তবে তোমার উচিত ছিল আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা, তার যিকির এবং নামাযে রাতটা কাটিয়ে দেয়া।

এ ধরনেরই একটা বিপদ নিয়ে একদিন এক লোক এসে বললো ঃ জনাব, আমার কিছু মূল্যবান জিনিস ঘরের মেঝেতে পুঁতে রেখেছিলাম, এখন ঠিক কোন জায়গাটায় রেখেছিলাম তা মনে আসছে না। ইমাম সাহেব বললেন ঃ তোমার মনে না আসলে আমার তো আরও মনে না আসার কথা! বেচারা কেঁদে ফেললো ! ইমাম সাহেব কয়েকজন ছাত্র সাথে নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন— মনে করো এটা তোমাদের ঘর, কোনো মূল্যবান জিনিস পুঁতে রাখতে চাইলে ঠিক কোন জায়গাটায় রাখতে! ভাবো সবাই! এক একজন এক একটা দেখালো এবং সেগুলোকে চিহ্নিত করে চারটি জায়গা খোঁড়ার জন্য নির্বাচন করা হলো। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী, তৃতীয় জায়গাতেই পাওয়া গেল।

ইমাম সাহেব ছিলেন প্রশান্ত মনের এবং অত্যন্ত ওজস্বী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কিন্তু কিছু কিছু কথায় তাঁর গভীর রসবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। একদিন চুল কাটাচ্ছিলেন, নাপিতকে বললেন ঃ সাদা চুলগুলো বেছে তুলে নিও। নাপিত বললো ঃ যে চুল উঠাবেন সেগুলো আরো বেশি গজাবে। তিনি বললেন ঃ যদি এ রকমই হয় তাহলে কালো চুলগুলো তুলে ফেলো, যেন ওগুলো বেশি গজায়! কাজী শরীফ ঘটনাটা শুনে মন্তব্য করেছেন- ইমাম সাহেব নাপিতের সাথেও কেয়াস করতে ছাড়েননি।

ইমাম সাহেবের মহল্লায় এক গোঁড়া শিয়া থাকতো, ব্যবসা ছিল গম পিষে আটা তৈরী করা। দুটো খচ্চর ছিল তার। গোঁড়ামীর সংকীর্ণ মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল তার খচ্চর দু'টির নামে। একটার নাম আবু বকর, অন্যটার উমর। ঘটনাচক্রে একদিন খচ্চরের লাথিতে তার মাথা ফেটে গেলো। সে আর ভাল হলো না। মরে গেল লোকটা। মহল্লার মানুষের মুখে

www.pathagar.com

মুখে কথাটার চর্চা হলো, ইমাম সাহেব শুনে বললেন ঃ ভালো করে খোঁজ-খবর করে দেখো! দেখবে, যে খচ্চরটার নাম উমর রেখেছিল সেটার লাথি খেয়েই ও মরেছে। লোকেরা অবাক হয়ে বললো তাই তো হয়েছে! কিন্তু আপনি বুঝলেন কি করে ?

আর এক প্রচণ্ড গোঁড়া শিয়ার কাহিনী— সে হযরত ওসমান (রা)-কে ইয়াহুদী বলতো। একদিন ইমাম সাহেব ওর বাড়িতে গিয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছো, আমার সন্ধানে একটি ছেলে আছে। ভদ্র, পয়সাওয়ালা, পরহেযগার, তার ওপরে রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং হাফেজে কুরআন। শিয়া লোকটি উৎফুল্ল হয়ে বললো ঃ ওর চাইতে ভালো পাত্র আর কোথায় পাবো ? আপনি দয়া করে বিয়েটা ঠিক করে দিন। ইমাম সাহেব বললেন, সামান্য একটু সমস্যাও আছে, সে ধর্মত ইয়াহুদী! লোকটি রেগে আগুন হয়ে উঠলো। কিন্তু তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললো ঃ সুবহানাল্লাহ্ আপনি একটা ইয়াহুদীর সাথে আমাকে সম্পর্ক করতে বলেন! এরকম রায় আপনি দিতে পারলেন ? ইমাম সাহেবও একটু অবাক হবার ভান করে বললেন ঃ কেন! তাতে অসুবিধা কোথায় ? তোমরা যাকে ইয়াহুদী বলে জানো, এমন একজনকে যখন স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল জামাতা বানাতে পেরেছেন তখন তোমার সমস্যাটা কি ? আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কৃপা এই সামান্য কথার ইঙ্গিতে লোকটির চেতনা ফিরে এলো এবং সে তার পুরনো ধারণা থেকে তওবা করে নিলো।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের রচনাবলী, মতামত, গবেষণা ও চিন্তাধারা

ইমাম সাহেব রচনা করেছেন বলে যেসব গ্রন্থের কথা ইতিহাস থেকে জানা যায়, তাহলো — ফিক্‌হে আক্‌বার, আল্‌-আলেম ওয়াল্‌ মুতাআল্লাম ইত্যাদি।

ফিক্‌হে আকবার ঃ আকায়েদ (বিশ্বাস সংক্রান্ত)-এর একখানা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।

এই পুস্তিকাখানা ছাপা হয়েছে এবং সর্বত্র পাওয়া যায়। অনেকেই এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লিখেছেন। যেমন মুহীউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বাহাউদ্দীন, ওফাত ৯৩৫ হিঃ, মাওলা ইলিয়াস বিন ইব্রাহীম ইসনুবী, মাওলা আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল মু'তাসাদী, হাকীম ইসহাক, শেখ আকমালুদ্দীন, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ। মুল্লা আলী কারীর শরাহ এর মধ্যে প্রথম। অন্যান্য কিছু কিছু ব্যাখ্যার বই কোথাও কোথাও আছে বলে জানা যায়। হাকীম ইসহাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে আবুল বাক্কার আহমাদী ৯১৮ হিজরীতে গ্রন্থণা করেছেন এবং মূল কিতাব করেছেন ইব্রাহীম বিন হিসাম যে আবার শারিফী নামেও খ্যাত।

আল-আলেম ওয়াল মুতাআল্লাম ঃ প্রশ্ন এবং উত্তর আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। কিন্তু আমাদের নাগালের মধ্যে তা পড়েনি।

ফিক্‌হ আকবারকে যদিও ফখরুল ইসলাম বাযুদী, আবদুল আলী, বাহরুল উলুম সহ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারিগণ ইমাম আবু হানিফার রচনা বলে দাবি করেছেন কিন্তু আমরা এই দাবির ওপর আস্থা রাখতে পারছি না, কারণ বইখানী যে সময়ের সংকলন বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেই সময়কালে ঐ ধরনের বর্ণনা পদ্ধতিরই প্রচলন হয়নি। অথচ তা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ এবং এমন সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিকতার সাথে লেখা হয়েছে যা পরবর্তীকালের লেখকগণের ধরন-ধারণ। তার মধ্যে এক জায়গায় জাওহার (মূলবস্তু) এবং উরূদ (প্রথম শ্লোকার্ধের শেষ পদ) শব্দ দু'টি এসেছে। বস্তুত এ ধরনের দার্শনিক শব্দাবলী সেকালের প্রচলিত ভাষায় অন্তর্ভূক্তই হয়নি। তবে খলিফা মনসুরের শাসনামলে বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় তরজমা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়কালটা ইমাম সাহেবের জীবনের শেষদিকের সময়। এই প্রেক্ষাপটে কিছুতেই ব্যাপারটা সঙ্গত মনে হয় না যে, বিদেশী ভাষায় বইগুলো তরজমা হচ্ছে আর তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলো সাথে সাথে স্থানীয় রচনা পদ্ধতিতে এসে প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে। ঐসব দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ শব্দগুলো ঠিক সেই সময়ই ধর্মীয় পরিসীমার মধ্যে প্রবেশ করেছে যখন ওগুলোর ব্যাপক ব্যবহারে স্থানীয় ভাষার অংশে পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ কথাবার্তায় ওগুলোর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তন ইমাম সাহেবের সময়কাল শেষ হবার পরে শুরু হয়েছে।

যদিও আমাদের এই পর্যালোচনা অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের আলোকে। তদুপরি বর্ণনা রীতির ধারাবাহিকতায়ও ব্যাপারটা প্রমাণ করা যায় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এমনকি চতুর্থ শতাব্দীর রচনাবলীর মধ্যেও এই পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায় না। আমাদের অনুসন্ধানে ঐ

www.pathagar.com

পুস্তিকার উল্লেখ রয়েছে এমন প্রাচীনতম গ্রন্থ ফখরুল আলম বাযুদীর কিতাবুল উসুল, যা রচিত হয়েছে পঞ্চম শতাব্দীতে।

ইমাম আবু হানিফার হাজার হাজার ছাত্র ও শিষ্য ছিল। দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পরবর্তীকালে যারা নিজেরাই শিক্ষক হয়েছেন। এভাবে স্তরে স্তরে পর্যায়ক্রমে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ছাত্র এবং ভাবশিষ্য তৈরী হয়েছে। এতো বিশাল সংখ্যক ছাত্রদের মধ্যে ঐ পুস্তিকাটির চর্চা, এমনকি নাম পর্যন্ত কাউকে নিতে দেখা যায় না। তাহলে কেমন করে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় ?

ইল্‌মে আকায়েদ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর বড় বড় গ্রন্থ যেমন— সাহায়েফ, শারহে মাক্কাসেদ, শারহে মাওয়াকেফ, মিলাল ওয়াননাহল ইত্যাদি রচিত হয়েছে যাদের মধ্যে তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। ঐ কিতাবের শরাহ অর্থাৎ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মূলক কিতাবাদী যা কিছু রচিত হয়েছে, তা সব অষ্টম শতাব্দী এবং তার পরের। এছাড়া আবুল মুতী বলখী যে ঐ কিতাবের বর্ণনাকারী হাদীস ও বর্ণনা পরম্পরা জগতে তেমন প্রমাণিত আস্থাভাজন নন। "কুতুবে রিজালে"-এ মুহাদ্দিসীনগণ তার সম্পর্কে অত্যন্ত শক্ত শক্ত মন্তব্য করেছেন যদিও আমরা তার সবগুলোর সাথে একমত নই। তবুও এমন একটি পুস্তিকা যার দলিল ও প্রমাণ শুধুমাত্র আবুল মুতী বল্‌খীর বর্ণনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। হাদীস চর্চার মূলনীতির আলোকে তাকে গ্রহণ করা যায় না।

আ'মল ঈমানের অঙ্গ নয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আসহাবগণ যতোদিন বেঁচে ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত ইসলামী আকায়েদের অবয়ব অত্যন্ত মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন ছিল। কোন ধরনের জটিলতা এবং অতিচর্চার সাথে আরবদের পরিচয় ছিল না। উমাইয়া শাসনের মাঝামাঝি সময়ে যখন সামরিক শক্তির অবক্ষয় শুরু হলো তখন সভ্যতা ও সামাজিক বিস্তৃতির ব্যাপকতার ফলে বিচিত্র সব কর্মকাণ্ডের উদ্ভব ঘটতে লাগলো। শক্তি ও সম্মান, সাধারণ ও বিশিষ্ট, ইনসাফ ও শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির বিতর্ক চর্চায় এসে গেলো। এসব চর্চার সূত্রপাত ঘটেছে অনারবদের দ্বারা এবং 'অনারব-সংস্কৃতি' প্রভাবিত আরবদের দ্বারা। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত ঘোলাটে। আরব ও আরবীয় মানসিকতার আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হলো। মুহাদ্দিসীন এবং ফকীহগণ নবউদ্ভূত সব বেদআতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। এই সাংঘর্ষিক প্রেক্ষাপটে ঐসব মহাত্মনদের নিজেদেরকেই সমস্যাগুলোর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক অবস্থানে দাঁড়াতে হলো। ফলে শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার কারণে তাদের অধিকাংশই ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। মুতাযিলাদের বিশ্বাস ছিল যে, "কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার এক অভিনব নতুন কালাম যা রাসূলে করীম (স)-এর নবুয়তের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে"। এই দর্শনের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা এমন পর্যায়ে চলে গেলেন যে, কতিপয় মুহাদ্দিসীন কুরআনের শব্দ চয়ন এবং উচ্চারণকেও প্রাচীন বলে দাবি করে বসলেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদগণের অন্যতম ইমাম যুহলী যার সনদে সহীহ্ বুখারীতে অনেক বর্ণনা রয়েছে। তিনি মুতাযিলাহ্ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর ওপর এতোটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাকে তার দরসের ক্লাশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন এবং সকল ছাত্রদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বুখারীর সাথে যার সম্পর্ক থাকবে সে যেন তার দরসে না আসে।[১] ইমাম বুখারী নিজেই মৌখিক কুরআনের আদি বা প্রাচীন হওয়ার মত পোষণ করতেন কিন্তু তার

১. ফাত্হুল বদী, হাফেজ ইবনে হাজার

www.pathagar.com

পঠনকে অভিনব বা নতুন বলতেন। ইমাম যুহলীর মত ছিল— না, তাও প্রাচীন। এরকম আরো অনেক প্রসঙ্গে ভারসাম্যহীন আচরণ হয়েছে যার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়।

ইমাম আবু হানিফা এইসব বিতর্কে নিজের অবস্থানকে মৌল সত্যের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, যা বুদ্ধির সাথে বর্ণনার মতো সামঞ্জস্যশীল ছিল। বিতর্কিত মাসায়েলগুলোর অন্যতম ছিল ঈমান ও আমলের প্রসঙ্গ। মারজীয়াহ্দের বিশ্বাস হলো ঈমান ও আমল দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এবং ঈমান ও বিশ্বাসের সুস্পষ্ট পূর্ণতা থাকলে আমল না হলেও ক্ষতির কিছু নেই। এক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে যদি আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব এবং নবুয়ত রিসালাতে আস্থা পোষণকারী হয় এবং তার ওপর আরোপিত ফরযগুলো যদি সে আদায় নাও করে— শেষ বিচার দিনে সে পার পেয়ে যাবে। এই মতের প্রথম অংশ যদিও শুদ্ধ ছিল কিন্তু মুহাদ্দিসীন এর কোন বিভাজন করেননি। তাঁরা ঐ মত পোষণকারী দলটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। যেহেতু কুরআনের কিছু আয়াত স্পষ্টতঃ তাদের মতের অনুকূলে ছিল যা তাদের অবস্থানকে আরও শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এটা ছিল একটা ইজতিহাদী রায়। ব্যাপারটা যদি এ পর্যন্তই থাকতো তাহলে অবস্থা এতোটা সংকটপূর্ণ হয়তো হোত না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, সেইসব মহাত্মনগণ এমন কঠিন অবস্থান নিয়েছিলেন যে, যেসব লোক তাদের মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে না তাদেরকে ফাসেক এবং কাফের হিসেবে গণ্য করা হতো। কাজী আবু ইউসুফ একবার শরীফের আদালতে স্বাক্ষী হয়ে গেলে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, যে লোক এই কথা বলে যে, নামায ঈমানের অংশ নয় তার কোন সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করবো না।

ঈমান ও আমল দু'টি আলাদা জিনিস ঃ ইমাম আবু হানিফার এ বিষয়ে কোন মাথাব্যাথা ছিল না যে, এই 'মতামত' কোনো ব্যক্তির বা কোনো দলের। তিনি যে কোনো বিষয়ের মূলের দিকে দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করতেন। অন্তর্চক্ষু দিয়ে বুঝতে চাইতেন সেই মৌলের মধ্যে কি সত্য নিহিত। সেখানে যে সত্য দেখতে পেতেন, তাকেই তিনি সত্য বলে গ্রহণ করতেন।

তাঁর কাছে যখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হলো, তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে বলে দিলেন। ঈমান ও আমল দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস এবং এ দুটোর বিধান বা নীতিও আলাদা আলাদা। লোকেরা তাঁর এই মতামত জানতে পেরে তাকেও 'মারজিয়াহ' বলে আখ্যায়িত করলো। তিনি এ অপবাদ খুশী মনে মেনে নিলেন। মুহাদ্দিসীন এবং ফকীহদের মধ্যে যারা তার মত পোষণকারী ছিলেন তাদের সবাইকেই অপবাদের ঐ খেতাব উপহার দেয়া হয়েছিল।

মারজিয়াহ যাদের বলা হয় ঃ মুহাদ্দিস ইবনে কুতাইবাহ তার বিখ্যাত দলিল সমৃদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ "আল মা'আরিফ"-এ মারজিয়াহ নামে আখ্যায়িত বেশ কিছু ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণের নাম উল্লেখ করেছেন। যাদের মধ্যে ইবরাহীম তাইমী, আমরূদ বিন মুররাহ, তালক্ আল হাবীব, হামাদ বিন সুলাইমান, আবদুল আজীজ বিন আবী দাউদ, খারেজাহ বিন মাহসাব, আমরূদ বিন কায়েস আল আছর, আবু মুয়াবিয়াহ আল দরীর, ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া, মা'সার বিন কিদাম (রহ) প্রমুখ। অথচ এঁদের অধিকাংশই হাদীস ও বর্ণনা বিষয়ক ইমাম। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এইসব ব্যক্তিবর্গের হাজার হাজার বর্ণনা বিদ্যমান। আমাদের এ যুগের কিছু কিছু সংকীর্ণমনা রয়েছে যারা এ ব্যাপারে একটু দুর্বলতা বোধ করেন যে, ইমাম সাহেবকে কোনো কোনো মুহাদ্দিসীন 'মারজিয়াহ' বলেছেন। ইবনে কুতাইবার দীর্ঘ

www.pathagar.com

তালিকা দেখলে তারা নিজেরাই লজ্জিত হবেন। মুহাদ্দিস 'যুহরী' তার "মীরাযুল ই'তেদাল"-এ মা'ছার বিন কিদাম সম্পর্কে লিখেছে, "মারজিয়াহ হওয়া অনেক বড় বড় আলেমদের ধর্ম এবং এই ধর্মে দীক্ষিতদের দোষারোপ করা উচিত নয়।" এটা আসলে সেদিকেই ইঙ্গিত করছে যা ইমাম আবু হানিফার বিশ্বাস ছিল।

প্রসঙ্গটি আদৌ এতোটা গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী নয়। কিন্তু এর পরিণতি অত্যন্ত বিশ্রী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এজন্য ইমাম সাহেব অত্যন্ত খোলামেলাভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমলকে ঈমানের অংশ হিসেবে ধরে নিলে যা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় তা হলো, যে লোক আমলের একনিষ্ঠ অনুশীলনকারী নয় সে আদৌ মুমিন নয়। খারেজীদের যে রকম বিশ্বাস।

তারা তো এমন অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বকেও কাফের মনে করতো, যাদেরকে মুহাদ্দিসীনগণ কাফের মনে করতেন না। কিন্তু এই মনে না করার কারণ ছিল, তারা 'অপরিহার্যতা' সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। অথচ এই অপরিহার্যতা সুনির্দিষ্ট এবং চূড়ান্ত, যাকে অস্বীকার করা যায় না।

ইমাম শাফেয়ীর এক বড় পৃষ্ঠপোষক ইমাম রাযী তাঁর গ্রন্থ 'মানাক্বিবুশ্ শাফেয়ী'তে লিখেছেন যে, লোকেরা ইমাম শাফেয়ীর ওপর একটা আপত্তি তুলেছে যে, তিনি এমন কিছু মত পোষণ করেন যা পরস্পর বিরোধী। কেননা একদিকে তিনি বলছেন যে, ঈমান সত্যায়ন ও কার্যে পরিণতকরণের সমন্বয়কে বলা হয়। আবার পাশাপাশি একথাও বলছেন যে, 'তরকে আমল' অর্থাৎ কর্মে প্রকাশ না করলেও সে মানুষটা কাফের হয়ে যায় না। অথচ কোনো যৌগিকের কোনো অংশ যখন থাকবে না তখন সেই যৌগিকও আর যৌগিক হিসেবে থাকবে না। যে কারণে 'মু'তাযিলা' সম্প্রদায় বিশ্বাস করে, 'যেখানে কর্মের প্রকাশ নেই সেখানে বিশ্বাসও নেই অর্থাৎ আমল নেই তো ঈমানও নেই।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে যে, আসল ঈমান, স্বীকারোক্তি এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে। তারপরে তার অভিব্যক্তি বা কর্মে প্রকাশ। সেতো ঈমানের ফসল এবং অনুশীলন। কিন্তু যেহেতু অনুশীলনীর ওপরেও কখনো কখনো রূপকভাবে আসল জিনিসের প্রয়োগ করা হয়। এজন্য রূপক কর্ম তৎপরতার ওপরেও ঈমানের প্রয়োগ হয়েছে এবং এটাতো স্বীকৃত যে, তৎপরতা ছুটে গেলেও মূলবস্তু হারিয়ে যায় না।

কিন্তু এই জবাব توجيه القول بمالايرضى به قايله খোদ ইমাম রাযীকে এর সমর্থন করতে হয়েছে। তাই জবাবের পরে বলছেন যে, فيه ترك لهذا المذهب অর্থাৎ ঐ জবাবে এই মত বাতিল হয়ে যায়। ইমাম রাযী তাঁর ইমাম ইমাম শাফেয়ীর মত পোষণকারী এবং তার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু যেহেতু নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়-বস্তু নির্বাচনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাই তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, হয় কর্ম তৎপরতাকে বিশ্বাস অনুযায়ী অনুশীলনী দিয়ে হিসেব করা উচিত। না হয় এটাই মেনে নেয়া উচিত যে, যে ব্যক্তি কর্ম প্রকাশে একনিষ্ট নয় সে বিশ্বাসীও নয়।

এই বিতর্ক প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফার একটি উক্তি রয়েছে। যা যুক্তি প্রদর্শনের ধরণ এবং সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রকৃতি দিয়ে ইমাম সাহেবের বিচক্ষণতার পরিমাপ করা যেতে পারে এবং

www.pathagar.com

আসল প্রসঙ্গের মূল তত্ত্বও খুলে যায়। এই জন্য আমরা এখানে উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। সেকালের অন্যতম প্রখ্যাত মুহাদ্দিস উসমান বাত্তী ইমাম সাহেবকে নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা উৎকট চর্চা চল্‌ছে দেখে একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো একখানা চিঠি লিখেছিলেন। "জনাব লোকেরা আপনাকে 'মারজিয়াহ' বলে অপবাদ দিচ্ছে এবং আরো বলছে যে, আপনি মুমিনদের পথভ্রষ্টতাকে জায়েয বলে অনুমোদন করেন। এইসব কথা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে। কথাগুলো কি আদৌ সত্যি, ইতি।"

ছোট্ট এই চিঠির জবাবে ইমাম সাহেব দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছিলেন। গোটা চিঠির মধ্য থেকে আমরা আমাদের নেহায়েত প্রাসঙ্গিক কথাগুলোকে নির্বাচন করেছি।

হামদ ও না'তের পরে ওসমান বাত্তীর বন্ধুসুলভ নসীহত ও মঙ্গল কামনার শুকরিয়া আদায় করে লিখছেন ঃ আমি আপনাকে বলছি— রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রেরণের পূর্বে সব মানুষ মুশরিক ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) প্রেরিত হয়ে মানুষকে এই কথার দিকে আহ্বান জানালেন যে, আল্লাহ্‌কে এক এবং একক মানো এবং রাসূল (স) হিসেবে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তাকে স্বীকার করো। এখন যে মানুষেরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করতো এবং শির্‌ক ছেড়ে দিত, তাদের জান ও মাল পরস্পরের জন্য হারাম হয়ে যেতো। এভাবে যারা ঈমান এনেছিল শুধুমাত্র তাদের জন্য ফারায়েজ বা ইসলামী বিধি-বিধান এলো। এই বিধি-বিধানের অনুশলীনকে আমল ধরা হয়।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا -

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে,

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই দিকেই ইশারা করেছেন। এ ধরনের আরও আয়াত রয়েছে যাতে প্রমাণ হয় যে, আমল না হলেই ঈমান চলে যায় না। অপরদিকে যদি বিশ্বাস এবং আস্থা না থাকে তাহলে তাকে মুমিন বলা যাবে না। ঈমান ও আমল দু'টি আলাদা জিনিস এবং তা এভাবেও প্রমাণিত যে, বিশ্বাস অনুযায়ী সকল মুসলমান এক কিন্তু আমল-এর ক্ষেত্রে মান ও মর্যাদায় পার্থক্য হয়ে যায়। কেননা দ্বীন ও ধর্ম সবার একই। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেনঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصّٰى بِهٖ
اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَايَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -

তোমাদের জন্য সেই দ্বীনকে বৈধ করলাম যা নূহের প্রতি অহী করেছিলাম এবং যা তোমাকেও অহী করে, পাঠিয়েছি এবং যার অসীয়ত ইবরাহীম মূসা ও ঈসাকে করেছি। আর তা এই যে, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো তার মধ্যে পার্থক্য করো না।

আপনি জানেন যে, বিশ্বাসে নির্দেশনা হেদায়াত এবং আমলে (কাজে-কর্মে) নির্দেশনা এই দু'টি দুই জিনিস। একটা লোক যে ধর্মীয় বিধি-বিধান জানে না তাকে আপনি মুমিন বলতে পারেন। অর্থাৎ লোকটি নিয়ম-নীতি জানে না বলে সে জাহিল এবং বিশ্বাস অনুযায়ী সে মুমিন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে এভাবেই গণ্য করেছেন। এক ব্যক্তি এমন, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে চেনে না বা চিনতে গিয়ে ভুল করছে, আর এক ব্যক্তি মুমিন এই দু'জনকে কি আপনি সমান ধরবেন। কিন্তু যে তার প্রতি আরোপিত কর্তব্য (আমল) সম্পর্কে অজ্ঞ— আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নির্ধারিত ফারায়েজ সম্পর্কে যেখানে বলেছেন সেখানে বলেছেন যে ঃ

www.pathagar.com

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا -

আল্লাহ্ তা'আলা এজন্যই বলে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও।

অন্য এক আয়াতে বলেছেন ঃ

أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى -

একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেবে।

হযরত মূসার (আ) -এর জবানীতে বলছেন ঃ

فَعَلْتُهَا إِذًا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ -

আমি যখন কাজটি করেছি তখন আমি বিভ্রান্ত ছিলাম।

এছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা এই দাবির সপক্ষে অকাট্য দলিল এবং হাদীসসূহে আরও বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ভাবে এর প্রমান পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা) এবং আলী (রা)-কে আমীরুল মুমিনীন বলে সম্বোধন করা হতো, তাহলে তার মানে কি এই যে, তাঁরা কেবল সেই লোকদেরই আমীর যারা তাদের ফারায়েজ ও 'আমল অনুশীলনে একনিষ্ঠ। হযরত আলী (রা) তাঁর সাথে লড়াই এবং বিরোধে লিপ্ত শামের লোকদেরকেও মুমিন বলেছেন। হত্যার চাইতে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে ? তাহলে যারা হত্যাকারী হয়েছিল তাদের এবং যারা নিহত হয়েছিল তাদের— এই উভয় পক্ষকেই কি আপনি ন্যায়ের ধারক বলে স্বীকৃতি দেবেন ? যদি আপনি তাদের একদল অর্থাৎ হযরত আলী (রা) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সত্য ও ন্যায়ের ধারক বলে স্বীকার করেন তাহলে তাঁর প্রতিপক্ষদেরকে কি বলবেন ? গভীরভাবে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবুন, চিন্তা করুন, তারপর ভালো করে বুঝে নিন।

আমার বক্তব্য হলো— কেবলা অনুসারী যতো মানুষ, তারা সবাই মুমিন। ফারায়েযসমূহ অনুশীলন করে না বলেই কাফের হয়ে যায় না। যে মানুষ ঈমানের দাবি অনুযায়ী সকল কর্তব্য অনুশীলনে একনিষ্ঠ, মুমিন এবং স্থায়ী জীবনে জান্নাতের অধিবাসী। যে লোক ঈমান ও আমল দুটোকেই উপেক্ষা করে, সে কাফের এবং আগুনের অধিবাসী। যে লোক ঈমান রাখে কিন্তু তার দাবি পূরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সে মুসলিম, তবে গুনাহগার মুসলিম। তার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন— হয় তাকে শাস্তি দেবেন, নয় ক্ষমা করে দেবেন।

এতো সুন্দরভাবে ইমাম সাহেব বিষয়টাকে যৌক্তিকতার নিরীখে প্রমাণ করেছেন যা শ্রেফ্ অনবদ্য অদ্বিতীয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হতো। তখন ফারায়েজের অস্তিত্ব ছিল না। ফারায়েজ এবং ঈমানের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সতন্ত্র পরিচয় প্রমাণে এর চাইতে বড় দলিল আর কি হতে পারে ?

ইমাম সাহেব কুরআন মজীদের যেসব আয়াতকে দলিল হিসেবে এনেছেন তার আলোকে এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে, এ দুটো দুই জিনিস। কারণ ঐসব আয়াতসমূহে আমলকে ঈমানের সাথে সংযোজন করা হয়েছে, সুতরাং এটাতো অনস্বীকার্য যে, একটি সম্পূর্ণ জিনিসের ওপর কোন সংযোজন হয় না!

مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَيَعْمَلُ صَالِحًا -

যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে অতঃপর সম্পাদন করে।

www.pathagar.com

এ আয়াতে হরফে তা'কীব এসেছে। যা এই বিতর্কের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়।

এই অকাট্য দলিলসমূহের বিপরীতে অপর পক্ষও কিছু আয়াত এবং হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু সেসব মূল বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। সবচাইতে বড় দলিল হিসেবে যে হাদীসখানা তারা উপস্থাপন করেন তা হলো "মুমিন মুমিন হয়ে জ্বিনা এবং চুরি করতে পারে না"। রাসূল (স)-এর এই বাণীকে আমরা আমাদের সমাজে প্রচলিত অতি সাধারণ একটি কথার মধ্য দিয়ে অনুভব করতে পারি। যেমন আমরা বলি, "তোমার মতো ভালো মানুষ এ রকম একটা কাজ করতে পারে না।" এখানে আমরা বোঝাতে চাই— মন্দ একটি কাজ ভালো একজন মানুষের মর্যাদার খেলাফ। ঠিক সেভাবেই জ্বিনা এবং চুরি ঈমানের মর্যাদার খেলাফ। হাদীসে রাসূল (স)-এর ইঙ্গিতও সেই দিকেই। নইলে হযরত আবু যর (রা) বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে একথার উল্লেখ কেমন করে থাকে যে, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্র এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার স্বীকৃতি দেবে সে জান্নাতে যাবে, যদি সে চোর এবং জ্বিনাকারীও হয়।

ঈমান কম ও বেশি হয় না

আর একটি মাসআলা হলো الايمان لايزيد ولا ينقص —"ঈমান বৃদ্ধিও পায়না কিংবা কমেনা।" অর্থাৎ ঈমান কম অথবা বেশি হতে পারে না। সন্দেহ নেই যে, এ উক্তি ইমাম সাহেবের। কিন্তু লোকেরা এর তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে ভুল করেছে। বড় বড় মোহাদ্দিসীন, ইমাম শাফেয়ীর মতাবলম্বী, এমনকি খোদ আবু হানিফার মতাবলম্বীদের মধ্যেও কেউ কেউ এই ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। ঈমানের কম অথবা বেশি দুইভাবে হতে পারে। তার একটা এই হিসেবে যে, তা 'কথার প্রকৃতি থেকে বোঝা যাবে যার মধ্যে শক্তিশালী এবং দুর্বলতার প্রকাশ সম্ভব।' অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, ঈমান আসলে ইয়াকিনেরই অপর নাম। আমরা আস্থাও বলতে পারি এবং আস্থার স্তরগত পার্থক্য হয়েই থাকে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্কে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি মৃতদের কেমন করে জীবিত করো ? আল্লাহ্ বললেন ঃ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ —এখনো কি তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না ? ইব্রাহীম বললেন, বিশ্বাস তো আমি অবশ্যই করি! কিন্তু لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِى —আমার অন্তরকে আস্থাপূর্ণ করে নিতে চাই। আল্লাহ্ তা'আলা বহু সংখ্যক আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ঈমানের উন্নতি হয় زَادَاتْهُمْ اِيْمَانًا। —"তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেল" এই আয়াতাংশে সুস্পষ্টভাবে তা-ই প্রকাশিত। প্রসঙ্গের এই তাৎপর্যের সাথে ইমাম আবু হানিফার যেমন কোন মতপার্থক্য নেই তেমনি তখনকার উত্থিত বিতর্কের বিষয়টিও এটা নয়।

ইমাম সাহেবের দাবির মূল উৎস ভিন্ন। যা মূলত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যারা আমলকে ঈমানের অংশ হিসেবে দাবি করেন তাদের বিশ্বাস, "ঈমান পরিমাণে কম বা বেশি হয়"। যে ব্যক্তি কায়-কর্তব্যে একনিষ্ঠ, সে বেশি মুমিন। অর্থাৎ তার ঈমানের পরিমাণ বেশি। আর যে গুনাহগার, অর্থাৎ কায়-কর্তব্যে অবহেলাকারী, সে কম মুমিন, তার ঈমানের পরিমাণ কম। মুহাদ্দিসীনগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে একথারই দাবিদার। এরই ওপরে তাঁরা বিভিন্ন দলিল পেশ করেন। আল্লামা কিছতালানী সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

فإعلم أن الا يمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية -

আর জেনে রেখো, ঈমান তার বিধি অনুযায়ী অনুশীলন করলে বেড়ে যায় আর গুনাহ করলে কম হয়ে যায়।

মুহাদ্দিসীনগণ সব জায়গায় একথারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এইভাবে ঈমানের বেশি বা কম হওয়ার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, কর্ম প্রকাশ (আমল) বিশ্বাসের (ঈমান) অংশই নয় তখন আমলের কম-বেশি হওয়াতে ঈমানের কম-বেশি হতেই পারে না। নিরপেক্ষ বিবেচনায় এই কথাটিকেই সত্য বলে মনে হয়। হাদীসে এসেছে যে, "তোমাদের ওপরে আবু বকরের যে প্রাধান্য তা অনেক বেশি নামায এবং রোযা পালনকারী হিসেবে নয় বরং যা তার অন্তরে আছে সেজন্যই তার এই শ্রেষ্ঠত্ব। বস্তুত ঃ ইমাম সাহেবের দাবি এটা নয় যে, ঈমান প্রকৃতিগতভাবে তীব্র অথবা দুর্বল, এ হিসেবে বেশি বা কম হতে পারে না। বরং তার দাবি হলো ঈমান পরিমাণগতভাবে কম বা বেশি হতে পারে না। আমল ঈমানের অংশ নয় এই কথার প্রেক্ষিতেই আমাদের এই দাবি যা ইতিমধ্যে আমরা প্রমাণ করে দেখিয়েছি।

ঈমানের ব্যাপারে সবাই সমান

সাধারণভাবে ঈমানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ বিশ্বাসী হিসেবে সব মুসলমান সমান। ঈমানের জন্য যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন তা সবার জন্যই সমান। রাসূল (স)-এর আসহাব এবং তৎপরবর্তী সব সাধারণ মুসলিম উভয়ই একটি ব্যাপারে একই রকম, তাহলো তারা তওহীদ এবং নবুয়তের ওপর বিশ্বাস রাখে। পার্থক্য যা কিছু তা বিশ্বাসের তীব্রতা এবং দুর্বলতার মধ্যে। এই কথাটাই ইমাম সাহেব ওসমান বত্তী'র চিঠির জবাবে এভাবে লিখেছিলেন–

دِيْنُ أَهْلِ السَّمَاءِ اولْأَرْضِ واحد -

আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের দ্বীন একটাই।

একথার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত থেকে দলিল পেশ করেছেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنَ مَاوَصَّيْنَابِه نُوْحًا -

আমরা তোমার জন্য সেই দ্বীনকেই নির্ধারণ করেছি যা নুহের জন্য করেছিলাম।

বিরোধীরা ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে খুব জোরেশোরে একটা অপবাদ রটিয়েছিল যে, তিনি মনে করেন তার ঈমান এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর ঈমান একই রকম। ইমাম সাহেবের দিক থেকে এই রকম একটি কথার সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু যদি বলেই থাকেন তো মন্দ কি বলেছেন ? আর তাতে ক্ষতিই বা কি ? রাসূল (স)-এর বংশধরগণের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তাদের পক্ষে তাঁর মতামত কে অস্বীকার করতে পারে ? সবচাইতে অবাক ব্যাপার হলো, এই রকম একটা সুস্পষ্ট বিষয় এতো বড় বড় বিশেষজ্ঞদের বুঝেই আসলো না! খতীব বোগদাদী পাতার পর পাতা মশীলিপ্ত করে গেছেন অথচ তিনি বুঝতেই পারলেন না যে, ইমাম সাহেবের দাবির বিষয় বস্তু কোন্‌টি! "আমাদের ও সাহাবাগণের ঈমান একই রকম" এই কথাটাকেই তিনি সহ্য করতে পারেননি। তিনি কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, আমাদের এবং সাহাবাগণের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এমন বহু জিনিস রয়েছে যার প্রকৃতিগতভাবে আমরা একই সমান।

www.pathagar.com

এই ধরনের মাসআলাগুলোতে ইমাম সাহেব একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত রাখতেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মত পোষণকারীদের প্রতি তিনি কখনো ফিস্ক এবং কুফ্র-এর মতো অপবাদ আরোপ করতেন না। এই উদারতা ইমাম সাহেবের একটি অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যা ইসলামের ইতিহাসে রাসূল (স)-এর প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পরে খুব কমই পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আল্লাহ্‌র দ্বীন-ইসলামকে যতোটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, অন্য কিছুই তার ততোটা ক্ষতি করতে পারেনি। দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার কারণে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যা সত্যের আকারে আজ প্রতিষ্ঠিত, তার বুনিয়াদ সাহাবা কেরামদের যুগেই স্থাপিত হয়েছিল।

আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) এবং আরও অনেক সাহাবাগণের বিশ্বাস ছিল— রাসূল (স) মে'রাজে নিজের চোখ দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছেন। হযরত আয়শা (রা) সুস্পষ্টভাবে একথার বিরোধিতা করেছেন। আমীর মুয়াবিয়া স্বশরীরে রাসূল (স) মিরাজে গিয়েছিলেন একথা বিশ্বাস করতেন না। হযরত আয়শা (রা) শ্রুতি বা শোনা কথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এই সময়কালে এসব বিতর্কের সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন মানদণ্ড ছিল না। যারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন তারা কেউ কাউকে ফাসেক বা কাফের বলে ফতোয়াও দিতেন না। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা)-এর কাছে একজন লোক প্রশ্ন করেছিল, কিছু লোক এমন বেরিয়েছে যে তারা কথার উল্টো-পাল্টা ব্যাখ্যা করে আর আমাদেরকে কাফের বলে! ওরাই কি আসলে কাফের নয়? আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক আল্লাহ্‌কে এক এবং একক মানবে ততোক্ষণ পর্যন্ত সে কাফের হতে পারে না।[১]

সাহাবায়ে কেরামের পরে ঐসব বিতর্ক শক্তিশালী হতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে তা নিয়ে আলাদা আলাদা দল বা 'ফেরকা' গড়ে উঠতে লাগলো। বিশ্বাস এবং নীতি শাস্ত্রীয় (ফিকহী) বিষয়গুলোর অধিকাংশই এমন যার মধ্যে অকাট্য যুক্তির খুব অভাব। কিছু কিছু এমন, যা পরস্পর বিরোধী। এই স্ববিরোধিতার উর্ধ্বে তুলে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে ইজতিহাদের প্রেক্ষাপটকে অনেক বিস্তৃত করে দিয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অসংখ্য অগণিত মতামত। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে এমন অসংখ্য রায় রয়েছে যা মূল সত্যের ধারে-কাছে নয়; বরং বহু দূরে। তার মানে এই নয় যে, ঐসব রায় প্রদানকারী লোকেরা সব কাফের হয়ে গেছে।

এর চাইতে দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় আর কি থাকতে পারে! প্রবল একনিষ্ঠ আনুগত্য ও ধর্মীয় চেতনা এবং পবিত্রতার নেশায় পাগলপারা প্রতিভা-যোগ্যতাগুলোকে মতপার্থক্যের আঘাত অনুতপ্ত করতে পারেনি বরং আরও উন্মত্ত করে বিরোধিতায় লিপ্ত করে দিয়েছে। কথায় কথায় কাফের ফতোয়া ছুঁড়ে মারছে একে অপরের প্রতি। যারা যতোটা বেশি ধর্মীয় অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ, কুফরকে প্রয়োগের মধ্যে তারা ততোটাই কম সতর্ক ছিল। ধীরে ধীরে অবস্থা এসে এমন পর্যায়ে পৌঁছালো, যেখানে একদল আর একদলের ভুল ও ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য বানানো বর্ণনা পরম্পরার সাহায্য নিতে শুরু করলো। ফলে শুরু হলো এই ধরনের হাদীসের উৎপত্তি— "আমার উম্মতের মধ্যে ৭২টি ফেরকা তৈরী হবে, যার মধ্যে মাত্র একটি হবে জান্নাতী, বাদবাকী সব জাহান্নামী।" এই কাল্পনিক সংখ্যাটিকে পূর্ণ করা প্রয়োজন ছিল তাই টেনে-হেঁচড়ে ৭৩ ফেরকা বানানো হলো এবং প্রতিটির আলাদা আলাদা নামকরণও করা হলো। এতেও যখন সন্তুষ্টি পাওয়া গেলো না তখন প্রতিটি ফেরকার জন্য আলাদা আলাদা (রেওয়ায়াত) বর্ণনার পরম্পরার ভিত্তি তৈরী করা হলো। যেমন —

أَلْقَدْرِ يَةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الامة وغيره وعيره –

কাদরিয়া সম্প্রদায় এই উম্মাহ্‌র অগ্নিপূজক এবং অন্যান্যরা এভাবে।

---

১. আছার ইমাম মুহাম্মদ, ৬৫ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

এইসব বিতর্ক এবং তা নিয়ে দলাদলি, ঐক্যবদ্ধ ইসলামী সমাজকে ঘুণে ধরা কাষ্ঠখণ্ডের মতো ভেতর থেকে খোকলা করে দিচ্ছিলো। যার প্রতিক্রিয়ায় সমাজের বাইরের অবয়বে ফুটে উঠছিল প্রচণ্ড অস্থিরতা। দ্বীন, চরিত্র, রাষ্ট্র শাসন, সংস্কৃতি, সমাজ সব কিছুই এক চরম বিকৃতির দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো। চরম বিশৃংখল বিক্ষুব্ধ সমাজ সাগরে প্রশান্ত এক নাবিকের আহ্বান ছিল সবার থেকে আলাদা। তিনি ডেকে ডেকে বলছেন, لانكفر احداً من أهل القبلة اهل القبلة —কেবলা অনুসারী কোন লোককেই আমি কাফের মনে করি না। ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর এই উদাত্ত আহ্বান বিতর্কের নেশায় উন্মত্ত সমাজকে হয়তো এতোটুকু থামাতে পারেনি। কিন্তু কালস্রোত যতোই মহাকালের দিকে এগিয়েছে তাঁর সার্বজনীন সেই আহ্বান ততোই উচ্চকিত হয়ে উঠছে। সেদিনের সেই ছোট্ট বাক্যটি আজ ধর্মশাস্ত্রের একটি মৌলিক নীতিতে পরিণত হয়েছে। তবে আফসোস, এই নীতির ওপর ইসলামী সমাজ কার্যকরভাবে আজো দাঁড়াতে পারেনি। কারণ বিতর্ক এবং তা নিয়ে দলাদলি আজো অত্যন্ত আনন্দের সাথে ইসলামী সমাজ লালন করে যাচ্ছে।

কেবলা অনুযায়ী সবাই মুমিন

ইমাম সাহেবের এই 'রায়' অনেক চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পরে তিক্ত থেকে তিক্ততর অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যারা দ্বীনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও গণ্য ঐ সমসাময়িককালে জন্ম নিয়েছিলেন। যাঁদের অনেকের সাথেই ইমাম সাহেবের সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। খারেজীদের প্রধান কেন্দ্র বসরা ইমাম সাহেবের নিবাস— শহর থেকে কাছেই ছিল। ওয়াসেল বিন আতা ও আমরুদ বিন উবায়েদ যিনি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, বসরার বাসিন্দা এবং ইমামের সমসাময়িক ছিলেন। জাহাম বিন সাফওয়ান, যার নামানুসারে 'জাহ্মীয়াহ্' ফেরকা বিখ্যাত, ঐ একই সময়ের। ইমাম সাহেব তাঁদের প্রত্যেকের সাথেই সাক্ষাত করেছেন এবং মত বিনিময় করেছেন। ঐসব ফেরকাগুলো সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত হয়েছিল তার কিছু ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং মিথ্যা অপবাদ। কারো কারো মতামতকে বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। কোনো কোনোটি মূলতই অর্থহীন, নেহায়েত ফালতু কথাবার্তা নিয়ে চর্চা করতো। কিন্তু কুফরীর সীমানায় কেহই পা রাখেনি। এজন্য ইমাম সাহেব সাধারণভাবে ঘোষণাটি দিয়েছিলেন— "আহলে কেবলা সবাই মুমিন"। তিনি দেখছিলেন, যেসব মাসআলা নিয়ে 'কেয়ামত' রচনা হচ্ছিল, যেসবকে কুফর ও ইসলামের মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছিল! সেগুলো শুধু কথার বাগাড়ম্বর এবং কাল্পনিক প্রবচন ছাড়া আর কিছু নয়। সব চাইতে বড় মাসআলা ছিল قدم قران কুরআনের প্রাচীনতা। যে প্রসঙ্গটিকে তার্কিকরা কালেমায়ে তাওহীদের সমপর্যায়ের বলে বিবেচনা করতো। বড় বড় আলেমদের মূল্যায়ন— অত্যন্ত নাজুক দু'টি পরিস্থিতিতে দুইজন ব্যক্তিত্ব ইসলামকে সংকটমুক্ত রেখেছেন। একজন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা) যিনি রাসূলে কারীম (স)-এর ওফাতের পরে ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ) উৎখাত করেছেন। আর একজন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, যিনি মামুনর রশীদের শাসনামলে 'হুদূসে কুরআনের' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একদিক থেকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল হযরত আবু বকর (রা)-এর চাইতেও বড় সংকট মুকাবিলাকারী। কেননা হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে অনেক সহযোগী ছিল। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ছিলেন সম্পূর্ণ একা। তাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না।

www.pathagar.com

হাদীস এবং উসূলে হাদীস বিষয়ে ইমামের কর্মপদ্ধতি

মহাদ্দিস হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেননি। তার মানে আমরা যেন এটা না ভেবে বসি যে, ইল্‌মে হাদীসের ওপর ইমাম আবু হানিফার অধিকার এবং দক্ষতা এতোটুকু কম ছিল। পূর্বসূরী মহাত্মনগণের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব চলে গিয়েছেন যাঁরা একই সঙ্গে রাওয়ায়াত (বর্ণনা পরম্পরা) এবং ইজতিহাদে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু খ্যাতি অর্জিত হয়েছে ঠিক সেই হিসেবেই যে বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা বেশি প্রকাশ পেতো। হাদীস বিষয়ের ওপর ইমাম আবু হানিফার বিশেষ কোন রচনা নেই। তবে অবাক ব্যাপার হলো, ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ীও 'মুহাদ্দিস' লকবের অধিকারী হতে পারেননি। হাদীস বিষয়ে তাঁদের রচনাবলী সেই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি যা 'ছাহ্হা ছিত্তা' পেয়েছে। তাঁদের চাইতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইল্‌মে হাদীস বিষয়ে অধিক সুনামের অধিকারী হয়েছেন। হাদীস সংকলনের জগতে তাঁর 'মুসনাদ' একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। সহীহ্ হাদীসের এতোবড় সংগ্রহ আর কোন সংকলনে নেই। কিন্তু হাদীস এবং রাওয়ায়াত বিষয়ে তাঁর আলোচনা যতোটা বেশি, ইসতেম্বাত ও ইজতিহাদের জগতে ততোটাই কম। আল্লামা 'তিবারী' (যিনি নিজেও মুহাদ্দিস এবং মুজতাহিদ ছিলেন) মুজতাহিদীনদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়নি।[১] কাজী ইবনে আবদুল বার্ তার "কিতাবুল ইনতেহা ফীছ ছুলাহাতিল ফুকাহা"তে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ) এই ত্রয়ীর ওপরে 'মুজতাহিদ' হিসেবে আস্থাশীল এবং নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন। ইমাম রাযী 'মানাকিবু শাফেয়ী'তে লিখেছেন— "ইমাম শাফেয়ীর পরে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন মুজতাহিত জন্মগ্রহণ করেনি"। যদিও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি ইজতিহাদের ব্যাপারে যোগ্যতমদের মতো পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তারপরেও তাঁর ইজতিহাদের ওপর সাধারণ মতৈক্য গড়ে উঠেনি।

মুজতাহিদ এবং মুহাদ্দিসের মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন

বস্তুত মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসগণ উপদেশ ও ঘটনাবলী, গুণ বৈশিষ্ট ও আচরণ ইত্যাদি সব ধরনের বর্ণনা পরম্পরার ওপরেই অনুসন্ধান চালান। অপরদিকে মুজতাহিদগণ শুধুমাত্র সেইসব হাদীস সম্পর্কে আগ্রহী হন যা থেকে শরীয়তের কোন বিধান আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে কারণে মুহাদ্দিসীনদের তুলনায় মুজতাহিদগণের বর্ণনা সংখ্যা খুব কমই হয়ে থাকে। ইমাম মালিকের সকল বর্ণনার সম্মিলিত সংকলন 'মুয়াত্তা'। যার মধ্যে হাদীসের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে হাজার খানেক। তার মধ্যে আবার সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত। 'হাদীস সম্পর্কে আমাদের তুলনায় তোমরা বেশি জানো'— ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে ইমাম শাফেয়ী সবসময়ই এভাবে স্বীকৃতি দিতেন। কাজী ইয়াহ্ইয়া বিন আকছাম 'তিরমিযীর' বরেণ্য পণ্ডিত, আফসোস করে বলতেন, "শাফেয়ী যদি ইল্‌মে হাদীসের ওপর পূর্ণ মনোযোগ দিতেন তাহলে আমাদের আর কোন অভাব থাকতো না।"[২]

১. তবকাতুল মুকাস্‌সিরীন, হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল্লামাহ তিব্‌রী
২. তাওয়ালা আত তাসীস, হাফেয ইবনে হাজার, পৃষ্ঠা ৫৬

www.pathagar.com

চার খলিফার অপ্রতুল বর্ণনা

আমরা এটা স্বীকার করি যে, অর্থ ও তাৎপর্য, ঘটনাবলী, আচরণ ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি চার খলিফার দৃষ্টি ততোটা প্রশস্ত ছিল না। ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ীর অবস্থাও তথৈবচ কিন্তু আহকাম ও আকায়েদ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের বিস্তৃতিকে ছোট করে দেখা— স্থূল দৃষ্টি এবং সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচায়ক হবে। তাঁর রচনাবলী ও বর্ণনাসমূহের নিবন্ধিত না হওয়া সংকীর্ণ দৃষ্টির দলিল হতে পারে না।

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা)-এর চাইতে বেশি রাসূলে করীম (স)-এর কাছাকাছি পাশাপাশি থাকার সৌভাগ্য আর কারো হয়নি। রাসূল (স)-এর কথা এবং কাজ সম্পর্কে সবচাইতে বেশি তাঁরই জানার কথা। কিন্তু হাদীসের সব গ্রন্থসমূহ সন্ধান করলে তাঁর বর্ণিত শুদ্ধ হাদীসের সংখ্যা ৭০-এর বেশি হবে না। কে বলবে যে রাসূল (স)-এর এই কয়টি বাণীই তাঁর জানা ছিল বা মনে ছিল ? তাঁর পরেই হযরত উমর ফারুক (রা)-এর অবস্থান এবং তাঁর কাছ থেকেও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ।[১] যার মধ্যে আবার অনেকগুলো হাদীসের প্রামাণিক দলিল নেই। এভাবে হযরত ওসমান এবং হযরত আলীর (রা) বর্ণনা সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। অথচ হযরত আবু হোরায়রাহ্ (রা) থেকে ৫,৩৪৬, হযরত আনাস (রা) থেকে ২,২৮৬, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে ২,২৬০, জাবের (রা) থেকে ২,৫৪০, রাসূল (স)-এর সময় নবীন যুবক আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে ২৬৩ খানি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা সংখ্যার আধিক্যই যদি মাপকাঠি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, চার খলিফার স্মরণশক্তি খুব নিম্নমানের ছিল অথবা রাসূল (স)-এর কথা এবং কাজের প্রতি তাঁদের আগহ ও লক্ষ্য অত্যন্ত কম ছিল। وحاشاهم عن ذالك —তারা এগুলো থেকে মুক্ত ছিলেন।

বুখারী ও মুসলিম, ইমাম শাফেয়ীর সূত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি ঃ শুধু ছয়খানি হাদীস গ্রন্থে দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ইমাম আবু হানিফার সূত্রে কোন বর্ণনা নেই। এটা যদি তার প্রতি কোনো অভিযোগ হয় তাহলে অনেক ব্যক্তিত্বই এই দায়ে অভিযুক্ত। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইসহাক বিন রাহেহায়া, আবু সাওর, হামিদী, আবু যার'আ আল-রাযী, আবু হাতেম, এঁদের মতো বড় বড় মুহাদ্দিসীন ইমাম শাফেয়ীকে হাদীস এবং রাওয়ায়াতের বিশাল ভাণ্ডার বলে জানতেন এবং স্বীকার করতেন। তাঁর দেয়া সনদ সূত্রে শুদ্ধতম দুইখানী হাদীস গ্রন্থে একটি বর্ণনাও স্থান পায়নি। বুখারী ও মুসলিম তাঁদের অন্য কোন গ্রন্থেও ইমাম শাফেয়ীর সনদ সূত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। ইমাম রাযী বুখারী ও মুসলিমের এই চরম উপেক্ষার অনেক কারণ দর্শানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু গ্রহণযোগ্য কোন কারণ দেখাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বুখারী-মুসলিম শরীফের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ প্রমুখ হাদীস সংকলনেও এমন হাদীস খুবই কম যার বর্ণনা পরম্পরায় ইমাম শাফেয়ীর নাম রয়েছে।

ইমাম বুখারীর বর্ণনা গ্রহণের মাপকাঠি

কোন কোন মুহাদ্দিসীন নির্ভরশীল অনুসন্ধানের যে মানদণ্ড স্থির করেছিলেন তার মধ্যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন অধিকাংশ ব্যক্তিত্বেরই প্রবেশানুমতি নেই। আল্লামা কিসতালানী সহীহ্

১. হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারিতে ইমাম বুখারীর এই কথাটি উদ্ধৃত করেছেন।

www.pathagar.com

বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী বলতেন[১] الايمان قول وعمل "কথা এবং কাজেই ঈমানের পরিচয়"। একথা যে বলতো না বা স্বীকার করতো না, এমন কোন লোকের কাছ থেকে আমি হাদীস বর্ণনা গ্রহণ করিনি। একথা যদি সত্যি হয় তাহলে ইমাম আবু হানিফার কোন স্থান তাঁর কাছে না হওয়াই স্বাভাবিক।

ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে কাবীর'-এ ইমাম শাফেয়ীর নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতোটা তুচ্ছভাবে করেছেন যা দেখে ইমাম রাযী এটাকেই গণীমত মনে করেছেন যে তিনি আর বেশি কিছু লিখেননি।

واما لامام محمد بن اسميعل البخارى فقد ذكرالشافعى فى تاريخه الكبير فقال فى باب محمد بن ادريس بن عبد الله محمد الشافعى القرشى مات سنة اربع ومأ تين ثم انه ماذكره فى باب الضعفاء مع علمه بانه كان فدروى شيئا كثيرا من الحديث ولو كان من الضعفاء فى هذا الباب لذكره -

অর্থাৎ ইমাম বুখারী তারীখে কাবীরে শাফেয়ীর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং একটা অধ্যায়ে লিখেছেন যে, মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ আশ্ শাফেয়ী আলকারশী ২০৪ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। কিন্তু কোন কার্যকর অধ্যায়ে উল্লেখ করেননি। অথচ ইমাম বুখারী জানতেন যে, শাফেয়ী অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি যদি দুর্বল হতেন তাহলে ইমাম বুখারী তাঁকে দুর্বল হিসাবেই উল্লেখ করতেন।

ইমাম আওযায়ী ছিলেন স্বতন্ত্র ইজতিহাদের অধিকারী মুজতাহিদ এবং মুহাদ্দিস। আরব ও ইরাকে ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ীর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল! ঠিক সেই রকমই বরেণ্য ছিলেন তিনি শাম দেশে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে তাঁর সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে বললে তিনি বলেন ঃ

حديث ضعيف وراى ضعيف

অর্থাৎ তাঁর হাদীস দুর্বল এবং দুর্বল রাবী।

সমকালীন দৃষ্টি বা প্রেক্ষিত অধ্যয়ন, উদ্ভাবনী শক্তি, বিষয় অনুসন্ধান এবং নির্ণয় ক্ষমতা, সর্বোপরি শরীয়তের বিধি-বিধানের ওপর তাদের বিচরণ, মুজতাহিদগণের জন্য গোটা ব্যাপারটা অহংকার করার মতো। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের কাছে সমুদয় ব্যাপারগুলো দোষণীয় এবং বিভ্রান্তি হিসেবে গণ্য। আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী কাজী আবু ইউসুফের স্মরণে লিখেছেন— মুহাদ্দিসগণের একটি দল তার বর্ণনাকে এই জন্য বর্জন করেছেন যে, সবকিছুর ওপরে তিনি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতেন এবং আহকামের বিভাগকে তিনি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করতেন। তদুপরি রাজা-বাদশাহদের সাথে তার ওঠাবসা ছিল এবং

১. মাসাকিবুশ শাফেয়ী, ইমাম রাযী। অন্যান্য মুহাদ্দিসীনদের মতে খলীফা চতুষ্ঠয়ের বর্ণিত আরো কিছু হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু তাতেও এর পরিমান ও উল্লেখ করার মতো কিছু হয়ে দাঁড়ায় না।

www.pathagar.com

বিচারপতি হিসেবে সরকারী চাকুরীও করেছেন। খণ্ড খণ্ড করে বিধি-বিধানের বিশ্লেষণ এবং সত্য উদ্ভাবন যদি অপরাধ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে ইমাম আবু হানিফা কাজী আবু ইউসুফের চাইতে বড় অপরাধী। সুতরাং একটি ব্যাপার বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে যে, ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর অনুগামীদের 'আহলুর রায়' অর্থাৎ গবেষণালব্ধ মতামতের অধিকারী কেন বলা হয়? ব্যাপারটা বুঝতে অধিকাংশ লোকেরাই ভুল করেছেন। আসলে ব্যাপারটা ছিল, তিনি স্থূল সুনাম-সুখ্যাতির বিপরীতে অনুসন্ধানকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

আহলুর রায়-এর বিশ্লেষণ

বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার করার জন্য একটু খুঁজে দেখা দরকার। উপাধিটা কবে, কোথায়, কখন উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং কি কারণে কাদেরকে প্রথম এ উপাধি দেয়া হয়েছিল। আমরা যতোটুকু জানি, এই উপাধিতে প্রথম ভূষিত হয়েছিলেন ইমাম মালিকের উস্তাদ শায়খুল হাদীস রাবীয়া-আররায়। রায় শব্দটি তাঁর নামের অংশ হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসে মনীষীগণের নামের তালিকায় তাঁর নামটি এভাবেই লেখা হয়। স্বনামধন্য মুহাদ্দিস এবং ফকীহ ছিলেন তিনি। রাসূল (স)-এর আসহাবগণের অনেকের সাথেই তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আল্লামা যুহবী তাঁর 'মীজানুল ই'তেদাল'-এ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন— "শুদ্ধ ছয়খানি হাদীস সংকলনের প্রণেতাগণ সবাই তাঁর কাছ থেকে দলিল উপস্থাপন করেছেন। আবদুল আযীয মাজেসুন বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম আমি রবী'র চাইতে বেশি হাদীসের হাফেয আর দেখিনি।"

সেই সময়কাল এবং তার পরবর্তী সময়ে আরও কিছু পণ্ডিত ও গবেষক এই উপাধির অধিকারী হয়েছিলেন। ইবনে কুতাইবাহ তার "কিতাবুল মা'আরেফ"-এ এই উপাধির মনীষীদের একটি তালিকা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ইবনে আবী লায়লা, আবু হানিফা, রাবীয়া আর রায়, যাফর, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, মালিক বিন আনাস, আবু ইউসুফ কাজী, মুহাম্মদ বিন হাসান (র) প্রমুখ। ইবনে কুত্তাইবাহ্ ২৬৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ প্রায় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত উল্লেখিত মনীষীগণ 'আহলুর রায়' হিসেবেই খ্যাত ছিলেন। যদিও একমাত্র 'যাফর' ছাড়া বাকী সবাই মূলত ছিলেন মুহাদ্দিস। কিন্তু ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী (রহ) প্রমুখের খ্যাতি কি কারো বর্ণার অপেক্ষা রাখে?

মুহাদ্দিসীনগণ ছিলেন দুই ধরনের ঃ যেসব মুহাদ্দিসীন ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ নিয়ে মশগুল থাকতেন তাদের মধ্যে দুইটি ধরন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এক ধরনের সাধক ছিলেন, তাঁরা শুধুমাত্র হাদীস এবং বর্ণনা পরম্পরা সংগ্রহ করতেন এবং বর্ণনাপ্রাপ্ত হাদীস নিয়েই তাদের আলোচনার পরিমণ্ডল। এমনকি বাতিল বা রহিত করা হয়েছে কিনা (নাসেখ-মনসুখ) সে নিয়েও তাদের কোন মাথাব্যাথা ছিলনা। আর একদল হাদীসসমূহ থেকে বিধানের উদ্ভাবন ও নীতি-নির্ধারণ তথা দিক-নির্দেশনা আবিষ্কারের গবেষনায় গভীর ধ্যানমগ্ন এবং সেখানে সুস্পষ্ট কোনো সূত্র পাওয়া না গেলে যুক্তিভিত্তিক কোনো নির্দেশনা স্থিরকরণে ব্যস্ত। এই দু'টি অবস্থানের দুই দলের মধ্যে একটা আন্তঃযোগাযোগ থাকলেও গুণ-বৈশিষ্ট্যের মানগত কারণে একে অপর থেকে স্বতন্ত্র ছিল। প্রথম দল আহলুর রাওয়ায়াত ও আহলে হাদীস এবং দ্বিতীয় দল মুজতাহিদ ও আহলুর রায় হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। ইমাম মালিক, সুফিয়ান ছাওরী, আওযায়ী (রহ) প্রমুখকে আহলুর রায় বলা হতো এই কারণে যে, তাঁরা মুহাদ্দিস হওয়ার সাথে সাথে স্বতন্ত্র ইজতিহাদের অধিকারী এবং দ্বীনের সংস্কারক ও পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

যেহেতু তাদের মধ্যেও হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান ও ইজতিহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী পার্থক্য দেখা যেতো সেহেতু এখানেও চিহ্নিত করার জন্য কাউকে আহলে হাদীস এবং কাউকে আহলুর রায় বলা হতো। যেমন ইমাম মালিকের তুলনায় ইমাম আবু হানিফা মুজতাহিদ ও আহলুর রায় হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে একবার নযর বিন ইয়াহ্ইয়া প্রশ্ন করেছিলেন যে, আবু হানিফার ব্যাপারে আপনাদের আপত্তিটা কোথায় ? তিনি জবাব দিয়েছিলেন 'রায়'। নযর বললেন, কেন ইমাম মালিক 'রায়' অনুযায়ী কাজ করেন না ? ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু আবু হানিফা 'রায়'কে বেশি প্রাধান্য দেন। নযর বললেন, তাহলে আনুপাতিক হারে দু'জনের উপরেই অভিযোগ আনা দরকার। শুধু একজনের উপরেই কেন ? আহমাদ বিন হাম্বাল চুপ হয়ে গেলেন, কোনো জবাব দিলেন না।[১]

ইমাম সাহেবের আহলুর রায় হিসেবে বিখ্যাত হওয়ার কারণ ঃ ইমাম আবু হানিফার পূর্বে 'ফিকাহ্' কোনো সুবিন্যস্ত স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইমাম সাহেব যখন তা লিপিবদ্ধ করতে গেলেন তখন এমন হাজারো মাসআলার উদ্ভব হলো যে সম্পর্কে কোনো সহীহ্ হাদীস তো দূরের কথা কোনো সাহাবার কোনো উক্তিও খুঁজে পাওয়া যায়না। তখন তিনি এই প্রেক্ষিত অনুযায়ী যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তের পথ ধরে এগিয়ে গেলেন। এ পদ্ধতিতে কাজ করার ইতিহাসও রয়েছে। খোদ সাহাবাগণ ক্বিয়াস করতেন এবং ফতোয়া দিতেন। কিন্তু সেই সময়কালে সমাজ ততোটা বিস্তৃত ছিল না যে, নিত্য নতুন সমস্যা এসে হাজির হবে আর নিত্য নতুন সমাধান বের করে দিতে হবে।

ইমাম সাহেব ফিকাহ্কে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তাই ক্বিয়াসের ব্যাপক ব্যবহারকে সামনে রেখে তার জন্য আবার আলাদা করে নিয়ম-নীতি, বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করতে হয়েছে।

অর্থাৎ উসূলে ফিকাহ্। যে বিষয়টি তাকে ক্বিয়াস এবং রায়ের সম্পৃক্ততায় বেশি সম্মান যুগিয়েছে। সুতরাং ইতিহাসে যেখানেই তার নাম লেখা হয় সেখানে "ইমাম আহলুর রায়" লেখা হয়।

আরো একটি কারণ ঃ সাধারণ মুহাদ্দিসীনগণ হাদীস এবং বর্ণনা পরম্পরার সাথে নিজের বুদ্ধি-জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করতেন না। যেটা ইমাম আবু হানিফা (রহ) প্রথম শুরু করেন। শুধু তাই নয়, তার জন্য তিনি একটি মৌলিক নীতিমালাও তৈরী করেন। যৌক্তিকতা এবং বিবেক-বুদ্ধির রায় শুদ্ধ বলে বিবেচনা করেনি বলে অনেক হাদীসকে তিনি হাদীস বলে গ্রহণ করেননি। এ কারণে তাঁর 'আহলুর রায়' হিসাবে খ্যাতি আরও উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট হয়। কেননা বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনা এবং 'রায়' বা দর্শন একার্থবোধক, সাধারণ মানুষ এর পার্থক্য বুঝতে পারে না। এ আলোচনাটুকু অপ্রাসঙ্গিক নয়। যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ইমাম আবু হানিফার ইল্মে হাদীসের ওপর কতোটা দখল বা অধিকার ছিল। সঠিকভাবে এর মান নির্ণয়ের জন্য সর্বজনবিদিত দলিল-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে আমরা তাঁর 'ইল্মী জিন্দেগীর' ঘটনাগুলোকে সামনে আনতে পারি। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বগণের মান নির্ণয়ে যেসব কিতাব বা গ্রন্থকে আমরা সর্বমহলে স্বীকৃত মনে করি সেইসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে ইমাম আবু হানিফার শিক্ষা জীবন বিশেষ করে হাদীস শিক্ষার

১. উকুদুল জুমান

www.pathagar.com

জন্য তাঁর অসাধারণ ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা লিখে এসেছি। তবু স্মরণের জন্য খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে, মানুষের জীবনে বুদ্ধি-জ্ঞান, বিচার-বিবেচনা ইত্যাদির ব্যবহার এবং প্রয়োগের বয়স কুড়ি বছর আর ঠিক সেই সময় থেকেই হাদীস শিক্ষার দুর্গম পথে তাঁর যাত্রা। তারপর একটা দীর্ঘ সময়কাল ধরে এই পথ-পরিক্রমা। কুফার অধিকাংশ হাদীস শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ। মক্কা মুয়াজ্জমায় মুহাদ্দিসগণের কাছে শিক্ষা গ্রহণ, মদীনা মুনাওয়ারার উস্তাদগণের কাছে স্বীকৃতি লাভ। যার হাদীস শিক্ষার উস্তাদগণ— আতা বিন আবী রিয়াহ, নাফে ইবনে উমর দীতার, মুহারেব বিন ওছার, আ'মাশ কুফী, ইমাম বাকের, আলকামা বিন মুরছাদ, মাকহুল শামী, ইমাম আওযায়ী, মুহাম্মদ বিন মুসলিম আয যুহরী, আবু ইসহাক ইয়ামিমী, সুলাইমান বিন ইয়াসার, আবদুর রহমান বিন হরমুয আল আরাজ, মনসুর আল মু'তামার, হিশাম বিন উরওয়াহ (রহ) প্রমুখ ছিলেন। যাঁরা বর্ণনা পরম্পরায় (রাওয়ায়াত) বিশ্বস্ত ধারা হিসেবে গণ্য। এমনকি বুখারী-মুসলিম যাঁদের বর্ণনায় ভরপুর তাঁদের মতো মনীষীবৃন্দের একনিষ্ট ছাত্র এবং আবু হানিফার নিজস্ব যুগশ্রেষ্ঠ প্রতিভা— এই দুয়ে মিলে 'ইমাম আবু হানিফা' ইল্‌মে'। হাদীসের কোন পর্যায়ের জ্ঞানী তিনি ছিলেন তা কি আমরা অনুমানও করতে পারবো না?

এবার আমরা তাঁর অধঃস্তন অর্থাৎ ছাত্রদের দিকে দৃষ্টিপাত করবো[১] ঃ ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আলকাতান হাদীসের বিশ্লেষণ ও ত্রুটি নির্ণয় বিষয়ক ইমাম ছিলেন। আবদুর রাজ্জাক বিন হামাস যার 'জামে কবীর' থেকে ইমাম বুখারী উপকৃত। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের উস্তাদ ইয়াযিদ বিন হারুন। ওকী বিন আল জারাহ্ যার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলতেন যে, বর্ণনার দলিল স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ আমি কাউকে দেখিনি। আবদুল্লাহ বিন আল মুবারক যাঁকে ইল্‌মে হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে স্বীকার করা হয়। ইয়াহ্‌ইয়া বিন জাকারিয়াহ বিন আবী জায়দাহ্, যাকে ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী বিন আল মাদিনী 'জ্ঞানের সীমানা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এইসব ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু হানিফার নামমাত্র ছাত্র ছিলেন না বরং দীর্ঘ দীর্ঘ দিন তারা তাঁর সঙ্গে থেকে শিক্ষা এবং দীক্ষা দুটোই হাসিল করেছেন। সুযোগ্য উস্তাদের একান্ত কাছে থেকে মন-মানস গড়ে নেবার যে সুযোগ তারা পেয়েছিলেন তাকে তাদের জীবনের এক পরম পাওয়া বলে স্বীকার করতেন। আবদুল্লাহ বিন আল মুবারক বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে আবু হানিফা এবং সুফিয়ান সাওরীকে দিয়ে সাহায্য না করতেন তাহলে আমি মা'মুলী একটা মানুষ থেকে যেতাম।[২] ওকী এবং ইয়াহ্‌ইয়া বিন আবী যায়দাহ্ ইমাম সাহেবের কাছে এতো দীর্ঘদিন ছিলেন যে, মানুষ তাদেরকে তাঁর ছেলে হিসেবে জানতো। এতো উঁচুমানের ব্যক্তিত্ব যাঁরা হাদীস ও দর্শন শাস্ত্রের মুখপাত্র এবং গোড়পত্তনকারী ছিলেন তাঁদের উস্তাদকে আমরা কিভাবে পরিমাপ করবো?

ইজতিহাদের শর্ত এবং সে হিসেবে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর যোগ্যতা

ওপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলো ছাড়াও ইমাম আবু হানিফার স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ হওয়ার ব্যাপারটি এমন স্পষ্টভাবে স্বীকৃত যে, সুদীর্ঘ বারশ' বছর ধরে ব্যতিক্রমী এক আধজন ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করেনি।

বাগবী রাফেয়ী (রহ) ও আল্লামা নুদী (রহ)-এর মতো ইল্‌মে হাদীসের পণ্ডিতগণ

১. এঁদের বিভিন্ন উক্তি বইয়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।
২. তারতীব আত্‌তাহযীব।

www.pathagar.com

ইজতিহাদের যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য একটা মাপকাঠি তৈরী করেছেন। বলেছেন ঃ কুরআন, হাদীস, পূর্বসূরীদের দ্বীন পালনের রকম, ধরন, ভাষা ও যুক্তি এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর যথেষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা থাকতে হবে। অর্থাৎ শরীয়তের মাসায়েল সম্পর্কে কুরআনে যেসব আয়াত রয়েছে, রাসূল (স)-এর হাদীস দিয়ে যা প্রমাণিত তার পরে পূর্বসূরীদের উক্তি ও বিধিসম্মত যুক্তি প্রদর্শন এবং ভাষাজ্ঞান ইত্যাদি সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় সম্পূর্ণ জানা থাকতে হবে। কারো মধ্যে যদি এর কোন একটিরও অভাব থাকে তাহলে সে মুজতাহিদ নয়। এটা যুক্তিসঙ্গত এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত মাপকাঠি।[১]

এই মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে আল্লামা ইবনে খালদুন তার উলুমে হাদীস অধ্যায়ে মুজতাহিদীন সম্পর্কে লিখেছেন যে, "কতিপয় অবিবেচক বিরোধীদের বক্তব্য হলো কোনো কোনো মুজতাহিদের হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানের ঘাটতি ছিল।" এ কারণে তাদের বর্ণনা সংখ্যা কম। কিন্তু এই ধারণা ভুল, বড় বড় ইমামগণের ব্যাপারে এ রকম সন্দেহ করা যায় না। কেননা শরীয়ত কুরআন ও হাদীস-এর উৎস থেকে নেয়া। কাজেই যার হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান একটু কম তার উচিত প্রাণপণ চেষ্টা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সে ঘাটতি পূরণ করে নেয়া। যেন দ্বীনকে তার সত্য সঠিক মূল উৎস থেকে বের করে আনতে পারে।

তিনি আরও লিখেছেন যে, যোগ্যতম মুজতাহিদীনদের মতো ইমাম আবু হানিফার ইল্‌মে হাদীসের ওপর গভীর জ্ঞানের পরিচয় এভাবেও পাওয়া যায় যে, তাঁর দেয়া মতামত প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিসীনদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী ছিল এবং অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতার সাথে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তিনি ইমাম আবু হানিফার বর্ণনা সংখ্যা কম হবার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা তার বিস্তারিত বর্ণনায় পরে যাবো ইনশাআল্লাহ্।

হাফেযে হাদীস হিসেবে গণ্য

অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন একথাটা স্বীকার করেছেন যে, আবু হানিফা ঠিক পরের প্রজন্মের সকল মুহাদ্দিসীনদের অগ্রগামী এবং ইমাম। ইমাম আল্লামা যুহরী হাদীসের হাফেযগণকে নিয়ে একটি আলাদা বই লিখেছেন, যার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে, এটা সেইসব মহাত্মনদের স্মরণিকা যাঁরা ইল্‌মে নববীর ধারক। এবং যাঁদের গবেষণামূলক প্রয়াসের ওপর আস্থা রেখে হাদীস শুদ্ধ ও জাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লামা যুহরী তার পুরোটা রচনায় এই সংজ্ঞাকে দৃশ্যমান করে রেখেছেন। এমন কোনো ব্যক্তির নামও তিনি লেখেননি, ইল্‌মে হাদীসের ওপর যার দক্ষতা সম্পর্কে এতোটুকু সন্দেহ করা যেতে পারে। কোন এক বিষয় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যায়দ বিন সাবেত প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, "আমি হাদীসের হাফেযগণের মধ্যে তার কথা উল্লেখ করিনি কারণ তার স্মরণে থাকা হাদীসের সংখ্যা অপ্রতুল।" ইমাম আবু হানিফার মুহাদ্দিস হওয়ার এর চাইতে বড় দলিল আর কি হতে পারে যে, আল্লামা যুহরী এই বইখানীতে তার জীবন বৃত্তান্ত লিখেছেন এবং তাঁকে হাদীসের হাফেযগণের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করেছেন।

১. এই রকম ঐতিহাসিক বর্ণনা বিশ্লেষণ থাকা সত্তেও সংকীর্ণ মনা কিছুলোক ইমামের হাদীসের জ্ঞান ছিলনা বলে দলিল হিসেবে ইবনে খাল্‌দুনের একটা প্রাসঙ্গীক কথাকে উপস্থিত করেছে।

www.pathagar.com

হাফেজ আবুল মুহাসিন দামেশকী শাফেয়ী তার "উকূদ আল জুমান"-এ একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছেন তাতে লিখেছেন ঃ

الباب الثالث والعشرون فى بيان كثرة حديثه وكونه من اعيان الحفاظ المحدثين،

(তিনি) তেইশতম অধ্যায়ে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং বিশিষ্ট হাফেজে হাদীসকারীদের অন্যতম হওয়ারব্যাপারে।

কাজী আবু ইউসুফ সাহেব যাকে ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন সাহেবুল হাদীস বলতেন এবং আল্লামা যুহরী তাকে হাদীসের হাফেযগণের মধ্যে শামিল করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমরা ইমাম আবু হানিফার সাথে মাসআলা নিয়ে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক করতাম। যখন তাঁর রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো তখন আমি তার মজলিস থেকে উঠে কুফার মুহাদ্দিসীনদের কাছে যেতাম এবং সেই মাসআলার ওপর হাদীস জানতে চাইতাম। যা কিছু সংগ্রহ হতো তা নিয়ে ইমাম সাহেবের কাছে ফিরে আসতাম। তিনি তার কিছু গ্রহণ করতেন আর কিছু হাদীস সম্পর্কে বলতেন, এগুলো শুদ্ধ নয়। আমি জিজ্ঞেস করতাম আপনি কেমন করে জানলেন ? বলতেন ঃ "কুফায় যে 'ইল্ম' আছে আমি তার আলেম"।[১]

'ইল্মে হাদীসে ইমাম আবু হানিফা কতোটা অগ্রগামী ছিলেন এসব কথা এবং ঘটনাবলী তা প্রমাণ করে দেয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে আবু হানিফাকে ইমাম আবু হানিফা বানায়নি। তিনি হাদীসের হাফেয ছিলেন— তো এরকম হাফেয আরও অনেকেই ছিলেন। তাঁর হাদীসের উস্তাদ ছিল কয়েকশ'— তো এমন বেশ কিছু মনীষীও ছিলেন যাঁদের উস্তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার। কুফা এবং মক্কা-মদীনার কেন্দ্রগুলোতে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করে থাকলে তাঁর সামসময়িক শিক্ষার্থী আরো অনেকেই ছিলেন। তবে হাদীস যাচাই বাছাই এবং অকাট্য দলিল ও যৌক্তিক প্রমাণের ওপর বিধি-বিধান বিন্যাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ইমাম আবু হানিফাকে তার সকল সমসাময়িকের চাইতে অগ্রগামী করে দিয়েছে।

ইমাম আবু হানিফার পরে হাদীস বিজ্ঞানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিশৃংখল অগোছালো হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে। তা থেকে শুদ্ধতমদের বাছাই করে আলাদা সংকলন করা হয়েছে। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হিসেবে 'উসূলে হাদীস' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে লক্ষ লক্ষ বই-পুস্তক রচিত হয়েছে। দিন বদলের সাথে সাথে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি এবং জটিল থেকে জটিলতর মাসআলা বা বিষয় নিত্য নতুন চেহারা নিয়ে সম্মুখে এসেছে তার সমাধানও হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু হাদীসসমূহের যাচাই-বাছাই, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিন্যাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে ইমাম আবু হানিফার অনুসন্ধান, বিচার-বিশ্লেষণ এবং গবেষণার যে সুউচ্চ মান, বিগত সহস্র অব্দের লক্ষ-কোটি প্রয়াস তাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে হাদীসের গোড়াপত্তন এবং সময়ের সাথে তার বিবর্তনের একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে পারলে গোটা ব্যাপারটা আরো পরিষ্কারভাবে আমাদের বোধগম্য

১. উকুদুস জুমান

www.pathagar.com

হবে এবং জানা যাবে বর্ণনাসমূহের পরম্পরা কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন সময়কালে তার কি কি পরিবর্তন হয়েছে। কেবলমাত্র তখনই উপলব্ধি করা যাবে যে, হাদীসসমূহের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গবেষণামূলক সিদ্ধান্তের কতোটা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর উদ্ভাবিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিগুলোর মর্যাদা কতোটা।

বর্ণনা পরম্পরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী বর্ণনা পরম্পরার রীতি রাসূলে করীম (স)-এর সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত সাদামাটা এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় ছিল। নবুয়তের শুরু থেকে তেরটি বছর এমন এক ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্য দিয়ে কেটেছে যে, তখন বিশ্বাসী মানুষদের জীবনটা বাঁচিয়ে আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করাটাই বড় প্রশ্ন, সনদ ও বর্ণনা চর্চার সুযোগ কোথায় ? বিধি-বিধান এবং সে অনুযায়ী কর্তব্যও তখন খুব কমই ছিল। শুধুমাত্র নামায ছাড়া ফরয বলতে আর কিছু তখন ছিল না। সে নামাযও ছিল সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ যোহর, আছর এবং এশার নামায দুই রাক'আত করে ফরয ছিল। জুম'আ ও দুই ঈদের নামায সবার জন্য প্রযোজ্য ছিল না। দ্বিতীয় হিজরী অর্থাৎ নবুয়তের তেরতম বছরে রোযা ফরয হলো। যাকাতের ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে, আল্লামা ইবনুল আছীর লিখেছেন, যাকাত নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে। এ বছরই হজ্বের নির্দেশ আসে। অর্থাৎ নবুয়তের শুরু থেকে প্রায় দেড় যুগ পর্যন্ত যেমন শুধুমাত্র নামায ছাড়া আর কোন বিধান বিধিবদ্ধ হয়নি। তেমনি অন্য কোন প্রয়োজনে রাসূলের কথা এবং তাঁর বর্ণনা পরম্পরারও সৃষ্টি হয়নি। রাসূল (স)-এর সঙ্গী-সাথীগণ হুকুম-আহকাম সম্পর্কে খুব একটা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না। কুরআনের আদেশ এসেছিল এভাবে ঃ

لَاتَسْئَلُوْعَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -

(হে মুমিনগণ!) তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করবেনা যা প্রকাশ করে দেয়া হলে তা তোমাদের খারাপ লাগবে। (সূরা মায়েদা ঃ ১০১)

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন ঃ আমি রাসূল (স)-এর আস্হাবদের চাইতে ভালো কোন জাতি দেখিনি। নবুয়তের পূর্ণ সময়কালের মধ্যে তারা মাত্র তেরটি প্রশ্ন তাদের নেতা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে করেছিলেন। যার সবই কুরআনেও বিধৃত।[১] অন্যান্য সাহাবাগণের কাছ থেকে এই ধরনের কথা বর্ণিত আছে।

যেসব আহকাম এবং ঘটনাবলী সামনে আসতো তা নিয়ে বর্ণনা রীতির খুব কমই প্রয়োজন পড়তো। কোন প্রশ্ন দাঁড়ালে সাহাবাগণ সরাসরি রাসূল (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। রাসূল (স)-এর নিজস্ব কোন কথা লিখে রাখার অনুমতি ছিল না। সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনা ঃ

لا تكتبوا عنى شئا غير القران ومن كتب عنى شيئا غير القران عنى فليمحه -

১. মুসনাদে দারেমী।

আমার কোনো কথাই লিখিও না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট হতে অন্য কিছু কেহ লিখে থাকিলে তা মুছে ফেল।

রাসূল (স)-এর পরে হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকাল শুরু এবং শুরুতেই তাঁর সমগ্র আরবের বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করতে হয়েছে।

বিদ্রোহ দমন শেষ হতে না হতেই রোম এবং ইরানের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের খিলাফতকালে তাঁর পক্ষে আর হাদীসের প্রতি কোনো লক্ষ্য দেয়ার সুযোগ হয়নি।

হযরত উমর (রা) সাত বৎসর খিলাফত করেছেন ঃ তাঁর খিলাফতকালে তিনি গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যকে স্থিতি এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে আসেন। তাঁর নাতিদীর্ঘ শাসনামলে অত্যন্ত সচেতনভাবেই তিনি হাদীস চর্চাকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

"তবাক্বাৎ আল হুফ্ফাযে" আল্লামা যুহরী লিখেছেন ঃ হযরত উমর (রা) ভয় পেতেন, কোন হাদীস বর্ণনাকারী রাসূল (স)-এর নামে যদি ভুল কিছু বলে ফেলে! তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন— তারা যেন খুব বেশি হাদীস চর্চা না করেন।[১] আনসারদের একটি দলকে কুফায় পাঠাবেন, যাবার সময় অন্যান্য নির্দেশনার পরে বললেন ঃ তোমরা কুফায় যাচ্ছ, সেখানে এমন একদল লোকের সাথে তোমাদের দেখা হবে যারা গভীর উপলব্ধি এবং অত্যন্ত আবেগ নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে। তোমাদের আগমন বার্তা শুনে তারা আনন্দিত হবে। রাসূল (স)-এর সঙ্গী-সাথীরা এসেছেন! তোমাদের দেখতে পাগলের মতো ছুটে আসবে। কিন্তু তারা এসে যখন রাসূলের (স) কিছু বাণী শুনতে চাইবে তখন নেহায়েত দু'একটি ছাড়া বেশি বলবে না।

সাহাবাগণের একটি প্রতিনিধিদল ইরাকের পথে রওয়ানা হয়েছেন, হযরত উমর (রা) নিজেই তাদের এগিয়ে দিতে এসেছেন। বললেন ঃ তোমরা জানো আমি নিজে কেন তোমাদের এগিয়ে দিতে এসেছি ? তারা বললেন ঃ تَكْرِمَةً عَلَيْنَا আমাদের সম্মান জানাতে আপনি মেহেরবাণী করে এসেছেন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু সাথে আরও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, তাহলো ওখানকার মানুষ বেশিরভাগ কুরআন অধ্যয়ন করে, তাদেরকে হাদীসসমূহের মধ্যে ফাঁসিয়ে ফেলো না। অর্থাৎ হাদীসের গোলক ধাঁধার জ্বালে আটকে ফেলো না এবং রাসূল (স)-এর বলা কথা কম বলবে।

তারা যখন 'ক্বেরতাহ্' পৌছলেন, রাসূলের সাহাবাগণ এসেছেন শুনে অসীম কৌতুহল এবং আগ্রহ নিয়ে লোকেরা দেখা করতে এলো। কুশল বিনিময়ের পর রাসূল (স)-এর কিছু বাণী শুনতে চাইলো। তাঁরা বিনীতভাবে জানিয়ে দিলেন আমীরুল মু'মিনীন তাদেরকে তা বলতে নিষেধ করেছেন।[২]

হযরত আবু হোরায়রাহ (রা)-কে আবু সালমা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনি কি হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে এই রকম হাদীস বর্ণনা করতেন ? বললেন ঃ আরে না! তাহলে তো উমর আমাকে দোররা মারতো![৩]

---

১. তবকাতুল হুফ্ফায, হযরত উমর (রা) জীবনী ও মুসনাদে দায়েমী।
২. তবকাতুল হুফফাযে ওমর ফারুক (রা)-এর জীবনী।
৩. তবকাতুল হুফফাযে উমর ফারূক (রা)-এর জীবনী

www.pathagar.com

হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা) এতদুভয়ের খিলাফতকাল বিশ-একুশ বছরের হবে। এই সময়ে হাদীসের চর্চা এবং প্রচার ও প্রসার অনেক বেশি হয়েছে। সাহাবাগণ দূর দূর দেশে পৌছে গিয়েছিলেন। নিত্যনতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলেন এবং নিত্যদিনই তার সমাধানের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিলো। নবউদ্ভুত এই পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে গিয়ে হাদীস এবং তার নির্ভরযোগ্য পরম্পরার চর্চা শুরু হয়ে গেলো এবং তা দিন দিন বিস্তার লাভ করতে লাগলো। হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষদিকে বিদ্রোহ শুরু হলো যার নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছিলেন খলিফা নিজেই এবং এটাই সেই দুর্ভাগ্যের সময় যখন অখণ্ড মুসলিম জাতি এবং ইসলামী সমাজ ভেঙ্গে খান খান হয়ে নিজের স্বচ্ছ মসৃণ অবয়বকে চিরতরে হারিয়ে ফেলার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

হাদীসের সংরক্ষণ

শুরু থেকেই হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত সংকটপূর্ণ ছিল এবং এই হাজারো সংকটের মধ্যেই হাদীস সংরক্ষণের গোড়াপত্তন হয়েছিল। সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপক চেষ্টা-প্রচেষ্টা যদিও সাহাবাগণের শাসন আমলের পরবর্তী সময়কালেই হয়েছিল। কিন্তু সেই সাহাবাগণের সময়ই অতি উৎসাহী ধার্মিকদের অসচেতনতা এবং দ্বীনের সচেতন সতর্ক শত্রুরা অসংখ্য অগণিত হাদীস উদ্ভাবন করে ফেলেছিল।

সহীহ্ মুসলিম শরীফের ভূমিকায় লেখা আছে— একবার বশীর আদুঈ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করে দিলো। আবদুল্লাহ্ (রা) সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছিলেন না। বশীর একটু রাগত স্বরে বললো ঃ ইবনে আব্বাস আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী বর্ণনা করছি আর তুমি সেদিকে লক্ষ্যই দিচ্ছ না? আবদুল্লাহ বললেন, একসময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ 'আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন' কথাটি কাউকে বলতে শুনলে ঝট করে আমাদের চোখ সেদিকে ফিরে তাকাতো এবং কান পেতে তা শুনতাম। কিন্তু যখন থেকে মানুষ ভালো এবং মন্দের পার্থক্য তুলে দিয়েছে তখন আমরাও শুধু সেইসব হাদীসই শুনি যা আমরা নিজেরাও জানি।"

যাই হোক, মৌখিক বর্ণনা রীতি অতিক্রম করে লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেল। মুসলিম বর্ণনা করছেন যে, একবার আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-এর একটি ফয়সালা শুনে শুনে লিখছিলেন। মাঝে মাঝে কিছু কিছু কথা ছেড়ে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন আল্লাহ্‌র কসম কিছুতেই এই ফয়সালা আলীর (রা)-এর হতে পারে না।

আর একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা) বক্তব্য হিসেবে লিখিত একটি বর্ণনা দেখছিলেন— সামান্য কিছু কথা রেখে বাদবাকী সব কেটে দিয়েছিলেন।

বর্ণনা পরম্পরা এবং হাদীস সংরক্ষণে অসতর্কতার কারণ

সুস্পষ্ট দলিল ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরার বিধিসম্মত রীতি-নীতি তখনও চালু হয়নি তাই যার যেভাবে খুশী সে সেভাবেই قَالَ رَسُوْلُ اللهِ বলে ফেলতো। কোন দলিল-প্রমাণের তোয়াক্কা করতো না। তিরমিযী তার কিতাবুল আল্লাল-এ ইমাম ইবনে শিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

www.pathagar.com

প্রথম যুগে মানুষ কোন সনদের কথা জিজ্ঞেস করতো না। কিন্তু যখন ফেতনা শুরু হয়ে গেলো তখন মানুষ গেলো সন্দিহান হয়ে। দলিল-প্রমাণের প্রশ্ন এসে গেলো যেন আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর মূল বাণীকে গ্রহণ করা যায় এবং নকল যা কিছু তা বর্জন করা যায়। কিন্তু যতোটা সতর্ক এবং সাবধানতার সাথে এই যাচাই-বাছাই করা দরকার ছিল তা করা সম্ভব হয়নি বলে ভুল-শুদ্ধের জগা-খিচুড়ী সময়ের ধারাবাহিকতার পথ ধরে এগিয়ে চললো।

উমাইয়াদের বংশীয় শাসন শুরু হলে হাদীস চর্চার জোয়ার এসে গেল। সাহাবাগণের সংখ্যা যতো কমে আসছিল ততোই তাদের ক্বদর এবং তাদের প্রতি কৌতুহল বেড়ে যাচ্ছিল। আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং নতুন নতুন দেশ ও জাতি মুসলিম সাম্রাজ্য এবং ইসলামী সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল। লাখ লাখ নওমুসলিমের ইসলামের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা এবং বিজয়ী জাতির মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবার জন্য হাদীস চর্চার চাইতে বড় অবলম্বন আর কিছুই পাওয়া গেল না। নবাগতদের অদম্য কৌতুহল এবং আগ্রহ-উদ্দীপনা এমন এক মহাপ্লাবন সৃষ্টি করে দিলো যে, ঘরে ঘরে হাদীস এবং তার বর্ণনা পরম্পরার চর্চা হতে থাকলো। লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। অনারবদের মধ্যে ইল্‌মে দ্বীনের যোগ্যতা এমন পর্যায়ে উঠে আসছিল যা স্বয়ং আরববাসীরাও দাবি করতে পারে না।

হাদীসের সংগ্রহ, সংকলন, প্রচার-প্রসার যে হারে যতোটা বেড়ে উঠছিল, ঠিক সেই হারে ততোটাই কমে যাচ্ছিল তার শুদ্ধতা এবং তার প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার মান। বর্ণনাকারীর কোনো নির্দিষ্ট চিহ্ন এবং সীমানা নির্ধারিত না থাকার ফলে ভিন্ন মানসিকতা, ভিন্ন স্বভাব, ভিন্ন বিশ্বাস এবং ভিন্ন জাতির লোকেরাও এর মধ্যে এসে মিলেমিশে গেলো। অপরদিকে নকলনবীশরা বসে নেই। তারা তাদের নব নব উদ্ভাবন চালিয়ে যাচ্ছিল। সবচাইতে বড় কথা এই চরম বিশৃংখল অবস্থায় পুরো একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেল, অথচ তার যাচাই-বাছাই, বিন্যাস এবং সে অনুযায়ী সংকলনের কোন পদ্ধতি গড়ে উঠলো না।

এই সব কারণে বর্ণনা পরম্পরা এতোটা এলোমেলো হয়ে গেছে যে, তা আর গোছাবার উপায় থাকলো না। তারপরেও যেসব মহাত্মন প্রায় অসম্ভব এই কাজে হাত দিয়েছিলেন তাদের একজনের একটা দৃষ্টান্ত দিলে গোটা ব্যাপারটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ইমাম বুখারী শুদ্ধ হাদীসের একখানী সংকলন করতে গিয়ে কয়েক লক্ষ হাদীসের মধ্যে মাত্র ৭৩৯৭ খানী হাদীস বিবেচনায় এনেছেন। তার মধ্যে আবার পুনরাবৃত্ত হাদীসসমূহ বাছাই করলে তার নির্ণীত শুদ্ধ হাদীসের সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৭৬১ (ছয় হাজার সাতশ' একষট্টি)।

জ্ঞানচর্চায় অভ্যস্ত লোকেরা লক্ষ লক্ষ হাদীস রচনা করেছিল। হামদান বিন যায়দ বলেছেন, একটি নাস্তিক, অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ই চৌদ্দ হাজার হাদীস রচনা করেছিল।[১] আবদুল করীম দা'আ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বিভিন্ন বিষয়ের চার হাজার হাদীস তার কাছেই আছে।[২] এছাড়া অনেক ভালো ভালো মানুষ পুণ্য অর্জনের আশায় হাদীস রচনা করেছেন।

হাফেয জয়নুদ্দীন ইরাকী লিখেছেন যে, ঐসব হাদীসগুলোই সবচাইতে বেশি ক্ষতি করেছে, কারণ ঐসব প্রবর্তনকারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং অক্লান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় হাদীসগুলো

১. ফাতহুল মুগীস, ১০৮ পৃষ্ঠা
২. ফাতহুল মুগীস, ১০৮ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

অধিকাংশই গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায় এবং রেওয়াজে পরিণত হয়। ব্যাপক ভুল ধারণা এবং চরম অসাবধানতার সুযোগে হাজার হাজার রচনা আল্লাহ্র রাসূলের নামে প্রচলিত হয়ে গেল।

অনেক মুহাদ্দিসীনের নিয়ম ছিল হাদীসের সাথে তার তাফসীরও বলে যেতেন। সাধারণত বক্তৃতার সময় ব্যাখ্যা বা তাফসীর শব্দটি উহ্য থাকতো। ফলে শ্রোতাবৃন্দ বুঝে উঠতে পারতো না কোনটা মূল কথা আর কোনটা তার ব্যাখ্যা। পরিস্থিতি খুব সহজেই অনুমেয়— মুহাদ্দিসীনদের ব্যাখ্যার অসংখ্য বাক্যও শ্রোতার স্মরণে মূল হাদীস হয়ে থেকে গেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, বড় বড় মুহাদ্দিসীনগণও এই ভুলটি করেছেন। ইমাম মালিকের উস্তাদ হাদীসের অনেক বড় ভাণ্ডার ইমাম যুহরী সম্পর্কে আল্লামা সাখাবী লিখেছেন ঃ

وكَذاكَانَ الزهرى تفسر الحديث كثيراً وَرُبمَا اسقط رأداة التفسر

সাধারণত এভাবেই ইমাম যুহরী অসংখ্যক হাদীসের তাফসীর করতেন। এবং কখনো কখনো তাফসীরের মূল শব্দ গুলো ছেড়ে দিতেন।

ওয়াক্বী'রও এই একই অবস্থা, তিনি সাধারণত হাদীসের মাঝে মাঝে 'অর্থাৎ' কথাটি বলে বক্তৃতা করে যেতেন এবং এই 'অর্থাৎ' শব্দটি মাঝে মাঝে বলতে ভুলেও যেতেন। ফলে মূল এবং ব্যাখ্যর পার্থক্য শ্রোতারা বুঝতে পারতো না। 'কুতুবে রিজাল' ও 'উসূলে হাদীসে' এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেয়া আছে।

ত্রুটি গোপন করা ও অস্পষ্টতা

ত্রুটি গোপন করার প্রবণতাটা ছিল ভয়ঙ্কর। জানতে বা অজানতে বড় বড় আলেমগণ এ কাজটি করতেন। আলেমদের অস্পষ্টতা জ্বাল হাদীসের সনদহীনতাকে সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া আরো অনেক উপেক্ষা, উদাসীনতা এবং অসতর্কতার ইতিহাস হাদীসের সংকলনসমূহে লেখা রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফার সময়কালে হাদীস বিষয়ক যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের সংগ্রহে বানানো হাদীস, ভুল হাদীস, দুর্বল হাদীস ইত্যাদির মিশ্রণে এক একটি জগা-খিচুড়ীর ভরা পাত্র ছিল এবং তখন ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মতো শুদ্ধ হাদীস চেনার সন্ধানী জহুরীও ছিল না। ইমাম আবু হানিফার প্রধান বিষয় ছিল 'ফিকাহ্' তা সত্ত্বেও হাদীস সমগ্রের ওপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রমাণিত হয় যখন বর্ণনা পরম্পরার সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই এবং তার নিয়ম-পদ্ধতি ও মানদণ্ড স্থাপনকারী প্রথম স্থপতি হিসেবে তাকে দেখতে পাই। যাচাই-বাছাইয়ে তাঁর উদ্ভাবিত নিয়ম অত্যন্ত কঠিন বলে বিবেচিত। মুহাদ্দিসীন তাঁকে مشددفى الرواية 'বর্ণনা বিচারে কঠিন' উপাধি দিয়েছিলেন। সকল মুহাদ্দিসীনদের তুলনায় তাঁর বর্ণনা সংখ্যা কম হওয়ার এটাও একটা কারণ। বরং বলা যায় অন্যান্য কারণের তুলনায় এই কারণটি সবচাইতে বেশি শক্তিশালী। আল্লামা ইবনে খালদুন লিখেছেন ঃ

وَالامام ابو حنيفة انما قلت رواية لشدة فى شروط الرواية والتحمل –

ইমাম আবু হানিফার বর্ণনা সংখ্যা কম এই কারণে যে, তিনি বর্ণনা এবং তার দায়িত্বের শর্তসমূহের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে হাদীস সম্পর্কে ইমাম সাহেবের প্রথম যে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তাহলো, "এমন হাদীস খুব কমই আছে যা শুদ্ধ"। অন্যভাবে বলা যায়, "যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে এমন হাদীসের সংখ্যা খুবই কম", এই যে আওয়াজ তিনি তুলেছিলেন তা অভিনব, নতুন বটে, কিন্তু তা মুছে যাবার বা মিলিয়ে যাবার মতো ছিল না।

অনেক বড় বড় মোহাদ্দিসীন কথাটিকে মেনে নিতে চাইলেন না এবং কঠিন বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন তাঁরা। কিন্তু ইমাম সাহেব তাঁর বক্তব্যে অটল-অবিচল রইলেন। সেখান থেকে সরে আসার প্রশ্নে সত্য, নিষ্ঠা ও নিজের নীতিবোধের কাছে তিনি অক্ষম-অপারগ বলে জানিয়ে দিলেন। কেননা তিনি তাঁর এই বক্তব্যের ওপরে অন্ধভাবে দাঁড়াননি! তার সময়ে যতো বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন তাঁদের সাথে থেকেছেন, দীর্ঘ দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন কার ভাণ্ডারে কতো হাদীস আছে তা জানার জন্যে। মক্কা-মদীনার বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেছেন। কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনায় যাওয়ায়াত বা বর্ণনা পরম্পরার যতো বড় বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাঁদের প্রায় সবার কাছেই তিনি শিখেছেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁদের কাছে থেকে দেখেছেন তাঁদের স্বভাব-চরিত্র, দোষ-গুণ, একান্ত ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি। সর্বোপরি তাঁদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা এবং ভাবনা-চিন্তার ধরন-ধারণ। অর্থাৎ এতো বড় একটি বিষয়ের ওপর যে ইজতিহাদী রায়টি তিনি দিয়েছেন তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক যতোগুলো শর্তের প্রয়োজন তা তার মধ্যে ছিল।

তাঁর এই মানসিকতার আরও একটি বড় কারণ, পারিবারিক উত্তরাধিকার। হাদীস ও ফিকাহ্র শিক্ষা গ্রহণে তাঁদের প্রথম পূর্বপুরুষ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) এবং হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদ রচনায় তাঁর খুঁজে পাওয়া তথ্য ও বর্ণনার উপাদানকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র রাসূল (স)-এর বাণী ধারণ ও সংরক্ষণে আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ অন্যান্য মুহাদ্দিস সাহাবাদের তুলনায় কম ছিলেন না, কিন্তু তিনি বর্ণনা করতেন কম। কারণ এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লামা যুহরী লিখেছেন ঃ

كان ممن يتحرى فى الاداء ويشدد فى الرواية وكان يقل من الرواية الحديث –

তিনি লিখিতভাবে তাঁর কাজ সম্পাদন করতেন এবং বর্ণনার ব্যাপারে ছিলেন কঠোর, তাই হাদীস বর্ণনা খুব কমই করতেন।

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের ছাত্র এবং ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ ইব্রাহীম নখয়ীর মানসিকতাও একই ছিল। যে কারণে তাকেও شير فى الحديث বলা হতো। অসংখ্যা মাদারসা এবং উস্তাদগণের কাছে আবু হানিফা শিক্ষা এবং দীক্ষা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন-মানস ও চেতনার মধ্যে মূল দিক-নির্দেশক ছিল বংশগত শিক্ষার ঐতিহ্য। তার সাথে যুক্ত হয়েছে অদম্য কৌতুহলী শিক্ষানুসন্ধান। ব্যতিক্রমী প্রতিভা-যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং সমকালীন পর্যবেক্ষণ। যা তাঁর মতামতকে অটল-অবিচল রাখার শক্তি যুগিয়েছে।

বর্ণনা-যোগ্যতার শর্তসমূহে ইমাম মালিকের সাথে সাযুজ্য ঃ ইমাম আবু হানিফার এই বিদ্রোহী মতামত এবং ঘোষণা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা হয়তো পায়নি কিন্তু তা একেবারে বিফলেও যায়নি। ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী ইজতিহাদের জগতে ইমাম আবু

www.pathagar.com

হানিফার পরবর্তী প্রজন্মে এসেছেন এবং তাঁদের নির্ধারিত ইজতিহাদের নিয়ম-নীতিতে আবু হানিফার মতামতের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ইমাম মালিক বর্ণনার ব্যাপারে যে বাধ্যবাধকতা ও শর্তাবলী আরোপ করেছেন তা আবু হানিফার শর্তসমূহের কাছাকাছি। তাঁর "বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন" পর্যায়ে দু'জনার নামই পাশাপাশি নেয়া হয়।

ইবনুস সালাহ্ ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

وَمَنْ مذاهب التشديد مذهب من قال لا حجة الا فيما رواة الراوى من حفظه وتذكره وذلك مروى عن مالك وابى حنيفة –

অর্থাৎ 'কঠোরতা' অবলম্বনকারীদের বক্তব্য হলো— 'কেবলমাত্র সেই হাদীস গ্রহণযোগ্য যা বর্ণনাকারী নিজে স্মরণে রেখেছে"। একথা মালিক ও আবু হানিফা থেকে বর্ণিত। মুহাদ্দিসীনগণ লিখেছেন— ইমাম মালিক যখন প্রথম 'মুয়াত্তা' রচনা করেন তখন তাতে দশ হাজার হাদীস ছিল। তারপর যখন তার ওপর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন তখন দিন দিন তা কমতে থাকলো এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র ছয়-সাতশ' বাকী থাকলো।

ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য

ইমাম শাফেয়ী অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ইমাম আবু হানিফার মতামতকেই পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ইমাম বায়হাকীর বর্ণনা ঃ একদিন বাজম ক্বারশী ইমাম শাফেয়ীকে বললেন, আপনি সেইসব হাদীস লিখিয়ে নিন যা রাসূল (স) থেকে প্রমাণিত! তিনি জবাব দিলেন, সত্য সন্ধানী জ্ঞানীদের কাছে শুদ্ধ হাদীস খুব কমই আছে। কেননা আবু বকর ছিদ্দিক (রা) যেসব হাদীস রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন তার সংখ্যা সতেরোর অধিক নয়। উমর বিন খাত্তাব (রা) রাসূল (স)-এর পরে দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন, তাঁর বর্ণনা থেকে পঞ্চাশটি হাদীসও প্রমাণিত নয়। হযরত উসমান (রা)-এর অবস্থা একই রকম। হযরত আলী লোকদের হাদীস শেখার উৎসাহ দিতেন কিন্তু তাঁর বর্ণনা সংখ্যাও নগণ্য, কারণ তিনি প্রশান্ত চিত্ত এবং নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। তার কাছ থেকে যেসব হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই হযরত উমর (রা) এবং হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালীন সময়ের। এছাড়া আরও অনেক সাহাবা (রা) থেকে অনেক হাদীসের বর্ণনা রয়েছে কিন্তু জ্ঞানীজনের কাছে সেইসব বর্ণনাসমূহ নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়নি।[১]

বর্ণনার জন্য আবু হানিফা (রহ)-এর নির্ধারিত শর্তসমূহ

ইমাম আবু হানিফা মু'তাযিলাদের মতো হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এ রকম কিছু ভাবার অবকাশ নেই। দু'-চার, দশ-বিশটা নয় তাঁর ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে শত-সহস্র হাদীস শিখেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আছার, কিতাবুল হুজ্জ, যা সবার হাতে হাতে রয়েছে। এসবের মধ্যে ইমাম সাহেব বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক। তবে অন্যান্য মুহাদ্দিসীনদের তুলনায় তাঁর ত্রুটিমুক্ত হাদীসের সংখ্যা কমই। কেননা

১. মানাকিবুশ শাফেয়ী (রহ), ইমাম রাযী।

www.pathagar.com

তাঁর বর্ণনা শর্তসমূহ অত্যন্ত কঠিন। ইমাম সাহেব বর্ণনার ব্যাপারে যে শর্তগুলো আরোপ করেছেন তা কিছু মুহাদ্দিসীনদের কাছে ভালো লেগেছে। কিছু শর্ত এমন আছে যা শুধু তার একার অথবা ইমাম মালিক ও এরকম কয়েকজন মুজতাহিদ আছেন যারা সমর্থন করেন।

শর্তগুলোর একটি এই রকম যে, শুধু সেই হাদীস সত্য বা শুদ্ধ যা "বর্ণনাকারী নিজের কানে শুনেছে এবং তা বর্ণনা করার সময় পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ স্মরণে রেখেছে"। নিয়মটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত যা কারো পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সব মুহাদ্দিসীন এই শর্তে একমত নন। তাদের বক্তব্য এরকম বাধ্যবাধকতায় বর্ণনার বৃত্ত খুব ছোট হয়ে যাবে। বস্তুত আমরাও তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু পাঠকবৃন্দ একবার অবশ্যই ভেবে দেখবেন যে, শুদ্ধতা নির্ণয়ে এটা কতো উত্তম প্রস্তাব। অথবা আমরা বাধা-বন্ধনহীন বর্ণনা ক্ষেত্রের কয়েকটি দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি যা প্রমাণ করে দেবে যে ইমাম আবু হানিফা (রহ) কি অবস্থার প্রেক্ষিতে এই রকম শক্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেকালের হাদীস আলোচনার ক্লাশগুলো আমাদের যুগের ছোট-বড় মাহফিল বা সেমিনারের মতো অনুষ্ঠিত হতো। কোনো কোনো মজলিসে রীতিমত আট-দশ হাজার লোকের সমাগমও হতো। তখন নির্দিষ্ট ব্যবধানে পুনরাবৃত্তিকারী দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো, যেন শায়খ কি বলছেন তা সর্বশেষ শ্রোতাটি পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। সেখানে হাজারো শ্রোতা এমন থাকতো যারা মূল বক্তার একটি শব্দও শুনতে পেতো না। তারা আবৃত্তিকারীর আবৃত্তি থেকে হাদীস শিখতো এবং তা বর্ণনা করতো! এখন প্রশ্ন বা বিতর্ক হলো— যে ব্যক্তি শুধু আবৃত্তিকারীর আবৃত্তি শুনেছে সে কি মূল বক্তার ব্যাপারে حدثنا বলতে পারে ? বা পারে না। অধিকাংশ বর্ণনা বিশেষজ্ঞগণের মতামত হলো— হ্যাঁ, পারে। ইমাম আবু হানিফা বলেন 'না, পারে না'। অর্থাৎ তিনি এর খেলাফ। নেতৃস্থানীয় মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে হাফেয আবু নঈম, ফজল বিন অকী, যায়েদ বিন কিদাম (রহ) প্রমুখ আবু হানিফার সাথে একমত।[২] হাফেয ইবনে কাসীর লিখেছেন— 'বিবেক-বুদ্ধির দাবি' এটাই আবু হানিফার মাযহাব' কিন্তু মাযহাবে ইল্‌ম সহজ-সরল।

যে জিনিসটি ইমাম আবু হানিফাকে এতোটা সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল তাহলো— তাঁর সময়কাল পর্যন্ত অর্থসহ বর্ণনা রীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এমন লোক খুব কমই ছিল যারা হাদীসের মূল বাণীকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতো। এ কারণে মূল বর্ণনার পরিবর্তন এবং বিকৃতির সম্ভাবনা প্রতিটি স্তরে বেড়ে যেতে থাকতো। কিছু না হোক অন্তত প্রতিটি বর্ণনা প্রথম স্তরে অর্থাৎ প্রথম বক্তার যতোটা স্পষ্ট এবং শক্তিশালী থাকতো প্রশ্নাতীতভাবে তার সেই মান দ্বিতীয় স্তরেই ক্ষুণ্ন হতো! আবৃত্তিকারীর পক্ষে তা অবিকৃত রাখা কিছুতেই সম্ভব ছিল না অথচ আবৃত্তিকারী নিয়োগ ছাড়া শ্রোতাকে সামাল দেবার আর কোনো উপায়ও তখন নেই। এখন বিবেচনার বিষয় হলো, একজন লোক মূল বক্তা মুহাদ্দিসের মুখ থেকে শুনেছে আর একজন লোক দ্বিতীয় বা তৃতীয় আবৃত্তিকারীর মুখ থেকে শুনেছে এই দু'জন শ্রোতার মান কি এক হতে পারে ? যাঁরা এই দু'জনকে একই মান দিতে চাইছেন বা দিচ্ছেন, তাঁরা কি কার্যত ন্যায় করছেন ? একজন বিজ্ঞ জ্ঞান-তাপস মুহাদ্দিস আর একজন নিতান্ত

২. ফাতহুল মুগীস, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮।

www.pathagar.com

অর্বাচীন শিক্ষানবীশ— এই দু'জনের বাচনভঙ্গি কিছুতেই কি এক হতে পারে ? কাজেই নির্দ্বিধায় একথা বলা যেতে পারে যে, বিকৃতি এখানে অবশ্যম্ভাবী। এতো গেল এক ধরন। এর চাইতে আরো ভয়ঙ্কর অসতর্কতামূলক পদ্ধতি ছিল خبرنا وحدثنا। আমাদেরকে খবর দিয়েছেন কোনো কোনো মুহাদ্দিসীন এ পদ্ধতিকে খুব সাধারণ এবং স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহার করতেন। ইমাম হাসান বসরী বেশ কিছু বর্ণনায় বলেছেন حدثنا ابوهرية —আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি আবু হোরায়রাকে কখনো দেখেননি। তিনি তার একথার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, আবু হোরায়রা যখন এই হাদীস বর্ণনা করছিলেন তখন তিনি সেই শহরেই ছিলেন।

"حدثنا" শব্দটির অর্থ ও ব্যবহার

এভাবেই বড় বড় মুহাদ্দিস এবং সাহাবাগণের বরাত দিয়ে حدثنا শব্দটি ব্যবহৃত হতো। অর্থ ধরা হতো এই রকম যে, 'তার শহরের লোকেরা অমুক শায়খের কাছ থেকে শুনেছে'। মুহাদ্দিস বারাজ লিখেছেন, হাসান বসরী এমন লোকদের বরাত দিয়ে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদের তিনি কখনো দেখেননি। তার বরাতের ধরন ছিল, "তার গ্রামের লোকেরা অমুক অমুক লোকদের কাছ থেকে এই হাদীস শুনেছে"।[১] এই ধরনের প্রবনতা হাদীসের বর্ণনা সূত্রকে গুরুত্বহীন করে দিতো। কারণ, বর্ণনাকারী যখন নিজে শায়খের কাছ থেকে শোনেনি তখন নিশ্চয়ই মাঝখানে কোন মাধ্যম ছিল। এবং যেহেতু বর্ণনাকারী সেই মাধ্যমের নাম উচ্চারণ করেনি তখন তার নির্ভরযোগ্যতা বা অনির্ভরযোগ্যতা কোনটাই বোঝার উপায় থাকে না। শুধু ইতিবাচক মানসিকতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ালো যে, এই রকম একজন ব্যক্তি যার কাছ থেকে শুনেছেন সেই লোক নিশ্চয়ই আস্থাভাজন হবে! ইমাম আবু হানিফা গোটা ব্যাপারটাকে আল্লাহ্র রাসূলের বাণী নিয়ে নিছক তামাশা এবং প্রহসন বলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাঁর সাথে সত্য সন্ধানী আলেম, মুহাদ্দিস এবং মুজতাহিদগণ ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন।

বর্ণনা রীতির আরও একটি ধরন ছিল, কেউ কারো কাছ থেকে কিছু হাদীস শুনলো এবং তা লিখে নিলো, ব্যাস এইটুকু পুঁজি নিয়েই সে আবার বর্ণনা করতে পারবে। ব্যাপারটাকে এতোটাই ব্যাপকতা দেয়া হয়েছিল যে, একজন বর্ণনাকারী, মূল হাদীসের বাণী বা অর্থ কিছুই তার মনে নেই, তার মনে আছে কিছু অংশ, সে তা বর্ণনা করতে পারে। ইমাম আবু হানিফা এই রীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু এখানে শর্তারোপ করেছেন যে, যতোটুকু তার মনে আছে সেইটুকুর মধ্যে মূল হাদীসের ভাষা এবং তাৎপর্য যেন বজায় থাকে— নইলে তা জায়েয নয়।

ইমাম আবু হানিফার এই মাসআলাও সাধারণভাবে গৃহীত হয়নি! তবে মুহাদ্দিস সাখাবী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মালিক এবং আরো কিছু বিশেষজ্ঞ একে সমর্থন করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের যুগে এই বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন আর থাকেনি। কারণ ততোদিনে 'বর্ণনা তার মূল ভাষায় করতে হবে' এই রীতি চালু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার সময়কালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থসহ হাদীস বর্ণনার রেওয়াজ ছিল। সে জন্য যদি বর্ণনাকারীর হাদীসের ভাষা, প্রেক্ষাপট এবং প্রত্যক্ষকরণ ইত্যাদি মনে না থাকতো তাহলে বাস্তবসম্মতভাবে

১. ফাতহুল মুগীস

www.pathagar.com

বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়তো। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই ইমাম আবু হানিফা (রহ) একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছেন এবং নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তখন এই বন্ধনের খুব প্রয়োজন ছিল।

তাৎপর্যগত বর্ণনা

সব চাইতে বড় মাসআলা বা বিতর্কিত বিষয় হলো, তাৎপর্যগত বর্ণনা জায়েয কি না ? অথবা এ ধরনের বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য কি না ? এ বিতর্ক তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন যে— কোনো কোনো তাবেয়ী একই হাদীস বেশ কয়েকজন সাহাবীর কাছ থেকে শুনেছেন। সাহাবীগণ যার যার অভিব্যক্তি অনুযায়ী তা বর্ণনা করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য বা অর্থ একই। তাবেয়ীগণ ব্যাপারটা একজন সাহাবীর কাছে বুঝতে চাইলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে, উদ্দেশ্য এবং অর্থ যদি একই হয় তাহলে সমস্যা কোথায় ? তবে ইমাম শাফেয়ী তার এই বর্ণনায় কারো নাম উল্লেখ করেননি যা দিয়ে বর্ণনাটির মান যাচাই করা যেতে পারে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কোনো কোনো সাহাবী এই একার্থবোধক বর্ণনাকে বৈধ মনে করতেন এবং সে অনুযায়ী কাজও করতেন। ব্যতিক্রম এখানেও আছে, যেমন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রাসূল (স)-এর মূল বাণীর হুবহু বর্ণনাকেই বিধিসম্মত বলে মনে করতেন।

একার্থবোধক বর্ণনায় সাহাবার সর্তকতা ঃ তাযকেরাতুল হুফ্‌ফাযে আল্লামা যুহরী আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের অবস্থা বর্ণনা করে পরিশেষে লিখেছেন যে, "তিনি বর্ণনা চর্চায় কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং তাঁর ছাত্রদেরকে রাসূল (স)-এর বাণী ও ভাষার বেলায় সম্পূর্ণ আপোসহীন থাকার শিক্ষা দিতেন।" এই সমার্থবোধক বর্ণনা যদিও বা কখনো তাঁকে করতে হতো তাহলে—

او مثله اونحوه اورشبيحة به امافوق ذلك، واما دون ذلك واما قريب من ذالك -

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) এভাবে বলেছিলেন, বা এই রকম, বা ঐটার মতো, একই রকম, বা তার চাইতে কিছু বেশি অথবা কম, বা এর কাছাকাছি বলেছিলেন ইত্যাদি।

আবুদ দারদাও একই রকম ছিলেন, তিনি হাদীস বর্ণনা করে বলতেন[১] ঃ هذا اونحوه هذا اوشكله এই, এটার মতো অথবা অনুরূপ। হযরত উমর (রা) যিনি লোকদের হাদীস চর্চা বা বর্ণনা করতে নিরুৎসাহিত করতেন, তাঁরও মনোভাব সম্ভবত এই ছিল। তিনি জানতেন যে, হুবহু কথা খুব কমই মনে থাকে এবং মানে বা তাৎপর্য বর্ণনার স্বাধীনতা দিলে পরিবর্তন ও বিকৃতির সম্ভাবনা বেড়ে যেতে থাকবে।

সাহাবা যুগের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই 'মাসআলা'র কোন কিনারা হয়নি। তাবেয়ীগণ এ ব্যাপারে দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। খোদ ইমাম আবু হানিফার উস্তাদুল উস্তাদ রাওয়ায়াত বিল মা'নির বড় প্রবক্তা ছিলেন। এই তাবেয়ীদের যুগেই একসময় প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে অর্থ বা তাৎপর্যগত বর্ণনা রীতির সাধারণ প্রচলন হয়ে গেল। উসূলে হাদীসের গ্রন্থসমূহে এই

১. ফাতহুল মুগী।

www.pathagar.com

পর্যায়টিকেই 'সাধারণ ঐকমত্যের সময় হিসেবে বর্ণিত আছে। মুজতাহিদীনদের মধ্যে শুধুমাত্র ইমাম মালিক এর বিরোধী ছিলেন। মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে ইমাম মুসলিম, কাসেম বিন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ বিন ছীর বিন রিজাও বিন হায়াত, আবু যারআহ, ছাম বিন আবী আল জুউদ, আবদুল মালিক বিন উমর (রহ) প্রমুখ 'রাওয়াত বিন লাফয' অনুযায়ী হাদীস চর্চা করতেন। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন প্রচলিত রীতিরই অনুসারী ছিলেন। আসলে এমন একটা দল যাদের সাধারণ প্রবণতা যে কোনোভাবেই অধিক বর্ণনার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারাতো সে রীতিকেই অনুমোদন দেবে!

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ সাহাবা এবং তাবেয়ীন হাদীসের অর্থ এবং তাৎপর্যকেই বর্ণনা করেছেন এবং শুরু থেকেই যদি শক্ত সীমারেখা টেনে দেয়া থাকতো তাহলে বর্ণনা সংখ্যা এতোটা কমে যেতো যে, বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসায়েল খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হয়ে যেতো। অপরদিকে এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাৎপর্যমূলক বর্ণনা দিয়ে মূল বর্ণনার আসল বাস্তবতার কাছে পৌঁছানো এতোটাই দুরূহ যে তা প্রায় অসম্ভব। ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেন, 'সমার্থবোধক কথা মূল কথার প্রভাব আনতে পারে না'। তাহলে অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু পার্থক্য তো অবশ্যম্ভাবী। অথচ অবস্থা এই যে, মহাত্মনরা এই সমার্থবোধকের সীমানাও মানতে রাজী নন, তারা যেন বলতে চান যে, কোন বিধি-নিষেধ নেই যেভাবে পারো 'কথাটা বলে দাও'।

সাহাবাগণের চাইতে বেশি আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর বাণী ও ভাষা বোঝা এবং অনুধাবন করা কার পক্ষে সম্ভব ? তাঁর বাচনভঙ্গি, সাধারণ কথোপকথন, তাঁর মুখনিঃসৃত ঐশী বিধি-বিধান ইত্যাদি বলার ধরন-রকম কেমন ছিল সেসবের সাথে সাহাবাগণ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কোনো বাণীকে পুনর্ব্যক্ত করতে গিয়ে তারা শব্দগত এবং অর্থগত উভয় ক্ষেত্রেই যে কম-বেশি করেছেন তার বহু প্রমাণিত ঘটনা হাদীস ও উসূলে হাদীসের গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে আছে।

এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো

ইবনে মাযাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, আবু মূসা আশআরী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করছেন ঃ

ان الميت يعذب ببكاء الحى انا قالو اواعضداه واكاسباه وانا صراه واجبلاه -

যখন মৃতের উদ্দেশ্যে এইসব কথা বলে কান্নাকাটি করা হয় তখন তাকে আযাব দেয়া হয়। কেউ একজন হযরত আয়শা (রা)-কে বললেন, ইবনে উমর এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়শা (রা) বললেন, "আমি এটা বলবো না যে, ইবনে উমর মিথ্যা বলেছেন, তবে তাঁর একটু ভুল হয়েছে।

ঘটনাটা এরকম— একজন ইয়াহুদী মহিলা মারা গেলে তার ঘরের লোকেরা কান্নাকাটি করে বিলাপ করছিল। রাসূলুল্লাহ (স) শুনে বললেন, ওর ঘরের লোকেরা কান্নাকাটি করছে অথচ কবরের মধ্যে ওর ওপর আযাব চলছে।

www.pathagar.com

আরও একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত আয়শা (রা) কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ لاتَزِرُوازِرَةٌ وِزراخری —"কেউ কারো বোঝা বহন করে না। একজনের কর্মফলের দায়িত্ব অন্যজন বহন করে না। ঘরের লোকেরা কাঁদছে, সেটা তাদের দোষ। এ ব্যাপারে মৃত ব্যক্তি কি করতে পারে, যে কারণে তাকে আযাব দেয়া হবে ? এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, 'কবরে মহিলার ওপর আযাব হচ্ছে' একথা আল্লাহ্‌র রাসূল (স) একটি চলমান ঘটনা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। অথচ বর্ণনাকারী সে আযাবকে আপনজনের কান্নার কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। যাতে হাদীসের ভাষা এ রকম হয়ে গেছে—

اِنْ الميت يعذب ببكاء الحى -

জীবিতদের কান্নার কারণে মৃতদের আযাব দেয়া হয়।

বদরের যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনা— রাসূলুল্লাহ (স) শহীদানদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন ঃ هل وجد تم مافعل ربكم حقا উপস্থিত সবাই বলে উঠলেন 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স) আপনি মৃতদের উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "আমি যা বলেছি, ওরা তা শুনেছে"। ঘটনাটি যখন মা আয়শা (রা)-এর সামনে বলা হলো তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এটা তো বলেননি! তিনি বলেছেন– لقد علموان ما دعو تهو حق (তোমাদের প্রভু সত্যই কি করছেন তা কি তোমরা পেয়েছ) ওরা ইতিমধ্যে জেনে গেছে যে, আমি যেসব কথার দিকে আহ্বান করেছিলাম তা সত্য। স্পষ্টতঃই দু'টি বাক্যের মধ্যে যে ব্যবধান তা 'মৃতদের শ্রোবণ' প্রসঙ্গের মাসলার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

বস্তুত রাসূলে কারীম (স)-এর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথীগণের দ্বারাই যদি এই ধরনের স্খলন বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যেতে পারে! তাহলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগের লোকদের দ্বারা কি হতে পারে, তা খুব সহজেই অনুমেয়। মজার ব্যাপার হলো যারা অর্থগত বর্ণনা রীতির পক্ষপাতী তারা উদাহরণ হিসেবে কিছু বাক্য উপস্থাপন করেন, যা দিয়ে বোঝাতে চান যে, একই কথা অন্যভাবে প্রকাশ করবো অথচ তার এতোটুকু ভাব পরিবর্তন হবে না। কিন্তু আসলে কি তা সম্ভব ? না তা সম্ভব নয়, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই সুস্পষ্ট গড়মিল আবিষ্কার করা যায়। মুহাদ্দিস সাখাবী লিখেছেন যে, হাদীস এসেছে ঃ

اقتلوا الاسودين الحية (العقرب)

কালো দুটি সাপ মেরে ফেল

এর পরিবর্তে এটা বলা যেতে পারে امربقتلهما অর্থাৎ দুটির মেরে ফেলার নির্দেশ

বাক্য দু'টির উদাহরণ দিয়ে মুহাদ্দিস সাখাবী বোঝাতে চেয়েছেন যে, কথাটি দুইভাবে বলা হলেও ভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ اقتلو (মেরে ফেল) এবং امر بالقتل (মেরে ফেলার নির্দেশ) বাক্যাংশ দু'টিতে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। اقتلو (মেরে ফেল) যদিও আদেশমূলক পদবাচ্য কিন্তু তার মধ্যে সেই আবশ্যিকতা এবং তাগিদ নেই যা امر (নির্দেশ-এর মধ্যে আছে।

ভাবব্যঞ্জক বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর নীতি

এইসব সমস্যাকে সামনে রেখেই ইমাম আবু হানিফা একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন

www.pathagar.com

করেছেন। তাঁর সময়ের পূর্বেই যেসব হাদীস ভাবব্যঞ্জক বর্ণনা রীতিতে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল এবং মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে ব্যাপকভাবে চর্চিত হচ্ছিলো, বাধ্য হয়েই তাকে তা গ্রহণ করতে হয়েছে! নইলে বর্ণনা বিষয়ক সকল নথিপত্র অকার্যকর হয়ে যায়। তাই তিনি তার পূর্বে প্রচলিত সকল হাদীস গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেখানে শর্ত লাগিয়েছেন যে, হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই নীতিশাস্ত্র বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হতে হবে। অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত বাক্য বা শব্দাবলীর ভাব, অর্থ ও তাৎপর্য এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হতে হবে। তারপরেও তার প্রকাশ রীতি এবং মূল আবেদনের মধ্যে পার্থক্যের সম্ভাবনা বাকী থেকে যায়। কিন্তু হাদীসসমূহের মূল বাণী (যেভাবে মুহাদ্দিসীনগণ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন) গৃহীত হবে ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে। তখন বিপক্ষের কোন দলিল না পাওয়া গেলে ভাবব্যঞ্জক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ইমাম সাহেব সেইসব হাদীসসমূহকেও গ্রহণ করেছেন যাদের বর্ণনাকারী ব্যক্তি হিসেবে আস্থাভাজন, কিন্তু ফকীহ নন। তবে তার গ্রহণযোগ্যতার মান দ্বিতীয় স্তরের এবং এক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োগকে আবশ্যিক মনে করেছেন। ইমাম সাহেব ঘোষিত এইসব মূল নীতির সাথে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন। 'আল-ফকীহুল হাদীসে' আছে যে, যে ব্যক্তি হাদীসের বক্তব্যকে ভালো করে বুঝতে পারে না তার ক্ষেত্রে হুবহু আবৃত্তি গ্রহণযোগ্য, তবে ভাব-তাৎপর্য বুঝতে পারে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিতর্ক রয়েছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতামত হলো, শেষোক্ত ব্যক্তি হুবহু বর্ণনার শর্তমুক্ত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা শুধুমাত্র সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য বলে মনে করেন এবং এ অধিকার শুধুমাত্র তাদেব জন্যই সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। এর পরের স্তরের সবার জন্য হুবহু বর্ণনার শর্ত স্থির করেছেন। ইমাম তাহাবী ধারাবাহিক সনদের ভিত্তিতে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "শুধুমাত্র সেইসব হাদীসই বর্ণনা করা উচিত যা বর্ণনা করার সময় স্মরণে ছিল।"[১] মোল্লা আলী ক্বারী এই বর্ণনাকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, এর অর্থ হলো, ইমাম আবু হানিফা (রহ) ভাবব্যঞ্জক বর্ণনাকে জায়েয রেখেছিলেন।

যদিও ইমাম মালিকসহ আরও কিছু মুহাদ্দিসীন এই বাধ্যবাধকতার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। ফাত্হুল মুগীছে বলা হয়েছে ঃ [২]

وَقِيلَ لاتجوزله الرواية بالمعنى مطلقًا قال له طائفة من المحد ثين الفقهاء الاصوليين من الشافعية وغير هم قال القرطبى وهو الصحيح من مذهب مالك -

বলা হয় সাধারণভাবে অর্থগত বর্ণনা তার জন্য বৈধ নয়। আর এ ব্যক্তি সম্পর্কে শাফেয়ী মাজহাবের মুহাদ্দিস, ফকিহ, উসুলবিদগণের একদল এবং অন্যান্যরাও ঐকমত্য। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ ইমাম মালিকের মাজহাবেও এতে একমত পোষণ করেন।

১. শরাহ্ মুসনাদে ইমাম আযম, মুল্লা আসী ক্বারী, পৃষ্ঠা -৩
২. অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, ভাব ব্যাঞ্জক বর্ণনা সাধারণভাবে জায়েয নেই। মুহাদ্দিসীন ফকীহ্ ও শাফেয়ী মতাবলম্বী এক দল এই মতই পোষণ করেন। এবং কুবতুবী বলেছেন ইমাম মালিকের সঠিক মতামত এই।

www.pathagar.com

কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনা বিশেষজ্ঞ এই কড়াকড়ি মেনে নেননি বরং উল্টো ইমাম সাহেবকেই "বর্ণনায় কাঠিন্য আরোপকারী" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত ইমাম সাহেব যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । খোদ হাদীস থেকে পাওয়া যায় যে—

نضر الله امر اسمع مناشيًا فبلغه كما سمعه -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির কল্যাণ করুন যে আমার কাছ থেকে কিছু শুনেছে এবং তা অন্যের কাছে এমনভাবে পৌছিয়েছে ঠিক যেভাবে সে আমার কাছ থেকে শুনেছে।

আমাদের আলোচিত গোটা প্রসঙ্গে এর চাইতে বড় দলিল আর কি প্রয়োজন? সাহাবাগণের মধ্যে হুবহু বর্ণনাকে যারা প্রয়োজন মনে করেননি রাসূল (স)-এর এই বাণী বা হাদীস হয়তো তাঁদের কাছে পৌছায়নি! প্রত্যক্ষভাবে এই হাদীস যাঁরা শুনেছেন বলে প্রমাণিত তাঁদের অন্যতম হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) যিনি এই হাদীসের বর্ণনাকারীও। তিনি নিজে 'হুবহু বর্ণনা' মতের ধারক। ইমাম আবু হানিফার সময়কালে এই হাদীস অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত, তাই তাকে যদি তিনি শুধু কার্যকর হিসেবে ঘোষণা দিয়ে থাকেন তো মন্দ কি করেছেন ?

বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের নীতি

হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান-গবেষণা এবং শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের নীতি নির্ধারণ ইমাম আবু হানিফার অবিস্মরণীয় অবদান। হাদীস শাস্ত্র এবং তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, বর্ণনার রীতি, এ বিষয়ের ওপর আমাদের মনীষীগণ যে রকম সর্বাত্মক মনোযোগ আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার নজীর অতীত ও বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চূড়ান্ত কাজটুকু যা সমাজ নির্মাণে সবচাইতে বড় অস্ত্র এবং অবলম্বন সেই গবেষণা এবং বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের মূল নীতি বিষয়ে তার হাজার ভাগের একভাগ মনোযোগও দেননি। হাফেয ইবনে হাজারের লেখা থেকে জানা যায় যে, কিছু কিছু গ্রন্থ এ বিষয়ের ওপর রচিত হয়েছে। তবে তা এতোটাই কম এবং অখ্যাত যে, তা একেবারে না থাকার নামান্তর। 'উসূলে হাদীস' একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং এতো উন্নতমানের রচনাবলী এ বিষয়ের ওপর তৈরী করা হয়েছে যা এক কথায় তুলনাহীন। কিন্তু তা থেকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের কোন দিক-নির্দেশনা খুব কমই পাওয়া যায়, অথচ বিষয়টি হাদীস শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপরিহার্য ছিল। এই সম্মান শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফার জন্যই নির্দিষ্ট। এমন একটি বিষয় যার কোন অস্তিত্ব তাঁর সময়ে ছিল না কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম এই বিষয়-বিন্দুটি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

সাহাবাগণের ইতিহাসে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত খুব কম হলেও দেখা যায়। সন্দেহ নেই, ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর গবেষণার পথে সেই দৃষ্টান্তসমূহই অকাট্য দলিল। কিন্তু মূল্যবান এই বিষয়টি সাধারণ মাসআলা-মাসায়েলের অতি-চর্চার ভীড়ে এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, তাকে আর মানুষ খুঁজে পেতে পারেনি।

বর্ণনার সত্যতা-অসত্যতার যাচাই সবসময় বর্ণনাকারীদের মান অনুযায়ী হয় না। হাদীসের গ্রন্থসমূহে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত পড়ে আছে যে, একটি ঘটনার বর্ণনায় যেসব সনদ দেয়া হয়েছে তার প্রতিটি স্তরের বর্ণনাকারী অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং আস্থাভাজন, অথচ ঘটনাটি সত্য নয়। এই

www.pathagar.com

জন্য শুধুমাত্র বর্ণনাকারীদের বরাতের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগেরও প্রয়োজন রয়েছে যা প্রমাণ করতে পারে যে, বিষয়টি আদৌ বিবেক-বুদ্ধির বিচারে সঙ্গত কি না।

বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনা বলতে আসলে বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে যে, যখন কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয় তখন তাকে নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবনামগ্ন হওয়া এবং অন্তর্দৃষ্টির আলোকে তা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী সময়ের প্রেক্ষাপটে সম্পৃক্তের অবস্থা এবং অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের সাথে তার কি সম্পর্ক রাখে। যদি এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হয় তাহলে তার সত্যতাও সন্দেহপূর্ণ হবে। অর্থাৎ এমন সম্ভাবনার অবকাশ এখানে আছে যে, বর্ণনা পরম্পরার পরিবর্তনে ঘটনার আসল চেহারা বদলে গেছে। এই ধরনের রীতি-নীতি হাদীসসমূহের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এবং এঁকেই বলা হয় 'বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনা'। হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ আল্লামা ইবনে জাওযী লিখেছেন[১], যে হাদীসকে তুমি দেখবে যে তা বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনায় আসে না এবং হাদীসের মূল নীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, বুঝে নেবে তা বানানো। তার সত্যতা সন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। একইভাবে সেই হাদীসও প্রবর্তিত যা চেতনার দর্শনে বাতিল বলে গণ্য হয়। অথবা কুরআন হাদীস অনুযায়ী সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হয় এবং ব্যাখ্যাযোগ্য না হয় অথবা সাধারণ একটি ব্যাপারে শক্ত আযাবের ধমকি থাকে অথবা সামান্য একটু পূণ্যের বিনিময়ে অনেক বড় পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি থাকে। এই ধরনের হাদীস ব্যবসায়ী বক্তা ও সুফীদের ধারাবাহিক পরম্পরায় অসংখ্য পাওয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফা বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনার ক্ষেত্রকেও মুক্ত ছেড়ে দেননি। সে ক্ষেত্রে তিনি যেসব নীতি নির্ধারণ করেছেন তার কতিপয় এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ঃ

এক ঃ যে হাদীস চূড়ান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিকতা বিরোধী তা বিবেচনার যোগ্য নয়।[২] এটা সেই মূলনীতি যাকে ইবনে জাওযী সকল নীতি দর্শনের ওপরে স্থান দিয়েছেন। ইবনে জাওযী ষষ্ঠ শতকের মানুষ। ইসলামী জগত উন্নতির শিখর চূঁড়ায় অবস্থিত। দার্শনিক মতাদর্শের প্রভাব তখন অনেক বিকশিত এবং ব্যাপকতা লাভ করেছিল। অথচ ইমাম আবু হানিফার যুগে দ্বীনের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির নাম নেয়াটাও একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ছিল। ইমাম সাহেব প্রথম যখন এই মূলনীতি ঘোষণা করলেন এবং বাধা-বন্ধনহীন বর্ণনা রীতিকে বিধিসম্মত নীতির আওতায় আনতে চাইলেন তখন তাকে অত্যন্ত শক্ত বিরোধিতার মুকাবিলা করতে হয়েছে। অসম্ভব এবং অবাস্তব সব ঘটনায় ভরা হাদীসগুলোকে ইমাম সাহেবের সম্মুখে আনলে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তাকে হাদীস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করতেন। সাধারণ লোকেরা ইমাম সাহেবের আচরণকে বরং অস্বাভাবিক মনে করতো। কেননা তাদের বিবেচনায় বর্ণনা পরম্পরায় সত্য-মিথ্যা যাচাই, শুধুমাত্র বর্ণনাকারীর অবস্থার নিরীখে হতে পারে! বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনার সাথে তাদের পরিচয় ছিল না। যদিও তার পরের যুগেই এই মূলনীতি উসূলে হাদীসে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্ণনা বিশেষজ্ঞগণ তাকে খুব কমই গ্রহণ করতেন। যার পরিণতি আজ অসংখ্য অগুণিত উদ্ভট কথাবার্তা আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর বাণী বা হাদীসের মর্যাদায় কোটি কোটি মুসলমানের মাথার ওপর অধিষ্টিত হয়ে আছে।

১. ফাতহুল মুগীস।

১. এই নীতিকে আল্লাসা ইবনে খালদুন মুকাদ্দামাহ্ তারীখে ইমাম আবু হানীফার বলেও উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

تلك الغرانيق العلى প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র মুখ থেকে (সূরা নাজম তেলাওয়াতের সময়) মূর্তিগুলোর প্রশংসায় এই কথা নিঃসৃত হয়েছে ঃ تلك الغرانيق العلى وان شفا عتهم الترجى এই মূর্তি অত্যন্ত সম্মানিত এবং এর সুপারিশের আশায় এর পূজা করা হয়। এই কথাগুলো শয়তান রাসূল (স)-এর মুখে তুলে দিয়েছিল। তেলাওয়াতের পরে জিবরাঈল (আ) এসে অনুযোগ করে বললেন ঃ আমি তো এসব কথা আপনাকে শিখাইনি! আপনি কেমন করে পড়ে ফেললেন ? এই হাদীসকে ইমাম সাহেবের বিধি মোতাবেক কিছু মুহাদ্দিসীন যেমন কাজী আয়াজ ও আবু বকর বায়হাকী 'মিথ্যা' বলেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসীনগণের একটি বিরাট অংশ এই রকম একটি হাদীসকে আজও সত্য বলে মনে করেন। হাফেয ইবনে হাজারের চাইতে বড় মুহাদ্দিস পূর্বগামীদের মধ্যে আর কেউ ছিল না। তিনি এই হাদীসকে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সমর্থন করে বলেন, যেহেতু এই হাদীসের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন সেহেতু এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহও করা যায় না।

এ রকমই আর একখানী হাদীস ردالشمس (সূর্যের ফিরে আসা)-এর হাদীস যার মধ্যে গল্প বলা হয়েছে যে, একবার হযরত আলী (রা)-এর আসরের নামায কাযা হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানানো হলে তিনি দো'আ করলেন, ফলে ডুবে যাওয়া সূর্য আবার উদয় হলো। মুহাদ্দিস ইবনে জাওযী অত্যন্ত দুঃসাহসিকভাবে একে 'বানোয়াট' বলেছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ খুব কঠিন ভাষায় তার বিরোধিতা করেছেন। ইমাম সাহেবের যুগে এর চাইতেও বেশি সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু তিনি এসবের তোয়াক্কা করতেন না। একটা ব্যাপার এখানে মনে রাখতে হবে যে, ইমাম আবু হানিফা বিবেক-বুদ্ধির বিচার বলতে এমন কিছু বোঝাননি যা আজকালকের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা বোঝাতে চায়। এদের মুক্ত বুদ্ধির চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু খোদায়ী বিধানের ভিত্তিসহ নড়ে উঠবে।

দুই ঃ দিন-রাত মানুষ যেসব চলমান ঘটনার মুখোমুখি হয় সেসব সম্পর্কে যদি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় তা 'আখবারে আহাদ'-এর পর্যায় থেকে বেশি না হলে সেই বর্ণনা সন্দেহপূর্ণ হবে। এই নীতির মূল ভিত্তি হলো, দৈনন্দিন জীবনের সেই ঘটনা সম্পর্কে রাসূলে কারীম (স)-এর যা কিছু বক্তব্য থাকতো তার প্রয়োজন সকলের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। এই কারণে শুধু এক-আধজন পর্যন্ত তার বর্ণনা সীমাবদ্ধ থাকা বিবেক-বুদ্ধির বিচারে সঙ্গত নয়।

প্রমাণিত হাদীসের বিপরীতে কিয়াস মূল্যহীন

ইমাম আবু হানিফার ব্যাখ্যা-বিবৃতি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি শুদ্ধ হাদীসের মুকাবিলায় কিয়াসকে গণ্য করতেন না। ইমাম মুহাম্মদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি রোযা থাকা অবস্থায় ভুল করে কিছু পানাহার করলো তার রোযা ভঙ্গ হবে না এবং তার 'কাযাও তার জন্য নির্ধারিত নয়। দলিলসহ হাদীসের উল্লেখ করে লিখেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (স) করেছেন বা বলেছেন, তা প্রমাণিত থাকলে বিচার-বিবেচনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না (কিয়াস)। এরপরে ইমাম আবু হানিফার বিশেষ উক্তিকে উল্লেখ করেছেন لولاماجاء فى هذا من الاثار لامرت بالقضاء। অর্থাৎ এ ব্যাপারে রাসূল (স)-এর বক্তব্য প্রমাণিত না থাকলে আমি 'কাযা' আদায়ের বিধান দিতাম।[১]

১. কিতাবুল হজ্জ, ইমাম মুহাম্মদ

www.pathagar.com

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হাদীসসমূহের সত্যাসত্য নির্ণয়ে ইমাম আবু হানিফার শর্তসমূহ অত্যন্ত কঠিন। শর্তগুলো পূরণ না হলে কোন বর্ণনাকেই তিনি হাদীস বলে স্বীকার করতেন না। কিন্তু সেইসব শর্ত অনুযায়ী হাদীস প্রমাণিত হলে তখন কিয়াসের কোন মূল্যই তার কাছে ছিল না।

কিয়াসের আর একটি তাৎপর্য

আমাদের গবেষণায় আমরা দেখেছি ইমাম আবু হানিফা ফিকহী কিয়াসকে কখনই হাদীসের উপরে অগ্রাধিকার দেননি। কিন্তু তাঁর যুগে কিয়াস শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। নিঃসন্দেহে সেইসব অর্থ অনুযায়ী তিনি কিয়াসকে হাদীসের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। মাসায়েল এবং শরীয়তের বিধান বিষয়ে ইসলামের শুরু থেকেই দু'টি দল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। একদলের ধারণা ছিল 'শরীয়তের বিধান' কোন মানবীয় বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল নয়। যার সার কথা হলো সুন্দর এবং কুৎসিত বা ভালো ও মন্দ বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিনির্ভর কোন বস্তু নয়।

দ্বিতীয় দলের রায় ছিল, "কল্যাণের জন্যই সকল বিধানের প্রতিষ্ঠা। যার মধ্য থেকে কতিপয়ের কল্যাণ সুস্পষ্ট প্রতীয়মাণ এবং স্বয়ং বিধানদাতার কালাম থেকে তার নির্দেশনাসমূহ পাওয়া যায়! কিছু এমনও আছে যার কল্যাণ আমাদের জানা নেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেইসবও কল্যাণের জন্যই বিধৃত।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য হাদীসসমূহের বর্ণনা রীতির ওপর বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে দিয়েছে। কিছু লোক যখন কোন হাদীস শুনতেন তখন শুধু এতোটুকুই দেখতেন যে, বর্ণনাকারী বিশ্বাসযোগ্য কি না! যদি তাদের বুঝ অনুযায়ী তা গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে সেখানে কোন বিতর্ক ছিল না— নির্দ্বিধায় সে হাদীস গ্রহণ করে নিতেন।

দ্বিতীয় দল যারা ভালো ও মন্দ, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিনির্ভর বলে মনে করতেন তারা এটাও দেখতে চাইতেন যে, যে মাসআলা বা মতাদর্শ হাদীস থেকে নির্গত হয় তা বিবেকসম্মত ও কল্যাণের উপযোগী কি না! যদি তা না হতো তাহলে তারা হাদীসের পুংখানুপুংখ বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের দিকে মনোযোগী হতেন। তাঁরা দেখতে চাইতেন যে, বর্ণনাকারী বুঝ ও উপলব্ধির দিক দিয়ে কতোটা যোগ্যতার অধিকারী হতে পারেন! বর্ণনা হুবহু অথবা তাৎপর্যগত, বর্ণনার প্রেক্ষাপট কি ছিল ? কোন লোকদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছিল ? কোন্ অবস্থায় কেন বলা হচ্ছিল ? ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর গবেষণা চালাতেন। এভাবে তাঁরা একসময় মূল সত্যের দুয়ারে পৌঁছে যেতেন।

অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের রীতি-প্রক্রিয়া

সহীহ্ ইবনে মাযাহ ও তিরমিযীতে বলা হয়েছে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, توضؤ امما غيرت النار অর্থাৎ যে জিনিসকে আগুন পরিবর্তন করে দিয়েছে তার ব্যবহারে অজু নষ্ট হয়ে যাবে। এই হাদীসের ভিত্তিতে কিছু মুজতাহিদীন মনে করেন, 'রান্না করা গোশত খেলে অজু ভেঙ্গে যাবে'! আবু হোরায়রাহ (রা) যখন এই হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, اتوضامن الحميم। অর্থাৎ তাহলে তো গরম পানি ব্যবহার করলে আবার অজু করতে হবে! আবু

হোরায়রা (রা) বললেন ঃ হে ভাই পুত্র! "যখন রাসূল (স) থেকে কোন বর্ণনা শুনবে তখন তার কোন পাল্টা কথা বলবে না"। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) নিজের কথায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। হযরত আয়শা (রা) ইবনে উমরের (রা) সেই হাদীস ان الميت يعذب ببكاء اهله (নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়)-এর ওপর যেভাবে আপত্তি করেছিলেন সেই ধরনের ইতিবাচক বিতর্কে লিপ্ত হতেন ইবনে উমর, যার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে নেয়া। সাহাবাগণের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা অনেক পাওয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এরকমই ছিল, কিন্তু লোকেরা এটাকেই 'কিয়াস' নাম দিয়ে তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছেন সেই মাসআলা অনুযায়ী যে, "শরীয়তের যাবতীয় বিধান কল্যাণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত"। এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা আর বড় করার সুযোগ এখানে নেই। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীর (রহ) অমর সৃষ্টি হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা পড়ে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শুধু এতোটুকুই বলা প্রয়োজন মনে করি যে, ওলামায়ে ইসলামের মধ্যে যারা বুদ্ধি ও বর্ণনার সমন্বয়কারী ছিলেন যেমন ইমাম গাজ্জালী (রা), ইজ্জামদ্দীন আবদুস সালাম (রহ), শাহওয়ালীউল্লাহ্ (রহ) প্রমুখের কর্মপদ্ধতি এরকমই ছিল। ইমাম আবু হানিফা হাদীসসমূহের যাচাই-বাছাই করার জন্য এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা খুবই প্রয়োজন বলে মনে করতেন। দু'খানী পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণনা পরম্পরার ধারাবাহিকতায় একই মানের অধিকারী, এর মধ্যে সেই হাদীসখানী তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য যাকে 'বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনা' উত্তম বলে মেনে নেবে।

ইমাম সাহেব কোনো কোনো সময় এই রীতির বৈপরীত্যের কারণে কিছু হাদীসকে মেনে নিতে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাঁর পরিভাষায় এটা একটা গোপন কারণ। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এক ধরনের হাদীসকে অর্থহীন, বেকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের পরিচয় হলো—বাহ্যিকভাবে তার সত্যতার সব ধরনের শর্ত উপস্থিত কিন্তু যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায় না। এই ধরনের হাদীসকে বাছাই করার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন একটা অহংকারবোধ করেন এবং তাঁরা এটাকে এক ধরনের ঐশী অনুপ্রেরণা বলে মনে করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী বিন আল মাদিনী বলেন ঃ

هى الهام ولو قلت للقيم بالعلل اين لك هذا الم تكن له حجة -

এটা (ইলহাম) ঐশী অনুপ্রেরণা। এখন তুমি যদি কোন অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারীর কাছে প্রশ্ন করো যে, তুমি কেমন করে তাকে ঐশী প্রেরণা বলছো তাহলে সে তোমাকে কোন দলিল পেশ করতে পারবে না।

মুহাদ্দিস আবু হাতেমের কাছে একজন কিছু হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তার কিছু মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, কিছু বাতিল, কিছু সরাসরি অস্বীকার করে কিছুকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ বলে মন্তব্য করলেন। প্রশ্নকারী বললো ঃ আপনি এসব কেমন করে বুঝলেন ? আপনাকে কি বর্ণনকারীরা এসে বলে গেছে ? আবু হাতেম বললেন ঃ না, আমি এমনিতেই বুঝতে পারি! প্রশ্নকারী এবার বললো, তাহলে কি আপনি 'ইলমে গায়েবের দাবিদার' ? আবু হাতেম জবাবে বললেন, তুমি গিয়ে বড় বড় আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তাঁরা যদি আমার মতো একই কথা বলে তাহলে বুঝে নেবে আমি মিথ্যা কিছু বলিনি। প্রশ্নকারী সাথে সাথে আবু যারআ'র

www.pathagar.com

কাছে গিয়ে একই কথা জানতে চাইলো। তিনি তাই বললেন, যা আবু হাতেম বলেছিলেন। প্রশ্নকারী বুঝতে পারলো, সন্তুষ্ট হলো।[১]

কোন কোন মুহাদ্দিসীন বলেন ঃ

أثر يعجم على قلو بهم لايمكنهم رده وهيئة نفسانية لامعدل لهم –

এটা এমন একটা ব্যাপার যা হাদীসের গবেষক-সাধকদের অন্তরে উপনীত হয় এবং তারা তাকে রোধ করতে পারে না। এটা মানসিক প্রভাব যা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

মুহাদ্দিসীনগণের এই দাবি সম্পূর্ণ সত্য এবং সঙ্গত। বর্ণনা পরম্পরা নিয়ে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হলে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি তৈরী হয় যা দিয়ে সে নিজেই অনুভব করতে পারে যে, এই কথা সত্যি সত্যিই আল্লাহ্র রাসূল (স) বলেছেন কি না! একইভাবে শরীয়তের বিধান ও মাসায়েলের ভালো-মন্দ নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ-গবেষণা ও চর্চা, এমন এক মানসিকতা তৈরী করতে পারে যা দিয়ে সে নিরূপণ করতে পারে যে, রাসূল (স) এরকম কোন আদেশ দিতে পারেন কি না ? কিন্তু এই ভালো-মন্দ নিরীক্ষণের দায়িত্ব মুহাদ্দিসগণের ওপর অর্পিত নয়। তা 'মুজতাহীদগণের' জন্যে নির্দিষ্ট। এই কারণেই যখন ইমাম আবু হানিফা তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের উপলব্ধি নিয়ে কিছু হাদীসকে অর্থহীন-অপ্রাসাঙ্গিক বলে ঘোষণা দিলেন তখন স্থূল দৃষ্টির অধিকারীরা তার বিরোধিতা করলো। কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, ইমাম সাহেব বিবেক-বুদ্ধির বিচার দিয়ে হাদীসকে বাতিল করে দেন। এখন বিবেকবান বুঝে দেখতে পারেন, যখন বর্ণনা পরম্পরা এবং বর্ণিত কথার পর্যবেক্ষণে খোদ মুহাদ্দিসীনদের এমন অভিরুচি তৈরী হয়ে যায় যা দিয়ে তারা বাহ্যিকভাবে সব শর্ত পূরণ করে হাদীসকেও বাতিল করে দিতে পারেন। তাহলে যে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ মেধা ও স্বীকৃত যোগ্যতা নিয়ে সমকালীন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী শরিয়তী বিধানের ভালো-মন্দ নির্ণয়ের গভীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালিয়েছেন তিনি কেন এই উপলব্ধির স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকবেন ? বস্তুত এ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও ভয়ঙ্কর দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অত্যন্ত উঁচুমানের আলেম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, সূক্ষ্ম জটিলতায় আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং সেখান থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত— এই রকম একজন ব্যক্তির পক্ষেই এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতে পারে। এইসব মহান ও পবিত্র গুণাবলীর সমন্বয় ইমাম আবু হানিফার চাইতে বেশি আর কার মধ্যে পাওয়া যাবে ?

হাদীসসমূহের বিন্যাসে বৈপরীত্য

ভীষণ প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল একটি কাজ, যার গোড়াপত্তন ইমাম আবু হানিফা (রহ) করেছেন। তাহলো হাদীস সমগ্রের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস। জীবন যাপনের মৌলিক বিধান (আহকাম) এবং উদ্ভূত সমস্যাবলীর (মাসায়েল) ঐশী সমাধানের প্রথম উৎস 'কুরআন'— যার মধ্যে কারো কিছু বলার অবকাশ নেই। কুরআনের পরে হাদীসের স্থান। হাদীস এবং কুরআনের মূল নির্দেশনার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই।

যা কিছু পার্থক্য এবং বৈপরিত্য আছে তা দলিল প্রমাণের কারণে আছে। বিশ্বস্ত পরম্পরার মাধ্যমে কোন হাদীস নির্ভুল প্রমাণিত হলে, (ঠিক যেমন কুরআন "লা রাইবা ফীহে" প্রমাণিত) তা কুরআনে বিধৃত বিধানের মতোই কার্যকর বা সমমানের। কিন্তু হাদীসসমূহ নির্ভুল প্রমাণ করার দলিলে রয়েছে প্রচুর গড়মিল এবং বিধানকে কার্যকর প্রমাণের জন্য সেইসব পার্থক্য এবং

১. ফাতহুল মুগীস, পৃষ্ঠা ৯৮

www.pathagar.com

ব্যবধানের সুস্পষ্ট মান-পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। মুহাদ্দিসগণ হাদীস সমগ্রকে বিন্যাস করেছেন— শুদ্ধ, সুন্দর বা উত্তম, দুর্বল, প্রসিদ্ধ, শক্তিশালী এবং বিরল ইত্যাদি ধরনের মান অনুযায়ী। তাঁদের বিন্যাসের ধরন কার্যকর বিধানের ওপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে না, সুতরাং মুহাদ্দিসীনগণ শুধুমাত্র 'যয়ীফ' বা দুর্বল ছাড়া বাদবাকী সব ধরনের হাদীসকে প্রায় একই রকম বিশ্বাসযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেন। এর চাইতে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিভাজন তাঁদের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা বিধানের অনুসন্ধান এবং মাসায়েলের শাখা-প্রশাখা খুঁজে বের করে তার কার্যকর সমাধান উদ্ভাবন তাদের দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার ইসলামী নীতি শাস্ত্র (ফিকাহ্) সংকলনের জন্য— যার উদ্ভাবকও তিনিই বটে— অনেক বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজনের মাধ্যমে এক নতুন ধরনের বিন্যাসে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি হাদীসসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ অনুযায়ী তাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. **পরম্পরাগত ঃ** (মুতাওয়াতির) এমন হাদীস যার বর্ণনায় প্রথম স্তরের বর্ণনাকারীদের মান ও পরিমাণ এতো বেশি থাকতে হবে যার পরম্পরায় মিথ্যা বা সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে। অর্থাৎ রাসূল (স)-এর কাছ থেকে অসংখ্য লোক তা শুনেছে এবং তারাই বর্ণনা করেছেন। এভাবে যুগ পরম্পরায় অগণিত মানুষ তার বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যাচ্ছে।

২. **প্রসিদ্ধ (মশহুর) ঃ** অর্থাৎ সেই হাদীস, যার প্রথম স্তরের বর্ণনাকারী অনেক না হলেও দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনাকারীদের থেকে শুরু করে এমনভাবে চলে আসছে যে সময়ের পরিবর্তন তাকে এতোটুকু অস্পষ্ট করতে পারেনি। অসংখ্য মানুষ তার বর্ণনা পরম্পরার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে।

৩. **আহাদ ঃ** যা মুতাওয়াতির ও মশহুর নয়।

তাঁর মতে এই বিভাজন শরীয়তের বিধানের ওপরে যে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে তা নিম্নরূপ। মুতাওয়াতির থেকে অবশ্য পালনীয় নির্দেশসমূহ (ফরযীয়াত) এবং তার প্রকৃতি প্রমাণ হতে পারে। মশহুরের গুরুত্ব যেহেতু মুতাওয়াতির থেকে কম সেহেতু তা দিয়ে ফরযীয়াত প্রমাণিত না হলেও কুরআনে যে আদেশ মুক্ত বা সাধারণ করে দেয়া হয়েছে মশহুর দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ বা শর্তযুক্ত করা যায়। একইভাবে তা দিয়ে 'যেয়াদাতু আলাল কিতাব' হতে পারে। আহাদের দলিল যেহেতু সম্পূর্ণ ধারণা-অনুমাণের ওপর নির্ভরশীল তাই কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানের ওপর তার কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই। বিষয়টা অত্যন্ত পরিষ্কার কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং আরও কিছু মুহাদ্দিসীন এর বিরোধী। ইমাম বায়হাকী প্রমুখ ইমাম শাফেয়ী (রহ) ও ইমাম মুহাম্মদের (রহ) মধ্যে সংঘটিত কিছু বিতর্কের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে যেসব মাসআলা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে তাতে ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইমাম মুহাম্মদকে লা-জবাব করে দিয়েছেন। যদিও আমাদের কাছে এই বিতর্ক 'ফরযী' বিতর্ক যাদের দলিল (উসূলে রাওয়ায়াত) বর্ণনা রীতির নীতি অনুযায়ী কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু এটা অবশ্যই প্রমাণ হতে পারে যে, ঐ মাসআলার প্রতিষ্ঠা ইমাম আবু হানিফার অনুকূলে যাবে। এমন সব শক্তিশালী যুক্তি এই মাসআলা প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, খোদ ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর ছাত্ররাও তার ওপর দাঁড়াতে পারেননি। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাতে লিখেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী ইমাম মুহাম্মদকে প্রশ্ন করলেন ? আপনার কাছে কি

www.pathagar.com

মনে হয়, খবরে ওয়াহেদ দিয়ে কুরআনের ওপর বাড়াবাড়ি হতে পারে না ? ইমাম মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। ইমাম শাফেয়ী বললেন ঃ কুরআন মজীদে উত্তরাধিকারীদের জন্য অসীয়ত করার সরাসরি আদেশ রয়েছে। لاوصية للوارث (উত্তরাধিকারি রজন্য কোনো অসীয়ত নেই) এই হাদীস অনুযায়ী কেমন করে আপনি তাকে নাজায়েয করেন।

শাহ সাহেব সম্ভবত বায়হাকীর শাফেয়ীর গুণাবলী (মানাকিবুশ শাফেয়ী) অধ্যায় থেকে উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে আরো কিছু সঙ্গতিহীন বর্ণনার উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু আমরা শাহ সাহেবের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, হানাফীদের কাছে উত্তরাধিকারীর জন্য উত্তরাধিকারের বিধান কোন হাদীস দ্বারা রহিত হয়নি বরং কুরআন মজীদের সেই আয়াত যার মধ্যে উত্তরাধিকারী করার আদেশসমূহ রয়েছে। এটা শুধু হানাফীদেরই মতামত নয়, বরং সকল মুফাচ্ছিরীনদেরও এই একই কথা। الاالشاذ النادرمنهم —কিন্তু খুবই কম সংখ্যক ছাড়া।

এইব মাসায়েল নিয়ে আরো অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু 'আখবারে আহাদ' এর বিতর্ক এবং তা থেকে 'ইসলামী আকায়েদের' ওপর যে প্রভাব পড়ে, তাকে নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করবো। কেননা কোন কোন মুহাদ্দিসীনের এইসব মাসআলা নিয়েই ইমাম সাহেবের সাথে যতো বিতর্ক।

আখবারে আহাদের মান ও মর্যাদা

'আখবারে আহাদ' সম্পর্কে চিন্তাবিদ এবং নেতৃস্থানীয় হাদীস বিশারদগণের এটাই অভিমত যে, তার দলিল-প্রমাণ ধারণা-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তৈরী করা। এর বিরুদ্ধেও একটি দল আছে যাদের নেতা আল্লামা ইবনুস্ সালাহ। কিন্তু তিনিও আখবারে আহাদের সব হাদীসকে অকাট্য মনে করেন না। তিনি সহীহ্ হাদীসকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন। (১) যার ওপরে বুখারী ও মুসলিম দু'জনেই একমত, (২) বুখারী একা, (৩) মুসলিম একা, (৪) বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি কিন্তু তা তাদের নির্ধারিত শর্তগুলো পূরণ করে, (৫) শুধু বুখারীর শর্ত পূরণ করে, (৬) মুসলিমের শর্ত পূরণ করে, (৭) বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী নয় কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসীনগণ তাকে সহীহ্ বলে স্বীকার করেন। এই সাতটি শ্রেণীর মধ্যে আল্লামা ইবনুস্ সালাহ্ প্রথম শ্রেণীকে শুদ্ধতম বলে ঘোষণা করেছেন এবং লিখেছেন ঃ

وَهٰذَا القسم جميعه مقطوع بصحة والعلم النظرى واقع به –

আর এই প্রকার, যার পুরোটিই বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে অকাট্য এবং চিন্তামূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবিচল, দৃঢ়।

দুই একক, বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই যে, এতদুভয়ের মধ্যে অল্প কিছু হাদীস ছাড়া যাদের নিয়ে 'দারেকুৎনী' প্রমুখ সমালোচনা করেছেন। ইবনুস সালাহ্‌র বক্তব্য স্থূলদৃষ্টির লোকদের মধ্যে বিশেষ করে ইদানীংকালে খুব বেশি চর্চিত হচ্ছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন। নেতৃস্থানীয় মুহাদ্দিসগণ এর বিপক্ষে। আল্লামা নূদী সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইবনুস সালাহ্‌র বক্তব্য সবিস্তারে উল্লেখ করে লিখেছেনঃ

وهذا الذى زكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ماقاله لمحققون والاكثرون فانهم قالو احاديث الصحيحين التى ليست بمتو اتره انما تفيد الظن

فـانـهـا احـادوالاحـاد انـمـا تـفـيـد الـظـن عـلـى مـاتـقـررولا فـرق بـيـن الـبـخـارى ومـسلم وغـيـر همافى ذالك

অর্থাৎ শায়খ ইবনুস সালাহ্ এ প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছেন, অধিকাংশ সত্য সন্ধানী গবেষকগণ তার বিরোধী। তাঁদের বক্তব্য হলো, সহীহ্ দু'খানী হাদীস গ্রন্থের হাদীসসমূহ ধারাবাহিক পরম্পরার সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌছায়নি। শুধু ধারণা-অনুমানের পূর্ণাঙ্গ রূপ। কেননা তা 'আখবারে আহাদ' এবং আখবারে আহাদ সম্পর্কে ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তা থেকে শুধু ধারণা সৃষ্টি হতে পারে! এবং এক্ষেত্রে বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য যারা এরকম আছেন তারা সবাই সমান।

ইবনুস সালাহ্র বক্তব্যকে অন্যান্য মনীষীবৃন্দও নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা এই আলোচনাকে আক্ষরিকভাবে অতিক্রম করতে চাই না। আমাদের ভালো করে বুঝে দেখতে হবে যে, 'আখবারে আহাদ' থেকে নিশ্চিত বিশ্বাস তৈরী হতে পারে, না নিছক ধারণা-অনুমান ?

অনুমান ভিত্তিক দলিলের বিশ্লেষণ

একজন মুহাদ্দিস (তিনি যে মান ও মর্যাদারই হোন না কেন) যখন কোনো হাদীসকে শুদ্ধ বলেন তখন তার এই দাবি কিছু পরোক্ষ দাবির ওপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। যেমন (১) তার বর্ণনা ধারাবাহিক, (২) বর্ণনাকারী আস্থাভাজন, বিশ্বাসযোগ্য, (৩) নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ, (৪) বর্ণনায় কোনো ব্যতিক্রম বা অস্বাভাবিকতা নেই, (৫) ত্রুটির কোনো কারণ নেই। জিনিসগুলো সবই ধারণা ও গবেষণালব্ধ মানসিক উপলব্ধি, যার ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। যেভাবে একজন ফকীহ্ কোনো মাসআলাকে কুরআন অথবা হাদীস থেকে অনুসন্ধান করে নিজের অভিজ্ঞতায় সত্য বলে বুঝে নেন এবং এই ধরনের সত্যতা সুনিশ্চিত বা সন্দেহাতীত হয় না। কেননা গবেষণায় যেসব উপাত্য থেকে তিনি সাহায্য নিয়েছে তার অধিকাংশই ধারণা-অনুমান ভিত্তিক। হাদীসের ব্যাপারটাও তাই। কোনো হাদীসকে শুদ্ধ বলা, তা মুহাদ্দিস মহোদয়ের ধারণা এবং গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই বলা। একজন অথবা কয়েকজন মুহাদ্দিসীন কোনো হাদীসকে শুদ্ধ বলেছেন এবং অন্য একজন তাঁদের সেই সত্যতাকে মেনে নিচ্ছেন না তাহ্লে এই অস্বীকারকারী ব্যক্তি শুধু এতটুকু অপরাধে অপরাধী যে, সে ঐ মুহাদ্দিস বা মুহাদ্দিসীনদের অনুসন্ধান রীতি, গবেষণার নিয়মাবলী, বর্ণনার ধরন অর্থাৎ তাঁর বা তাঁদের ইজতিহাদের বিরোধী! অন্য কিছু নয়।

হাদীস গবেষণায় মুহাদ্দিসীনগণ যে রীতি-নীতি নির্ধারণ করেছেন এবং যা হাদীসসমূহের শুদ্ধতা নির্ণয়ের মাপকাঠিও বটে। এই গোটা ব্যাপারটাই আসলে বুদ্ধিবৃত্তিক এং গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা। এবং এ কারণেই মুহাদ্দিসীনগণ পারস্পরিক মতদৈততা ও মহা স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত। স্থূল দৃষ্টির অধিকারীরা মনে করে হাদীসের সম্পূর্ণ বিষয়টি বর্ণনা ভিত্তিক, এখানে বুদ্ধি-বিবেচনার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি হাদীস বিষয়ের নীতি শাস্ত্র (উসূলে হাদীস) সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন তিনি খুব সহজেই এই ভ্রান্তিটা বুঝতে পারবেন। গোটা বিষয়ের এই দিকটির দিকে ইমাম আবু হানিফা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

هذا الذى نـحـن فـيـه رأى لابـخـبـر عـلـيـه احد اولا نـقـول يـجـب عـلـى احد قبوله –

ইহা যা খবরে আহাদ যাতে আমরা রায় দিই, না কাহকে এর ওপর আমল করাকে আবশ্যক মনে করি। (অর্থাৎ আমরা এর গ্রহণ করাকে কারো ওপর আবশ্যক করিনা)

কতিপয় লোক ভুল করে ইমাম আবু হানিফার এই ব্যাপকার্থের কথাটিকে শুধুমাত্র 'ফিকাহ' সম্পর্কে নির্দিষ্ট মনে করেছেন। তাদের জানা নেই যে, মুজতাহিদকে সকল মাসায়েলের উৎসের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়।

শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ

হাদীসের ব্যাকরণ অর্থাৎ উসূলে হাদীস বিষয়টি সম্পূর্ণত বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ হওয়ার কারণেই হাদীসের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের পরস্পরের মধ্যে যতো বিতর্ক সৃষ্টি হয়। একজন মুহাদ্দিস একটি হাদীসকে প্রমাণিত দলিল ভিত্তিক ওয়াজিবুল আমল বলে ঘোষণা দিচ্ছেন, তো আর একজন মুহাদ্দিস সেই একই হাদীসকে দুর্বল বা নকল হাদীস বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মুহাদ্দিস ইবনে জাওযী এমন কিছু হাদীসকে তৈরী করা নকল হাদীসের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন যাকে অন্যান্য মুহাদ্দিসীন শুদ্ধ, সুন্দর, উত্তম বলে তুলে নিয়েছেন। ইবনে জাওযী আরও একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছেন— সর্বজন স্বীকৃত শুদ্ধতম দু'খানী হাদীস সংকলনের (বুখারী-মুসলিম) কিছু হাদীস নকল, বানোওয়াট হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লামা সাখাভী লিখেছেন ঃ

بل ربما اورح فيها الحسن والصحيح مماهوفى احد الصحيحين فضلا من خير هما -

অর্থাৎ ইবনে জাওযী 'হাসান' এবং 'সহীহ' যা বুখারী ও মুসলিমে সংকলিত তাকেও নকলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এবং অন্যান্য কিতাবের উল্লেখ করেছেন।

সন্দেহ কি যে, ইবনে জাওযী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছেন ? কিন্তু এ ভুল কি আসলে সে রকম কিছু ? না তা নয়। এ ভুল ইজতিহাদী ভুল বা ভ্রান্তি। যার সারকথা হবে তিনি বুখারী অথবা মুসলিমের সঠিক ইজতিহাদকে সর্বৈভ সঠিক মনে করেন না। এইসব নীতিগত মতপার্থক্যের কারণে হাদীসসমূহের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়ে যে মহাবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার বিস্তারিত ইতিহাস লিখলে এক বিশাল বিশ্বকোষ তৈরী হতে পারে!

শুদ্ধতম হাদীসের প্রধান শর্ত হলো খোদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত ধারাবাহিক পরম্পরা নেহায়েত আস্থাভাজন এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে। কিন্তু এই যোগসূত্র প্রমাণের যে পদ্ধতি স্থির করা হয়েছে খোদ সেই পদ্ধতির অবকাঠামোই বেশিরভাগ ধারণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইজতিহাদের উপাদান দিয়ে নির্মিত। সাহাবাগণের এইসব উক্তি "এই কাজটি সুন্নত, আমাদেরকে এটা কম দেয়া হয়েছিল, আমাদেরকে এ ব্যাপারে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে এই কাজগুলো করতাম অথবা আমরা এগুলোকে 'খারাপ' মনে করতাম না। ইত্যাদি কথাগুলোকেই অধিকাংশ মুহাদ্দিস সর্বোচ্চ মানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেউ কেউ এ ব্যাপারে এতোটা অগ্রগামী হয়েছেন যে, যেসব হাদীসের মধ্যে এইসব উক্তি রয়েছে তাদেরকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন বলে বর্ণনা করে দিয়েছেন। অথচ

www.pathagar.com

এসব উক্তি নির্ভুল দলিল ভিত্তিক নয়! বরং সাহাবাগণের ধারণা এবং তাদের ইজতিহাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যাপারে সাধারণভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে যে, فهم الصحابى ليس بحجة —সাহাবীদের (রা) বুঝ বা উপলব্ধি কোন দলিল নয়। এই রায়ের ওপর ভিত্তি করেই কিছু ওলামায়ে কেরাম প্রতিবাদ করেছেন যে, এইসব উক্তি বর্ণনা সূত্র নির্ভুল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। ইমাম শাফেয়ী, ইবনে হায্‌ম, জাহিরী, আবু বকর রাযী এবং আরও সত্যপন্থী আলেমগণ "এই কাজটি সুন্নত" সাহাবাগণের এই ধরনের কথাকে "হাদীসে মরফূ" বলে স্বীকৃতি দেননি। জীবনচরিত ও হাদীস গ্রন্থসমূহে এমন হাজারো উদাহরণ পাওয়া যায় যার মধ্যে সাহাবাগণ ঐসব উক্তি ব্যবহার করেছেন। এসব কথা নবী (স)-এর বাণী ছিল না বরং সাহাবীগণেরই ধারণা বা ইজতিহাদ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ঐসব হাদীসকে শুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং এই ধারণাটাই সম্পূর্ণ পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে দিয়েছে। অনেকে এরই ওপর ভিত্তি করে দ্ব্যর্থহীন হাদীস বর্ণনা করে দিয়েছেন। যে কারণে সন্দেহজনক অবস্থাটা গোটা পরিবেশকে ঘিরে ফেলেছে।

সূত্র ধারায় বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে

সূত্র ধারায় বর্ণিত বর্ণনাগুলোর বর্ণনা সূত্র প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অথচ এই ধরনের বর্ণনাই বেশি। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মতামত হলো, বর্ণনাকারী এবং যার থেকে সে বর্ণনা করেছে এই দু'জন একই সময়ের এবং পরস্পরের সাক্ষাত হয়েছে, তাহলে তার ধারাবাহিকতা সংযুক্ত ধরে নেয়া হবে। ইমাম বুখারীর ছাত্র এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম মুসলিম এই বিষয়টা নিয়ে উস্তাদের সাথে শক্তভাবে বিরোধিতা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শুধু একই সময়ের হওয়াকে যথেষ্ট মনে করেন।[১] এই মতপার্থক্যের পরিণতি—ইমাম বুখারীর নিয়ম অনুযায়ী ইমাম মুসলিমের সূত্র ধারায় বর্ণিত বর্ণনাগুলো, যাতে 'সাক্ষাৎকার' প্রমাণিত নয় তার সবই ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ ইমাম মুসলিম তাদেরকেই সংযুক্ত মনে করেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর আপন অবস্থান সম্পর্কে তিনি দৃঢ় সংকল্প। যাই হোক, ইমাম মুসলিম বর্ণনা পরম্পরার পরিধিকে উস্তাদের চাইতে আরও প্রশস্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু বুখারীও যে কঠিন শর্ত এবং সীমিত গণ্ডির ধারা পরম্পরাকে গ্রহণীয় মনে করেন সেটাও তো নিছক ধারণার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেননা একই সময়ের দুই ব্যক্তি তাদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত হয়েছে এখন এই দুই ব্যক্তির কথা সব সময় একই হবে এমন গ্যারান্টি কে দিতে পারে? যেখানে حدثنا এবং اخبرنا হবে সেখানে অবশ্য একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে! কিন্তু যদি এই শব্দ দু'টি না হয় এবং বর্ণনাকারী عن শব্দ দিয়ে বর্ণনা করে তাহলে যোগাযোগের সম্ভাবনা বেশি হতে পারে বটে; কিন্তু নিরেট আস্থাশীল হবে না। হাদীস ও জীবন চরিতের মধ্যে এমন হাজারো উদাহরণ পাওয়া যাবে যে, দু'জন বর্ণনকারী একই সময়ের এবং এদের পরস্পরে সাক্ষাতও হয়েছে। তার পরেও একজন অন্যজন থেকে কিছু বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যম অন্য আর একজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে, যা স্মরণ করলেই আমরা বুঝে নিতে পারি।

---

১. মুকাদ্দামাহ্ সহী মুসলিম

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্বের যাচাই

সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অথচ সমস্যার বিষয় হলো অতীতকালের ঐসব ব্যক্তিবর্গের আস্থাশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা যারা হাদীসের ইতিহাসের সাথে মাখামাখি হয়ে আছেন। অথচ আখবারে আহাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি তাদের ওপরেই বর্তানো। তারাই তার মাপকাঠি। আর এই মাপকাঠিগণের মান নির্ণয় ব্যাপারটি একদিকে যেমন সম্পূর্ণত বুদ্ধিবৃত্তিক অপরদিকে তার কোন স্থায়ী সমাধান শুধু অসম্ভব নয় অবাস্তবও বটে।— একজন ব্যক্তি যাকে অনেক লোক অত্যন্ত আস্থাভাজন, বিশ্বাসযোগ্য এবং একেবারে সঠিক মনে করে! এই একই ব্যক্তিকে অন্য অনেক লোক ততোটা আস্থাভাজন, সঠিক এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে ততোটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো, উভয় দলের লোকেরাই এমন মান, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না! ইমাম বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যে তেমন কোন বড় মতবৈষম্য নেই তবুও এমন অনেক বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদের এই দুই ইমামের একজন বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, আর অপরজন তাকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। আল্লামা নুদী সহীহ্ মুসলিম শরীফের বিস্তৃত ব্যাখ্যার ভূমিকায় এই রকম কতিপয়ের নামও উল্লেখ করেছেন এবং মুহাদ্দিস হাকিমের "কিতাবুল মুদ্খাল" থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইমাম মুসলিম সহীহ্ সনদের প্রমাণস্বরূপ তার সংকলনে যাদেরকে পেশ করেছেন ইমাম বুখারী তার শুদ্ধ সংকলনে দলিল হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেননি এমন ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ৬২৫।

বর্ণনাকারীদের দলিল ও প্রমাণের গড়মিল

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, হাজার হাজার বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদের কথা এবং ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যাপারটা তো আসলে খুবই স্বাভাবিক ছিল। কেননা কোনো মানুষের সেইসব গুণাবলী ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া, যা দিয়ে বর্ণনাটির মান অনুমান করা যায়, তা তো দীর্ঘদিন খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা এবং অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে! হাদীস সংকলনের কাজ যারা করেছেন তাদের পক্ষে এই হাজার হাজার বর্ণকারীদের ব্যক্তি চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হওয়া কোনভাবেই কি সম্ভব ? এই জন্য বিভিন্ন গুণাবলী, বাহ্যিক চরিত্র এবং সাধারণ খ্যাতি ইত্যাদির শ্রুতিনির্ভর ধারণা নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। যা দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া খুব কমই সম্ভব হয়েছে। মুহাদ্দিসীনগণ যদিও এই সমস্যার সমাধানকল্পে একটা নীতি নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু সে নীতিও তাদেরই উদ্ভাবিত। অর্থাৎ ধারণা-অনুমান এবং চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করা। যার ওপরে তারা নিজেরাই সব সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। সাধারণভাবে বর্ণনার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্বলতাসমূহ সূক্ষ্ম যাচাই বাছাইয়ের শর্ত সাপেক্ষ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদের ব্যাপারে এই নীতি অনুসরণ করা হয় না। মুহাম্মদ বিন বাশার মিসরী, আহমাদ বিন সালেহ মিসরী, আকরামা মাওলা, ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুত এবং দুর্বলতা বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে কিন্তু সেসব ঠিক গণ্য করা হয় না।

বিস্ময়কর হলেও সত্য এই যে, বাছ-বিচার না করে বর্ণনাকারী এবং যাচাই বাছাই করে বর্ণনাকারী উভয় পক্ষই এ বিষয়ের ইমাম পর্যায়ের ব্যক্তিত্ববর্গ। তাদের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে মাঝে মাঝে এমন মারাত্মক বৈষম্য দেখা যায়, যা প্রায় দিশাহারা করে দেবার মতো। জাবের

জাফী কুফী একজন বিখ্যাত বর্ণনাকারী। যিনি দাবি করেন, পঞ্চাশ হাজার হাদীস তাঁর স্মরণে আছে। তার ব্যাপারে উভয় পক্ষের ইমামগণের মতামত এখানেও উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

সুফিয়ান বলছেন, আমি হাদীসের ব্যাপার জাবেরের চাইতে সতর্ক-সাবধানী আর কাউকে দেখিনি। শো'বা বলছেন, জাবের যখন 'আখবারনা' ও 'হাদ্দাসনা' বলেন, তখন তা গোটা মানব সমাজের মধ্যে দৃঢ়তর মনে করতে হবে।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী শোবাকে বললেন, তুমি যদি জাবের জাফীর ব্যাপারে কথাবার্তা বলো তাহলে আমিও তোমার ব্যাপারে কথাবার্তা বলবো।

ওয়াকী বলছেন, তোমরা অন্য কারো ব্যাপারে সন্দেহ করো, তা করতে পারো, কিন্তু জাবের জাফীর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করোনা।

বিষয়ের অন্যান্য ইমামগণের অবস্থান ঠিক এর উল্টোদিকে। জাবেরের ব্যাপারে তাঁদের প্রয়োগ করা শব্দগুলো গায়ে কাঁটা দেবার মতো ভয়ঙ্কর। তাঁরা বলেন, সে পরিত্যক্ত, বর্জিত, মিথ্যাবাদী, হীন-অপদস্থ।

সুতরাং সফল মুহাদ্দিসীনের মতামত অনুসন্ধান করা হলো। শেষ পর্যন্ত ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, জাবেরের বর্ণনা আদৌ গ্রহনযোগ্য নয়। আলোচনার মানে এই নয় যে, 'ত্রুটি সন্ধান এবং সংস্কার' গোটা বিষয়টাই তার বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলেছে। বরং মূল উদ্দেশ্য হলো এই যে, যেসব অবলম্বন এবং উপায় মাধ্যমের সাহায্যে বর্ণনা পারম্পরার ব্যক্তিত্বগণের সঠিক অবস্থা লেখা হয়েছে এবং লেখা যেতে পারত, তার অবস্থান, সুস্পষ্ট ধারণা বা নিছক ধারণা-অনুমান এর চাইতে বেশি উর্দ্ধে স্থান দেয়া যায় না। একারণেই তার ওপর সন্দেহাতীত স্থীর বিশ্বাসের ভিত্তি কোনো ভাবেই স্থাপিত হতে পারেনা।

ভাব প্রকাশ প্রসঙ্গে

ভাব প্রকাশের যথার্থতা নিয়ে একটা প্রশ্ন তারপরেও বাকী থেকে যায়। যেমন ঃ একটি হাদীস সকল মুহাদ্দিসীন এবং মুজতাহিদীনের নির্ধারিত নীতি এবং বর্ণনা পরম্পরার সঠিক রীতি অনুযায়ী প্রমাণিত। বর্ণনাকারী আস্থাভাজন, সেখানে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তার পরে যে প্রশ্নটি বাকী থাকে তাহলো-- বর্ণনাকারী তার বর্ণনায় সঠিক বার্তাটির প্রকাশ করতে পেরেছে কি না। স্থান-কাল-পাত্র, অর্থাৎ বর্ণনা রীতির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখা হয়েছিল কি না। তার বুঝ এবং পরে তা বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো ভুল করেছে কি না। এটা যেহেতু স্বীকৃত যে, অধিকাংশ হাদীস অর্থ এবং তাৎপর্যমূলকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এইসব সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়! সাহাবাগণের সময়ে কোনো বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করা হলে তা এইসব সম্ভাবনার আশংকা সামনে রেখেই করা হতো। কেননা সাহাবাগণ (রা) সাধারণভাবেই সত্যবাদী ছিলেন এবং তাদের বর্ণনায় মিথ্যার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

সহীহ্ মুসলিমের তায়াম্মুম অধ্যায়ে আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-কে প্রশ্ন করলেঃ আমার গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কিন্তু পানি পাওয়া যায়নি এ অবস্থায় ? হযরত উমর (রা) যেন কথাটি বুঝেই ফেলেছেন এভাবে সাথে সাথে বললেন ঃ তুমি নামায পড়বে না। হযরত আম্মার (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মাসআলাটি সম্পর্কে রাসূল (স)-এর

www.pathagar.com

একটি উক্তি বর্ণনা করে বললেন, আপনিও তো তখন উপস্থিত ছিলেন! হযরত উমর (রা) বললেন, اتق الله ياعما হে আম্মার! আল্লাহ্কে ভয় করো। এটাতো পরিষ্কার যে, আম্মার (রা) মিথ্যা বলেছেন, এজন্য তাকে আল্লাহ্কে ভয় করতে বলেননি, তিনি বরং রাসূল (স)-এর কথাটি তার বুঝতে ভুল হয়েছে, এজন্য সাবধান করেছেন। তখন আম্মার (রা) বললেন ঃ আপনার সম্মতি না হলে আমি আর এ হাদীস কখনো বর্ণনা করবো না।

'আখবারে আহাদের' আলোচনাকে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এতোটা বিস্তৃত করেছি কারণ মুহাদ্দিসীনগণ এইসব মাসআলার জন্যই ইমাম আবু হানিফার বিরোধিতা করেন। অথচ ইমাম সাহেবের মতামত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এই সকল সম্ভাবনা এবং ধারণা-অনুমান আখবারে আহাদের জন্য প্রযোজ্য। মুতাওয়াতির ও মশহুরের মধ্যে এ ধরনের বিতর্কের অবকাশ নেই। ঐসব কারণ এবং অসঙ্গতির জন্য আখবারে আহাদ সম্পর্কে এতো বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে। মুতাযিলা সম্প্রদায় একে সরাসরি অস্বীকার করেছে। কিছু মুহাদ্দিসীন কঠিনভাবে তাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে 'খবরে ওয়াহেদ'কে পুরোপুরি সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। শুধু শর্ত এতোটুকু রেখেছেন যে, বর্ণনাকারী আস্থাভাজন হতে হবে এবং বর্ণনা পরম্পরায় কোনো বিচ্ছিন্নতা বা ব্যতিক্রম হতে পারবে না। কিছু মুহাদ্দিসীন যদিও নীতিগতভাবে আখবারে আহাদকে ধারণা-অনুমান ভিত্তিক বলেন কিন্তু বিধি-বিধান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত মাসআলায় এর কার্যকারিতা কতোটুকু তা মনে রাখেন না। ইমাম আবু হানিফা (রা) এই বিতর্কের মধ্যে যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ এবং তাঁর বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়ক। না তিনি মুতাযিলাদের মতো সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এবং না স্থূল দৃষ্টির অতিভক্তদের মতো সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। ইমাম সাহেবের এই দৃষ্টিভঙ্গি বড় বড় সাহাবাগণের সাথে তুলনা করা যায়।

খবরে ওয়াহেদ নিঃসন্দেহ নয়

হযরত উমর (রা), হযরত আয়শা (রা), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) প্রমুখ বিভিন্ন সময় খরবে ওয়াহেদকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, কারণ তাঁরা তাকে নিঃসন্দেহ মনে করতেন না। ফাতেমা বিনতে কায়েস যখন হযরত উমর (রা)-এর সামনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছিলেন لاسكنى ولانفقة তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ

لاترك كتاب الله بقول امرة لا ندرى صدقت ام كذبت -

অর্থাৎ একজন মহিলার কথার ওপর ভরসা করে, যার সম্পর্কে জানা নেই যে, সে ঠিক বলছে না ভুল বলছে, আমরা আল্লাহ্র কিতাবকে ছাড়তে পারি না।

ফকহী বিধানে এই নিয়মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেমন 'আখবারে আহাদ' দিয়ে কোন হুকুমের 'ফরয' হওয়া না হওয়া প্রমাণ করা যায় না। কেননা ফরযসমূহ নিঃসন্দেহ দলিলের দাবি রাখে। তবে তা দিয়ে মোটামুটি এমন ধারণা পাওয়া যেতে পারে! যা দিয়ে ওয়াজিব, সুন্নত, মুসতাহাব ইত্যাদি প্রমাণ করা যায়। এর ওপর ভিত্তি করে নামাযে সূরা ফাতিহার তেলাওয়াত ইমাম শাফেয়ী ফরয মনে করেন এবং ইমাম আবু হানিফা ওয়াজিব। এভাবে বিভিন্ন আহকামের মান নির্ণয়ে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

ধর্মতত্ত্বে এই রীতির প্রভাব

ধর্মতত্ত্বের ওপর এই রীতির প্রভাব ফিকাহর চাইতে অনেক বেশি এবং ইমাম আবু হানিফাকে বিষয়টি নিয়ে একটা দীর্ঘসময়কাল ধরে গোটা ইল্‌মী পরিবেশের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। "যেসব রীতি-নীতি এবং মাসায়েল ইসলামে সাধারণভাবে সর্বসম্মত, তার বিপরীতে আখবারে আহাদের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেমন, আম্বিয়াগণের পবিত্রতা সাধারণভাবে একটি সর্বসম্মত এবং স্বীকৃত বিষয়। এর বিপরীতে যে সব বর্ণনায় নবীগণের দ্বারা পাপ বা অপরাধ সম্পাদন প্রমাণ হয় ইমাম আবু হানিফার রীতি অনুযায়ী সেইসব বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। এই নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকলে বেদ্বীনদের উত্থাপিত অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান মেলে। অথচ বর্ণনা বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই এই মূল্যবান সিদ্ধান্তটি মূল্যায়ন করলেন না; বরং বিরোধিতা করেছেন। ব্যাপারটা নেহায়েত দুঃখজনক। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে আবদুল বার কিতাবুল কুনীতে লিখেছেন ঃ

كان من مذهب الامام ابى حنيفة فى اخبار احدان لايقبل منها المخالف لاصول المجمع عليها فانكر عليها اصحاب الحديث فامن طو -

অর্থাৎ আখবারে আহাদ নিয়ে ইমাম আবু হানিফার মতামত ছিল যে, সাধারণভাবে সর্বসম্মত কোনো নীতিমালা বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তার এমন নীতিমালা বিরোধিতা করেছেন যা সকল সীমা অতিক্রম করে গেছে।

১. বর্ণনাটুকু হাফেয আবুল মুহাসিন উকূদুল জুমানে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

ফিকাহ্ এবং তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য

তাফসীর, হাদীস, মাগাযী, (সামরিক অভিযান) ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূত্রপাত যদিও ইসলামের সাথে সাথেই হয়েছে। কিন্তু যতোদিন পর্যন্ত এর এক একটি কোন পূর্ণ বিষয়ের রূপ ধারণ করেনি ততোদিন কোনো ব্যক্তিত্বের নামও তার সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে এসব বিষয়সমূহের সংগ্রহ, সংকলন ও গবেষণা প্রভৃতি কাজগুলো শুরু হয়। যাঁরাই এসবের সংকলন ও বিন্যাসের কাজ করেছেন তিনিই সেই বিষয়ের গোড়াপত্তনকারী বা প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। সুতরাং ফিকাহ বিষয়ের প্রতিষ্ঠাতার উপাধী ইমাম আবু হানিফা (রঁহ) পেয়েছেন। যুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবক বা জনক যদি এরিস্টোটল হয় তাহলে নিঃসন্দেহে ইমাম আবু হানিফাকে ইসলামের নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ ফিকাহর জনক বলা যায়। তাঁর সারা জীবনের জ্ঞান চর্চার নির্যাস বা ফসল এই 'ফিকাহ'। এই জন্য আমরা বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো। তবে তার আগে ইল্মে ফিকাহর কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে অপরিহার্য। যেন বুঝতে পারা যায় এর শুরু কিভাবে কখন হয়েছিল এবং বিশেষ করে ইমাম সাহেব যখন এ জগতে প্রবেশ করলেন তখন বিষয়টির অবস্থা কি ছিল ?

ফিকাহ্র ইতিহাস

ফিকাহর ইতিহাস সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ)-এর অত্যন্ত মূল্যবান রচনা রয়েছে। তা থেকে কিছুটা এখানে প্রণিধানযোগ্য। রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় ইসলামী বিধি-বিধানের কোন রকমফের ছিল না। রাসূল (স) সাহাবাগণের সম্মুখে অজু করতেন, তারা তা দেখে দেখে ঠিক সেভাবেই অজু করে নিতেন। রাসূল (স) বলেননি যে, এটা 'রোকন' এইটা 'ওয়াজিব' এইটা 'মুস্তাহাব'। নামাযের বেলায়ও তাই। সাবাহাগণ ফরয-ওয়াজিবের পার্থক্য করতেন না। যেভাবে যখন আল্লাহ্র রাসূলকে নামায আদায় করতে দেখতেন তারাও সে অনুযায়ী তাদের নামায আদায় করে নিতেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ "আমি রাসূল (স)-এর সঙ্গী-সাথীদের চাইতে উত্তম কোন জনগোষ্ঠী দেখিনি। তারা তাদের নেতার গোটা নবুয়তী জীবনে মাত্র তেরটি প্রশ্ন করেছিলেন যার সবই কুরআনে লেখা আছে"। তবে ব্যতিক্রমী কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে তখন তাঁরা রাসূলের (স) কাছে জিজ্ঞেস করতেন এবং রাসূল (স) তার জবাব দিতেন। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, তাঁরা কোন কাজ করে ফেলেছেন! রাসূল (স) তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন অথবা অসন্তোষ। এ ধরনের ফতোয়াগুলো বেশিরভাগই রাসূল (স)-এর সাধারণ বৈঠকে আলোচিত হতো এবং সাহাবাগণ তাঁর মতামত বা মন্তব্য বুঝে নিতে পারতেন।

রাসূল (স)-এর তিরোধানের পরে একদিকে যেমন মুসলিম সমাজের পরিধি বিস্তার লাভ করেছে অপরদিকে উদ্ভব ঘটেছে নিত্য নতুন হাজারো প্রশ্নের। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুসন্ধান এবং গবেষণামূলক প্রয়াস তখন অনিবার্য। সামগ্রিক বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের

www.pathagar.com

দিকে মনোযোগ না দিয়ে উপায় ছিল না। যেমন ঃ কোন একজন তার নামাযের কোন অংশ বাদ দিয়েই নামায আদায় করেছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে তার নামায আদায় হয়েছে ? না হয়নি ? এই প্রশ্ন উদ্ভবের প্রেক্ষিতে এমনও সম্ভব ছিল না যে, নামাযের সকল অনুসঙ্গকে ফরয বলে ঘোষণা করা যায়। সাহাবাগণ ভাবতে বাধ্য হয়েছেন এবং তাদের খুঁজে বের করতে হয়েছে নামাযের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ইত্যাদির কোনটা কতোটা। এই বিভাজনের জন্য যে নীতি নির্ধারণ করা যেতো তার নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার জন্য সকল সাহাবীর (রা)-এর ঐকমত্য সংগ্রহ ছিল অসম্ভব। মাসায়েল নিয়ে মতপার্থক্যের মূল বুনিয়াদ এখানেই রচিত হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে থাকলো। এমনো অনেক ঘটনা সম্মুখে আসতে লাগলো যার সমাধানে রাসূল (স)-এর বাস্তব কৃতকর্মের কোনো নমুনা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ সমাধান দিতে সাহাবাগণ বাধ্য ছিলেন। চিন্তা-ভাবনা এবং বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে তাঁরা তখন বাধ্য হয়েছেন। ইজতিহাদের রকম-ধরন যেহেতু সবার এক ছিল না, মতপার্থক্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। সর্বোপরি আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েলের এক বিরাট প্রতিষ্ঠান তখনই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যা সঙ্গত কারণেই ভিন্ন ভিন্ন রীতি-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চিন্তাবিদ ও গবেষণাধর্মী মতামত প্রকাশে বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। এঁদের মধ্যে হযরত আলী (রা) এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বেশিরভাগ সময় কুফাতেই কাটিয়েছেন। কাজেই বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসায়েল যা কিছু সেখানে প্রকাশ ও চর্চা হয়েছে তা তাঁদের চিন্তা-দর্শনের অভিব্যক্তি অনুযায়ী হয়েছে! যার ওপর ভিত্তি করে কুফা নগরী ইসলামী নীতি শাস্ত্রের এক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঠিক যেমন হযরত উমর (রা) এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) কে ঘিরে মক্কা ও মদীনা ইসলামী জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

হযরত আলী (রা)

শিশুকাল থেকেই হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোলে-পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও জীবনাচরণ আলী যতোটা কাছে থেকে শুনেছেন এবং দেখেছেন সাহাবাগণের মধ্যে এতোটা সৌভাগ্যের অধিকারী আর কেউ হতে পারেননি। হযরত আলী (রা) কে একজন জিজ্ঞেস করেছিল— এতো বর্ণনা আপনি কেমন করে করেন ? আলী (রা) বললেন ঃ "আমি যতো কথা জানতে চাইতাম সব আমাকে বলতেন আর যদি কখনো চুপ থাকতাম তাহলে নিজেই আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকতেন।" এর সাথে আলী (রা)-এর মেধা, প্রতিভা, উদ্ভাবন, আবিষ্কারের সূক্ষ্ম জটিলতায় বিদ্যুৎগতির সমাধান যোগ্যতা সাহাবাগণ সবসময়ই স্বীকার করতেন। হযরত উমর (রা) বলতেন, আল্লাহ্ না করুন, কোনো জটিল সমস্যা এসে দাঁড়ায় আর তখন আলী উপস্থিত নেই! আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) নিজে মুজতাহিদ ছিলেন কিন্তু বলতেন ঃ আমরা যখন আলী (রা)-এর ফতোয়া পেয়ে যেতাম তখন আর কিছুর প্রয়োজন মনে হতো না।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)

রাসূল (স)-এর অত্যন্ত কাছের মানুষ। এতোটা কাছে খুব কম লোকের পক্ষেই আসা সম্ভব

www.pathagar.com

হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমের হাদীস আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ ইয়ামান থেকে ফিরে আমরা কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করছিলাম, এসময় আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এতো বেশি আসতে-যেতে দেখেছি যে, আমাদের মনে হয়েছে তিনি রাসূল (স)-এর ঘরেরই একজন (আহলে বাইত)। আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ দাবি করে বলেন ঃ কুরআন মজীদে এমন কোন আয়াত নেই যার প্রেক্ষাপট আমার জানা নেই। তিনি আরো বলতেন ঃ কুরআন মজীদ সম্পর্কে আমার চাইতে বেশি যদি কেউ জানতো তাহলে তাঁর কাছে আমি পৌছে যেতাম তা যতো দূরের পথই হোক না কেন! "কোন এক সমাবেশে তিনি দাবি করে বলেন ঃ উপস্থিত সকল সাহাবাগণ জানেন যে, কুরআন মজীদ সম্পর্কে আমি সবার চাইতে বেশি জানি। শফীক (রা) সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিল। শফীক (রা) বলেন ঃ এরপরে আরো অনেক সাহাবাগণের মজলিসে আমি বসেছি কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের সেই দাবিকে অস্বীকার করেছে এমন লোক আমি দেখিনি"। ঘটনাটি সহীহ্ মুসলিমের একটি হাদীসের।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, রীতিমতো হাদীস এবং ফিকাহ্র তালিম দিতেন। তার দরসগাহে প্রচুর শিক্ষার্থীর সমাগম হতো। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— আসওয়াদ, উবায়দাহ, হারেছ, আলকামাহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। আলকামাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হযরত উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), আয়শা (রা), সো'ওদ (রা), হোযায়ফাহ্ (রা), খালিদ বিন ওলীদ (রা), খাব্বা (রা) এবং আরও অনেক সাহাবার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর সান্নিধ্যে এমনভাবে থেকেছেন এবং তাঁর বলা, কাজকর্ম এমনভাবে পদে পদে অনুসরণ-অনুকরণ করতেন যে, লোকেরা বলতো ঃ আলকামাহকে যে দেখে নিয়েছে সে অনায়াসে বলতে পারে আমি আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদকে দেখেছি। খোদ আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলতেন ঃ যতো তথ্যাবলী আলকামাহ্র জানা আছে তার চাইতে বেশি আমারও জানা নেই। এর চাইতে বেশি আর কি হতে পারে, স্বয়ং সাহাবাগণ আলকামার কাছে মাসআলা-মাসায়েল জানতে আসতেন। আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রা) ছাত্রদের মধ্যে আলকামাহ্র (রা) সমকক্ষ কেউ থাকলে সে 'আসওয়াদ' (রা)।

ইবরাহীম নাখয়ী (রহ)

আলকামাহ্ ও আসওয়াদ (রা)-এর ইন্তেকালের পরে ইবরাহীম নাখ্য়ী তাঁদের উত্তরসূরী হন এবং তিনি ফিকাহ্কে আরো বিস্তৃত করেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে 'ইরাকের ফকীহ্' উপাধী লাভ করেন। হাদীস সমগ্রের ওপর তাঁর অধিকার এতোটাই ছিল যে, তাঁকে 'হাদীসের জহুরী' বলা হতো। তাবেয়ীগণের নিদর্শন হিসেবে খ্যাত ইমাম শা'বী তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছেন, "ইবরাহীম নাখয়ী ফিকাহ্ ও অন্যান্য জ্ঞানের দিক দিয়ে সবাইকে অতিক্রম করে গেছে।" উপস্থিত একজন আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন রাখলো হাসান বসরী ও ইবনে শিরীনও ? হাসান বসরী ও ইবনে শিরীন আর এমনকি, বসরা, কুফা, শাম, হেজাযে তার চাইতে বড় আলেম আর কেউ ছিল না।

ইবরাহীম নাখ্য়ীর সময়কালেই ইসলামী নীতিশাস্ত্রের (ফিকাহ্) একটা সংক্ষিপ্ত-সমগ্রের আকার তৈরী হয়ে গিয়েছিল। যার মূল উৎস রাসূল (স)-এর হাদীস এবং হযরত আলী (রা) ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ফতোয়াসমূহ। যদিও সুবিন্যস্ত লিপিবদ্ধ আকার তখনো তা পায়নি। তবে তাঁর ছাত্র-শিষ্যরা তাঁর কাছ থেকে শিখে যেভাবে মুখস্ত করেছিলেন তার মধ্যে একটা

www.pathagar.com

বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। ইবরাহীমের ছাত্রদের মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন 'হামাদ', তাঁর স্মরণের সংগ্রহ ছিল সবচাইতে বেশি। সুতরাং ইবরাহীমের ইন্তেকালের পরে ফিকাহ্‌র 'মসনদে খিলাফত' তারই অধিকারে আসে। উস্তাদের রেখে যাওয়া বিষয়ের ওপর তেমন কোন অগ্রগতি হামাদ দিতে পারেননি! তবে উস্তাদের রেখে যাওয়া সংগ্রহের সত্যিকার উত্তরাধীকারীর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থও ছিলেন না। ১২০ হিজরী সালে হামাদ ইন্তেকাল করেন। ফিকাহ্‌র মসনদে খিলাফত শূন্য থাকেনি, লোকেরা ইমাম আবু হানিফাকে সেই মসনদে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম সাহেবের সময় পর্যন্ত ফিকাহ্‌র পরিসংখ্যান মাসআলা অনুযায়ী সংগৃহীত ছিল। কিন্তু তা ছিল মৌখিক বর্ণনা রীতির ওপর দাঁড়ানো এবং আলাদা কোন বিষয় হিসেবে নয়। অনুসন্ধান উদ্ভাবন এবং প্রমাণ উপস্থাপনের কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি স্বীকৃত ছিল না। বিধি-বিধান পালনের কোন শৃংখলাবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ও ছিল না। না ছিল হাদীসসমূহের পার্থক্য নির্ণয়ের কোনো পদ্ধতি আর না ছিল তার অনুরূপ সদৃশ উপস্থাপনের কোনো নির্দিষ্ট কায়দা। মোটকথা অসংখ্য মাসায়েলের সমাধান-সমগ্রের যে নাম 'ফিকাহ্' তার আজকের স্বীকৃত নীতিশাস্ত্রের অবস্থানে পৌঁছাতে তখনো অনেক সিড়ি বাকী ছিল।

কেমন করে ইমাম আবু হানিফার মনে ফিকাহ্ সংকলনের পরিকল্পনা এলো ঃ বিশেষ সেই কারণটি ইতিহাস থেকে খুঁজে বের করা খুবই দূরূহ কাজ। "ক্বালায়েদ উকুদুল আক্বইয়ান"-এর রচয়িতা যুদ্ধের নমুনা থেকে তার একটা গল্পের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গল্পটা এরকম— দুই ব্যক্তি গোসল করতে 'হাম্মামে' গেল। দু'জনেই হাম্মামের মালিকের কাছে তাদের কিছু আমানত রেখে গোসল করতে ঢুকলো। তাদের মধ্যে একজন গোসল করে বেরিয়ে এসে মালিকের কাছে গচ্ছিত আমানত ফেরত চাইলে সে তা দিয়ে দিলো। দ্বিতীয় জন একটু পরে বেরিয়ে এসে তার জিনিস ফেরত চাইলে মালিক বললো ঃ আমি তো তা তোমার সঙ্গীকে দিয়ে দিয়েছি! ততোক্ষণে প্রথমজন হাওয়া। কাজীর আদালতে মামলা ঠুকে দিলো দ্বিতীয় ব্যক্তি। কাজী হাম্মামের মালিককে দোষী সাব্যস্ত করে বললেন ঃ দু'জনে যখন একসাথে তোমার কাছে আমানত রেখেছিল তখন তোমার উচিত ছিল দু'জনের উপস্থিতিতে তা ফেরত দেয়া। হাম্মামের মালিক উপায়ান্তর না দেখে ইমাম আবু হানিফার কাছে গেল। তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি ঐ লোককে বলো যে, আমি তোমার আমানত ফেরত দিতে প্রস্তুত কিন্তু কাজী সাহেব যেভাবে বলে দিয়েছেন সে অনুযায়ী একজনকে তো আর দেয়া যায় না! তুমি তোমার সঙ্গীকে নিয়ে এসে তোমাদের আমানত ফেরত নিয়ে যাও। এই ঘটনাটি হঠাৎ ইমাম সাহেবের মনে ফিকাহ্‌র একটা সংকলন তৈরী করার কথা জাগিয়ে দিলো এবং তিনি তার বিন্যাস শুরু করে দিলেন।

হতে পারে ঘটনাটি সত্য, তবে এটাই একমাত্র কারণ, তা নাও হতে পারে। ইতিহাস অধ্যয়নে যতোটুকু অনুমান করা যায় তাহলো ১২০ হিজরীতে যখন উস্তাদ হামাদের ইন্তেকাল হয়ে যায় তখন ইসলামী সমাজের অবস্থা দিন দিন এতোটাই বড় হয়ে যাচ্ছিল যে, ইবাদাত-বন্দেগী, মাসআলা-মাসায়েল, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কিত হাজারো-লক্ষ প্রশ্নের জবাব এবং নিয়ন্ত্রণ আপাততঃ স্থায়ী কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে বিভিন্ন জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি এসে ভীড় করছিল ইসলামী সমাজের চারিপার্শ্বে। ফলে দিন দিন প্রচলিত মৌখিক পদ্ধতি অকার্যকর হয়ে পড়ছিল। খোদায়ী বিধানের খোদায়ী সংরক্ষণের ওয়াদা মুতাবিক সময়ের

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক অনেকের মনেই হয়তো 'নীতি-নির্ধারণ' বিষয়টির একটা লিখিত স্থায়ী রূপের প্রয়োজনবোধ আল্লাহ্ তা'আলা জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

ইবাদতে ধ্যানমগ্নতা এবং দ্বীন সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় ঐকান্তিক বিনয়ের সাথে করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে ইঙ্গিত লাভের আশায় গভীর গবেষণায় লিপ্ত হওয়া এ ছিল ইমাম আবু হানিফার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এরকম কোনো অবস্থায় কোনো ঐশী নির্দেশনা হয়তো তিনি লাভ করেছিলেন! এর সাথে নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপদেশে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষের সাথে তার সম্বন্ধ-সম্পর্ক, লেন-দেন ইত্যাদির ইসলামী রীতি-নীতি কি, তা সাধারণ্যে জানাবার তীব্র অনুভূতি হয়তো জেগে উঠেছিল! সর্বোপরি দেশ-বিদেশের হাজারো মানুষ বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে যেভাবে তাঁর কাছে ভীড় করতো তাতে নীতিশাস্ত্রের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে রূপদানের পরিকল্পনা তাঁর মতো মনীষীর মনে আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া শাসকগোষ্ঠীর দুঃশাসন এবং বিচারালয়সমূহে কাজীদের ভুল-ভ্রান্তি যার সাথে তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাই তাঁর পরিকল্পনার বিষয়টিকে জাতির জন্য তাঁর সম্মুখে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। সে যাই হোক, নতুন যে কোন কিছু উদ্ভবের পেছনে প্রেক্ষিতের যেমন একটা প্রয়োজন থাকে তেমনি সূত্রপাতের জন্য থাকে উপলক্ষ। ঠিক তেমনি ইসলামী নীতিশাস্ত্র ফিকাহ্‌র স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে জন্মলাভের প্রেক্ষিত এবং তা শুরু করার উপলক্ষ আমাদের বর্ণিত গল্পটি। এ সবই ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

ফিকাহ্ সংকলনে সহায়তাকারী ছাত্রবৃন্দ

ফিকাহ্ সংকলনের যে পরিকল্পনা ইমাম সাহেব নিয়েছিলেন তা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিশাল এবং দুরূহও বটে। এই জন্য তিনি শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব মতামত এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে যোগ্যতমদের বাছাই করেন। যেমন ঃ ইয়াহ্ইয়া বিন আবী যায়েদাহ্, হাফাস্ বিন গিয়াস, কাজী আবু ইউসুফ, দাউদ আল তাঈ, হাব্বান, মুনদেল (রহ) প্রমুখ যারা হাদীস ও সুন্নত এবং সাহাবায়ে কিরামের মতামত সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। যার প্রমাণ আমরা ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁদের অবস্থান দেখে বুঝতে পারি।

ইমাম জাফর আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ব্যাপারে বিখ্যাত ছিলেন, কাছেম বিন মো'ওন এবং ইমাম মুহাম্মদ আরবী সাহিত্যের পণ্ডিত। ইমাম আবু হানিফা এইসব ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মজলিস গঠন করেন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিকাহ্ সংকলনের কাজ শুরু হয়। ইমাম তাহাবী নির্ভরযোগ্য পরম্পরা সূত্রে বর্ণনা করেন— ইমাম আবু হানিফা তাঁর যেসব ছাত্রদের নিয়ে ফিকাহ সংকলনের মজলিস গঠন করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন। যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— আবু ইউসুফ, জাফর, দাউদ আল তাঈ, আসাদ বিন ওমর, ইউসুফ বিন খালিদ, আল তামিমী, ইয়াহ্ইয়া বিন আবী যায়েদা (রহ)" প্রমুখ। ইমাম তাহাভী আরো বর্ণনা করেছেন যে, লেখার দায়িত্ব ছিল ইয়াহ্ইয়ার ওপর এবং তিনি তার কাজ সুদীর্ঘ তিরিশ বছর পর্যন্ত একটানা করে গেছেন।

এখানে একটি ব্যাপার ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ১২১ হিজরী থেকে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত ফিকাহ্‌র সংকলনের কাজ চলেছে এবং এ বছরেই ইমাম আবু হানিফা ইন্তেকাল করেন। কিন্তু

www.pathagar.com

একটি তথ্য ভুল, তাহলো 'ইয়াহ্ইয়া শুরু থেকেই এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন'। ইয়াহ্ইয়ার জন্মই যেখানে ১২০ হিজরীতে সেখানে শুরু থেকেই তার সম্পৃক্ততা কেমন করে সম্ভব ? তাহাভী যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের সাথে 'আফিয়া আজদী, আবু আলী, ইজ্জী, আলী মুসহার, কাছেম বিন মো'ওন, হাব্বান, মুনদেল (রহ) প্রমূখের নাম আসেনি। অথচ এঁরাও ঐ মাজলিসের সদস্য ছিলেন।

নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া

মাজলিসের সদস্যগণের সামনে বিশেষ কোনো বিষয়ের মাসআলা পেশ করা হতো। তারপর তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা চলতো। সদস্যগণ এক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে মতামত প্রকাশ করতেন। সমাধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেটা সর্বসম্মতভাবে উৎরে যেতো, শুধুমাত্র সেটাইকে লিপিবদ্ধ করা হতো। কোনো কোনো বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা চলতে থাকতো এবং ইমাম সাহেব অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে গভীর মনোযোগে তা শুনতেন। অবশেষে ইমাম সাহেব নিজের মতামত প্রকাশ করতেন। অনেক সময় তা সবারই সম্মতি অর্জন করতে সক্ষম হতো আবার কখনো কখনো বিতর্ক থেকেই যেতো। যেসব প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যেতো সেসবকে অগ্রাহ্য না করে বরং ঐ একই বৈঠকে ইমাম সাহেবের মতামতসহ অন্যদের মতামতকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখে নেয়া হতো। একটি শর্ত ছিল বাধ্যতামূলক ঃ সদস্যগণের সবার উপস্থিতি ছাড়া চূড়ান্তভাবে কোন মাসআলার জবাব গৃহীত হতো না— তা সর্বসম্মতিমূলক হোক বা মতপার্থক্যমূলক।

আফিয়া

'জাওয়াহের মুদিয়ার' লেখক আফিয়া বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইসহাকের বর্ণনা সূত্রে লিখেছেন যে, ফিকাহ্ কমিটির সভায় কোন মাসআলা নিয়ে আলোচনায় আফিয়া অনুপস্থিত থাকলে ইমাম সাহেব বলতেন, আফিয়া আসুক তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আফিয়া উপস্থিত হয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করলে তার সেই মাসআলা চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হতো। এইভাবে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর সময়কাল ধরে এই মহান কর্মযজ্ঞ তার পরিণতিতে পৌছায়। ইমাম সাহেবের শেষ জীবন বন্দীশালায় কেটেছে কিন্তু সেখানেও এই কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত গতিতে জারী ছিল।

বিন্যাস পরম্পরা

আবুল মুহাসীনের বর্ণনায় এই সংকলনের বিন্যাস পরম্পরা এই রকম— প্রথমেই তাহারাত (পবিত্রতা অর্জন সংক্রান্ত), তারপরে সালাত (নামায) তারপরে সওম (রোযা) তারপরে ইবাদতের অন্যান্য অধ্যায়। এরপরে মুয়ামেলাত (পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন এবং আচরণবিধি), সবার শেষে মীরাসের (উত্তরাধিকার) অধ্যায়।

ইমাম আবু হানিফার জীবনেই তাঁর সংকলনের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা কোন পর্যায়ে পৌছেছিল, তখনকার সেই প্রেক্ষাপট অনুমান করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। তবে যখনি তার কোনো অংশ প্রস্তুত হতো সাথে সাথে গোটা ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি শহরে তা প্রকাশ করা হতো। ইমাম সাহেবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল একটি আইন-বিষয়ক মাদারসা। যার ছাত্ররা বেশিরভাগই বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তার পদে বহাল হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রশাসনিক

www.pathagar.com

কার্যক্রম পরিচালনার প্রাণশক্তি ছিল এই সংকলন। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেসব আলেম ইমাম সাহেব সমসাময়িক ও সমমানের দাবি রাখতেন তাঁরাও এই কিতাবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারতেন না। ইমাম সুফিয়ান সাওরী অত্যন্ত আগ্রহসহকারে 'কিতাবুর রহন'-এর একখানা অনুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সব সময়ই তা নাড়াচাড়া করতেন। যায়েদাহ্ বর্ণনা করছেন ঃ আমি সুফিয়ানের মাথার কাছে একখানা কিতাব রাখা দেখতাম। একদিন দেখি তিনি তা গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করছেন। অনুমিত নিয়ে কিতাবখানা দেখতে চাইলাম। দেখি আবু হানিফার 'কিতাবুর রহন'। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আবু হানিফার বই-পুস্তক পড়েন ? বললেন ঃ যদি সব কিতাবগুলো আমার কাছে থাকতো!

এটাও কম আশ্চর্যের কথা নয়! বড় বড় আলেম তখন বিরাট বিরাট অবস্থান নিয়ে বিরাজ করছিলেন এবং এর মধ্যে অনেকেই আবু হানিফার সরাসরি বিরোধিতা করতেন কিন্তু এই কিতাবের কোনো সমালোচনা করার কোনো দুঃস্বাহস কারো হয়নি। ইমাম রাযী 'মানাকিবুশ শাফেয়ী'তে লিখেছেন ঃ

ان اصحاب الرای اظهر ومذهب هم وكانت الدنيا مملوة من المحدثين
ورواة الاخبارولم يقدر احد منهم الطعن فی اقاويل اصحاب الرائے -

অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধির বিচারপন্থী আবু হানিফা এবং তার ছাত্ররা তাদের মাসায়েল যে যুগে প্রকাশ করেছে। মুহাদ্দিসীন ও বর্ণনা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা দুনিয়া তখন ভরপুর। কিন্তু কারো সাধ্যে এটা কুলায়নি যে, তাদের কোনো বক্তব্যের ব্যাপারে এতোটুকু আপত্তি তোলেন।

ইমাম রাযী তো সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন কিন্তু আমরা অনেক অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, এই সাধারণত্বের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম আছে। কেননা বায়হাকী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আওযায়ী আবু হানিফার কিতাবুস সিয়ামকে খণ্ডন করে লিখেছিলেন, যার পাল্টা জবাব লিখেছেন কাজী আবু ইউসুফ।

হাজার হাজার মাসআলা সম্বলিত এই সংকলন সম্ভবত বিরাট-বিশাল ছিল। 'কালায়েদ উকুদুল আকইয়ান'-এর লেখক কিতাবুস সিয়ামের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানিফার সংকলনে মাসআলার পরিমাণ বারো লাখ নব্বই হাজারের কিছু বেশি। শামসুল আয়েম্মা কুরদুরী লিখেছেন, সংকলনে মাসআলার সংখ্যা ছয় লাখ ছিল। আসলে এই পরিমাণ কতো ছিল তার কোন প্রমাণিত দলিল পাওয়া যায় না। তবে সন্দেহ নেই যে, তার পরিমাণ কয়েক লাখ ছিল। ইমাম মুহাম্মদের যেসব কিতাব এখন পাওয়া যায় তা থেকে কিছুটা অনুমান এবং সত্যায়ন করা যেতে পারে।

সেই সংকলনের বিলুপ্তি

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ইমাম সাহেবের জীবনেই ফিকাহ্র সকল অধ্যায়ের বিন্যাস সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। একথা অস্বীকার করা ইসলামী পরম্পরার ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করার শামিল। এটা অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় যে, সেই মূল সংকলনের কোন কপি পৃথিবীর কোন সংগ্রহশালায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ওলামায়ে কেরাম কেমন করে তাকে বিলুপ্ত

www.pathagar.com

হতে দিলেন ? মানাকিবুশ শাফেয়ীতে ইমাম রাযী লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানিফার কোনো ধরনের কোনো রচনাকেই যত্ন করে রাখা হয়নি— তা সব বিলুপ্ত। ইমাম রাযী ৬০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, সে হিসাবে প্রায় পাঁচশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। যে সময়ের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর যাবতীয় রচনাবলী অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। ইমাম সাহেবের রচনা সমগ্র হারিয়ে যাওয়া সময়ের প্রেক্ষাপটে খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু নয়। কেননা ঐ সময়কালের কারো কোনো রচনারই কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ইমাম আওযায়ী, ইবনে জারীহ্, ইবনে আকুবাহ, হামাদ বিন আবী মুয়াম্মার প্রমুখের রচনাবলী এই সময়কালেই প্রকাশ পেয়েছিল। (যখন ইমাম আবু হানিফর ফিকাহ্ সংকলনের কাজ চলছিল)। এঁদের কারো কোনো রচনার কোনো নামও কেউ জানে না। তবে ইমাম আবু হানিফার মূল সংকলন হারিয়ে যাওয়ার বড় একটি কারণ ইমাম মুহাম্মদ এবং কাজী আবু ইউসুফের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ ঐসব মাসায়েলের পুনঃলিখন। প্রতিটি মাসআলার পেছনে দলিল-প্রমাণ, যুক্তি প্রদর্শন, নোট, ফুটনোট ইত্যাদি মিলিয়ে তাদের লেখাগুলি এতোটা সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন যে, লোকেরা এদেরকেই লুফে নিলো। নতুন সংস্করণের জনপ্রিয়তা পুরানো মূল রচনাকে আড়াল করে দিলো। ঠিক যেভাবে নতুন ব্যাকরণবিদদের রচনার পরে ফ্রা, কিছাঈ, খলিল, আখ্ফাস, আবু উবায়দাহ্ প্রমুখের বই-কিতাব পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ এঁরাই ছিলেন এই বিষয়ের উদ্ভাবক এবং গোড়াপত্তনকারী। ইমাম আবু হানিফার সঙ্কলিত যে মাসায়েলের ভাণ্ডার আজকের পৃথিবীতে মওজুদ রয়েছে তাঁর রক্ষক কাজী আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ। তাঁদের রচনাবলীর মাধ্যমেই আমরা মূল খনির অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি।

আজকের ফিকাহ্ যাকে সাধারণভাবে হানাফী ফিকাহ্ বলা হয় আসলে তা চারজন ব্যক্তিত্বের মত-অভিমত ও সিদ্ধান্ত সমগ্রের সামষ্টিক রূপ। এঁরা হলেন ইমাম আবু হানিফা, জাফর, কাজী আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ)। কাজী আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ অনেক মাসআলার ব্যাপারে ইমাম সাহেবের সাথে একমত হননি। হানাফী ফকীহগণ বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা স্বীকার করতেন, আমরা যেসব বক্তব্য নিয়ে ইমাম সাহেবের সাথে বিতর্ক করি সেগুলোও তারই শেখানো ভিন্ন ভিন্ন মত। কারণ অনেক মাসআলার ব্যাপারে ইমাম নিজেই বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এসব বর্ণনার উল্লেখ 'শামী'তে পাওয়া যায়। কিন্তু তা প্রমাণ করা কষ্টকর। আমাদের কাছে এগুলো ফকীহ্বৃন্দের শুভ এবং ইতিবাচক ধারণা বা চিন্তা-ভাবনা। কাজী আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ স্বাধীন চিন্তা এবং মুক্তবুদ্ধি প্রয়োগের মানসম্পন্ন ছিলেন। তদুপরি ইমামের ফিকাহ্ কমিটির সদস্য সভায় মতপার্থক্য প্রকাশের পূর্ণ অধিকার দিয়েই তাদের বসানো হয়েছিল। ইসলামের সোনাঝরা ক্রমবিকাশ ও উজ্জ্বল আলোকিত প্রগতি-অগ্রগতি ঠিক তাতোদিন অব্যাহত ছিল যতোদিন লোকেরা সম্মানিত গুরুজন এবং উস্তাদগণের সাথে মতপার্থক্য নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতেন এবং চিন্তা-বিকাশের গণ্ডি সীমাবদ্ধ ছিল না।

মাসআলা-মাসায়েল যা হানাফী ফিকাহ্র নামে প্রচলিত ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে স্থায়ী আসন তৈরী করে নিলো। আরব জাহানে ততোটা ব্যাপকতা না পাওয়ার কারণ মদীনায় ইমাম মালিক এবং মক্কায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই এর প্রয়োজন মিটিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। আরব ভূখণ্ড ছাড়া সিন্ধু থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মহাদেশ জুড়ে হানাফী ফিকাহ্ প্রচলিত হয়ে গেল। হিন্দুস্তান, সিন্ধু, আফগান, বুখারা প্রভৃতি দেশগুলোতে ইমাম আবু হানিফার মতামত ছাড়া অন্য কারোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য দেশে শাফেয়ী এবং হাম্বালী ফিকাহর প্রচলনও হয়েছে কিন্তু তা হানাফী ফিকাহ্র অস্তিত্বকে মুছে দিয়ে নয়। তবে কিছু কিছু দেশে এর প্রচলন নেই তার বিশেষ কারণ, যেমন আফ্রিকায় ৪০৫ হিজরী পর্যন্ত হানাফী ফিকাহ্র প্রচলন ছিল সবচাইতে প্রভাবশালী। কিন্তু মুয়াজ বিন বাউলিস ৪০৬ হিজরীতে স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্রীয়ভাবে মালিকী ফিকাহ্র প্রচলন করে দিলো যা আজো সেখানে একইভাবে প্রতিষ্ঠিত।

বেশিরভাগ সুলতান হানাফী ফিকাহর অনুসারী ছিলেন

মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিকাংশ সুলতান হানাফী ফিকাহ্র অনুসারী ছিলেন। আব্বাসী খলিফারা এর বাইরে। কারণ এই বংশের লোকেরা যতোদিন শাসন করেছে তলোয়ারের সাথে কলমের মালিকও তারাই ছিল। অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে ইজতিহাদের অধিকারী মনে করতো এবং কোনোদিনই কারো আনুগত্য অনুসরণ করেনি। পতনের পরে তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল যে, এই বংশের লোকেরা কোনোদিন শাসন ক্ষমতায় ছিল তা অনুমান করাও সম্ভব ছিল না। এই রকম একটি রাজবংশের কোনো এক রাজা ইমাম আবু হানিফার যোগ্যতার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল। মোটামুটিভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল ইমামের আনুগত্য। ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান চর্চায় অভ্যস্ত ছিলেন বলেই হয়তো আবু হানিফা (রহ)-এর মতো জ্ঞানীকে সম্মান জানাতে পেরেছিলেন। আরবী অলংকার শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্ভাবক এবং আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে সবচাইতে বড় কবি ও সাহিত্যিক খলিফা আবদুল্লাহ্ বিন আল মু'তাজ।

আব্বাসী রাজবংশের পতনের পরে যেসব বংশীয় শাসনের উত্থান হয়েছিল বেশিরভাগই হানাফী ছিল। সেলজুতী বংশের দীর্ঘ শাসনামলে চীনের কাশগর থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভ করে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতি ইমাম আবু হানিফার ফিকাহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হতো। সম্রাট মাহমুদ গজনবী হানাফী ফিকাহ্র একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং 'আল-নাফরীদ' নামে কম-বেশী ষাট হাজার মাসআলা সম্বলিত ফিকাহ্র একখানা কিতাব তিনি নিজেই রচনা করেছিলেন। নূরুদ্দীন জঙ্গীর নাম ইতিহাসে ততোটা বড় করে লেখা হয়নি অথচ তিনি রাষ্ট্রনায়ক এবং সমরনায়ক হিসেবে ইতিহাসের সফলতমদের অন্যতম একজন। বায়তুল মুকাদ্দিস বিজয়ী সালাহ্উদ্দীন আইয়ুবী ছিলেন তারই একজন সেনাপতি। সর্বপ্রথম দারুল হাদীস তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। সালাহ্উদ্দীন ব্যক্তিগতভাবে শাফেয়ী ও মালিকী ফিকাহ্র অনুরাগী ছিলেন কিন্তু তার পরিবার ছিল হানাফী। মহান সম্রাট ঈসা ইবনুল মালিক আল আদিল হানাফী মাযহাবের ভক্ত ছিলেন। চারাক মিছির নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশরের ক্ষমতায় আরোহণ করেন এবং দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে সাম্রাজ্য বিস্তার ও রাজ্য শাসন করেন। নিজে হানাফী ছিলেন এবং তার দরবারে হানাফী মাযহাবের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম চলতো। মুসলমানদের অহংকার প্রায় দুই মহাদেশজুড়ে সুদীর্ঘ ছয়শ' বছরের তুর্কী শাসন হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছিল। খোদ ভারতবর্ষের সাতশ' বছরের মুসলিম শাসনও হানাফী নীতির অনুসারী ছিল।

www.pathagar.com

হানাফী মাযহাবের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণ

অনেকের ধারণা হানাফী মাযহাবের বিশাল ব্যাপকতার কারণ শাহী ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা। বিখ্যাত ইমাম ইবনে হাযম বলেছেন ঃ দুইটি মাযহাব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ঘোড়ায় চড়ে একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছেছে। একটি আবু হানিফার মাযহাব আর একটি ইমাম মালিকের মাযহাব। কাজী আবু ইউসুফ প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হওয়ার পর সাম্রাজ্যের অন্যান্য বিচারালয়সমূহে হানাফী ফিকাহ্‌র বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দান করেন। অপরদিকে ইমাম মালিকের শিষ্য ইয়াহ্‌ইয়া আসমুদী স্পেনের খলিফার উপদেষ্টা ছিলেন। প্রশাসনিক পদসমূহে তার পছন্দ ছাড়া খলিফা অন্য কাউকে নিয়োগ করতোনা এবং এই সুযোগে তিনি তার মাযহাবের লোকদেরকেই বেছে বেছে নির্বাচন করতেন।

ঘটনার বাহ্যিক দিকটাই ইবনে হাযম দেখেছেন। কেননা ইমাম আবু হানিফা ইজতিহাদের মসনদে বসেছেন ১২০ হিজরীতে আর কাজী আবু ইউসুফ প্রধান বিচারপতি হয়েছেন ১৭০ হিজরীতে খলিফা হারুন আর-রশীদের সময়ে। আবু ইউসুফের পদ প্রাপ্তির পূর্বে পঞ্চাশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং এই পঞ্চাশ বছরের সময়কালে ইমাম আবু হানিফার অন্যান্য অসংখ্য ছাত্র নিজ নিজ যোগ্যতায় প্রশাসনিক বিভিন্ন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া ইমাম আবু হানিফার মতামত মানবীয় বিবেক বুদ্ধির অনুকূলে হওয়ায় সাধারণ গ্রহণযোগ্যতার জন্য শাসন-প্রশাসন বা অন্য কোন রকম প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি-ক্ষমতার আদপেই কোন প্রয়োজন পড়েনি। তবে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, কাজী আবু ইউসুফের কারণে হানাফী মাযহাবের একটা বিশেষ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইমাম রাযী স্বীকার করেছেন যে—

ثُمْ اِنَّهُ لِمَا قوى مذهبِ اَصَحْابِ الراى واشتهر وعظم وقعته فى القلوب ثم اتفق اتصال ابى يوسف ومحمد بخدمة هارون الرشيد عظمت ملك القوة جدالان العلم والسلطنة خصلا معاً -

বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগকারীদের মাযহাব অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে মানুষের মনে জায়গা করে নিলো এবং বিখ্যাত হয়ে গেলো। তার ওপরে হারুন আর-রশীদের দরবারে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের বিশেষ অবস্থানের কারণে তা আরও শক্তিশালী হলো, কেননা জ্ঞান ও শাসন এই দুই শক্তি তখন মিলেমিশে একাকার।

এছাড়া কাজী আবু ইউসুফের প্রভাব হারুন আর-রশীদের খিলাফত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তারপরে প্রতিষ্ঠা ও অব্যাহত অগ্রগতির গতি কে সৃষ্টি করেছিল ? সাধারণভাবে অনেক বড় বড় আলেম তাদের নিজ নিজ সময়কালে খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন। যেমন ইমাম আওযায়ী তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যু পরবর্তীকালেও দীর্ঘদিন শাম দেশের সর্বোচ্চ ইমাম হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। সাধারণভাবে লোকেরা তাঁরই অনুসরণ করতো। কিন্তু সেই সব প্রভাব কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি। এইসব ইতিহাস প্রমাণ করে দেয় যে, ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা সময়ের গণ্ডি অতি সহজে অতিক্রম করে যায় এবং অনাগত সময়ের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দানেও সক্ষম।

www.pathagar.com

অন্যান্য মুজতাহিদগণের মাযহাব প্রচলনের কারণসমূহ

মুসলিম দেশগুলোতে যেসব নেতৃবৃন্দের ফিকাহ্ প্রচলিত হয়েছে তারা মাত্র চারজন— আবু হানিফা, শাফেয়ী, মালিক, আহমদ বিন হাম্বাল (রহ) প্রমুখ। ফিকহী মাসায়েলের প্রচার-প্রসার ও প্রচলনের মূল কারণ যদিও খোদ সেই মাসআলাসমূহের মান ও বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে, এ ব্যাপারে ফিকাহ্ রচনাকারীর ব্যক্তিত্বের মান ও মর্যাদার ভূমিকাও কিছুমাত্র কম নয়। আমাদের কাছে ইমাম আবু হানিফা (রহ) ছাড়া অন্যান্য মুজতাহিদীনের ফিকাহ্র প্রচার-প্রচলনের কারণ অধিকাংশই তাঁদের ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপর নির্ভরশীল বলে প্রতিয়মান হয়েছে। যেমন ইমাম মালিক মদীনার অধিবাসী ছিলেন। যা নবুয়তের মারকাজ এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের 'দারুল খুলাফা' ছিল। সঙ্গত কারণেই মদীনা ও মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণের সাথে সকল মানুষের একটা আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তিনি এক ইল্মী পরিবারের সন্তান। দাদা মালিক বিন আবী আমের, বড় বড় সাহাবাগণের কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন। চাচা ছিলেন শায়খুল হাদীস। ইমাম মালিক যখন হাদীস ও ফিকাহয় দক্ষতা অর্জন করেছেন তখন তাঁর এই অর্জিত গুণাগুণ ব্যক্তি যোগ্যতার মুকুট হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। চারিদিকে সুখ্যাতি ছড়াতে সময় লাগেনি।

ইমাম শাফেয়ীর আরও কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্য ছিল। জন্ম ও নিবাস মক্কা নগরী। পিতৃকূল কোরায়েশী, মাতৃকূল হাশেমী। বংশ পরম্পরায় সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত। পরদাদা 'সায়েব' বদর যুদ্ধে হাশেমীদের ঝাণ্ডাধারী ছিলেন। পরাজিত হলে বন্দি দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় জন্ম, সম্মানিত বংশ পরিবার। রাসূল (স)-এর সমগোত্রীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার জন্য অনেক বড় কারণ।

ইমাম আবু হানিফার মধ্যে এ ধরণের কোন বাড়তি বৈশিষ্ট্য ছিল না। কোরেশী বা হাশেমী হওয়া তো দূরের কথা, আরবীও ছিলেন না। পূর্ব পুরুষদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যে, ইসলামী সমাজে গণ্যমান্য। পৈত্রিক পেশা ব্যবসায় এবং নিজেও সারাজীবন ব্যবসা করেই জীবিকা নির্বাহ করেছেন। জন্মস্থান কুফা নগরী যদিও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল কিন্তু মক্কা এবং মদীনার সাথে তার কি তুলনা! অসঙ্গত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু কারণে কতিপয় বর্ণনা বিশেষজ্ঞ তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগেছিল। তদুপরি সাধারণ গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রভাবশালী যেসব কার্যকারণ থাকে তাঁর ক্ষেত্রে এরকম কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর রচিত ফিকাহ্ ইসলামী দুনিয়ার মুসলিম মানসে এমনভাবে স্থান করে নেবার ক্ষমতা এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর ভাবনা-চিন্তা এবং উদ্ভাবিত রীতি-পদ্ধতি মানুষের মানবিক চাহিদার প্রয়োজন পূরণ করতে পেরেছিল। বিশেষভাবে বলতে হয়, পরিবর্তনশীল সভ্যতা ও সমাজের সাথে তাঁর ফিকাহ্র যে সঙ্গতি এবং উপযোগিতা, তা অন্য কারো ফিকাহ্তে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণেই অন্য ফকীহ্গণের ফিকাহ্ সেইসব দেশেই প্রচলিত হয়েছে ও রয়েছে যেখানে সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতি এবং বিকাশের গতি খুবই সামান্য। আল্লামা ইবনে খালদুন মরক্কো ও স্পেনে ইমাম মালিকের ফিকাহ্ প্রচলনের কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে, দেশগুলো সভ্যতার দিক থেকে পশ্চাৎপদ ছিল এবং মানুষের মানবিকতা বিকাশের প্রেক্ষিত ছিল সীমাবদ্ধ। তাই প্রগতিশীল কোন কিছুকে তারা গ্রহণ করতে পারেনি।

ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দের তৈরী ফিকাহ্ সেই সময়ে সবচাইতে বড় আইন-বিধান ও মাসআলা-মাসায়েলের উৎস ছিল। পরবর্তীকালে হানাফী পণ্ডিতগণ যদিও তার

www.pathagar.com

সাথে নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী আরো অনেক সংযোজন করে যুগোপযোগী করে তুলেছিলে কিন্তু নতুন উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের সময় থেকেই কোন বিষয়ের এতোটা গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কথা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না যতোটা ইমাম আবু হানিফার ফিকাহ্‌র ভাগ্যে জুটেছিল।

এই সংকলনে ইবাদতের অধ্যায় ছাড়াও দেওয়ানী, ফৌজদারী, দণ্ডবিধি, খাজনা, জমির খাজনা, স্বাক্ষী, চুক্তিনামা, উত্তরাধিকার, অসিয়ত ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক আইন বিধানের অধ্যায় রয়েছে। এর উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে সবচাইতে বড় প্রমাণ, সিন্ধু থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত খলিফা হারুন আর-রশীদের বিশাল সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে হানাফী বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হতো।

মাসায়েলে ফিকাহ্‌র ব্যাখ্যা

এই নীতিশাস্ত্র যাকে ফিকাহ্ বলা হয়। দুই ধরনের নিয়ম-নীতি নিয়ে গঠিত এবং এ হিসেবে তার দু'টি ভিন্ন অবস্থান রয়েছে।

এক ঃ সেইসব মাসায়েল যা শরীয়ত থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ শরীয়তী বিধান।

দুই ঃ সেইসব বিধি-বিধান যেসব সম্পর্কে শরীয়ত নীরব। পরিবর্তনশীল সমাজ-সভ্যতার প্রয়োজন থেকে উৎসারিত অথবা শরীয়তে তার উল্লেখ রয়েছে কিন্তু বিধান হিসেবে নয়।

প্রথমোক্ত মাসায়েলের ক্ষেত্রে ফকীহ্‌র অবস্থান ব্যাখ্যাকারী, বিস্তারিতভাবে বর্ণনাকারী এবং ভাষ্যকারের। এজন্য যেসব যোগ্যতার প্রয়োজন তাহলো ভাষা জ্ঞান, মূল পাঠ বা মূল সূত্রের জ্ঞান, উদঘাটন বা খুঁজে বের করার ক্ষমতা, স্ববিরোধিতা নির্ণয়ে উপযুক্ত দলিল প্রয়োগের দক্ষতা। কিন্তু তা আইন প্রণয়ন বা বিধান প্রবর্তনের পর্যায়ে নয়।

এবং দ্বিতীয় ধরনের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ফিকাহ্ রচনাকারী একজন আইন রচনাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সে হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ঠিক সেই মানের হওয়া চাই যা পৃথিবীর বিখ্যাত আইন রচনাকারীগণের ছিল। দুটো বৈশিষ্ট্যই একটি আর একটির সম্পূরক। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব অতীত হয়ে গেছেন যাঁরা কুরআন-হাদীসের স্বার্থক ব্যাখ্যাকারী এবং ভাষ্যকার ছিলেন কিন্তু তা থেকে প্রয়োগিক বিধান রচনা করতে পারতেন না। একইভাবে এমন মনীষীও ছিলেন যারা আইন রচনা এবং বিধান প্রবর্তনের যোগ্যতা রাখতেন, কিন্তু শরীয়তের মূল সূত্রের ব্যাখ্যাকারী হতে পারেননি। ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই দু'টি যোগ্যতার ভারসাম্যপূর্ণ সম্মিলন বিশ্বপ্রকৃতির মালিক ইমাম আবু হানিফার মধ্যে যেভাবে ঘটিয়েছেন অন্য কোন মুজতাহিদ বা ইমাম এই অনন্য দানে ধন্য হতে পারেননি। ফিকাহ্ রচনার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার অতুলনীয় কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি শরীয়ত এবং পরিবর্তশীল সভ্যতার বিধানসমূহের সমন্বয় সাধন করেছেন।

শরীয়ত এবং শরীয়ত বহির্ভূত হাদীসসমূহের পার্থক্য ঃ আল্লাহ্‌র বিধান প্রণেতা রাসূল (স)-এর কথা এবং কাজ যা ধারাবাহিক বর্ণনা পরম্পরার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এর মধ্যে এমন অনেক কথাও আছে যা 'রেসালাতের অবস্থানের' সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু প্রচলিত রীতি অনুসারে সেইসবের ওপরেও হাদীস শব্দটির প্রয়োগ করা হতো। ফিকাহ্‌র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সাধারণভাবে অনেক বড় যে ভুলটা হয়ে গেছে তাহলো লোকেরা সেইসব

www.pathagar.com

বিষয়গুলোকেও শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত করে ফেলেছে এবং সে অনুযায়ী সেইসবের ওপরে ভিত্তি করে মাসায়েল ও বিধি-বিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। অথচ সেইসব হাদীস শরীয়তী মর্যাদার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। শাহ ওয়লীউল্লাহ দেহলভী লিখেছেন যে, রাসূলে করীম (স) থেকে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে এবং হাদীসের কিতাবসমূহে যাদের সংকলন করা হয়েছে তা দুই প্রকারের। এক— যা রিসালাতের দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত এবং সে ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

مَا اتَٰها كُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু নিষেধ করেন সেসব থেকে বিরত হও।

দুই ঃ যা রিসালাতের দাওয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, সে সম্পর্কে রাসূল (স) ইরশাদ করেন ঃ

انما انابشر اذا امر تكم بشئ من دينكم فخذوه واذا امر تكم بشئ من رايى فانما انابشر -

আমি একজন মানুষ, আমি যখন কোন দ্বীনি আদেশ করবো তখন তা পালন করো এবং যখন আমি আমার নিজস্ব মতামত অনুযায়ী কোনো আদেশ করি, তখন আমি শুধুমাত্র একজন মানুষই।

এই দ্বিতীয় ধরনের মধ্যে এমন সব কাজও রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে স্বভাবজাতভাবে প্রকাশ পেয়েছে, ইবাদাত হিসেবে নয়। এবং আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে, ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। এবং এই ধরনের মধ্যেই সেইসব হাদীস অন্তর্ভূক্ত যা রাসূল (স) নিজ জাতির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে আগেই বলে দিয়েছেন। যেমন উম্মে যারআ'র বর্ণিত হাদীস, খুরাফাহ্‌র হাদীস এবং এই ধরনের মধ্যে সেইসব কাজও রয়েছে যেগুলো রাসূল (স) স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী কল্যাণার্থে গ্রহণ করেছেন। সেগুলো অনুসারীদের জন্য 'ওয়াজিবুল আমল' নয়। যেমন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ও প্রদর্শনীর ব্যাপারে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন, এখন রাম্‌ল করার কি প্রয়োজন। যে জাতিকে দেখাবার জন্য আমরা তা করতাম তাদেরকে তো আল্লাহ্ তা'আলাই ধ্বংস করে দিয়েছেন। এভাবে রাসূল (স)-এর অনেক আদেশও এর মধ্যে পড়ে যায়। যেমন এই আদেশ ঃ "জিহাদে যদি কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করে তাহলে সেই অস্ত্রের মালিকানা তারই"।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী সাহেব হাদীসসমূহের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এটাই সেই বিষয়-বিন্দু যার ওপর সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানিফার লক্ষ্য স্থির হয়। এরই ভিত্তিতে অনেক মাসায়েল যেমন ঃ জুম'আর জন্য গোসল, দুই ঈদে মহিলাদের বের হওয়া, তালাক সম্পাদন, জিযিয়া নির্ধারণ, ভূমির খাজনা নির্ণয়, সম্পদ বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে যেসব হাদীস রয়েছে তাদেরকে ইমাম আবু হানিফা দ্বিতীয় ধরনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী প্রমুখগণ এইসব হাদীসকেও শরীয়তের বিধানমূলক হাদীস মনে করেন।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফার চিন্তা-দর্শনের ওপরই হানাফী ফিকাহ্র মাসায়েল গঠন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মুক্তবুদ্ধি এবং চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগের বিশাল ক্ষেত্র। এটাই হানাফী ফিকাহ্র বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য ফিকাহ্ রচনাকারীগণের মাসায়েলের মধ্যে নেই। নেহায়েত পরিতাপের বিষয় হলো, অন্যান্য ইমামগণ এরকম একটা সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না। যদি খুলাফায়ে রাশেদুনের দৃষ্টান্তসমূহ বিদ্যমান না থাকতো তাহলে হয়তো ইমাম আবু হানিফারও এই পন্থা অবলম্বনের দুঃসাহস হতো না।

ইমাম সাহেব পরবর্তী যুগের কিছু ইমাম ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর বিরোধিতাই করলেন এবং তাঁদের মতামতের ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রগতিশীল এই নীতি-দর্শনের দিকে তারাও একটু ভ্রূক্ষেপও করলেন না। কিন্তু সময় তার গণ্ডী পেরিয়ে যতোই সম্মুখে এগিয়ে চলছে, সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের চিরনতুন জীবন বিধানকে ছায়ার মতো পথের সাথী হিসেবেই দেখতে পাচ্ছে। দৃষ্টিভঙ্গির এই চিরন্তন প্রয়োগবিধি আমরা খুঁজে পাই আমাদের নেতা ইমাম আবু হানিফার রীতি ফিকাহ্ বা ইসলামী নীতিশাস্ত্রের মধ্যে। যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

যেসব মসায়েল শরীয়তের বিধানমূলক নয়। শরীয়তের বিধানকে খুলাফায়ে রাশেদুনের চাইতে বেশি জানা কার পক্ষে সম্ভব! দেখা যাক, তাঁরা যে ব্যাপারে কে কি করেছেন! উমরী খিলাফতের প্রাথমিককাল পর্যন্ত 'মালিকের সন্তান প্রসবকারিণী দাসীদের বেচা-কেনা প্রচলিত ছিল। হযরত উমর (রা) তাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিলেন। রাসূলে কারীম (স) তাবুক সফরের সময় বিধর্মীদের জনপ্রতি এক দীনার করে জিযিয়া ধার্য করেছিলেন। হযরত উমর (রা) ইরানে ৪৮, ১২, ৬ হিসেবে ভাগ ভাগ করে ধার্য করলেন। রাসূলে কারীম (স) যখন গণিমতের মাল-সম্পদ ভাগ করতেন তখন আপনজনের অংশও নির্দিষ্ট করতেন। খুলাফায়ে রাশেদুনের কেউ এমনকি হযরত আলীও (রা) নিজ বংশ হাশেমীদের কখনো কিছুই দেননি। রাসূল (স) থেকে হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত পর্যন্ত তিন তালাককে একই মনে করা হতো। কিন্তু হযরত ওমর (রা) তাঁর সময়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, তিন তালাক চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে মদ্যপানের শাস্তি হিসেবে কোন নির্দিষ্ট দণ্ড নির্ধারণ করা হয়ে উঠেনি। হযরত আবু বকর (রা) তার শাস্তি হিসেবে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের দণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন এবং হযরত উমর (রা) তাঁর আমলে মদ্যপানের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে বেত্রাঘাতের পরিমাণ বাড়িয়ে চল্লিশ থেকে আশিটি নির্ধারণ করলেন। এগুলো সেইসব ঘটনা যা হাদীসের সংকলনসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। যা প্রমাণের জন্য অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। কারো পক্ষেই এসব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাহলে তার মানে কি এই যে, খুলাফায়ে রাশেদুন কোনো নির্দেশ রাসূল (স)-এর প্রবর্তিত জেনেও তাঁরা তার বিরোধিতা করছিলেন ? নাউযুবিল্লাহ্ যদি তাঁরা তা-ই করে থাকেন তাহলে তাঁরা খুলাফায়ে রাশেদুন ছিলেন না রাসূল (স)-এর প্রতিপক্ষ এবং বিরোধী ছিলেন, আল্লাহ্ রক্ষা করুন।

বস্তুত সাহাবাগণ দিন-রাত তাঁদের প্রিয় রাসূলকে (স) ঘিরেই তাঁদের সময় কাটাতেন। শরীয়তের প্রয়োগবিধি স্বচক্ষে দেখে দেখেই তাঁরা শিখেছেন। কোনটা শরীয়ত নির্ধারিত বিধান আর কোনটা তা নয়, তা নির্ণয় করা তাদের পক্ষে খুব একটা কষ্টকর কিছু ছিল না। যেসব সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছিলেন ঃ

انتم اعلم بامور دينكم –

তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে যথেষ্ট জান।

www.pathagar.com

রাসূল (স)-এর ওফাতের পরে মা আয়শা কোন এক ঘটনাক্রমে বলেছিলেন, "আজ যদি রাসূলুল্লাহ (স) বেঁচে থাকতেন তাহলে মহিলাদের মসজিদে যাবার অনুমতি দিতেন না।" উক্তিটি সেই কথারই স্বাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত আয়শা রাসূল (স)-এর সেই অনুমতিকে বিধান হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। নইলে সময় এবং অবস্থার পরিবর্তনে তার ওপর কি এমন প্রভাব পড়তো? এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানিফা সাহাবাগণের পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং এ ধরনের মাসায়েল সম্পর্কে তাঁর 'রায়' সাধারণত খুলাফায়ে রাশেদুনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু যাঁদের দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌছায় না তাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ) এমনকি সাহাবাগণকেও অপবাদ দিতে ছাড়েননি। তালাকের মাসআলায় কাজী শাওকানী হযরত উমরের উক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর মুকাবিলায় বেচারা উমরের (রা) কি এমন যোগ্যতা রয়েছে"? কাজী এটা বুঝতেই পারলেন না যে, হযরত উমর (রা) একথা কাজী সাহেবের চাইতে অনেক বেশি করে বুঝেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর তুলায় তাঁর কোনো যোগ্যতাই নেই।

প্রথম ধরনের ফিকহী মাসায়েল সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার সবচাইতে বড় অবদান উদ্ভাবন-আবিষ্কারের নিয়ম-পদ্ধতিকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিন্যাস করা। যার ওপর ভিত্তি করে ফিকাহ্ একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। ঐশী জীবন বিধানের যথার্থ বিকাশ, প্রকাশ ও প্রয়োগের যে স্বার্থক পদ্ধতি ইমাম আবু হানিফা আবিষ্কার করেছেন এটাই তাঁর সারা জীবনের আল্লাহ্‌মূখী জ্ঞান-গবেষণার সবচাইতে বড় ফসল বা অর্জন। এক্ষেত্রে বিস্ময়ের সীমা থাকেনা যখন লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁর সময়কালটা ছিল জ্ঞানচর্চার নেহায়েত প্রাথমিক যুগ। লেখালেখি বা বই-কিতাব রচনার কোন প্রচলন তখন আদৌ ছিল না। এরকম একটা সময়ে এমন একটি বিষয়ের অবতারণা বা গোড়াপত্তন করা ইমাম আবু হানিফার মতো যুগশ্রেষ্ঠ প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

প্রচলিত একটি ধারণা এখনো রয়েছে যে, নিয়ম-পদ্ধতি যা আজ 'উসূলে ফিকাহ্' নামে অবহিত তা সর্বপ্রথম ইমাম শাফেয়ী (রহ) উদ্ভাবন করেন। একদিক থেকে এই দাবিকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ ইমাম শাফেয়ীর পূর্বে মাসায়েল নিয়ে আলাদা কোন রচনা কেউ করেননি। কিন্তু মূল বিষয়ের বুনিয়াদ ইমাম শাফেয়ীর অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সম্পাদনা বা রচনার বন্ধন তুলে নিলে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-কে উদ্ভাবক-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

নিয়ম-নীতির প্রথম অনুসন্ধান

নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, অর্থাৎ ইসলামী জীবন পদ্ধতির মাসায়েল অনুসন্ধানের কাজ সাহাবাগণের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু এই সন্ধান এবং উদ্ভাবনের যে পদ্ধতি ছিল তার মধ্যে জ্ঞান চর্চার কোন আকর ছিল না। সাধারণভাবে মানুষ যেমন কোন গল্পের পরিণতি বা তার মধ্যে কোন শিক্ষা অথবা অন্য কোন ইশারা-ইঙ্গিত— চিত্ত বিনোদন আনন্দ গ্রহণের জন্য করে থাকে সেখানে সে লক্ষ্য করে না যে, তার এই উদ্ভাবনের কায়দা বা পদ্ধতি কোন নিয়মের মধ্যে পড়লো। এবং তার ভাবনা-চিন্তা পরিচালনের ক্ষেত্রে কোন কোন শর্ত ও রীতি অনুযায়ী সে করেছিল। ফিকহী মাসায়েল নিয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা) অনেকটা সেভাবেই

www.pathagar.com

নাড়াচাড়া করতেন। জ্ঞান চর্চার সাধারণ কোন প্রচলন ছিল না, তার ওপরে তার নিয়ম-নীতির প্রশ্ন অবান্তর।

ওয়াসেল বিন আতার কিছু বর্ণনা

উমাইয়া শাসনের শেষদিকে জ্ঞান চর্চার কিছু প্রচলন ঘটে। ধর্মতত্ত্বের (ইল্মে কালাম) উদ্ভাবক ওয়াসেল বিন আতা শরীয়তী বিধানের ধরন ভাগ করেন। বলেন ঃ সত্য প্রমাণের চার রকম উপায় সুস্পষ্ট— কুরআনের বাণী, হাদীসের স্বীকৃতি, জনগণের ঐকমত্য এবং বিবেক-বুদ্ধির রায়। তিনি আরও কিছু বিষয় এবং নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন সার্বজনীনতা ও বিশিষ্টতা— দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। রহিতকরণ, বাতিলকরণ বা প্রত্যাহারকরণ শুধুমাত্র আদেশ ও নিষেধের বেলায় প্রযোজ্য। তথ্য প্রদান বা ঘটনাসমূহে তার (নছখের) কোন ভূমিকা নেই।

এসব মাসায়েল অনুযায়ী উসূলে ফিকাহ্ উদ্ভাবনের কৃতিত্ব ওয়াসেলের জন্য বরাদ্দ করতে হয়। কিন্তু তাঁর এই উদ্ভাবন অনেকটা হযরত আলী (রা)-এর ব্যাকরণ উদ্ভাবনের সাথে তুলনা করা চলে। যেমন ঃ তিনি বাক্যবিন্যাস শাস্ত্রের (নাহু) কয়েকটি অধ্যায় রচনা করেছিলেন। বস্তুত ইমাম আবু হানিফার সময়কাল পর্যন্ত মৌলিক বিষয়সমূহের অবস্থা এক-রকম হাটি হাটি পা পা পর্যায়েরই ছিল। কিন্তু যেহেতু ইমাম আব্ হানিফা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বিন্যাস করে 'ফিকাহ্কে' একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, সে কারণে মাসায়েল নিয়ে যে কোন ধরনের গবেষণামূলক প্রয়াসের জন্য আগেই একটি নীতিমালা তৈরী করে নিতে হয়েছিল।

সময়ের পরবর্তী পর্যায়ে উসূলে ফিকাহ্ অনেক বড় কার্যকর বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এমন অসংখ্য মাসায়েল উদ্ভব হতে থাকে, ইমাম আবু হানিফার যুগে যাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু এই বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েলসমূহ যার ওপর গোটা বিষয়টির ভিত্তি স্থাপিত, ইমাম আবু হানিফার যুগেই তা বিন্যাস করা হয়েছিল। চার মূলনীতির বিশ্লেষণ, হাদীসের ধারাবাহিক বিন্যাস এবং তার বিধান, সংগ্রহ ও মূল বিন্যাসের নিয়ম-নীতি, ঐকমত্যের নিয়ন্ত্রিত সীমা, যুক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি ও শর্তসমূহ, বিধানসমূহের প্রকারভেদ, সঠিকতা ও বিশিষ্টতার সংজ্ঞা দান, পরস্পর বিরোধিতা মীমাংসার নিয়ম, তাৎপর্য অনুধাবনের উপায় ইত্যাদি বিষয়গুলো উসূলে ফিকাহ্র মূল স্তম্ভ বিশেষ এবং এই যাবতীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন।

হাদীস সমগ্র সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিভঙ্গি এবং দিক-নির্দেশনা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পর্কে ইমাম সাহেবের নির্ধারিত রীতি-পদ্ধতি যেমন ঃ

مالم يثبت بالتواترلي بقران الزيادة نسخ لايجوزالزيادة على الكتاب

بخبرا واحد حمل المطلق على المقيد زيادة على النص عموم القران

لايتخصص بالاحادالعام قطعى كالخاص ان كان متاخرا خصص العام وان

كان متقد مافلابل كان العام ناسخالالخاص وان كان جهل التار يخ تساقط لم يطلب دليل اخر مفهوم لايحتج به لاتدل على البطلان -

আর তাওয়াতের দ্বারা কুরআনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করণ দ্বারা নসখ বৈধ নহে। খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কুরানের ওপর বৃদ্ধি করণ যায়েজ নয়। মুতলাকের প্রয়োগ মুকায়্যাদের ওপর যা কুরআনের উপর বৃদ্ধি করণের শামিল। কুরআনের সামগ্রিকতা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা নির্দিষ্ট হবেনা। আর আম বা ব্যাপকতা খাস বা নির্দিষ্টের মতোই অকাট্য যদি তা বিলম্বে হয় তাহলে আম বা ব্যাপকতার হুকুম নির্ধারিত হবে। আর যদি তা অগ্রে সংগঠিত হয় তাহলে হুকুম খাসের হুকুম কার্যকর হবে না। বরং আম বা ব্যাপকতার বিধান খাসের জন্য রহিতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি সময় বা ঘটনাপঞ্জির কোন তকতা থাকে তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। তখন কোন প্রমাণ অনুসন্ধান কার্যকর হবে না। মূল কথা হলো তখন এ বিষয়ে কোনো বিতর্কের কারণ নেই এবং বাতিলের ব্যাপারে কোনো দলিল বা প্রমাণ দেয়া যাবে না।

ইমাম সাহেবের এই ধরনের অসংখ্য উক্তি তাঁর ছাত্রবৃন্দের রচনাবলী ও শাস্ত্রীয় কিতাবসমূহে প্রাসঙ্গিকভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সবগুলোকে একত্রিত করা হলে মোটামুটি একখানা গ্রন্থ তৈরী হয়ে যাবে।[১] এবং এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা (রহ)-কে ইজতিহাদের বিশেষ একটি ধরনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মানা হয়। ইমাম মুহাম্মদ ও কাজী আবু ইউসুফকে ইমাম আবু হানিফার অনুগামী মনে করা হয় কারণ তারা উস্তাদের দেয়া মূলনীতির সাথে একমত। অথচ মাসায়েলের আনুসঙ্গিক দিকগুলো নিয়ে তারা বিতর্ক করেছেন এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

এসব নীতিগত প্রশ্নে ইমাম শাফেয়ী (রহ) প্রমুখের বিরোধিতা বিতর্কের বিরাট-বিশাল প্রেক্ষাপট তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের আফসোস আমরা তার বিস্তারিত প্রতিপাদন এখানে করতে পারছি না। আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি যে, ফিকাহ্‌র এই অংশে ইমাম সাহেব একজন ব্যাখ্যাকার, বিন্যাস দানকারী তথা সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, ইমাম আবু হানিফা এ পর্যায়ে যে কাজটি করেছেন শুধু ইসলামের ইতিহাস নয় দুনিয়ার অন্য কোন ইতিহাসেও এর তুল্য কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে আসমানী কিতাবের দাবিদার আরও জাতি রয়েছে এবং তারা তাদের কিতাব থেকে বিধি-বিধানও খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু কোন জাতি এটা দাবি করতে পারে না যে, তারা সেই বিধি-বিধান অনুসন্ধানের জ্ঞান ও কোন রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার এবং নির্ধারণ করে তাকে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়ের সম্মানিত অবস্থানে তুলে দিয়েছেন।

---

১. কিন্তু এটা কথা মনে রাখতে হবে যে, অসংখ্য রীতি-নীতি সম্বলিত উসুলে ফেকার কিতাব গুলোতে যা কিছু আছে তার সবই ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাতে এসম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত একটি পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি এমন কিছু কওলের অস্বীকৃতি জানিয়েছেন যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরা অনুযায়ী ইমাম সহেবের বলে প্রমাণিত।

www.pathagar.com

দণ্ডবিধি ও রাষ্ট্রনীতির ভূমিকায় 'হানাফী ফিকাহ্'

ফিকাহ্র দ্বিতীয় অংশ শুধুমাত্র আইন-কানুন বিষয় সম্বলিত । প্রথম অংশের তুলনায় তা অনেক বড় এবং ব্যাপক। এটাই সেই বিশেষ অংশ যা ইমাম আবু হানিফা (রহ) কে অন্যান্য সকল মুজতাহিদীন থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বরং শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। ইসলামের ইতিহাসে আইন বিশারদ হিসেবে কাউকে সনাক্ত করতে হলে ইমাম আবু হানিফার নামটাই সবার ওপরে ভেসে উঠে। ইমাম আবু হানিফা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে বিশেষ এই গুণটির জন্য আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, তিনি ধর্মীয় পবিত্রতার সাথে পার্থিব কাজকর্মের ভারসাম্য স্থাপন করেছিলেন এবং পরিবর্তনশীল সমাজ-সভ্যতার নিত্য-নব প্রয়োজনগুলোকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ধর্মীয় প্রধান এবং বিচারকের অবস্থানে থাকার কারণে অসংখ্য জটিল আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন ইত্যাদি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তাঁর ফতোয়াদানকারী সংস্থা অনেক বড় উচ্চ আদালত ছিল। যেখানে হাজার হাজার মোকদ্দমার ফয়সালা হয়েছে এবং তা ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যায়ের বিভিন্ন পরামর্শ নিতে রাজন্যবর্গ তাঁর এখানে আসা-যাওয়া করতো। তাঁর হাজার হাজার ছাত্র-শিষ্য বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাছাড়া ইতিমধ্যে তাঁর মানসিকতাও অভিজ্ঞ বিচারকের মতো হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটি ব্যাপার আইনের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁর অতি সূক্ষ্ম কারণ-বিন্দু বের করে ফেলতেন। ঐতিহাসিকগণের উল্লেখ করা কিছু ঘটনা আমরা তুলে ধরবো যা তাঁকে আরো কাছে থেকে দেখার সুযোগ করে দেবে।

এ পর্যায়ে আমরা সেইসব বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করবো যাদের কারণে হানাফী ফিকাহ্ অন্যান্য ফিকাহ্র তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

হানাফী ফিকাহ্র নীতি-পদ্ধতি বিবেক-বুদ্ধির অনুকূলে ঃ মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি এবং পৃথিবীতে তাঁর জীবন যাপন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত সমস্যাবলীর ইতিবাচক কল্যাণে, ধর্মীয় সমাধান— এটাই হানাফী ফিকাহ্র প্রধান বৈশিষ্ট্য। শরীয়তী বিধানের ব্যাপারে ইসলামী সমাজে শুরু থেকেই দু'টি চিন্তাধারা কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত। এক দলের অভিমত ঃ এই বিধান 'দাসত্বমূলক বিধান', এখানে কল্যাণ-অকল্যাণের কোন প্রশ্ন নেই। যেমন ঃ মদ্যপান বা পাপ অপকর্ম শুধুমাত্র এ কারণেই বর্জনীয় যে, তা শরীয়ত অনুমোদিত নয়। এভাবেই দান-খয়রাত এজন্য দেয়, কারণ তা শরীয়তের বিধানদাতা দিতে বলেছেন। অন্যথায় এই উভয় শ্রেণীর কাজ স্ব স্ব স্থানে কাজ হিসেবে মন্দ বা ভালো নয়। ইমাম শাফেয়ীর চিন্তাধারায় এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শাফেয়ী মতাবলম্বী ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আশ'আরী শাফেয়ী দৃষ্টিভঙ্গির ধর্মতত্ত্ব এভাবেই রচনা করেছেন।

অন্য দলের দৃষ্টিভঙ্গি

শরীয়তের সকল নীতি-বিধান ইতিবাচক কল্যাণধর্মীতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে কিছু বিষয়

www.pathagar.com

এমনও রয়েছে যার কল্যাণ সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারে না। তাই বলে তা কল্যাণশূন্য নয়! দু'টি ধারার নেপথ্যেই বড় বড় চিন্তাবিদ-মনীষীগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন বলে বিষয়টি বিতর্কিতই রয়ে গেছে। নইলে আদৌ কোন বিতর্কিত বিষয় এটি নয়। সকল বিষয়াদির গুরুত্ব ও কল্যাণী তাৎপর্য চূড়ান্তভাবে 'কালামে ইলাহী'র মধ্যে বিধৃত। কাফিরদের বিপরীতে আল-কুরআনের যুক্তি প্রদর্শন সাধারণভাবে এই মূল নীতিরই অভিব্যক্তিমূলক। নামাযের কল্যাণ আল্লাহ্ তা'আলা সোজাসুজি বলেছেন, তা تنهى عن الفحشاء والمكر —সকল নিকৃষ্ট কাজ এবং অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করে। রোযার কর্তব্য নির্ধারণের সাথে সাথে বলে দিয়েছেন ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ —যাতে তোমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনকারী হয়ে উঠতে পারো। জিহাদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ "যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়।"এভাবেই কুরআন-হাদীসের সর্বত্র যেসব বর্ণনা এবং ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে তা একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় যে, তার চূড়ান্ত লক্ষ্য কোন দিকে স্থির করা। সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা, প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত এই লক্ষ্যবিন্দুকেই ইমাম নিজের জন্য স্থির করেছেন এবং বিশ্বমানবতার ইহজাগতিক সকল কার্যক্রম যেন সেই লক্ষ্য অর্জনের পথেই পরিচালিত হয়, সেই কারণেই তাঁর রচিত নীতিশাস্ত্রের ছোট-বড় নীতি-পদ্ধতিগুলো যেমন মানব প্রকৃতির অনুকূলে, তেমনি তা সহজাত বিবেক-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীলও বটে। মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস ইমাম তাহাভী (রহ্) শারহে মা'আনী আল আসর' নামে যে বইখানি লিখেছেন তাতে এই বিতর্কের আলোচনা রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ ফিকাহ্র মাসায়েল মূল সূত্রের তথ্য অনুযায়ী প্রাসাঙ্গিক করা উচিত। ফিকাহ্র প্রত্যেকটি অধ্যায় নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফার কিছু কিছু মাসআলা নিয়ে অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সাথে সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মাসায়েল সম্পর্কে মুজতাহিদী যুক্তি প্রয়োগ প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফার মতামত হাদীস এবং বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনায় সামঞ্জস্যশীল। ইমাম মুহাম্মদও তাঁর কিতাবুল হজ্বে অধিকাংশ মাসায়েল বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিকতার আলোকে পর্যালোচনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফার দর্শন বিবেক-বুদ্ধির অনুকূলে, ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীরা কথাটা যখন বলেন একটু কটাক্ষ করেই বলেন। কারণ তাঁদের কাছে শরীয়তী বিধান, বিশেষ করে 'ইবাদত' বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ যতোই বিবেক-বুদ্ধি বর্জিত হবে ততোই তা দাসত্ব-ঘনিষ্ঠ হবে।

ইমাম রাযী (রহ্)-এর যুক্তি

যাকাত বিধান সম্পর্কে ইমাম রাযী ইমাম আবু হানিফার চাইতে ইমাম শাফেয়ীর মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[১] বলেছেন ঃ ইমাম শাফেয়ীর মতামত 'বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনার বাইরে' এবং এটাই তার শুদ্ধতার দলিল। কেননা যাকাতের বিধানসমূহ প্রায় সবটাই সরাসরি আদেশমূলক বিধান, যার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই।

সমসাময়িক অন্যান্য মনীষীগণের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের একটি বিশেষ কারণ ছিল। তৎকালীন সময়ে ফিকাহ্র বিষয়াবলী নিয়ে যেসব মনীষী চর্চা করতেন তাঁদের শিক্ষা জীবনের শুরুও এই ফিকাহ্র মাসায়েল নিয়ে হয়েছিল। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফার শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক বিষয় ছিল 'ধর্মতত্ত্ব' (ইল্‌মে কালাম)। যার

১. মানাফিবুশ শাফেয়ী, ইমাম রাযী।

www.pathagar.com

অনুশীলনী তাঁর চিন্তাশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছিল। এছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান চর্চায় অভ্যস্ত মু'তাযিলাদের সাথে তাঁর সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ব ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যেও বুদ্ধি চর্চার ভিত অসচেতনভাবেই রচিত হয়ে যাচ্ছিল। এবং মাসআলা নিয়ে বিতর্কের সময় তার ইতিবাচক কল্যাণময় দিকগুলো তাঁকে তুলে ধরতে হতো। এই ধরনের তর্ক-বিতর্ক, চিন্তা-গবেষণা ও চর্চা অনুশীলনী একপর্যায়ে তার সামনে মূল যে সত্যকে উদ্ভাসিত করে তুললো তাহলো শরীয়তের প্রতিটি মাসআলা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির অনুকূলে রচিত হয়েছে। ধর্মতত্ত্বের পরে তিনি যখন ফিকাহ্র প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিলেন, তখন সেখানেও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর থাকলো।

অন্যান্য ফিকাহ্র বিপরীতে হানাফী ফিকাহ্র মাসায়েলকে তুলনা করতে গেলে স্পষ্টতঃ এই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। লেনদেন ও আচরণবিধি সংক্রান্ত মাসআলায় তো বটেই ইবাদতের মাসআলাসমূহেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। যে ব্যাপারে অন্যান্য মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো— 'ইবাদতে বুদ্ধিবৃত্তির কোন ভূমিকা নেই'।

যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতগুলো কি কল্যাণ অর্জনের জন্য শরীয়তে ফরয করা হয়েছে ? সেই কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে বিধানসমূহের কার্যকারিতার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন ? তাহলে সেই প্রক্রিয়ায় সবচাইতে উত্তম বলে প্রমাণিত হবে, যা ইমাম আবু হানিফার ফিকাহ্য় বিধৃত। যেমন নামায— ভিন্ন ভিন্ন কিছু তৎপরতার সমন্বিত রূপের নাম। তাহলে নামাযের আসল যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিনয়, দাসত্ব প্রকাশ, আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্বের স্বীকারোক্তি ও প্রার্থনা ইত্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন্ কাজটি কি ভূমিকা পালন করে। কাজগুলোর পর্যায় বিভিন্ন। কিছু কাজ অবশ্য করণীয়, তা না হলে নামাযের আসল উদ্দেশ্যই সাধন হবে না। সেইসব কাজগুলোকে শরীয়তের ভাষায় 'ফরয' বলা হয়েছে। কিছু কাজ এমন রয়েছে যেগুলো মূল কাজের অনুসঙ্গ হয়ে প্রকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তা না হলে লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হয় না। সেই কাজগুলোর মর্যাদা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় কম। শরীয়ত যাদেরকে সুন্নত ও মুস্তাহাব নাম দিয়ে ব্যক্ত করেছে।

রাসূল (স) নিজে নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ধরনের কোন স্তর ভাগ করেননি। তা সত্ত্বেও কর্মতৎপরতাগুলোর অভিব্যক্তি অনুযায়ী তার সবটাই যে সমান গুরুত্বের অধিকারী নয়, তা অন্তত অনুমান করা যায়। এজন্য সকল মুজতাহিদগণ তার স্বাতন্ত্র্য ও পর্যায় ক্রমিক বৈশিষ্ট্য বিন্যাসের দিকে মনোযোগী হন। গভীর গবেষণার ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পর নামাযের তৎপরতাগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে স্তর বিন্যাস করেন। ইমাম আবু হানিফাও তা-ই করেছেন। তবে অন্যদের তুলনায় তাঁর বিন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে, তিনি যে তৎপরতাটিকে যে অবস্থান দিয়েছেন, তার অবস্থান মূলতঃ সেখানেই। যেমন নামাযের অবয়বই প্রকাশ পাবে না এমন কাজ কোন কোনটি ? নামায যেহেতু দাসত্ব স্বীকার এবং ভীতি প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতার নাম, তাই সকল মুজতাহিদগণের কাছে নিয়ত, তাকবীর, কেরাআত, রুকূ, সিজদা ইত্যাদি যার চাইতে উত্তম কোন প্রক্রিয়ায় দাসত্ব স্বীকার এবং ভয় প্রকাশের জন্য উপযোগী হতে পারে না। এগুলোই ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। স্বয়ং বিধানদাতাও এসবের গুরুত্বের প্রতি ইশারা করেছেন। কোথাও কোথাও ব্যাখ্যা করেও বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য মনীষীগণ অতিভক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে অনুসঙ্গগুলোকেও 'ফরয' বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ কোনভাবেই তা ফরযের গুরুত্ব রাখে না। তাই ইমাম আবু হানিফাও তাদের 'ফরয' বলে স্বীকার করতে নারাজ। যেমন ঃ ইমাম আবু হানিফার মতে তাকবীরে তাহরীমা الله اكبر (আল্লাহ্ মহান)-এর পরিবর্তে অন্য বাক্য দিয়েও বিধাতার মহানত্ব প্রকাশ করা যায়।

www.pathagar.com

যথা ঃ اللّٰه اَعْظَمُ وَاللّٰه اجلُّ (আল্লাহ্ মহান) যা আল্লাহু আকবারের সমার্থক ভাব প্রকাশ করে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, তা হতে পারে না। ইমাম আবু হানিফার মতে, তাকবীর ফার্সী ভাষায় উচ্চারণ করলেও কোন অসুবিধা নেই। ইমাম শাফেয়ীর কাছে তাতে নামায বাতিল হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ীর কাছে সূরা 'ফাতিহার' আরবী তেলাওয়াত ছাড়া নামায শুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না! ইমাম আবু হানিফার কাছে যে ব্যক্তি কুরআন বুঝে পড়তে পারে না! সেই অক্ষমতার জন্য সে তার নিজ ভাষায় তার অর্থ আবৃত্তি করতে পারে।[১] ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কাছে তরজমার দ্বারা কিছুতেই নামায শুদ্ধ হতে পারে না।

যাই হোক, এসব উদাহরণ দেখে এটা ধারণা করে নেয়া ঠিক হবে না যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ) বা অন্যান্য মুজতাহিদগণ তাদের গবেষণালব্ধ উপায়ে নামাযের মৌলিক কাঠামো নির্ধারণ করেছেন। মনীষীগণ হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার মধ্যে নিহিত ইশারা-ইঙ্গিতকে তার সাথে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যা ফিকাহ্র কিতাবগুলোতে নানানভাবে লেখা রয়েছে। আমরা আসলে বলতে চাই যে, ইমাম আবু হানিফার মতামতের সাথে দলিল হিসেবে হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনা। যা থেকে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ) শরীয়তের কল্যাণী দর্শনকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন।

যাকাত বিধান ও হানাফী ফিকাহ্

যাকাতের আসল উদ্দেশ্য স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি-সমমর্মিতা ও সাহায্য-সহযোগিতা। যে কারণে যাকাত কোন লোকেরা পেতে পারে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। দরিদ্র, ভিখারী, যাকাত প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি,...... ঋণগ্রস্ত, পথিক, যোদ্ধা, ডাক পিওন, ইত্যাদি যেহেতু এদের ব্যাপারে খোদ কুরআন মজীদে বিস্তারিতভাবে বলা আছে সেহেতু মুজতাহিদীনদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু বরাদ্দের ব্যাপারে একটা বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ) মনে করেছেন যে, এই আট প্রকারের লোক প্রত্যেকেই সমানভাবে যাকাত পাওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত এই আট প্রকারের লোকের কাছে যাকাত পৌছানো না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত যাকাতের ফরয আদায় হতে পারে না। ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য একটু অন্য রকম ঃ ঐ আট প্রকারের লোকেরাই যাকাত পাওয়ার অধিকারী, তবে ঐ আট ধরনেরই হতে হবে এটা শর্ত নয়, কয়েক প্রকারের মধ্যেও বন্টন করা যেতে পারে এবং স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী সময়ের ইমাম বা ধর্মীয় নেতা তা নির্ধারণ করে দেবেন কাকে দিতে হবে।

হানাফী ফিকাহ্র সহজতা

অন্যান্য ফিকাহ্র তুলনায় হানাফী ফিকাহ্র নিয়মগুলো সহজ-সরল । কুরআন মজীদের বহু জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সবকিছুকে সহজ করে দিয়েছেন, কঠিন করে নয়"। রাসূল (স) বলেছেন, "আমি সহজ এবং সরল শরীয়ত নিয়ে এসেছি"।

১. ইমাম মুহাম্মদ 'জামে ছাগীরে' যে বর্ণনা করেছেন তাতে অক্ষমতার কথাটি বলেননি। যার ফলে সমালোচকরা বলার সুযোগ পেয়েছে যে ইমাম আবু হানীফা কুরআনের মূল বানীর চাইতে অর্থকে বেশি গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ তার মতে শুধুমাত্র কুরআনের অর্থ বুঝলেই কুরআনের সাথে সম্পর্ক হতে পারে। ইমাম সাহেবের এই ভুলকে আমরা স্বীকার করি। কিন্তু হানাফী ফিকাহ্ প্রমাণ করেছে যে, শেষ পর্যন্ত ইমাম সাহেব তার কথা প্রত্যাহার করেছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলামের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তা বৈরাগ্যতা মুক্ত। এর মধ্যে কোন কঠিন ইবাদত নেই। এর বিধি-বিধান অত্যন্ত সরল এবং পালনের জন্য সহজ। অন্যান্য ফিকাহ্‌র তুলনায় হানাফী ফিকাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই, যে তা আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়তের মতোই সহজ-সরল।

অন্যান্য ফিকাহ্‌র কিছু কিছু বিধান অত্যন্ত কঠিন। নমুনা হিসেবে আমরা এখানে কিছু বিধান তুলে ধরছি।

ইসলামে চুরির শাস্তি হাত কেটে দেয়া, এটা সর্বজনবিদিত। কিন্তু মুজতাহিদীনগণ চুরির সংজ্ঞা এবং শর্ত আরোপ করেছেন যা পূর্ণ না হলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। এইসব শর্ত অনুযায়ী মূল বিধানের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয় তা নিম্নলিখিত তালিকায় প্রকট হয়ে উঠবে এবং অনুভব করা যাবে যে, ইমাম আবু হানিফার মতামত আসলেই কতোটা বাস্তব এবং জীবনঘনিষ্ঠ।

ইমাম আবু হানিফার মাসায়েল	ন্যান্যদের মাসায়েল
শাস্তিযোগ্য চুরির মাত্রা একটি স্বর্ণ মুদ্রা বা তার সমপরিমাণ। এই মাত্রার মধ্যে কয়েকজন থাকলে কারোই হাত কাটা যাবে না।	ইমাম আহমাদের নির্ধারিত মাত্রা এক স্বর্ণ মুদ্রার চারভাগের একভাগ এবং প্রত্যেকেরই হাত কাটা যাবে।
অবুঝ শিশু হাত কাটার শাস্তিযোগ্য নয়।	ইমাম মালিকের মতে, তারও কাটতে হবে।
কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না।	অন্যদের মতে, কাটা যাবে।
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে একে-অন্যের মাল চুরি করলে তা হাত কাটার শাস্তিযোগ্য নয়।	ইমাম মালিকের মতে, সেখানেও কাটতে হবে।
পুত্র, পিতার মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।	ইমাম মালিকের মতে, কাটতে হবে।
নিকটাত্মীয়ের মাল চুরি হাত কাটার শাস্তিযোগ্য নয়।	ইমাম মালিকের মতে, কাটতে হবে। অন্যদের সবার মতে কাটতে হবে।
ধার নিয়ে অস্বীকারকারী হাত কাটার যোগ্য নয়।	অন্যান্য সবার মতে, যোগ্য।
এক লোক কোন জিনিস চুরি করলো, পরে দান অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে তার মালিক হলো। এমন ব্যক্তি হাত কাটার শাস্তি পাবে না।	অন্য ইমামদের মতে শাস্তি পাবে।
অন্য ধর্ম থেকে আগত নওমুসলিম চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি পাবে না।	অন্য সবার মতে, সেও শাস্তি পাবে।
কুরআন চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।	ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালিকের মতে, যাবে।
জ্বালানি কাঠ অথবা দ্রুত পচনশীল কোন বস্তু চুরির জন্য হাত কাটা নয়।	অন্যান্য সব ইমামের মতে, সেখানেও আছে।

www.pathagar.com

হানাফী ফিকাহ্‌র নিয়ম অত্যন্ত ব্যাপক ও সমাজ-সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যশীল

ফিকাহ্‌র বেশ বড় অংশজুড়ে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও পারস্পরিক লেনদেন, তথা আচরণবিধি (মুয়ামিলাত)। এবং এটাই সেই অধ্যায় যেখানে মুজতাহিদগণের সমকালীন পর্যবেক্ষণ ও বিষয় নির্ণয়ের যোগ্যতা কার কতোটুকু তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) দানের জন্য দখলের প্রয়োজন মনে করেন না। প্রতিবেশীর অগ্রক্রয়ের অধিকার অনুমোদন করেন না। লেনদেন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে উপস্থিত মহিলাদের স্বাক্ষী নাজায়েয ঘোষণা করেছেন। বিবাহের স্বাক্ষীগণের দায়িত্ববান ও ন্যায়পরায়ণ বলে বিবেচিত হওয়াকে প্রয়োজন মনে করেন। জিম্মীদের পারস্পরিক বিষয়ে জিম্মীদের স্বাক্ষীকে নাজায়েয মনে করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমাজ-সভ্যতার খুব একটা উন্নতি প্রগতি যেখানে ঘটেনি সেখানে ঐসব নিয়ম-নীতি চলতে পারে। কিন্তু যেসব দেশে সমাজ-সভ্যতা ক্রমউন্নয়নশীল, পারস্পরিক সম্পর্ক যেখানে নিত্য পরিবর্তনশীল, অধিকার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যেখানে কোন উপায় নেই, সেখানে এই ধরনের নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয় এবং এ কারণেই ঐসব বিষয়গুলোতে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতামত ইমাম শাফেয়ীর বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন লিখেছেন ঃ ইমাম মালিকের মতামত, সেইসব দেশেই প্রচলিত হাতে পেরেছে, যেসব দেশে সমাজ-সভ্যতার বিকাশ ঘটেনি। তার কারণ ইমাম মালিকের মাসায়েলে পরিবর্তনশীল সমাজনীতির জন্য কোন অবকাশ ছিল না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) যে পর্যবেক্ষণ এবং দূরদর্শিতার সাথে আচরণবিধির নীতিমালা তৈরী করেছেন তার সঠিক পরিচয়ের জন্য তাঁর রচিত আচরণবিধির কিছু অধ্যায় নিয়ে বিস্তারিত একখানা বই লেখা যায়, কিন্তু সে রকম বিস্তারিতভাবে কিছু লেখার অবকাশ সংক্ষিপ্ত এই প্রয়াসের মধ্যে নেই। তাই مالايدرك كله لايترك كله "পুরোটা না পারলে সবটা ছেড়ে দিওনা" এই প্রবাদের আওতায় নমুনা হিসেবে শুধুমাত্র বিবাহের মাসায়েল উল্লেখ করতে চাই যার মধ্যে ইবাদত এবং পারস্পরিক আচরণ দুটোরই সমন্বয় রয়েছে।

বিবাহের মাসায়েল

যদিও ফকীহ্‌গণ বিবাহকে ইবাদতের মধ্যে শামিল করেছেন। কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা প্রথা। তা না হলে সমাজ ও সভ্যতার দুটি বড় বড় সিদ্ধান্ত এর ওপর পুরোপুরি কার্যকর কাজেই আচরণবিধির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে তাকে গণ্য করা যায়।

বিবাহের বিষয়গুলো যে নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা নিম্নরূপ ঃ

১. পাত্র-পাত্রী এবং পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক নির্বাচন।

২. বৈবাহিক সম্পর্ক এবং কার্যক্রমের রূপরেখা।

৩. তার স্থিতি-স্থায়িত্বের দৃঢ়তা কতোটা প্রয়োজন।

৪. উভয়পক্ষের অধিকারসমূহ নির্ধারণ করা।

৫. বিবাহের রীতি ও আনুষ্ঠানিকতার পদ্ধতি আলোচনা।

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণের ব্যাপারে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া

www.pathagar.com

সকল মাযহাবে প্রায় একই রকম নিয়ম প্রচলিত। কিছু বিধি-নিষেধের বেলায় সকল জাতি সকল মাযহাব একই মত পোষণ করে। কারণ, ব্যাপারটা সুস্পষ্টভাবে নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর হুজ্জাতুল্লা হিল বালেগায় এবং দার্শনিক বাট্রান্ড রাসেলের Book of utility-তে বিবাহের জন্য নিষিদ্ধজনদের নিষিদ্ধ হওয়ার যে কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তা প্রায় একই। যেহেতু ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে এবং কুরআন মজীদে নিষিদ্ধজনদের নাম বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে। তাই মূল মাসআলার ব্যাপারে সকল মুজতাহিদীন একমত। তবে বাহ্যিক কিছু ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে। এর মধ্যে জ্বেনা'র কারণে নিষিদ্ধ হওয়ার মাসআলা। যা ইমাম আবু হানিফা (রহ) এবং ইমাম শাফেয়ীর (রহ) মধ্যে বিতর্কিত মাসআলাসমূহের অন্যতম। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মতে অবৈধ যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধতার আওতায় পড়ে না। যেমন ঃ পিতা কোন মহিলার সাথে জ্বেনা করলে পুত্রের সাথে সে মহিলার বিবাহে কোন বাধা নেই। ইমাম শাফেয়ী এই পরিধিকে আরো বড় করে দিয়ে বলেন ঃ এক ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে জ্বেনা করলো এবং এর ফলে মেয়ে জন্ম নিলো, এই জন্মদাতা পুরুষটি সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। তার দলিল, জ্বেনা একটি হারাম কাজ, সে জন্য সে কোন হালালকে হারাম করতে পারে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠতার ফলে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ওপর যে প্রাকৃতিক প্রভাব পড়ে তা বিবাহের ওপর সীমাবদ্ধ নয়।

বস্তুত এটাই স্বতসিদ্ধ কথা, বিবাহের জন্য নিষিদ্ধজনদের নিষিদ্ধতা যে নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত তার সাথে বিবাহের কোন সম্পৃক্ততা নেই। নিজের ঔরশে যে সন্তান জন্ম নেবে, হোক না তা জ্বেনার কারণেই! তার সাথে আবার বিবাহ বা যৌন সম্পর্কের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতা বিরোধী। পিতার সাময়ীক বিবাহ (মু'তা) সম্পর্কিতদের বেলায়ও এই একই মতামত। এবং এব্যাপারে খোদ কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছে কিন্তু যেহেতু এটা বর্ণনা ভিত্তিক বিতর্ক নয়, তাই আমরা তা উল্লেখ করছি না।

বৈবাহিক সম্পর্ক বেছে নেবার স্বাধীনতা

বিবাহের জন্য বেছে নেবার অধিকারী কে ? বিবাহ বিষয়ক সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিবাহের পরিণতি ভালো বা মন্দ তা সম্পূর্ণভাবে এই অধিকারের ওপর নির্ভর করে। ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের মতে, নারী প্রাপ্তবয়স্ক এবং বুদ্ধিমতি হলেও বিবাহের ব্যাপারে তার কোন মতামত নেই। অর্থাৎ কোনভাবেই সে নিজের বিয়ে নিজে করতে পারবে না। তার অভিভাবক তাকে বিয়ে দেবে। মনীষী মহাত্মনগণ এক্ষেত্রে একদিকে নারীর স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার হরণ করলেন! অপরদিকে তার অভিভাবককে এমন ক্ষমতা দিয়ে দিলেন যে, তারা যার সাথে খুশী তার সাথে মেয়েটির বিবাহ দিতে পারেন। তাকে অস্বীকার করার কোন অধিকার মেয়েটির নেই।

ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে, প্রাপ্তবয়স্ক নারী নিজের বিবাহের ব্যাপারে স্বাধীন মতামতের অধিকারী। এমনকি অভিভাবক নাবালেগ অবস্থায় বিবাহ দিলে সেই মেয়ে বালেগ অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সে বিয়েকে নাকচ করে দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর অবস্থান বর্ণনাভিত্তিক দলিলের ওপর। কিন্তু বর্ণনাভিত্তিক দলিল প্রদানে ইমাম আবু হানিফাও এতোটুকু কম বলেননি। ইমাম শাফেয়ীর দলিল যদি— لانكاح الاولى "ওলী ব্যতিত বিবাহ বৈধ নহে" —হয় তাহলে ইমাম আবু হানিফার দলিল الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن فى نفسها —"পূর্বে তালাক প্রাপ্তা মেয়ে তার নিজের যাবতীয় ব্যাপারে তার অভিভাবকের তুলনায় বেশি অধিকার সম্পন্ন আর

www.pathagar.com

কুমারী মেয়ের থেকে অনুমতি চাওয়া হবে"— উপস্থিত রয়েছে। যাই হোক, আমরা এ আলোচনায় যাবো না।

তৃতীয় আলোচনা বৈবাহিক সম্পর্কের স্থিতি-স্থায়িত্বের কতোটা প্রয়োজন

বৈবাহিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা সভ্যতার বুনিয়াদ এবং সমাজের মেরুদণ্ড। এটা শুধু তখনই সম্ভব যখন তা সম্মানিত এবং মর্যাদাবান ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তা না হলে বিবাহ নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের একটা লাইসেন্স ছাড়া আর কিছুই নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ) অত্যন্ত শক্তভাবে এই নীতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি বিবাহ বন্ধনের পদ্ধতি, মোহর নির্ধারণ, তালাক বাস্তবায়ন, স্ত্রীর আগ্রহে প্রদত্ত তালাক ইত্যাদির যে নিয়ম রচনা করেছেন তা ঐ মূলনীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

এই অধ্যায়ে তাঁর দেয়া সর্বপ্রথম মাসআলা ঃ

الطلاق مع استقامة حال الزوجين حرام -

যতোক্ষণ পর্যন্ত দম্পত্তির অবস্থা যথাযথ অবস্থানে থাকে, তালাক দেয়া হারাম।

নিতান্ত প্রয়োজন এবং অক্ষমতার প্রেক্ষিতে তালাক দেয়া জায়েয রেখেছেন। তবে তার পদ্ধতি স্থির করে দিয়েছেন। তিন বারে তালাক দিতে হবে এবং প্রতিবার দেয়া তালাকের ব্যবধান এক মাস। যেন এই সময়ের মধ্যে স্বামী তার সিদ্ধান্ত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট অবকাশ পায় এবং সিদ্ধান্ত বদলাতে চাইলে বদলাতে পারে। বস্তুত তালাক না দেয়াই উত্তম। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও যদি আপোস-মীমাংসা না হয় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, এতদুভয়ের কিছুতেই একত্রে থাকা সম্ভব নয়, তখন তালাক দেয়া যাবে। তালাকের পরে স্ত্রীর মোহরানা আদায় করে দেবে এবং তিন মাস পর্যন্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। শর্তটির তাৎপর্য এই যে, যতোদিন পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্যন্ত খাওয়া-পরা নিয়ে যেন কোন সমস্যা না হয় এবং মোহরের টাকা সে তার ইচ্ছামত অন্যান্য খাতে ব্যয় করতে পারে।

এ অধ্যায়ে আমরা ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর যেসব মাসআলা নিয়ে অন্যান্য ইমামগণের সাথে মতপার্থক্য হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। যা পড়লে অনুমান করা যাবে, ইমাম আবু হানিফা (রহ) বিবাহের বিষয়টিকে কতোখানি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কতো শক্তভাবে এর চারিদিকে দেয়াল তোলার চেষ্টা করেছেন যেন কোনভাবেই বন্ধনটি ছিন্ন না হয়।

ইমাম আবু হানিফা মত	অন্যান্য ইমামগণের মত
১. যতোক্ষণ পর্যন্ত দুই পক্ষের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যাবে তালাক দেয়া হারাম।	১. ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কাছে হারাম নয়।
২. একবারে তিন তালাক দেয়া হারাম, যে তা দেয়, সে পাপী।	২. ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং আহমদ বিন হাম্বাল (রহ) বলেন ঃ তাতে কোন সমস্যা নেই।
৩. মোহরের পরিমাণ কোন অবস্থায় দশ দেরহামের কম হতে পারবে না। এর উদ্দেশ্য পুরুষ যেন যখন-তখন তালাক দেবার দুঃসাহস না করে। অর্থের এই পরিমাণটা নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য ততোটাই কঠিন যতোটা উচ্চবিত্তের জন্য দু'চার হাজার।	৩. ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম ইবনে হাম্বালের মতে, একটি শস্যদানাও মোহর হতে পারে।

www.pathagar.com

এর পরিণাম কতো ভয়ঙ্কর। পুরুষ যখন-তখন তালাক দিয়ে দিতে পারে এবং তালাকের পরে মহিলাদের অবস্থা তখন কল্পনাও করা যায় না।

ইমাম আবু হানিফা মত	অন্যান্য ইমামগণের মত
৪. পূর্ণ তালাকের পরে সম্পূর্ণ মোহর আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়।	৪. ইমাম শাফেয়ীর মতে অর্ধেক ওয়াজিব।
৫. কোন রোগ-ব্যাধির কারণে, এমনকি যদি কুষ্ঠ রোগও হয়, তালাক দেয়া যাবে না।	৫. ইমাম শাফেয়ী (রহ) ও ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে এ কারণেও তালাক দেয়া যাবে।
৬. যদি কোনো ব্যক্তি মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং ইদ্দতের সময়কাল শেষ হবার পূর্বেই স্বামীর মৃত্যু হয় তাহলে সে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গণ্য হবে।	৬ ইমাম শাফেয়ীর মতে সে মিরাস পাবে না।
৭. প্রত্যাহারযোগ্য তালাক অবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ নয়। অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্ক এরকম রাগারাগির কারণে শেষ হয়ে যায় না।	৭ ইমাম শাফেয়ীর মতে, তা হারাম এবং তা শেষ তালাকের মতোই।
৮. প্রত্যাহারের জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। ভালো সম্পর্কের যে কোন নিদর্শনমূলক তৎপরতাই যথেষ্ট। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের পথ সহজ করে দেয়া।	৮. ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মতে, মৌখিক স্বীকারোক্তি ছাড়া দাম্পত্য সম্পর্ক প্রত্যাবর্তন কিছুতেই সম্ভব নয়।
৯. প্রত্যাহারের জন্য স্বাক্ষীর প্রয়োজন নেই। কেননা এমনও হতে পারে যে, স্বাক্ষী পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ চূড়ান্ত তালাক কার্যকর হওয়ার সময় অতি নিকটে।	৯. ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে স্বাক্ষী ছাড়া প্রত্যাবর্তণ শুদ্ধ নয়।

বিবাহের নিয়ম সিদ্ধ হওয়ার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী যে, পক্ষদ্বয়ের অধিকারসমূহ যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যেসব ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত তা যেন বাতিল হয়ে না যায়। কেননা বিবাহে নারী যেন তার নিজের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারে। এমন না হয় যে, সে তার মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। এটা ইসলামের বিশেষ বদান্যতা। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এইভাবে নারীর অধিকার সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্মে নেই। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এই মৌলিক নীতি তার সকল মাসআলার মধ্যে জীবন্ত রেখেছেন। এখানেই বলা যায় যে, এইসব মাসায়েলে অন্যান্য ইমামগণ যে বিরোধিতা করেছেন, শ্রেফ ভুল করেছেন।

বিবাহ সম্পাদনের নিয়ম

সর্বশেষ আলোচনা বিবাহের রীতি নিয়ে অর্থাৎ বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা কিভাবে সম্পাদন হবে। যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা দু'টি বিষয় অর্জনের জন্য। একটি ঃ উভয়পক্ষের সার্বিক সম্মতি

এবং অনন্দময় সম্মিলন। দ্বিতীয়টি ঃ বিবাহ্ সংগঠনের ঘোষণা ও প্রচার। এজন্য ইমাম আবু হানিফা খুব সহজ এবং সাধারণ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন। উভয়পক্ষ এমন কিছু কথা উচ্চারণ করবে যাতে প্রকাশ পাবে যে, তারা বিবাহকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ঘটনাটি কমপক্ষে উপস্থিত দু'জন স্বাক্ষীর সম্মুখে সংঘটিত হতে হবে। শর্ত দু'টি এতোটাই সহজ যে, তা যে কোন সময় ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু ইমামগণের মধ্যে কেউ কেউ শর্তগুলোকে এমন কঠিন করে দিয়েছেন, যা পালন করা খুবই কষ্টকর। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মতে, বিবাহের স্বাক্ষীগণ নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। নইলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষতার যে সংজ্ঞা মুজতাহিদগণ বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ী (রহ) দিয়েছেন তা ইদানীংকালে লক্ষজনে দু'-একজন পাওয়া যেতে পারে এবং তার দেয়া শর্ত অনুযায়ী শুদ্ধ বিবাহের সংখ্যা সাধারণ সমাজে আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং ইমাম ইবনে হাম্বাল (রহ)-এর মতে স্বাক্ষীগণ পুরুষ হতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে নারীও হতে পারে। ইমাম শাফেয়ীর মতে বিশেষভাবে প্রচলিত কোন ভাষা ব্যবহার করতে হবে। অথচ বিশেষ কোন ভাষা বা পরিভাষা ব্যবহারের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। যে কোন শব্দ বা কথা, যা দিয়ে মূল উদ্দেশ্য বোঝানো যায়। যেমন ঃ দান করলাম, গ্রহণ করলাম ইত্যাদি বিবাহ-বন্ধন শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

জিম্মীদের অধিকার

মুসলিম রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য হানাফী ফিকাহ্‌র বিধান অত্যন্ত উদার ও স্বাধীনতাপূর্ণ। অন্য কোন ইমাম এবং মুজতাহিদগণের মাসআলায় এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। যদিও সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণে স্বয়ং শরীয়তদাতার বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা রয়েছে, কিন্তু তা সব সামগ্রিক। তাছাড়া শরীয়তের কিছু কথা এমন যা বাহ্যত তাদের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে বলে মনে হয়, এজন্য তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রচুর বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সঠিক এবং বিবেকসম্মত বলে মনে হয়।

একসময় মুসলমানরা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছে। লক্ষ-কোটি অমুসলিম সংখ্যালঘু সুখে-শান্তিতে বসবাস করেছে সেই মুসলিম রাষ্ট্রে। তাদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারটি এতোটুকু উপেক্ষিত হলে রাষ্ট্রীয়ভাবে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ) সংখ্যালঘুদের যে অধিকার দিয়েছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সরকার তার রাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের দিয়েছে বলে প্রমাণ নেই। মানবতা এবং ন্যায়বিচারের অহংকারী দাবিদার পাশ্চাত্য, মৌখিক বাগাড়ম্বর অনেক করতে পারে, কিন্তু বাস্তব কোন উদাহরণ তারা দেখাতে পারে না। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা (রহ্) রচিত বিধান অধিকাংশ মুসলিম শাসনের রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল। বিশেষ করে হারুন আর-রশিদের বিশাল সাম্রাজ্যে এই নীতি স্বার্থকভাবে কার্যকর ছিল।

সবচাইতে বড় মাসআলা কতল এবং কেসাসের মাসআলা

ইমাম আবু হানিফার মতে জিম্মীদের রক্ত ও মুসলমানদের রক্ত একই রং, একই মূল্য। অর্থাৎ কোন মুসলিম ইচ্ছাকৃতভাবে কোন অমুসলিমকে হত্যা করলে সেই মুসলমানকে হত্যা করেই কেসাস নেয়া হবে। যদি ভুল করে হত্যা করে তাহলে একজন মুসলিম হত্যার যে রক্তমূল্য নির্ধারণ করা থাকবে জিম্মী হত্যার দায়ে ঠিক একই পরিমাণ আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

ইমাম রাযী (রহ) তাঁর মানাকিবুশ্ শাফেয়ী কিতাবে হানাফীদের কটাক্ষ করে বলেছেন যে, 'ওদের কাছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর রক্ত একটি নিকৃষ্ট বিধর্মীর রক্তের সমান। অর্থাৎ যদি আবু বকর সিদ্দিক (রা) কোন নিরপরাধ জিম্মীকে হত্যা করে ফেলতেন তাহলে হানাফীদের মতে তিনিও হত্যার দায়ে হত্যারযোগ্য হয়ে যেতেন। হানাফীপন্থী আলেমগণ তাদের মাসআলা বিশ্লেষণে এ ধরনের কোন উদাহরণ প্রয়োগ করেননি। ইমাম রাযী নিজেই এই ধরনের একটা উদাহরণ রচনা করেছেন ঐ মাসআলাটিকে বদনাম করার জন্য। কিন্তু আমরা অত্যন্ত অহংকারের সাথে এই কটাক্ষকে কবুল করে নিচ্ছি। নিঃসন্দেহে বিধাতার দেয়া ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বাদশাহ-ফকির, আপন-পর, প্রিয়-অপ্রিয় সব এক সমান। এটা ইসলামের উদারতা যে, সে তার প্রজাকেও অধিকারের দিক থেকে নিজের সমান মনে করে। ইসলাম তার ইনসাফ নিয়ে অহংকার করছে, ইমাম রাযী যদি তাতে লজ্জাবোধ করেন করতে পারেন!

খোদ সাহাবাগণের কথা এবং কাজ কি রকম ছিল ?

হযরত আলী (রা) বলছেন ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا -

অর্থাৎ জিম্মীদের রক্ত যেন আমাদের রক্ত, তাদের রক্তমূল্য আমাদের রক্তমূল্যের মতোই।

শুধু হযরত আলী (রা)-ই নয়, সকল মুহাজেরীন ও আনসার সাহাবাগণেরও এই একই মত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) পিতা হযরত উমর (রা)-এর আহত হবার পেছনে সন্দেহভাজন দুই কাফিরকে হত্যা করে ফেললেন। হযরত উসমান (রা) খিলাফতে আসীন হওয়ার পর সকল মুহাজেরীন ও আনসারগণের পরামর্শ সভায় সেই খুনের ব্যাপারে রায় জানতে চাইলে সর্বসম্মতভাবে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-কে হত্যা করে কেসাস প্রতিষ্ঠার অবিচল রায় দিয়েছিলেন।

বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘুদের অবস্থান সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার মতামত সমঅধিকারের। ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানদের মতো তারাও সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে কোন ধরনের ব্যবসা তারা করতে পারবে। ট্যাক্স বা খাজনা তারা ততোটুকুই দেবে যতোটুকু মুসলিমরা দেয়। 'জিযিয়া' যা তাদের ধর্ম রক্ষার জন্য দেয়, তা অবস্থা এবং অবস্থানের প্রেক্ষিতে ধার্য হবে। গরীব বিধর্মী জিজিয়া বাকী রেখে মরে গেলে তার জিযিয়া মওকুফ হয়ে যাবে। সংখ্যালঘুদের নিজস্ব পারস্পারিক আচরণবিধি তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে। এমনকি কোন অগ্নিপূজক তার নিজ কন্যার সাথে বিবাহ করলে ইসলামী সরকার তাদের ধর্ম অনুযায়ী তাকে শুদ্ধ বলেই বিবেচনা করবে। জিম্মীদের স্বাক্ষী তাদের নিজেদের মামলা-মোকদ্দমায় গ্রহণযোগ্য হবে। জিম্মীদের সামাজিক মর্যাদা মুসলিমদের মতো সমান। তারা মক্কা-মদীনার মাসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে। এই শহর দু'টিতে বসবাসের ইচ্ছা করলে তাও করতে পারবে। সকল মসজিদে কারো কোনো অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবে। মুসলমানদের নিজেদের তৈরী করা শহরের সুবিধাজনক স্থানে তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় স্থাপন করতে পারবে। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে অংশগ্রহণ করতে চাইলে প্রধান সেনাপতি তার ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারবে এবং যে কোনো ধরনের সহযোগিতা নিতে পারবে।

www.pathagar.com

এই ধরনের অন্যান্য নীতি-বিধানেও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা সামাজিক আচরণবিধিতে (মোয়ামেলাত) জিম্মীদের অধিকার মুসলিম নাগরিকদের মতো সমান সমান রেখেছেন এবং কোনো কোনো ব্যাপারে মুসলিমদের চাইতেও বেশি অধিকার দিয়েছেন। যেমন জিম্মীরা কখন তাদের চুক্তির বাইরে চলে যায়? এ মাসআলায় তাঁর মতামত ঃ তারা যদি দল গঠন করে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কেবলমাত্র তখনই তাদের সকল অধিকার বাতিল বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া অন্য কোন কারণে তাদের অধিকার হরণ করা যাবে না। যেমন ঃ যদি জিযিয়া না দেয়, কোন মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, কাফিরদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করে, বা কোনো মুসলিমকে কুফরীর প্ররোচণা দেয়, অথবা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (স)-এর সাথে বেআদবী করে। এইসব অবস্থায় সে শাস্তিযোগ্য হবে বটে, কিন্তু বিদ্রোহী বলা যাবে না এবং তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

এবার অন্যান্য ইমামগণের মতামত আলোচনা করা যাক। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মতেঃ কোনো মুসলিম নিরাপরাধ কোনো জিম্মীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে সে মুসলিম কেসাসের আওতায় আসবে না। শুধুমাত্র রক্তমূল্য দেবে। অথবা কোন অর্থদণ্ড আদায় করবে। তাও মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ। ইমাম মালিক (রহ)-এর মতে অর্ধেক। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের আরোপিত কাঠিন্য এরকম যে, কোনো জিম্মী ব্যবসায়ী মালামাল নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াত করতে চাইলে, যতোবার সে যাতায়াত করবে প্রতিবারই নতুন করে কর আদায় করতে হবে।

জিযিয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মতামত হলো, কোন অবস্থায় এক আশরাফীর কম হতে পারবে না। বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, দরিদ্র যাই হোক না কেন, কোনো ক্ষমা নেই— আমৃত্যু তা দিয়ে যেতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ) থেকে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, দারিদ্র্যতার জন্য যে জিযিয়া দিতে পারবে না সে যেন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে না থাকতে পারে। জিযিয়া করের যে পরিমাণ হযরত উমর (রা)-এর সময় ধার্য করা হয়েছিল তার থেকে বাড়ানো যাবে, কিন্তু কোন অবস্থায় কম করা যাবে না। সংখ্যালঘুদের কোন স্বাক্ষ্য নেই। এমনকি তাদের নিজেদের মধ্যের মামলা-মোকদ্দমায়ও তাদের কোন স্বাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই মাসআলাটির ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (রহ) দু'জনেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

মাসজিদুল হারামে কোনো জিম্মী কোনো অবস্থাতেই প্রবেশ করতে পারবে না এবং মক্কা ও মদীনা শহরে তাদের বসবাসের কোন প্রশ্নই উঠে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে সাধারণ মাসজিদসমূহে অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু ইমাম মালিক ও ইমাম ইবনে হাম্বাল (রহ)-এর মতে কিছুতেই সে অনুমতি পেতে পারে না।

জিম্মী ইসলামী সাম্রাজ্যের কোন স্থানে তাদের উপাসনালয় স্থাপন করতে পারবে না। জিম্মীদের ওপর আস্থা রাখা যাবে না এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনীতে তাদের কোনো স্থান নেই। কোনো জিম্মী ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোনো মুসলিমকে হত্যা করে অথবা কোনো মুসলিম মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে সেই মুহূর্তে তার সকল অধিকার হরণ করে বিদ্রোহী কাফির হিসেবে গণ্য হবে। এই বিধান ইয়াহুদী এবং খ্রীস্টানদের জন্য প্রযোজ্য। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মতে, জিযিয়া দিতে চাইলেও ইসলামী সীমানায় মূর্তিপূজকদের কোনো স্থান নেই। এই আইনগুলো এতো কঠিন যে, দুর্বল থেকে দুর্বলতম কোনো জাতির পক্ষেও মেনে চলা সম্ভব

www.pathagar.com

নয়। এবং এই কারণেই ইমাম শাফেয়ী (রহ) প্রমুখের মাযহাব কোনো রাষ্ট্রীয় শাসনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। যদিও মিশরে একটা দীর্ঘসময়কাল সরকারীভাবে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মাযহাব কার্যকর ছিল, কিন্তু তার তীব্র প্রতিক্রিয়া মাঝে মাঝেই ইয়াহুদী খ্রীস্টানদের বিদ্রোহী করে তুলতো এবং তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করতো।

এ পর্যায়ে হানাফী ফিকাহ্‌র কিছু দুর্বলতাও আলোচনায় আসা প্রয়োজন বলে মনে করছি। এই জিম্মীদের ব্যাপারেই এমন কিছু বিধান রয়েছে যা অত্যন্ত কঠিন এবং সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় বহন করে। এবং যেহেতু তা এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যেন তা বিশেষভাবে ইমাম আবু হানিফারই মাসায়েল। যে কারণে অন্য জাতির হানাফী মাযহাবের উপর বরং সাধারণভাবে ইসলামী বিধি-বিধানের ওপর আক্রমণ করার সুযোগ করে দিয়েছে। 'হেদায়াতে' আছে যে, জিম্মীরা চাল-চলন ও লেবাস-পোশাকে মুসলমানদের সমপর্যায়ে আসতে পারবে না। তারা ঘোড়ায় চড়তে পারবে না, অস্ত্র বহন করবে না, চিহ্ন হিসেবে বেল্ট পরবে। তাদের ঘরগুলোকে নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে পরিচিত করে তুলতে হবে। যেন তা দেখে বোঝা যায় যে, এরা ইসলামী সমাজের বহির্ভূত ইত্যাদি ইত্যাদি। 'হেদায়ার' রচয়িতা তার বিধানগুলোর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, জিম্মীদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন আছে। ফতোয়ায়ে আলমগীরির মধ্যে এর চাইতেও ভয়ঙ্কর এবং নির্দয় বিধান দেয়া আছে। কিন্তু এই যে সব বাড়াবাড়ি তা পরবর্তী কালের ফকীহ্‌দের রচনা এবং তাদের সংযোজন, ইমাম আবু হানিফার সত্ত্বা এই কুৎসিত কলঙ্ক থেকে মুক্ত।

হানাফী ফিকাহ্ শরীয়তের মূল সূত্রের সাথে সম্পৃক্ত

একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানে এই যে, যেসব বিধান মূল সূত্রের আলোকে তৈরী করা এবং যা নিয়ে অন্যান্য ইমামগণের সাথে বিতর্ক রয়েছে এসব ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার অবস্থান সাধারণভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী দলিল-ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে।

নস্ (মূল সূত্র) শব্দটি কুরআন এবং হাদীস এই দুই মৌলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ কারণে সেই সব বিধানকে নস্‌সী (মূল সূত্র অনুযায়ী) বলা হয় যা কুরআন থেকে নয় বরং শুধুমাত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত। কিন্তু আমরা এ পর্যায়ে কোন বিতর্কে জড়াবো না। তার কারণ প্রথমতঃ এই ধরনের মাসায়েল অসংখ্য। যার অতি সামান্য অংশও এখানে আনা সম্ভব নয়। নমুনা হিসেবে যদি অল্প কিছু মাসায়েল এখানে তুলে ধরি তাহলে সমালোচকদের একথা বলার সুযোগ করে দেয়া হবে যে, দুর্বল মাসায়েলগুলো আড়ালে রেখে শক্ত দলিলভিত্তিক মাসায়েলগুলোকে দেখিয়েছে। দ্বিতীয় বড় কারণ হলো, আজ সেই সব মাসায়েলের ফয়সালা বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনা দিয়ে করা যাবে না।

হাদীস সম্পর্কে সবচাইতে বড় বিতর্ক তার শুধু-অশুদ্ধা নিয়ে। যা ফিকহী মাসায়েলের সমাধানের জন্য অপরিহার্য। অথচ তাই নিয়েই ইমামগণের মধ্যে যতো বিতর্ক। একখানি হাদীস এক ইমামের কাছে একেবারে শুদ্ধ— বিশ্বাসযোগ্য, সেই একই হাদীস আর একজন ইমামের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ— প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এইসব বিতর্ক সমাধানে যেসব তথ্য-সূত্র প্রয়োজন সেইসব আদি কিতাব এবং অন্যান্য উপাদান আমাদের দেশে অপ্রতুল। যতোটুকু যা আছে তা দিয়ে কোনো কোনো হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আরো একটি বড় সমস্যা, জীবনী গ্রন্থসমূহ নিয়ে। যেসব কিতাবাদী আমাদের দেশে পাওয়া যায় যেমন ঃ তাহযীবুল কামাল, তাহযীবুত তাহযীব, মীজান আল ইতেদাল, তব্‌কাতুল হুফ্‌ফায, তাহ্‌যীবুল আসমায়ে

www.pathagar.com

ওয়াল্‌লুগাত ইত্যাদি। এসবের মধ্যে তথ্য সূত্র হিসেবে যেসব ইমামগণের উক্তি-উদ্ধৃতি দেয়া আছে, তার বেশিরভাগই সনদসূত্রের পরম্পরাবিহীন। যে কারণে হাদীস বিজ্ঞান অনুযায়ী তার প্রমাণ এবং প্রমাণহীনতার চূড়ান্ত নির্ধারণ হতে পারে না। এছাড়া অধিকাংশ বক্তব্য অস্পষ্ট। যেসব উক্তি-উদ্ধৃতিকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সেগুলোও অস্পষ্টতার উর্ধ্বে নয়। এ বিষয়ে পূর্বসূরীগণ যা কিছু লিখেছেন, নিঃসন্দেহে তার সাথে এইসব বিতর্ক জড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এখানে তা সরলভাবে আসেনি। 'হানাফী ফিকাহ্‌র মাসায়েল শুদ্ধ হাদীসসমূহের সনদসমৃদ্ধ', হানাফী আলেমগণ বিশেষ করে এই প্রসঙ্গে অনেক কিতাবাদি লিখেছেন।

কিন্তু কুরআনে এসে বিতর্কের এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায়। কেননা কুরআনী কোনো দলিলের ওপরে কারো কোনো কথা চলে না। তখন বিতর্কের অবকাশ শুধু এতোটুকু থেকে যায় যে, গবেষণা করে যে মাসআলাটি বের করা হয়েছে তা ঠিক হয়েছে কি না। ব্যাস এতোটুকুই। যেসব বিধান সরাসরি কুরআন থেকে প্রমাণিত তার সংখ্যাও কিছুমাত্র কম নয়। ফিকাহ্‌ বিষয়টির মৌলিক মাসায়েলসমূহ সেগুলোই। এজন্য যদি এটা প্রমাণ করা যায় যে, হানাফী ফিকাহ্‌র মাসায়েল কুরআনী উৎসের সাথে বেশি সম্পৃক্ত তাহলে গুরুত্বের দিক থেকে হানাফী ফিকাহ্‌র মাসায়েল অনেক উর্ধ্বে উঠে আসে। সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কুরআনের গবেষণায় এবং মাসায়েলের ইজতিহাদে সকল ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবু হানিফাই শ্রেষ্ঠ। কেননা মুজতাহিদের মান বেশিরভাগ নির্ভর করে গবেষণা-অনুসন্ধান ও সঠিক নির্দেশনা অনুধাবনের ওপর।

হানাফী ফিকাহ্‌ হাদীস বিরোধী

উপরে উল্লেখিত কারণগুলো আমাদেরকে কুরআনী দলিলসমৃদ্ধ মাসায়েলের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। এ পর্যায়ে হাদীসের ওপর একটা সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন যেন সন্দেহভাজনদের ধারণা আর ঘনীভূত হতে না পারে।

অনেকেরই ধারণা, ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর অনেক মাসায়েল সহীহ্‌ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি অপবাদ দিয়েছেন যে, ইমাম সাহেব সচেতনভাবে হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। কোন কোন ন্যায়পরায়ণ কারণ দেখিয়েছেন যে, ইমাম সাহেবের সময় পর্যন্ত হাদীস সমগ্রের ততোটা ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়ে উঠেনি, যার ফলে অনেক হাদীস তাঁর পর্যন্ত পৌছায়নি। আসলে এ ধারণাটা ঠিক নয়। তখন পর্যন্ত যা বাকী ছিল তা শুধু হাদীস সমগ্রের একত্রিত হওয়া। কিন্তু যখন সব একত্রিত হলো তখন কেমন করে বড় বড় সব মুহাদ্দিসীন তাদের মাসায়েলকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ বলে মনে করতেন? সহীহ্‌ বুখারীর বহু হাদীসের বর্ণনাকারী, যার সম্পর্কে ইমাম হাম্বাল (রহ) বলতেন এই রকম স্মরণশক্তি আমি আর দেখিনি সেই 'অকী বিন আল হাজর' ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মাসায়েল অনুসরণ করতেন। খতীব বোগদাদী তার সম্পর্কে বলেন :[১] كَانَ يفتى بقول ابى حنيفه তিনি (আবু হানিফা (রহ)-এর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফতোয়া দিতেন) হাদীস সংগ্রহ ও সংস্কার বিষয়ের উদ্ভাবক। অধিকাংশ মাসায়েলে ইমাম আবু হানিফার অনুসারী ছিলেন। তিনি বলতেন :[২]

১. মুখতাসার তারীকে বাগদাদ, ইবনে জায়লা, আলী বিন আল জেরাহর জীবনী।
২. তাহযীর আত তাহযীর, হাফেয ইবনে হাজার, ইমাম আবু হানীফার জীবনী।

www.pathagar.com

قد اخذنا باكثر اقواله "আমরা ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর বক্তব্য বেশি সংখ্যক গ্রহণ করি।" হাফেজুল হাদীস ইমাম তাহাভী (রহ) প্রথমে ইমাম শাফেয়ী এবং পরে ইমাম আবু হানিফার মাসায়েল অনুসরণ করতেন। বলতেন আমি আবু হানিফার অনুসারী নই তবে তার বক্তব্যের সাথে আমার ভাবনা মিলে যায়। তাহাভী ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের সমসাময়িক। এটা সেই সময়ের কথা যখন হাদীস-সমগ্র পরিপূর্ণভাবে সংকলিত হয়ে গেছে। উত্তরসূরীদের মধ্যে আল্লামা মারদীনি, হাফেজ রীলাঈ, ইবনে ইলহাম, কাসেম বিন কিতলুবাগা (রহ) প্রমুখের বিচক্ষণ বিবেচনা সম্পর্কে কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে ? এঁরা সবাই হানাফী ফিকাহ্‌র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এছাড়া হাফেজুল হাদীস সম্পর্কে যাঁরা সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন তাঁদের মাসায়েল কেমন করে ইমাম আবু হানিফার সাথে মিলে যেতো ? প্রথম শ্রেণীর মধ্যে সবচাইতে বড় মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, যাঁর ছাত্র হতে পেরে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম গর্ববোধ করতেন এবং যাঁর সম্পর্কে সকল মুহাদ্দিসীন বলতেন, ইমাম হাম্বাল যে হাদীস জানেন না সেটা হাদীসই নয়। ইমাম হাম্বাল (রহ) বহু মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর বিপক্ষে এবং ইমাম আবু হানিফার পক্ষে ছিলেন। খাওয়ারিজমী লিখেছেন যে, আনুষঙ্গিক গৌণ কিছু বিষয় ছাড়া ফিকাহ্‌র মৌলিক একশত পঁচিশটি মাসআলায় ইমাম আবু হানিফার সাথে একমত এবং ইমাম শাফেয়ীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন। আমরা নিজেরাই অনেক মাসায়েল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি, তাতে খাওয়ারিজমীর দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুফিয়ান সাওরী (রহ) যাকে খোদ মুহাদ্দিসীনগণ ইমামুল হাদীস উপাধি দিয়েছেন তাঁর মাসায়েলের সাথেও ইমাম আবু হানিফার মাসায়েলের মিল রয়েছে। কাজী আবু ইউসুফ বলতেন ঃ

وَاللّٰهِ سُفْيَانُ اَكْثَرُ متابعة منى لابى حنيفة -[১]

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম সুফিয়ান আমার চাইতে বেশি আবু হানিফার অনুসরণ করে।

'সহীহ্ তিরমিযী'তে সুফিয়ান সাওরী (রহ)-এর মাসায়েল বর্ণিত আছে যার অধিকাংশই ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর বিপক্ষে এবং ইমাম আবু হানিফার মতের অনুকূলে।

তায়াম্মুম প্রসঙ্গে

ইমাম আবু হানিফার মতে এক তায়াম্মুম দিয়ে কয়েকটি ফরয আদায় হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালিকের মতে প্রতিটি ফরয আদায়ের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করতে হবে। ইমাম সাহেবের যুক্তি, অজুর যে মর্যাদা তায়াম্মুমের সেই একই মর্যাদা। প্রত্যেক নামাযের জন্য যদি অজুর প্রয়োজন (না ভাঙলে) না হয়, তাহলে তায়াম্মুমের নবায়নও অপ্রয়োজনীয়। তবে যাদের মতে এক অজু দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামায হয় না তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও তারা এই শর্ত লাগিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ) যেভাবে অজু এবং তায়াম্মুমের পার্থক্য করেছেন তার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

ইমাম আবু হানিফার মতে নামাযের মধ্যেই যদি পানি পাওয়া যায় তাহলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। ইমাম মালিক এবং ইমাম হাম্বাল এর বিরোধী। ইমাম সাহেবের যুক্তি হলো,

---

১. উক্তিটি হাফেয আবুল মুহাসিন কালায়েদুল আকইয়ানে উদ্ধৃত করেছেন।

www.pathagar.com

আল-কুরআনে পানি না পাওয়ার প্রেক্ষিতে তায়াম্মুমের অনুমোদন এসেছে, لَمْ تَجِدُوْمَا — পানি যদি না পাও। পানি যখন পাওয়া গেল তখন শর্তও ভেঙ্গে গেল।

অপরাধ অধ্যায়

অপরাধ অধ্যায়ে কুরআন মজীদে যেসব বিধান বিদ্ধৃত সেই বিধানের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সমান্তরাল রেখে ইমাম আবু হানিফা (রহ) তা বাস্তবায়নের যে রূপরেখা দাঁড় করিয়েছেন, অন্য কোনো মুজতাহিদের পক্ষে ঠিক সে রকমটি সম্ভব হয়নি। জাহিলিয়াতের যুগে কেসাস বাস্তবায়নের যে নিয়ম প্রচলিত ছিল তা যেমন অমানবিক, তেমনি বর্বরোচিত। ইসলাম তাকে ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তির ওপর ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কার সাধন করেছে। জাহিলিয়াতের সময় কেসাস হত্যাকারী এবং নিহতের মান-মর্যাদা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হতো। যারা ক্ষমতাবান গোত্রের লোক তারা অন্যান্য গোত্র থেকে তাদের মর্জিমাফিক বদলা নিতো। যেমন নিজেদের দাস খুন হলে অন্য গোত্রের কোনো মুক্ত মানুষকে খুন করা হতো। নিজেদের কোনো মহিলা খুন হলে খুনী গোত্রের কোন পুরষ খুন করে বদলা নিতো এবং নিজেদের কোনো পুরুষ খুন হলে খুনী গোত্রের দুইজন পুরুষ খুন করে কেসাস বাস্তবায়ন করা হতো। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এই কেসাসকে নির্ধারণ করে দিলেন চিরদিনের জন্য।

কেসাসের বিধান কোন শর্তে আবদ্ধ নয়। খুনী সে যেই হোক, তাকে হত্যা করেই নিহতের প্রতিশোধ নেয়া হবে। সম্ভ্রান্ত হোক, কি সাধারণ পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক, দাস হোক বা মুক্ত, মুসলিম হোক বা অমুসলিম। আরও বিস্তারিতভাবে বোঝাবার জন্য জাহিলী যুগের প্রচলিত বিশেষ দিকগুলোর ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِيْ الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُنْثٰى بِالاُنْثٰى –

তোমাদের ওপর নিহতের জন্য কেসাস ফরয করে দেয়া হলো। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক।

জাহিলিয়াতের যুগের ইচ্ছাকৃত হত্যার বদলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়াটা যথেষ্ট মনে করা হতো এবং তাকেই তারা 'দিয়াত' বলতো। ইসলাম তাকে বাতিল করে দেয় এবং 'দিয়াত্' যা আসলে এক ধরনের অর্থদণ্ড তা শুধু সন্দেহপূর্ণ এবং ভুল করে করা হত্যার বিনিময় হিসেবে জায়েয রাখা হয়েছে এবং তার পরিমাণ মুসলিম-অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে সমান ধার্য করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয় ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْر
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِه اِلَّا اَنْ يَّصَّدَّقُوْا فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِه وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ –

কোন মুসলিমের এই অধিকার নেই যে সে কোনো মুসলিমকে হত্যা করে। কিন্তু যদি ভুল

করে এরকম কিছু করে তাহলে তাকে একজন মুমিন গোলাম মুক্ত করে দিতে হবে এবং নিহতের পরিবারকে রক্তমূল্য দিতে হবে। তবে তারা যদি ক্ষমা করে দেয়, সে ভিন্ন কথা। নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু জাতির কেউ হয় এবং সে নিজে মুমিন হয় তাহলে একজন মুমিন গোলাম মুক্ত করে দিতে হবে। নিহত ব্যক্তি যদি এমন জনগোষ্ঠীর কেউ হয় যাদের সাথে তোমাদের সন্ধি-চুক্তি রয়েছে। তাহলে হত ব্যক্তির পরিবারকে রক্তমূল্য দিতে হবে এবং একজন মুমিন গোলাম মুক্ত করে দিতে হবে। (সূরা বাকারা)

এইসব বিধান সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে কুরআন থেকে প্রমাণিত। ইমাম আবু হানিফা (রহ) সেইসব বিধানেরই কথক বা প্রবক্তা। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ) প্রমুখগণ কিছু মাসায়েল নিয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ করেছেন যেসব সম্পর্কে অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাদের বলতে হয় যে, তারা নিঃসন্দেহে ভুল করেছেন।

১. প্রথম বিতর্ক ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম ইবনে হাম্বাল (রহ) প্রমুখ মত পোষণ করেন যে, "গোলামের বদলে মুক্ত হত্যা করা যেতে পারে না।" দাস এবং স্বাধীন মানুষের মধ্যে এই ব্যবধান মানবিকতার মানদণ্ড কুরআন থেকে কস্মিনকালেও প্রমাণ করা যাবে না। যদি الْحُرُّ بِالْحُرِّ —'মুক্তের বদলে মুক্ত' এটা তাদের দলিল হয় তাহলে الانثى بالانثى —'স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক'। এই বিশিষ্টকরণ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীলোকের বদলে কোনো পুরুষকে কিছুতেই হত্যা করা যাবে না। অথচ একথা কেহই স্বীকার করবেন না।

২. দ্বিতীয় ঃ ইমাম শাফেয়ী জিম্মীর রক্তমূল্য একজন মুমিনের রক্তমূল্যের চাইতে কম নির্ধারণ করেছেন। অথচ রক্তমূল্যের ব্যাপারে যে কথা আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন, সেই একই কথা তাদের সম্পর্কেও বলেছেন যাদের সাথে মুমিনদের সন্ধি চুক্তি রয়েছে। ইনসাফের ধারক ইসলাম, অত্যন্ত উদারতার সাথে মানবীয় অধিকারের ক্ষেত্রে মুমিন এবং জিম্মীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। কিন্তু সেই মহান ইসলামের ধারক কোনো কোনো ব্যক্তিত্ব সেই উদারতার নীতিকে ভুল বুঝে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

৩. তৃতীয় ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রেও অর্থদণ্ড আদায় করাকে যথেষ্ট মনে করেছেন। অথচ কুরআন মজীদে ইচ্ছাকৃত হত্যার বদলে হত্যা করেই কেসাসের দাবি পূরণের আদেশ রয়েছে। এক্ষেত্রে রক্তমূল্যের কোনো অনুমতি নেই এবং এটাই যুক্তিসঙ্গত। জাহিলীয়াতের যুগে হত্যা মামলাগুলো দেওয়ানী পর্যায়ের ছিল, সে কারণে অর্থদণ্ড সেখানে কার্যকর ছিল। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের বৈষম্যমূলক ভ্রান্তির অবকাশ কোথায়?

৪. চতুর্থ ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের পক্ষপাতী। অর্থাৎ খুনী যদি পাথর দিয়ে আঘাত করে খুন করে থাকে, তাহলে তাকেও ঠিক সেভাবেই প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা এবং কেউ যদি আগুনে পুড়িয়ে কাউকে হত্যা করে তার প্রতিবিধানে তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা। কিন্তু এ ধরনের সমতা বিধানের কোন ইঙ্গিত কুরআন থেকে পাওয়া যায় না।

৫. পঞ্চম ঃ বিতর্ক এই নিয়ে যে, ইমাম আবু হানিফা ইচ্ছাকৃত হত্যার বিপরীতে কেসাসের উপরে কাফ্ফারার প্রয়োজন অনুভব করেন না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ) কেসাস, কাফ্ফারা দু'টোই জরুরী মনে করেন। অথচ কুরআন মজীদ ভুল করে হত্যার ক্ষেত্রে কাফ্ফারার প্রশ্নটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ইচ্ছাকৃত হত্যায় কাফ্ফারার কোনো উল্লেখ নেই।

www.pathagar.com

উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকারের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর সাথে ইমাম শাফেয়ীর বিতর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার অবস্থান পরিষ্কারভাবে কুরআন থেকে প্রমাণিত। উত্তরাধিকারের যে বিধান কুরআন দিয়েছে তা সারা দুনিয়ায় প্রচলিত নিয়ম থেকে ভিন্ন এবং তা এমন সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা নিজেই প্রমাণ করে দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া এই রকম বিধান তৈরী করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। উত্তরাধিকারের মূলনীতি হলো, পরলোকগত ব্যক্তি যদি তার সহায়-সম্পদ কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে দিয়ে যায়, তাহলে তা সে-ই পাবে। কিন্তু এ ধরনের কোনো নির্দেশ যদি না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কে যারা সম্পর্কিত তারা তাদের সম্পর্কের অবস্থান অনুযায়ী সম্পদের অংশীদার হবে। এটা যেন মৃতের একটা 'না বলা কথা' যে, আমার সম্পদের অংশ ঠিক সে অনুযায়ী যেন সে পায়, যার সাথে আমার যে রকম সম্পর্ক ছিল।

দ্বিতীয় মূলনীতি সামাজিক অর্থনীতির সাধারণ দাবি পূরণ করে। তাহলো একজনের কাছে সম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার চাইতে অনেকের মধ্যে সুষম বন্টন। মানবতার জন্য আশীর্বাদের মতো এই বন্টননীতি পৃথিবীর অন্য কোন জাতির বিবেচনায় আসেনি। তাই তাদের উত্তরাধিকারের আইন অসম্পূর্ণ এবং সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট। খ্রীস্টানদের মধ্যে বড় ছেলে সম্পদের প্রধান অধিকারী, অন্যান্য ভাইয়েরা সামান্য কিছু পায়। হিন্দুদের মধ্যে শুধুমাত্র পুরুষ সন্তানরা পাবে। মৃতের পিতা বা ভাই কোন কিছুর অধিকারী হবে না। মানবীয় অধিকারের ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য স্থাপনকারী ইসলাম প্রতিটি অধিকারের নায্য দাবি পূরণ করেছে তাই উত্তরাধিকারীদের তিনটি স্তরে বিন্যাস করেছে ঃ শরীয়ত নির্ধারিত অংশীদার পিতৃকূল ও মাতৃকূল। তিনটি স্তরেরই বিস্তারিত বর্ণনা আল-কুরআনে বিদ্যমান। বিশেষ করে মাতৃকূল সম্পর্কে এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَاولو الارحام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ -

পিতা-মাতার ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যা ত্যাগ করে যায় সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর আত্মীয়তার অধিকারীগণ একে অন্যের অধিকতর উপযোগী।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) উত্তরাধিকার বন্টনে এই তিনদিকের অধিকারকেই সমুন্নত রেখেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং ইমাম মালিক (রহ) মাতৃকূলকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, মায়ের পিতা, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে ইত্যাদি কিছুতেই উত্তরাধিকারের অংশ পেতে পারে না। মহাত্মনগণ 'যুল আরহাম'কে সাধারণ করে দিয়েছেন এবং 'যুল ফুরূয' ও 'ওসবাত'কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। যেভাবে ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর বিশিষ্ট ছাত্রগণ

ইমাম সাহেবের অগণিত ছাত্রদের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র সেই চল্লিশজনের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছিলাম যারা তাঁর সাথে 'ফিকাহ্' সংকলনের সহযোগী ছিলেন, কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের অনুসন্ধান তাদের মধ্যে মাত্র অল্প ক'জনার নাম উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

১. কাজী আবু ইউসুফ (রহ)
২. জাফর (রহ)
৩. আসাদ বিন উমর (রহ)
৪. আসীয়া আল আযদী (রহ)
৫. দাউদ আত-তায়ী (রহ)
৬. কাসেম বিন মো'ওন (রহ)
৭. আলী বিন মুসহার (রহ)
৮. ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারীয়াহ (রহ)
৯. হাব্বান (রহ)
১০. মুনদেল (রহ)

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের সেই সব ছাত্র যারা ছিলেন সময়ের বিখ্যাত মুহাদ্দিস

এছাড়া সেইসব ছাত্রগণ সম্পর্কেও আলোচনা হওয়া দরকার যারা হাদীস এবং জীবনী বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁদের সময়ের ইমাম ছিলেন। ইমাম আবু হানিফার মুহাদ্দিস ছাত্রগণের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর নাম আসে তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাতান। বিষয়ের পরম্পরা তার থেকেই শুরু হয়েছে। আল্লামা জুহরী 'মীজানে ইতেদালে'র ভূমিকায় লিখেছেন, জীবনী বিষয়ের লেখা সর্বপ্রথম ইয়াহ্ইয়া সাঈদ আল কাতান লিখেছেন। তাঁর পরে তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন, আলী বিন মাদীনি, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, আমরুদ বিন আলী, আল ফালাস, আবু খাসীমাহ (রহ) প্রমুখ তাঁর ওপরে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। তাদের পরে বর্ণনা পরম্পরায় ব্যক্তিত্বগণের পর্যালোচনা মূলক জীবনী লিখেছেন তাদেরই ছাত্র ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহ) প্রমুখ।

হাদীস সমগ্রের ওপর তাঁর এতোটা অধিকার ছিল যে, যখন তিনি শ্রেণীকক্ষে বসতেন তখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে থেকে তার সাথে হাদীসের আলোচনা করতেন। এবং আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যতোক্ষণ উস্তাদ দর্স দিতেন, তারা দাঁড়িয়ে থেকেই তা শুনতেন।'[১] বর্ণনাকারীগণের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ এতোটা উন্নত পর্যায়ের ছিল যে, হাদীসের ইমামগণ সাধারণভাবে বলতেন ঃ ইয়াহ্ইয়া যাকে ছেড়ে দেবেন আমরাও তাকে ছেড়ে দেবো।[২] ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের বিখ্যাত উক্তি[৩] مَارايت يعنى مثل يحيى بن سعيد অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়ার মতো আর কাউকে আমি আমার চোখ দিয়ে দেখিনি'। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিভা নিয়ে ইমাম আবু হানিফার দরসগাহে বসতেন এবং তাঁর ছাত্র হতে পারার জন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। সেই সময় পর্যন্ত অনুসরণের নির্দিষ্ট প্রথা চালু হয়নি। কিন্তু তিনি ইমাম আবু হানিফাকেই অনুসরণ করতেন। তার নিজের কথা[৪] قد اخذنا باكثر اقواله অর্থাৎ 'আমি ইমাম আবু হানিফার অধিকাংশ কথাকে গ্রহণ করেছি এবং স্মরণে রেখেছি।' আল্লামা জুহরী তাজকেরাতুল হুফ্ফাযে ওয়াকী বিন আলজেরাহ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

يفتى بقول ابى حنيفة وكَانَ يحيى القطان يفتى بقوله ايضا -

ওয়াকী ইমাম আবু হানিফার কথা অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।

১৩০ হিজরীতে জন্ম এবং ১৯৭ হিজরী সনে বসরায় ইন্তেকাল করেন।

১. ফাত্হুল মুগীস ও জাওয়াহের মুদীয়াহ।
২. তাহ্যীব আত্ তাহযীব, হাফেয ইবনে হাজার ইয়াইয়া বিন আল কাতানের জীবনী
৩. মীয়ামুল ই'তেদান, আল্লামা যুহবী, ভূমিকা।
৪. তাহ্যীব আত তাহযীব, হাফেয ইবনে হাজার ইয়াহ্ইয়া বিন আল কাতানের জীবনী।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ বিন আল মুবারক ঃ মুহাদ্দিস নুদী 'হাতযীবুল আসমায়ে ওয়াললুগাত'-এ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "সেই ইমাম যার নেতৃত্ব এবং যোগ্যতার ওপর প্রতিটি বিষয়েই সাধারণভাবে ঐকমত্য পাওয়া গেছে। যার স্মরণে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত নাযিল হয়। যার ভালবাসা পোষণ করলে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়।

হাদীস সমগ্রের ওপর তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা এবং অধিকার সম্পর্কে অনুমান করা যায়— মুহাদ্দিসীনগণের তাঁকে দেয়া সর্বসম্মত উপাধী দেখে "আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস"। একবার তাঁর ছাত্রদের মধ্যে একজন তাকে "হে পূর্ব দেশের আলেম' বলে সম্বোধন করলে ইমাম সুফিয়ান সাওরীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বললেন ঃ কি আশ্চর্য, পূর্ব দেশীয় বলছো! উনি পূর্ব ও পশ্চিম সব দেশেরই সর্বোচ্চ আলেম।[১] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের চাইতে হাদীস সংগ্রহের চেষ্টা তার সমসাময়িক কেউ তাঁর মতো করে করেনি। তিনি নিজে বলেছেন ঃ আমি চার হাজার শায়খের কাছ থেকে হাদীস শিখেছি এবং তার মধ্য থেকে এক হাজারের বর্ণনা সূত্রে বর্ণনা করেছি।[২] সহীহ্ বুখারী এবং মুসলিমে তাঁর সূত্রে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। সর্বোপরি বর্ণনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে তিনি অন্যতম স্তম্ভ বিশেষ। হাদীস এবং ফিকাহ্ সম্পর্কে তাঁর অনেক রচনা ছিল যা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাঁর প্রতিভা-যোগ্যতা, জ্ঞান-গরিমা, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আত্মনিবেদনের ঐকান্তিক নিষ্টা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে এমন এক উচ্চ অবস্থানে পৌছে দিয়েছিল যার তুলনায় রাজা-বাদশাহদের মর্যাদাও ছিল তুচ্ছাতিতুচ্ছ। একবার খলিফা হারুন আর-রশিদ বাক্কায় গেলেন, কিছু পরেই আবদুল্লাহ্ বিন আল মুবারকও বাক্কায় পৌছালেন। তাঁর আগমনের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁকে একনজর দেখার জন্য চারিদিক থেকে এতো মানুষ এসে শহরে ভিড় করলো যাতে শহর সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে পড়লো। দুর্গের এক কামরার জানালা দিয়ে হারুন আর-রশিদের এক স্ত্রী এতো হট্টগোল দেখে প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার এতো মানুষ ভিড় করছে কেন? কেউ একজন জবাব দিলো, খোরাসানের আলেম এসেছেন, যার নাম 'আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক'। সম্রাজ্ঞী বলল, আসলে একেই বলে বাদশাহী। হারুন আর-রশিদের রাজত্ব কোনো রাজত্ব হলো? পুলিশ আর সৈন্যবাহিনী ছাড়া সাধারণ একটা মানুষও যার চারপাশে দেখা যায় না![৩]

এই মাহাত্মন ইমাম আবু হানিফার শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে একজন। সবসময় তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে প্রকাশ করতেন যে, জ্ঞানের জগতে যা কিছু আমার অর্জন, ইমাম আবু হানিফা এবং সুফিয়ান সাওরীর কাছ থেকেই আমি পেয়েছি। তার বিখ্যাত উক্তি ঃ

لولا ان اللّه تعالى اغاثنى بابى حنيفة وسفيان كنت كسائرالناس

যদি আল্লাহ্ তা'আলা আবু হানিফা এবং সুফিয়ান সওরীর মাধ্যমে আমার সাহায্য না করতেন তাহলে সাধারণ এক মূর্খ মানুষ হয়েই আমি থেকে যেতাম।[৪]

১. তাহ্যীবুল আসমা'আ ওয়াল্লুগাত, আল্লামা নূদী।
২. সংক্ষিপ্ত তাহ্যীবুল কামাল, আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারকের জীবনী।
৩.তারীখে ইবনে খালকান, আবদুল্লাহ বিন মুবারকের জীবনী।
৪. তাহযীব আত্ তাহযীব, হাফেয ইবনে জাহার, ইমাম আবু হানীফার জীবনী

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফাকে উদ্দেশ্য করে তার লেখা অনেক কবিতার চরণ রয়েছে ঃ খতীব বোগদাদী তাঁর ইতিহাসে কিছু চরণ উল্লেখ করেছেন। যার মধ্য থেকে একটি ঃ

رایت اباحنیفه حین تولی - ویطلب علمه مبحراعزیزاً

আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ)-কে দেখেছি যখন তিনি সমাসীন হতেন, তার জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল সাগর তুল্য।

১১৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া বিন আলী মায়েদাহ্

আল্লামা জুহরী তাযকেরাতুল হুফ্ফাযে শুধুমাত্র তাদের কথাই লিখেছেন যারা বিশেষভাবে "হাফেযুল হাদীস" হিসেবে খ্যাত ছিলেন। সুতরাং ইয়াহ্ইয়াও তাদের মধ্যে গণ্য! মর্যাদার দিক থেকে সর্বপ্রথম তার নামই উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী বিন আল মাদীনি বলতেন, ইয়াহ্ইয়ার যুগে জ্ঞানের উচ্চতা ইয়াহ্ইয়া পর্যন্ত উঠে ক্ষান্ত হয়েছিল।[১] সহাহ্ সিত্তায় তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে। হাদীস এবং ফিকাহ্র ওপরে তার দক্ষতাই তাঁকে ফকীহ্ এরং মুহাদ্দিস হিসেবে বিখ্যাত করে তুলেছিল। আল্লামা জুহরী তাঁর 'মীজানুল ই'তেদালে' এই ভাষায় তাঁর জীবনী লেখা শুরু করেছেন ঃ

احد الفقهاء الكبارو المحدثين الاثبات كثيرا -

ইমাম আবু হানিফার (রহ) বড় মাপের ফকীহ এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসদের একজন।

ইমাম আবু হানিফার ছাত্রদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ছিলেন একটু ব্যতিক্রম। তিনি উস্তাদের বাড়িতেই থাকতেন এবং এমনভাবে থাকতেন, লোকে দেখে মনে করতো তাঁর ছেলে। আল্লামা জুহরী তাঁর তাযকেরাতুল হুফ্ফাযে 'সাহেবে আবু হানিফা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফিকাহ্ সংকলনে ইমাম সাহেবের প্রধান সঙ্গী বললে অত্যুক্তি হবে না। ইমাম তাহাভী লিখেছেন ঃ তিনি তিরিশ বছর ছিলেন। যদিও সময়কালের এই হিসাবটা সঠিক নয়, তবে সন্দেহ নেই যে, একটা দীর্ঘসময়কাল ধরে ইমাম সাহেবের সাথে ফিকাহ্ সংকলনের কাজ করেছেন। এবং বিশেষ করে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত একমাত্র জীবন ব্যবস্থার বিকাশ-প্রকাশের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[২] মীজানুল ই'তেদালে' লেখা আছে যে, 'কুফায় যে ব্যক্তি প্রথম কোন কিছু রচনা করেছেন তিনি ইয়াহ্ইয়া'। অনুমান করা যেতে পারে, ইয়াহ্ইয়া যেহেতু লিপিবদ্ধকরণের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন একারণে লোকেরা তাঁকেই ফিকাহ্র লেখক হিসেবে ধরে নিয়েছে। মাদায়েনে বিচারপতি হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং ১৮২ হিজরী সালে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ওয়াকী বিন জাররাহ্ ঃ হাদীস শাস্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত। ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল তাঁর ছাত্র হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। তাই যখন তিনি তাঁর বর্ণনা সূত্রে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন তখন এভাবে শুরু করতেন ঃ এই হাদীস আমার কাছে এমন

১. মিযানুল ইতেদাল, আল্লামা যুহবী ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারীয়ার জীবনী।
২. আল জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ্। ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়ার জীবনী।

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তোমাদের চোখ তাঁর মতো কাউকে দেখেনি।[১] বিখ্যাত জীবনী লেখক ইয়াহইয়া বিন মুঈন বলতেন, "আমি কোন ব্যক্তিত্ব এমন দেখিনি যাকে ওয়াকী'র উপরে স্থান দেয়া যেতে পারে।[২] অধিকাংশ হাদীসের ইমামগণ তাঁর সম্পর্কে এই ধরনের সম্মানজনক মন্তব্য করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে তার বর্ণনা সূত্রে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। হাদীস এবং বর্ণনা পরম্পরা বিষয়ে তার বর্ণনা এবং বক্তব্য ও মন্তব্য একান্ত নির্ভরযোগ্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

ইনি ইমাম আবু হানিফার প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। অধিকাংশ মাসায়েলে ইমাম সাহেবের অনুসরণ করতেন এবং তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। খতীব বোগদাদী তার ইতিহাসে লিখেছেন ঃ

كان يفتى بقول ابى حنيفه وكان قدسمع منه شيئا كثير-

তিনি ফতোয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মতামতকে প্রাধানা দিতেন। আর তিনি ইমাম আবু হানিফা থেকে অনেক বিষয় শুনেছেন, জেনেছেন।

আল্লামা জুহরীও তাঁর তাযকেরাতুল হুফ্ফাযে তা সত্যায়িত করেছেন। ১৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

দাঊদ আত্ তায়ী ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পছন্দ করেছিলেন। সুফীগণ তাঁকে মুর্শীদে কামেল বলে মনে করেন। তাযকেরাতুল আউলিয়ায় তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থানের কথা লেখা আছে। ফকীহ্গণ এবং বিশেষ করে হানাফী ফকীহ্গণ তাঁর চিন্তা-গবেষণা এবং ইজতিহাদের কাছে ঋণী। মুহাদ্দিসীনগণ বলেন,[৩] ثقة بلا نزاع (নির্দ্বিধায় তিনি একজন বিশুদ্ধ রাবী)এই ধরনের যতো উপাধী আছে নির্দ্বিধায় বলা যায় তিনি সব কয়টির যোগ্য অধিকারী। বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহারেব বিন ওতার বলতেন ঃ "দাঊদ যদি 'সুদূর অতীতে' জন্ম নিতেন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে তাঁর কিস্সা বর্ণনা করতেন।[৪]

শিক্ষা জীবনের শুরুতে ফিকাহ্ এবং হাদীসের ওপর জ্ঞানার্জন করেছেন, তার পরে ইল্মে কালাম, অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বের ওপর দক্ষতা অর্জন করেন। তর্ক-বিতর্ক এবং বিতর্কিত বিষয়ে প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। একদিন এক তর্কযুদ্ধে প্রতিপক্ষের বন্ধুর ওপরে কংকর ছুঁড়ে মেরেছিলেন। বন্ধু বললেন, দাঊদ, তোমার মুখ এবং হাত দুটোই বেশ খুলে যাচ্ছে। এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো তার। তর্ক-বিতর্ক সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলেন। জ্ঞানার্জনের প্রতি আরো ঝুঁকে পড়লেন। কিছুদিন পরে সমস্ত কিতাবাদি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সকল সামাজিক সম্পর্ক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। ইমাম মুহাম্মদ বলেন, 'আমি যে কোন প্রয়োজনে দাঊদের কাছে যেতাম, প্রয়োজনীয় মাসায়েল জেনে নিতাম। খুব বেশি জরুরী কোন মাসআলা হলে বলে দিতেন নইলে বলতেন, ভাই আমার অন্য কিছু জরুরী কাজ পড়ে আছে আমাকে ক্ষমা করো।

১. তাহযীবুল আসমা'আ ওয়াল্লুগাত, আল্লামা নূদী, অক্বী বিন জেরাহার জীবনী
২. তাহযীবুল আসমা'আ ওয়াল্লুগাত।
৩ . মী-যাসুল ইতেফা। যুহ্বী।
৪. তারীখে ইবনে খালকান।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের সেই সব ছাত্রগণ তাদের সময়ে ফিকাহ্‌র ইমাম

ইনিও ইমাম আবু হানিফার প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে একজন। খতীব বোগদাদী, ইবনে খালকান, আল্লামা জুহরী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ যেখানেই তাঁর কথা লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফার শিষ্যত্বের কথাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ফিকাহ্ সংকলনের বিশেষ কমিটির এই সম্মানিত সদস্য ১৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এইসব বিশেষ মহাত্মনগণ ছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন ফজল বিন আমীন, হামযাহ্ ইবনে হাবীব আজজীয়াত, ইব্রাহীম বিন তাযমান, সাঈদ বিন আওস, আমরুদ বিন মাইমুন আফজাল, ইবনে মূসা প্রমুখ ইমাম সাহেবের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র তাঁদের কথাই উল্লেখ করেছি যারা ছাত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট এবং দীর্ঘ দীর্ঘদিন ইমামের একান্ত সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষা এবং দীক্ষা দুটোই অর্জন করেছিলেন। ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে যারা ফিকাহ্‌র ইমাম হয়েছিলেন তাঁরা হলেন ঃ

কাজী আবু ইউসুফ (রহ) ঃ তাঁর অবস্থা, অবস্থান এবং মর্যাদা এতোটা উচ্চে যে, আলাদা করে তার সম্পূর্ণটা লিখতে পারলে তাঁর জ্ঞান-গরিমা এবং মর্যাদার আসল অবস্থানটা বোঝানো যেতো। কিন্তু সে অবকাশ আমাদের নেই। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তওফিক দিলে এই কাজটি পূর্ণ হতে পারে। আমাদের বইয়ের বিষয়বস্তু হিসেবে যে দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায় তাহলো, অতি সংক্ষেপে এতোটুকু ইতিহাস লিখে দেই যাতে তার জীবন এবং জ্ঞান সাধনার বাস্তব রূপ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা তৈরী হয়।

তাঁর পূর্ব পুরুষ আনসার, সো'ওদ বিন হাব্‌তাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ছিলেন। পিতা একজন দরিদ্র দিনমজুর ছিলেন। ১১৩ অথবা ১১৮ হিজরী সালে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই লেখাপড়ার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, কিন্তু পিতা চাইতেন দু'পয়সা রোজগার করে ঘরে আনুক। তা সত্ত্বেও আবু ইউসুফ সময়-সুযোগ পেলেই জ্ঞানচর্চার আসরে গিয়ে বসতেন। একদিন ইমাম আবু হানিফার দরসগাহে বসেছিলেন, এমন সময় বাবা এসে জোর করে তুলে নিয়ে গেলেন। খুব ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, দেখো বাবা, আল্লাহ্ তা'আলা আবু হানিফাকে অঢেল দিয়েছেন সে জন্য সে ওগুলো করতে পারছে। তোমার কি আছে বলো ? আবু ইউসুফ বাধ্য হয়ে বাবার সাথে কাজে লেগে গেলেন। দু' চার দিন পরে ইমাম সাহেব অন্যান্যদের কাছে প্রশ্ন করলেন, ইয়াকুব এখন আর আসে না ? ইমাম সাহেবের আগ্রহের কথা শুনে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে নিজেদের দরিদ্র অবস্থার কথা সব খুলে বললো, সব কথা শুনে ইমাম সাহেব তার হাতে একটা পুটলি গুঁজে দিয়ে বললেন, খরচ হয়ে গেলে বলবে। এইভাবে ইমাম সাহেবের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে ইয়াকুব একসময় কাজী আবু ইউসুফ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা ছাড়াও সেকালের অন্যান্য সব বড় বড় ইমাম— আ'মাশ, হিশাম বিন উরওয়াহ, সুলাইমান তাইমী, আবু ইসহাক শাইবানী, ইয়াহ্ইয়া বিন সাউদ আল আনসারী (রহ) প্রমুখের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাকের কাছ থেকে সমরনীতি ও ইতিহাস শিখেছেন, মুহাম্মদ বিন আবী লায়লার কাছে মাসায়েল শিখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিভা এবং স্মরণশক্তি এতো প্রবল দিয়েছিলেন যে, একই সময়ে এতোগুলো বিষয়ের জ্ঞানকে তিনি ধারণ করে নিতে পারতেন। হাফেয ইবনে আবদুল বার যিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন, লিখেছেন, আবু ইউসুফ মুহাদ্দিসীনদের কাছে যেতেন এবং একই বৈঠকে পঞ্চাশ-ষাটটা হাদীস শুনে স্মরণে ধরে রাখতে পারতেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) যতোদিন বেঁচেছিলেন, ততোদিন রীতিমত তাঁর দরসগাহে আবু ইউসুফের উপস্থিতি ছিল। ইমামের ওফাতের পরে কোন এক সূত্রে শাহী দরবার থেকে বিচারকের পদে কাজ করার আহ্বান এলো। তিনি তা গ্রহণ করেন। ১৬৬ হিজরী সালে খলিফা মেহদী আব্বাস কাজী হিসেবে তাকে নিয়োগ দান করেন। মেহদীর পরে তার উত্তরসূরী 'হাদী'ও তাকে একই পদে বহাল রাখেন। কিন্তু হারুন আর-রশিদ তাঁর জ্ঞান এবং যোগ্যতার কথা জানতে পেরে গোটা ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দান করেন। সেই সময় পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে একজন আলেমে দ্বীনের এতো উচ্চ পদে আসীন হওয়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এর পরবর্তীকালের ইতিহাসেও একমাত্র কাজী আহমাদ বিন আবী দাউদ ছাড়া আর কেউ এই পদে আসীন হতে পারেননি। কাজী আবু ইউসুফ বিচার বিভাগের যেসব সংস্কার সাধন করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আর এক উপাখ্যান যা এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

১৮২ হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার যোহরের সময় এই মহান ব্যক্তিত্ব ইহধাম ছেড়ে পরলোকের পথে রওয়ানা করে যান। মৃত্যুশয্যায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর নিবেদনের কথাগুলো মুহাম্মদ বিন ছামাআর জবানীতে এ রকম ঃ "হে আল্লাহ্, তুমি জানো জ্ঞানতঃ আমি তোমার বিধানের খেলাফ কোনো ফয়সালা করিনি। সব সময়ই চেষ্টা করেছি, যে ফয়সালাই আমার দ্বারা হতো তা যেন তোমার কিতাব এবং তোমার রাসূলের কর্মপ্রক্রিয়া অনুযায়ী হয়। যখন কোন জটিল ফয়সালা সম্মুখে আসতো তখন আমি ইমাম আবু হানিফার পদ্ধতি অনুসরণ করতাম। যতোটুকু আমি জানি, আবু হানিফা তোমার বিধানকে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং স্বজ্ঞানে কখনো সত্যের পথ থেকে এতোটুকু বাইরে যাননি।" কাজী সাহেব কর্মজীবনে প্রচুর ধনার্জন করেছিলেন এবং যথারীতি তার সর্বোত্তম ব্যবহারও করে গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তার সঞ্চিত চার লক্ষ টাকা মক্কা, মদীনা, কুফা এবং বাগদাদের দরিদ্রজনের মধ্যে বিলিয়ে দেবার অসিয়ত করে গিয়েছিলেন।

কাজী সাহেব বহুবিধ জ্ঞানের গুণী ছিলেন। যদিও তার খ্যাতি ও সুনাম বেশিরভাগ ফিকাহ্ বিন্যাসের কারণেই হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। ঐতিহাসিক ইবনে খালকান হাল্লাল ইবনে ইয়াহ্ইয়ার উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, আবু ইউসুফ তাফসীর মাগাজী, আইয়ামুল আরব-এর হাফেয ছিলেন। ফিকাহ্ ছিল তার সবচাইতে হালকা বিষয়। হাদীসের ওপর তাঁর অধিকার অনুমান করা যায় তখন, যখন বলা হয় হাদীসের হাফেযগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। আল্লামা জুহরী তাযকেরাতুল হুফ্ফাযে তাঁর জীবনী

www.pathagar.com

লিখেছেন। ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলতেন, দার্শনিকগণের মধ্যে আবু ইউসুফের চাইতে অধিক হাদীস কেউ জানতো না। ইমাম আহমাদ হাম্বাল বলেন ঃ كَانَ مُنْصِفًا فِىْ الْحَدِيْثِ "হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ"। ইমাম শাফেয়ীর (রহ) ছাত্র মজনী বলতেন— ابويوسف اتبع القوم للحديث। "ইমাম আবু ইউসুফ হাদীস শিখার জন্য মুহাদ্দিসদের একটি দলকে অনুস্মরণ করেন।[১]" খতীব বোগদাদী তার ইতিহাসে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের উক্তি উল্লেখ করেছেন। "প্রথম যখন আমার ইল্মে হাদীসের ওপর আগ্রহ জন্মালো, আমি আবু ইউসুফের স্মরণাপণ্ন হলাম। ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং আরও অনেক হাদীসের ইমামগণ আবু ইউসুফের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানের জগতে তাঁর উচ্চতার দলিল এর চাইতে বেশি আর কি দেয়া যেতে পারে?[২]

ফিকাহ্ বিষয়ের ওপর তাঁর অধিকার কে অস্বীকার করবে? ইমাম আবু হানিফা (রহ) নিজে তাঁর দক্ষতার কথা স্বীকার করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে ইমাম সাহেব তাঁকে দেখতে যান, ফিরে এসে সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "আল্লাহ্ না করুন, এই ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে দুনিয়ার আলেম মরে যাবে"। অন্যান্য ইমামগণও তাঁর উন্নত প্রতিভা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা স্বীকার করতেন। ইমাম আ'মাশ সেকালের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনি আবু ইউসুফের কাছে একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তার জবাব বলে দিলেন। ইমাম আ'মাশ বললেন, এর ওপর কোন সনদ আছে? আবু ইউসুফ বললেন ঃ হ্যাঁ এটা সেই হাদীস যা আপনি অমুক সময়ে আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। ইমাম আ'মাশ বললেন ঃ ইয়াকুব, এই হাদীসখানি আমার সেই সময় থেকে মনে আছে যখন তোমার বাবারও বিয়ে হয়নি, কিন্তু এর আসল তাৎপর্য আজ এবং এখন বুঝতে পারলাম।[৩]

কাজী আবু ইউসুফ প্রথম ব্যক্তি যিনি হানাফী ফিকাহ্র ওপর লেখালেখি করেছেন। অন্যান্য ইল্মী বিষয়ের ওপরও তাঁর অনেক রচনা রয়েছে। ইবনে নাদীম কিতাবুল ফাহারসাতে তার বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আমাদের অনুন্ধানে 'কিতাবুল খারাজ' নামে মাত্র একখানি কিতাব খুঁজে পেয়েছি। তাই আমরা শুধু সেই কিতাব সম্পর্কেই লিখবো।

হারুন আর-রশীদ খেরাজ এবং জিযিয়া সম্পর্কে তার কাছে মৌখিকভাবে জানতে চেয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি তার জবাব লিখিত আকারে পাঠিয়েছিলেন। এই ধরনের প্রশ্ন-উত্তরগুলোর সম্মিলিত সংস্করণ এই কিতাব। এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের ওপরেও লেখা আছে, খেরাজের মাসআলা-মাসায়েলই বেশি। এ কারণেই ঐ কিতাবকে সেকালের 'খাজনার বিধান' সংক্রান্ত কিতাবও বলা যেতে পারে। ঐ কিতাবে জমির বন্টন বিভিন্ন পদমর্যাদা অনুযায়ী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মান অনুযায়ী ভাগ করার নিয়ম, খাজনার বিভিন্ন পরিমাণ, কৃষকের শ্রেণী বিন্যাস এবং ফসলের ভাগ-বন্টন ইত্যাদি ধরনের নিয়ম-কানুন সমকালীন বাস্তবতার

---

১. এই স্বীকারোক্তি আল্লামা যুহবী তাযকেরাতুল হুফফাযে উল্লেখ করেছেন।

২. কাজী সাহেব সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থ সমূহে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সে সব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সেই সব অস্পষ্ট দোষ-ত্রুটি, তাঁর ইজাতেহাদী মাসলার বিরোধিতা করতে গিয়েই কেউ কেউ করেছেন।

৩. ইবনে খালকান, কাজী আবু ইউসুফের জীবনী।

www.pathagar.com

আলোকে এতো সুন্দর করে বিন্যাস করা হয়েছে যা আজও বিস্ময় জাগাতে পারে। স্বাধীনচেতা বর্ণনাভঙ্গী, সঙ্গত এবং ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার বন্টনের পরামর্শ এবং বিভিন্ন সরকারী অসাম স্যতার কঠোর সমালোচনা করে বর্তমান খলিফার দৃষ্টির আকর্ষণ করা হয়েছে।

কাজী আবু ইউসুফের জীবন-ইতিহাসে সবচাইতে বড় উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো ঃ হারুন আর-রশীদের মতো ক্ষমতাবান আত্মপূজারী বাদশাহর দরবারে তিনি তাঁর কর্তব্য পালনে এতোটা নির্ভীক এবং স্বাধীনতার সাথে কাজ করে গেছেন যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কিতাবুল খেরাজে এক জায়গায় তিনি হারুন আর-রশীদকে সম্বোধন করে লিখেছেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, তুমি যদি তোমার প্রজাবৃন্দের প্রতি ন্যায়বিচারের স্বার্থে একমাসে একটিবারের জন্যও দরবারে বসে মজলুমের ফরিয়াদ শুনতে, তাহলে আমার মনে হয় তাদের মধ্যে তোমার কোনো শত্রু জন্মাতে পারতো না যারা প্রজাদেরকে আড়াল করে। আর তা না হলে দু' একবারও যদি বসতে তাহলে এই সংবাদ গোটা সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে যেতো এবং জালিম তার জুলুম থেকে সরে দাঁড়াতো। তোমার কর্মচারী ও সুবেদাররা যদি অন্ততঃ এতোটুকু জানতো যে, তুমি বছরে একবার হলেও প্রজা সাধারণের কথা শোনার জন্য দরবারে বসো তাহলে তোমার রাজ্যে কোথাও জালিমদের জুলুমের দুঃসাহস হতো না। এই ভাষায় খলিফাকে ভর্ৎসনা করা কাজী আবু ইউসুফের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

ইমাম মুহাম্মদ ঃ হানাফী ফিকাহ্‌র দ্বিতীয় বাহু। পিতৃভূমি দামেস্কের উপকণ্ঠে ছোট্ট একটি গ্রাম, নাম 'হারাস্‌তা'। পিতা স্বদেশ ছেড়ে 'ওয়াসেতে' এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। ইমাম মুহাম্মদ ১৩৫ হিজরীতে এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের শুরুতেই কুফায় এসে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। বড় বড় মুহাদ্দিস এবং ফকীহ্‌গণের সান্নিধ্যে জ্ঞানচর্চা চলতে থাকে। মাশআর বিন কিদাম, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, মালিক বিন দীনার, ইমাম আওযায়ী (রহ) প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কমপক্ষে দু' বছর ইমাম আবু হানিফার দরসগাহে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তারপর থেকে কাজী আবু ইউসুফের কাছে শিক্ষা সমাপণ করেন। এর পরে মদীনায় গিয়ে তিন বছর ইমাম মালিকের কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই তার চমৎকার প্রতিভার কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে শিক্ষকের আসনে বসে দরস দিতে শুরু করেন।

হারুন আর-রশিদ তাঁর জ্ঞান-গরিমার কথা জানতে পেরে বিচারকের পদে নিয়োগদান করলেন এবং সবসময় নিজের কাছাকাছি রাখতেন। ১৮৯ হিজরীতে রাজ্য পরিদর্শনে গমন করলে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। এই সফরে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ 'কিসাঈ'ও সঙ্গে ছিলেন। 'রে' পৌছাবার পূর্বে 'জাম্বুইয়া' নামক এক গ্রামে এসে দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় খলিফা হারুন আর-রশীদ জ্ঞানের দুই আধারকে সেখানে দাফন করে সঙ্গীদের বললেন, আজ ফিকাহ্ এবং নাহু দুটোকেই আমি দাফন করে গেলাম। হারুন আর-রশীদের দরবারী কবি বিখ্যাত সাহিত্যিক আল্লামা ইয়াজিদী তাদের শোকে যে কবিতা লিখেছিলেন তার দু'টি চরণ এ রকম ঃ

فقلت اذا ماشكل الخطب من لنا

يابضا حه يوما وانت فقيد

আমরা বললাম, যখন তোমরাই আর রইলে না তখন আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করে দেবার মতো লোক আসবে কোথা থেকে।

যদিও ইমাম মুহাম্মদ তার জীবনের অনেক বড় একটি অংশ দরবারের সাথেই সম্পৃক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে একবিন্দু আপোস তিনি কখনো করেননি। ১৭৫ হিজরীতে 'ইয়াহ্ইয়া উলুই' যখন বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিলো তখন হারুন আর-রশীদ তার আয়োজন দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সন্ধি চুক্তির হাত বাড়িয়ে দিলো। চুক্তিনামা লিখিত হলে ইয়াহ্ইয়ার সন্তুষ্টির জন্য স্বাক্ষী হিসেবে দেশের বড় বড় আলেম, গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব, ফকীহ্, মুহাদ্দিসগণ দলিলে দস্তখত করেন। সন্তুষ্ট হয়ে ইয়াহ্ইয়া বাগদাদে চলে আসেন। কিছুদিন পরে হারুন আর-রশীদ সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করতে চাইলে দরবারী আলেমগণ বাদশাহর ভয়ে ফতোয়া দিয়েছেন যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ইমাম মুহাম্মদের জ্ঞানের গভীরতা এবং প্রজ্ঞার পরিমাণ আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনের মন্তব্য থেকে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ "ইমাম মুহাম্মদ যখন কোন মাসআলা বর্ণনা করতেন, তখন মনে হতো যেন অহী নাযিল হচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, "আমি ইমাম মুহাম্মদের কাছ থেকে এক উটের বোঝার পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেছি"। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি এতো সূক্ষ্ম মাসায়েল কোথা থেকে পেয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ বিন আল হাসানের কিতাবসমূহ থেকে।[১] ইমাম মুহাম্মদের দরসগাহ থেকে অনেক বড় বড় আলেম শিক্ষা নিয়ে বেরিয়েছে, কিন্তু এঁদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। আমাদের যুগের সংকীর্ণমনাদের কাছে ব্যাপারটা খুব অবাক লাগবে! পূর্বকালেও ইবনে তাইমীয়াহ্ ইমাম শাফেয়ীর কাছে কিছু শিখতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সত্য যা তাকে কে অস্বীকার করতে পারে ? ইতিহাস এবং জীবনী গ্রন্থ আজকের দিনে বেশুমার পাওয়া যায়। সেসব কিসের স্বাক্ষ্য বহন করে ? নিঃসন্দেহে ইমাম মুহাম্মদের শিক্ষা-দীক্ষা ইমাম শাফেয়ীকে জ্ঞানের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিল! তাঁর নিজের মুখেই তা শোনা যাক! ইবনে হাজার ইমাম শাফেয়ীর উক্তি উল্লেখ করেছেন।

كَانَ مُحَمَّدُبْنُ الحسن جيد المَنْزِلَة عِنْدَ الخَلِيْفَةِ : فَاختلفت اليه وقلت هواولى من جهة الفقه فلز مته وكتبت عنه -

মুহাম্মদ বিন আল হাসান খলিফার দরবারে অত্যন্ত সম্মানিত আসনে আসীন ছিলেন, এজন্য আমি তার কাছে যাতায়াত করতাম। আমি মনে মনে বলতাম, "ফিক্হী" জ্ঞানেও তিনি উচ্চ অবস্থানে রয়েছেন। এ কারণে তার সান্নিধ্য অবশ্যই আমার প্রয়োজন। তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শিখতাম, লিখে নিতাম।[২]

১. মুহাদ্দেস আল্লামা নূদী। তাহযীব আল আসমা ওয়ানুগত।
২. তাওয়ালা আততাসীস। মিশরে প্রকাশি পৃষ্ঠা ৬৯।

www.pathagar.com

ছাত্র হলেও ইমাম মুহাম্মদ ইমাম শাফেয়ীকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন এবং ছাত্রদের মধ্যে তার বিশেষ অবস্থান ছিল। একদিন ইমাম মুহাম্মদ দরবারে যাচ্ছিলেন। একই সময় ইমাম শাফেয়ীও তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে আসছিলেন। তাকে দেখেই ঘোড়া থেকে নেমে চাকরকে বললেন, দরবারে গিয়ে জানিয়ে দাও আমি আজ আসতে পারবো না, শাফেয়ী (রহ) বললেন, আমি অন্য একসময় আসবো, আপনি দরবারে যাচ্ছিলেন যান। ইমাম মুহাম্মদ বললেন, এর চাইতে বড় কাজ দরবারে নেই।[১] ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং ইমাম মুহাম্মদের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক হতো এজন্য অনেকেই তার ছাত্র হতে চায়নি। সেকালের উস্তাদ-সাগরেদের বিতর্ক ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। কোনভাবেই তা দোষের কিছু নয়। আজও তাই হওয়া উচিত।

ইমাম মুহাম্মদের খ্যাতি ফকীহ্ হিসেবেই বেশি। তাঁর রচনা এই বিষয়ের ওপরেই বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু তাফসীর, হাদীস এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি মুজতাহিদের মান রাখতেন। ইমাম শাফেয়ী বলতেন, আমি কুরআন মজীদ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদের চাইতে বড় জ্ঞানী দেখিনি।[২] আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপরে তার কোনো রচনা বর্তমান নেই, কিন্তু ফিকাহ্র যেসব মাসায়েল 'জামে' কবীরে উল্লেখিত তার বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি এবং গতিময় অভিব্যক্তি দেখলে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, ভাষা-সাহিত্যের ওপর তাঁর দখল কতোটা ছিল। ইবনে খালকান এই দিকটা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর সহজকৃত হাদীস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' প্রসিদ্ধ। ইমাম মালিকের যুক্তি খণ্ডন করে লেখা 'কিতাবুল হজ্জ্ব' যাতে প্রচুর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে অত্যন্ত শক্ত দাবি উত্থাপন করে বলেছেন, "মদীনাবাসীরা দাবি করেন যে, তারা সব হাদীসের অনুসরণ করেন, অথচ এসব মাসায়েলে তাদের বিপক্ষে হাদীসেরই স্বাক্ষ্য রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদের রচনা সংখ্যা অনেক। আজকের হানাফী ফিকাহ্র ভিত তার রচনাবলীর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমরা সেইসব কিতাবের তালিকা দিচ্ছি যার মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মাসায়েল হুবহু উল্লেখ করা আছে।

মাব্সূত ঃ মূল রচনা কাযী আবু ইউসুফের। ইমাম মুহাম্মদ তাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে আরও বিস্তৃত করে পুনঃ রচনা করেন এবং এটাই তাঁর প্রথম রচনা।

জামে সাগীর ঃ মাব্সূতের পরের রচনা। এই কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ কাজী আবু ইউসুফের বর্ণিত ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর সকল বক্তব্য পুনঃ উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে ৫৩৩টি মাসায়েল রয়েছে যার ১৭০টি মাসায়েলে তার মতপার্থক্যের বিষয়ও বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এ কিতাবে তিন ধরনের মাসায়েল আছে।

১. যাদের উল্লেখ এই কিতাব ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

২. অন্যান্য কিতাবেও উল্লেখ করা আছে। কিন্তু সেইসব কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ স্পষ্ট করে বলেননি যে, এগুলো বিশেষভাবে ইমাম আবু হানিফার মাসায়েল। এই কিতাবে তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

---

১. তাওয়ালা আত্তাসীস, পৃষ্ঠা ৬৯

২. জাওয়াহের আল মুদিরুহ, ইমাম মুহাম্মদের জীবনী।

www.pathagar.com

৩. অন্যান্য কিতাবেও আছে। কিন্তু এই কিতাবে যেভাবে যে ভাষায় লেখা হয়েছে তাতে নতুন কিছু নিয়ম-পদ্ধতির সংযোজন হয়েছে। এই কিতাবের তিরিশ থেকে চল্লিশখানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লেখা হয়েছে। যাদের নাম এবং সার-সংক্ষেপ "কাশফুজ জুনুনে" পাওয়া যায়।

জামে কাবীর ঃ জামে সাগীরের পরে লেখা। বিশাল কিতাব। এর মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর সকল বক্তব্যের সাথে কাজী আবু ইউসুফ এবং ইমাম জাফরের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি মাসআলার সাথে দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী যুগের হানাফী পন্থীগণ উসূলে ফিকাহ্‌র যেসব মাসায়েল প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার অধিকাংশই এই কিতাবের দলিল উপস্থাপনের ধরন এবং উদ্ভাবনের পদ্ধতি অনুসারে করেছেন। বড় বড় বিখ্যাত ফকীহ্‌গণ জামে কাবীরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লিখেছেন। যার ৮২ খানার উল্লেখ "কাশফুজ্ জুনুনে" করা হয়েছে।

জেয়াদাত ঃ জামে কাবীরের রচনার পরে যেসব শাখা-প্রশাখা মনে পড়েছে তা সব এর মধ্যে লিখেছেন। একারণেই নাম রেখেছেন 'জেয়াদাত'।

কিতাবুল হুজ্জ ঃ ইমাম আবু হানিফার ওফাতের পরে ইমাম মুহাম্মদ মদীনায় চলে গেলেন। তিন বছর সেখানে থেকে ইমাম মালিকের কাছে মুয়াত্তা পড়েছেন। মদীনা কেন্দ্রিক চিন্তাধারা ছিল ভিন্ন। বহু মাসায়েলে ইমাম আবু হানিফা (রহ) থেকে তারা ভিন্নমত পোষণ করতেন। ইমাম মুহাম্মদ মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই কিতাব লিখেছেন। এর মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যসমূহ উল্লেখ করেছেন। এর পরে মদীনা কেন্দ্রিক মনীষীদের মতপার্থক্য বর্ণনা করে হাদীস, সাহাবাগণের ঐতিহ্য এবং অকাট্য যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রমাণ করেছেন যে, আবু হানিফা (রহ)-এর মতামতই যথার্থ এবং সঠিক। অন্য সবার যা-ই আছে তা ভুল। ইমাম রাযী মানাকিবুশ্ শাফেয়ীতে এই কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এই কিতাব এখন সহজলভ্য।

সীরে সাগীর ওয়া কাবীর ঃ এটা সব শেষের রচনা। প্রথমে সীরে সাগীর লিখেছেন। তার একটা কপি ইমাম আওযায়ীর চোখে পড়েছে। তিনি বিদ্রূপ করে বলেছেন ঃ 'জীবন চরিত' বিষয়ের সাথে ইরাকবাসীর কি সম্পর্ক। ইমাম মুহাম্মদ একথা শুনে জীবনী লেখা শুরু করে দেন। প্রস্তুত হলে পরে ষাটখানা খণ্ড দাঁড়ায়। এই বিশাল গ্রন্থ একটা খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে হারুন আর-রশীদের দরবারে নিয়ে এলেন। হারুন আর-রশীদ যে আগেই জানতে পেরেছিলেন তা প্রমাণ করতে ইমামকে স্বাগত জানাতে খোদ শাহজাদাদের পাঠিয়ে দিলেন।

এসব কিতাব ছাড়া ইমাম মুহাম্মদের ফিকাহ্ বিষয়ের ওপর আরও বেশ কিছু রচনা রয়েছে। যেমন ঃ কিয়ানিয়াত, জুরজানিয়াত, রেকায়াত, হারুনিয়াত ইত্যাদি কিন্তু এসব রচনা ফকীহ্‌গণের প্রচলিত ধারার মধ্যে পড়ে না। বরং কিতাবুল হুজ্জ, যে সম্পর্কে আগেই বলে এসেছি তাও এই ধারার বাইরে।

ইমাম জাফর ঃ ফকীহ্ হিসাবে যদিও তাঁর অবস্থান ইমাম মুহাম্মদের উপরেই ধরা হয়, কিন্তু যেহেতু তার কোন রচনার অস্তিত্ব নেই এবং তাঁর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ইতিহাসও বর্তমান নেই। এ কারণে ইমামদ্বয়ের পরেই তাকে রাখতে হয়েছে। জন্মসূত্রে আরব

www.pathagar.com

বংশোদ্ভূত। প্রথম জীবনে হাদীস চর্চায় মশগুল ছিলেন। যে কারণে তাকে সাহেবুল হাদীস উপাধী দেয়া হয়েছিল। এরপরে ফিকাহ্‌র প্রতি মনোযোগী হলেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত সেই চর্চায়ই ব্যস্ত ছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়াহ্ বিন মুঈন বলেন[১] ঃ زفر صاحب الرای ثقة مامون ইমাম যুফার ছিলেন ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য, কেউ কেউ তার রচনা সম্পর্কেও বলেছেন, কিন্তু তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যুক্তিভিত্তিক বিধান নির্ণয়ে পারদর্শী ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেন ঃ اقيس اصحابی তিনি ছিলেন আমার সেই সাথীর অন্তর্ভূক্ত যিনি কিয়াসের ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী। ওয়াকী বিন জেরাহ্ তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং কাজীর পদেও কাজ করেছেন। ১১০ হিজরী সালে জন্ম এবং ১৫৭ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

১. তাহযীব আল আসমাআ ওয়াল্লুগাত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইমাম মালিক (রহ)

জন্ম ৯৩ হিজরী, ওফাত ১৭৯ হিজরী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মাদীনাতুর রাসূলের সবচাইতে বড় আলেম, মুহাদ্দিস এবং ফকীহ্ ছিলেন।
- একাগ্র তাপস, রাসূলপ্রেমে অনন্য, নবী প্রদর্শিত জীবনাদর্শের তুলনাহীন বাস্তবায়নকারী।
- 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' শুদ্ধতম কিতাব। 'আল-কুরআনের' পরেই যার স্থান।
- মাদীনার বাইরে কখনো যাননি। তাঁর 'দরসগাহ' ঐশী শিক্ষা এবং নবুয়তী জ্ঞানচর্চার সবচাইতে বড় বিশ্ববিদ্যালয়।
- জ্ঞানী হিসেবে এতোটা উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, তৎকালীন খলিফা একজন সাধারণ ছাত্রের মতো তাঁর শ্রেণীকক্ষে অংশ নিতো।
- 'জোরপূর্বক তালাকের' বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন। নীতিগতভাবে তা 'বাধ্যতামূলক আনুগত্যের' বিরুদ্ধে চলে যায়। তাই রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে বেত্রাঘাতের দণ্ড ঘোষিত হলো। শাস্তি কার্যকর হলো, কিন্তু কষাঘাতের তীব্র যন্ত্রণা তার বাকশক্তিকে রুদ্ধ করতে পারেনি। প্রতিটি আঘাতের প্রতিঘাত হিসেবে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল, "আমি মালিক বিন আনাস, 'সিদ্ধান্ত' জানিয়ে দিচ্ছি, জবরদস্তিমূলক তালাক— হারাম, হারাম, হারাম।
- উপসাগরীয় দেশসমূহ এবং মুসলিম স্পেনের জনগণ মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

www.pathagar.com

জন্ম, শৈশবকাল এবং বংশ পরিচয়

নাম— মালিক। ডাকনাম— আবদুল্লাহ। উপাধী— ইমাম দারুল হিজরাহ্। পিতার নাম— আনাস। বংশ পরম্পরা এরকম— মালিক বিন আনাস বিন মালিক বিন আবী আমের বিন উমার বিন হারেস বিন গীমান বিন হাবছিল বিন আমরুদ ইবনে হারেছ যী আছবাহ।[১]

ইমাম মালিক খাঁটি আরবীয় বংশের ছেলে। জাহিলীয়াতের যুগেও এই পরিবার অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থানে ছিল। পূর্বপুরুষগণের নিবাস ছিল ইয়ামান। কিন্তু ইসলামের পরে মাদীনায় স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন। ইমাম ইয়েমেনের শেষ রাজবংশ 'হামীরের শাখা' আছবাহ'র সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ বংশের প্রথম পুরুষ 'হারেস', গোত্র প্রধান ছিলেন। এ কারণে যী আস্‌বাহ্‌র উপাধীপ্রাপ্ত এবং প্রষিদ্ধ। তার বংশে সর্ব প্রথম প্রোপিতামহ আবু আমের ইসলাম গ্রহণ করেন। সৌভাগ্য প্রাপ্তির এই ইতিহাস একটু পুরানো, সম্ভবত ২য় হিজরী।

ইমামের জন্ম-সাল নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ঐতিহাসিক 'ইয়াফাঈ' তব্‌কাতুল ফুকাহায় লিখেছেন ৯৪ হিজরী। ইবনে খালকান বলেছেন, ৯৫ হিজরী। কিন্তু আসলে ৯৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যেভাবে মুহাদ্দিস জুহরী 'তায্‌কেরাতে' বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ছামআনী 'আনসাবে' তা-ই গ্রহণ করেছেন।

সময়টা উমাইয়া শাসনের প্রাথমিককাল। উমাইয়া মারওয়ানী শাসনের তৃতীয় শাসক ছিল অলীদ বিন আবদুল মালিক। খেলাফতের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল 'দামেস্কে'। ইসলামের বিজয় কেতন পূর্বদিকে তুর্কীস্তান, কাবুল এবং সিন্ধুতে উড়ছে। পশ্চিমে আফ্রিকা এবং স্পেনের বেলাভূমিতে গিয়ে আঘাত করেছে ইসলামের বিজয় তরঙ্গ। ঘটনাচক্রের কি অদ্ভূত যোগাযোগ যার শাসনামলে ইমামের জন্ম হয়েছিল, তার তলোয়ার যেসব ভূখণ্ড জয় করেছিল, ইমামের 'কলম' সেইসব ভূখণ্ডে সবচাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেমন ঃ ত্রিপোলী, তিউনিস, আলজিরিয়া, মরক্কো এবং স্পেন।

---

১. কিতাবুল আনসাব সিছ্ ছাম'আনী।

www.pathagar.com

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, ফিকাহ্ অধ্যয়ন, হাদীস সংকলন সম্পন্নকরণ

ইমাম মালিক (রহ)-এর চেতনার উন্মেষ ঘটে ঐশী জ্ঞান-সাধনার এক অপূর্ব ভাব-গম্ভীর পবিত্র পরিবেশের মধ্যে। ঘরে-বাইরে আন্দ-আঙ্গিনায় ঊর্ধ্বলোক থেকে আগত নির্দেশ অনুধাবনের ধ্যানে মগ্ন সব মানুষজন। সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের বাণী বাহকের প্রত্যাবর্তনের পরে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার সঙ্গী-সাথী সাহাবীগণ। শূন্য ভাণ্ড তবু যেন শূন্য পড়ে থাকেনি। বিধাতার বিধান এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ার তাবত জ্ঞানের অধিকারী সাহবীগণ এই নগরীতেই তাদের আবাস-নিবাস তৈরী করে নিয়েছিলেন।' নবী (স)-এর জীবনকাল এবং তার পরবর্তী ২৪/২৫ বছর যাবত এ নগরীই ছিল ইসলামী শাসন প্রশাসনের মূল কেন্দ্র। জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় বিধানের উৎপত্তিস্থল এই নগরী। এখান থেকেই গোটা সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো।

মদীনার সাহাবী ফকীহ্গণ

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা), হযরত উমর ফারুক (রা), হযরত আয়শা (রা) যাঁরা শরীয়তের মূল রহস্যের সন্ধান জানতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাসূল (সঃ)-এর কথা এবং কাজের একনিষ্ঠ অনুসারী, যার চাইতে বেশি আর কেউ ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আবু হোরায়রাহ্ (রা) যার চাইতে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী আর কেউ নয়। কাতেবে অহী হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) প্রমুখের বসবাস এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় মুখর ছিল এই নগরী। হাজার হাজার মানুষ ঐশী জীবন যাপন পদ্ধতি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার শিক্ষা গ্রহণ করে বেরিয়ে গেছেন এই শহর থেকে।

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা)-এর উত্তরাধিকারী হযরত আয়শা সিদ্দিকার (রা) ছাত্র, তাঁর ভাইয়ের ছেলে কাছেম বিন মুহাম্মদ বিন আবী বকর। তাঁর বোনের ছেলে উরওয়াহ বিন জুবায়ের। হযরত উমর ফারুকের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ বিন উমর। হযরত ইবনে উমর (রা)-এর নিষ্ঠাবান ছাত্র ছিলেন নাফে ও আবদুল্লাহ বিন দীনার। তাদের দুই গোলাম এবং পুত্র সালেম বিন আবদুল্লাহ। হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা)-এর উত্তরাধিকারী পুত্র খারেজা বিন যায়েদ। হযরত আবু হোরায়রাহ (রা)-এর আমানত রেখে যান জামাতা সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের কাছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর ধন-সম্পদ মদীনার বাইরে মক্কা, কুফা এবং বসরায় বিলিয়ে দেন, বাদবাকী যা কিছু ছিল তা সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের অধিকারে আসে।

সাহাবাগণের ছাত্রগণ, প্রচলিত ভাষায় যাদের তাবেয়ীন বলা হয়, গোটা ইসলামী সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে ছিলেন তাঁরা। কিন্তু আমাদের আলোচনা মদীনা কেন্দ্রিক। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের কথা আগেই বলেছি। এঁদের ছাড়া হিশাম বিন উরওয়াহ, মুহাম্মদ বিন মুনকাদের, আবদুল্লাহ বিন উৎবাহ্ বিন মাস্‌উদ, মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আজ্‌যুহরী, আমের বিন

আবদুল্লাহ জাফর সাদেক, রাবিয়ার রায়, আবু যোহেইল নাসের বিন মালিক, সুলাইমান বিন ইয়াসার (রহ) প্রমুখ যাঁদের দিন-রাতের বিরামহীন চেষ্টা-সাধনায় ইল্মে দ্বীনের ছোট্ট চারাগাছটি ফুলে-ফলে শুশোভিত হয়ে উঠেছিল।

ফকীহ্ সপ্তক

আবু বকর বিন হারেস ৯৪ হিজরী, খারেজ বিন যায়েদ ৯৯ হিজরী, কাসেম বিন মুহাম্মদ ১০১ হিজরী, সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব ১০১ হিজরী, আবদুল্লাহ বিন উৎবাহ্ ১০২ হিজরী, সালেম বিন আবদুল্লাহ ১০৬ হিজী, সুলাইমান বিন ইয়াসার ১০৭ হিজরী। এই সাতজনকে মদীনার 'ফুক্কাহায়ে সাব'আ' অর্থাৎ ফকীহ্-সপ্তক বলা হতো। সাহাবাগণের পরে ফতোয়া, মাসায়েল, মোকদ্দমা এবং বিচার এঁদের ফয়সালা অনুযায়ী সমাধান হতো। তাঁদের 'মজলিসে ইজতেমাঈ' অর্থাৎ যেখানে এই সাতজন একত্রে বসতেন, সেই সময়ের সবচাইতে বড় আদালত হিসেবে বিবেচিত হতো। পরবর্তীকালের মদীনার ফকীহ্গণ এঁদেরই উত্তরসূরী।

ইমাম মালিকের উস্তাদগণ

তিনি যখন শিক্ষাঙ্গনে প্রথম পা রাখেন তখন মদীনার জ্ঞান-বাগিচা বসন্তের গুল-বাগিচার মতো ফুল-সূধা-অলীর আহরণ-বিতরণে মুখর। ওপরে উল্লেখিত গুণীজনের প্রত্যেকের কাছ থেকেই তিনি জ্ঞান আহরণ করেছেন, ফলে মদীনার যে জ্ঞানের খনি বিভিন্ন হৃদয়ে ছড়িয়ে ছিল তা এখন মাত্র একটি হৃদয়ে এসে জমা হয়ে গেলো এবং এ কারণেই 'ইমামে দারুল হিজরত' লকবের অধিকারী হয়েছিলেন। ইমামের শিক্ষক বিশেষ করে হাদীস গ্রহণের মাধ্যম সংখ্যায় অনেক। 'আসমাউর রিজালের' কিতাবসমূহে তা দেখা যায়। তিনি অনেকের সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মুয়াত্তার মধ্যে তিনি যাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাদের অল্প ক'জন ছাড়া অধিকাংশই মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা। এ কারণে কিছু শেখার জন্য মদীনার বাইরে তাকে কখনই পা বাড়াতে হয়নি। বস্তুত ঘরেই যার অফুরন্ত ভাণ্ডার বাইরে হাত বাড়াবার তার কি প্রয়োজন? তাছাড়া মদীনা ইল্মে দ্বীনের মূল মারকাজ। গোটা সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে থেকে জ্ঞানী-গুণীজনের এখানে আগমনের হেতু অনেক। সর্বোপরি হজ্বের মৌসুমে বছরে একবার অন্তত রাসূল (স)-এর নগরীতে আসার লোভ কে সামলাতে পারতো?

ইমামের আপন ঘরে দাদা, চাচা এবং স্বয়ং পিতা এক-একজন মান্যবর মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম শিখতে চাইলেন, দেখলেন ঘরেই তার বিশ্ববিদ্যালয়! ইমামের দাদা অত্যন্ত বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের একজন। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন ইমামের বয়স দশ। মুহাদ্দিসীন এবং সাধারণ, সবাই এটা জানেন যে, হয়তো তাঁর শিশুকাল অথবা দাদার বার্ধক্যের কারণে, দাদার কাছ থেকে তিনি কিছু নিতে পারেননি। আবু সুহাইল নাফে ইমামের এক চাচা, বর্ণনা এবং হাদীস বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ। ইমাম জুহরীর উস্তাদ। ইমামও তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন। পিতা আনাস এবং আর এক চাচা রাবী' দু'জনই তাদের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মুয়াত্তায় তাদের কাছ থেকে নেয়া কোন হাদীস তিনি উল্লেখ করেননি। ইমাম কুরআন পাঠ এবং তার সনদ অর্জন করেছেন মদীনার ইমামুল কের'আত নাফে' বিন আবদুর রহমান (ওফাত ১৬৯ হিঃ)-এর কাছ থেকে।[১] যাঁর কেরাত বা পাঠরীতি আজ পর্যন্ত গোটা

১. ইবনে খাল্লকান, ইমাম মালিক ও নাফে বিন আবদুর রহমানের জীবনী।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। নাফে বিন আবদুর রহমানের কাছে কুরআন পাঠ শেখার কথা ইমাম নিজে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু অন্য কোন সূত্রে তার উল্লেখ নেই।

ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষাও তাঁর বাল্যকাল থেকেই শুরু হয়েছে। ইমামের সর্বপ্রথম শিক্ষক শায়খুল হাদীস হযরত নাফে' (রহ) অথবা সম্ভবত তাঁর চাচা আবু সুহাইল (রহ)।

নাফে ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের মুক্ত করা গোলাম। ইসলামের ইতিহাসে গোলামের মানে তা নয় যা ইউরোপীয় অভিধানে দেখা যায়। সেখানে নির্যাতন, নিপীড়ন, অপমান-লাঞ্ছনার এক মূর্ত প্রতীক, মানুষ নামের এক নরপশু কিন্তু ইসলামে সম্মান, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা, শিক্ষা-দীক্ষা, স্নেহ-মমতা এবং ভালবাসার উত্তরাধিকারীকে গোলাম বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর গোলাম আকরামাহ্ (রা) যিনি ইল্‌মে তাফসীরের মানদণ্ড এবং নাফে ইবনে উমর (রা)-এর গোলাম যিনি হাদীস বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী এবং উস্তাদ। নাফে একটানা ৩০ বছর হযরত ইবনে উমরের খেদমত করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) ছাড়া হযরত আয়শা (রা), হযরত উম্মে সালমা (রা) হযরত আবু হোরায়রাহ্ (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আওযায়ী, ইমাম জুহরী, আইয়ুব সুখতিয়ানী, ইবনে জারিয, ইমাম মালিক (রহ) প্রমুখের মতো হাদীসের ইমামগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। নাফে'র যোগ্যতা এবং মর্যাদা অনুমান করা যাবে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজীজের মূল্যায়ন থেকে। খলিফা মিশরবাসীর উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে নাফে'কে পাঠিয়েছিলেন। ১১৮ হিজরী সালে এই মহাত্মন পরলোক গমন করেন।

নাফে' যতোদিন বেঁচে ছিলেন ইমাম মালিককে একনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে প্রতিটি আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত পেয়েছেন। ইমাম মালিক যদি কখনো প্রশ্ন করতেন— এইসব মাসায়েলে হযরত ইবনে উমর (রা)-এর বক্তব্য কি ? নাফে' অত্যন্ত যত্নের সাথে তাঁর উস্তাদের বক্তব্য তুলে ধরতেন।[১] উস্তাদের উপর ইমাম মালিকের এতোটা নির্ভরতা ছিল যে, তিনি বলতেন, "আমি যখন ইবনে উমর (রা) বর্ণিত কোন হাদীস নাফে'র মুখ থেকে শুনে নিতাম, তখন আর কারো কাছ থেকে তা শোনার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হতো না। "যে বর্ণনা মালিক নাফে' থেকে, নাফে' ইবনে উমর থেকে"— বর্ণনা বিজ্ঞান তাকে স্বর্ণালী পরম্পরা অর্থাৎ 'সোনার শিকল' হিসেবে আখ্যায়িত করে।

নাফে' ছাড়া মদীনার অন্যান্য শায়খুল হাদীসগণের কাছ থেকেও ইমাম মালিক হাদীস শিখেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— মুহাম্মদ বিন শিহাব আয যুহরী, জাফর সাদেক বিন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ বিন মুনকাদির, মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া আল আনছারী, আবু হাযেম, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (রহ) প্রমুখ।

মুহাম্মদ বিন শিহাব আয্ যুহরী ঃ তাঁর আসল নাম মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ্ বিন আবদুল্লাহ্ বিন শিহাব আয্ যুহরী আল ক্বারশী। কিন্তু শুধুমাত্র ইবনে শিহাব আয্ যুহরী নামেই তিনি খ্যাত। সাহাবাগণের পরে তাবেয়ীনদের মধ্যে বর্ণনা এবং হাদীসের যারা ধারক-বাহক ছিলেন তাদের মধ্যে ইমাম যুহরীর অবদান হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব ছাড়া বাদবাকী সবার ওপরে। মহান ইসলামী পণ্ডিতগণের অসাধারণ সৃষ্টি ছয়খানা শুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে ইবনে শিহাব যুহরী (রহ)-এর বর্ণনায় ভরপুর। আবু বকর বিন হায্ম এর

১. তবকাত ইবনে সো'ওদ, তাবেঈনে মদীনা ও ইমাম মালিকের জীবনী।

www.pathagar.com

পরে হাদীস সমগ্রের এই দ্বিতীয় নিবন্ধনে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আনাস (রা) হযরত জাবের (রা) ইবনে উমর (রা) এবং সহল বিন সো'ওদ (রা) প্রমুখের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ থেকে বর্ণনা এবং তাঁদের স্বাক্ষাত-ধন্য ছিলেন। ফুকাহায়ে সাব'আ এবং অন্যান্য মনীষীগণের অন্তরে যে জ্ঞান বিস্তৃত এবং বিক্ষিপ্ত ছিল ইমাম যুহরী (রা)-এর পরে ইমাম মালিকের অন্তরে এসে তা কেন্দ্রীভূত হলো। সেই ইমাম মালিকের জবানীতে— ইবনে শিহাব যখন মদীনায় আসতেন তখন আমরা ছাত্ররা তাঁর চারপাশে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করতাম।

ইমাম যুহরী মদীনা ছেড়ে শামে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম মালিক উস্তাদের এই পরবাস মেনে নিতে পারছিলেন না। অনুযোগ করে একদিন বলেই ফেললেন— উস্তাদজী, আপনি মদীনাতেই লেখাপড়া শিখলেন আর যখন কামেল হলেন, তখন চলে গেলেন দূরের এক দেশে ? উস্তাদ জবাব দিলেন– মদীনার লোকেরা যখন মানুষ ছিল তখন আমি মদীনায় থাকতাম, যখন তারা বদলে গেল তখন আমিও বেরিয়ে পড়লাম।[১]

ইমাম লাইস মিস্‌রী স্বীকার করতেন যে, 'যুহরীর চাইতে বড় সর্বজ্ঞানে গুণী দ্বিতীয় কেউ নেই'। খোদ ইমাম যুহরীর নিজের কথা, "যে জিনিসই আমি আমার মনকে বুঝিয়ে দিয়েছি, তা কখনো হারিয়ে যায়নি"। হাদীসের সমীক্ষকগণ বলেন, হাদীসের মূল পাঠ এরং সনদের হাফেয ইমাম যুহরীর চাইতে বড় কেউ ছিল না। ইমাম মালিক ছাড়া ইমাম লাইস মিস্‌রী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আওযায়ী, আতা বিন আবী রাবাহ (শেখ যুহরী), আমরুদ বিন দীনার, সুফিয়ান বিন আইনীয়াহ, ইবনে জারীহ্ এবং এই সমসাময়িক যতো মুহাদ্দিসীন রয়েছেন সাধারণভাবে তাঁরা ইমাম যুহরীর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে তাঁর নামটি সবচাইতে বেশি যে উজ্জ্বল করেছেন তিনি ইমাম মালিক। ব্যক্তিত্ব সমীক্ষায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের চাইতে বড় আর কে আছে ? একদিন তার ছেলে তার কাছে জিজ্ঞেস করলো, ইমাম যুহরীর ছাত্রদের মধ্যে সবচাইতে বেশি বিশ্বাসযোগ্য কে ? আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ) জবাব দিলেন 'মালিক' সবচাইতে অগ্রগামী। সেই সোনালী যুগের মনীষীগণ তাদের ছাত্রগণের সাথেও খোলামেলা মত বিনিময় করতেন। ছাত্রদের বক্তব্য থেকে শেখার কিছু বেরিয়ে এলে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ছাত্রকে বলে-কয়ে উস্তাদ শিখে নিতেন। এভাবে ইমাম যুহরী বেশ কিছু ব্যাপারে ইমাম মালিকের ধারণা থেকে উপকৃত হয়েছেন, শিখেছেন। ১২৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম জাফর সাদেক (রহ) ঃ জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আবী তালিব। ইমাম জাফর সাদেক নামে খ্যাত। সম্মানিত পিতা ইমাম বাকের, উরওয়াহ্ বিন জুবায়ের, আ'তা এবং মুহাম্মদ বিন মুনকাদির থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্, সুফিয়ান সাওরী, শো'বা, আবু আসেম, ইয়াহ্ইয়া আনসারী প্রমুখ তাঁর ছাত্র। ব্যক্তিত্ব সমীক্ষক আবু হাতেম বলেন ঃ ইমাম জাফর সাদেকের মতো মহাত্মনের ব্যাপারে যদি প্রশ্ন করা হয় তিনি কেমন ছিলেন ? তাহলে তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়। ইবনে হাব্বান বলেন, ইমাম আহলে বাইত, রাসূল (স)-এর যোগ্য বংশধর, তাবে তাবেয়ীন এবং মদীনায় আমাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন তাঁকে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং আস্থাশীল বলেছেন।

ইমাম জাফর সাদেক মাঝে মাঝে ছাত্রদের পরীক্ষা নিতেন। একবার আবু হানিফা (রহ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এহরাম বাধা অবস্থায় যদি কেউ হরিনের সম্মুখের চারটি দাঁত

১. জামে বায়ানুল ইল্‌ম, ইবনে আবদুল বার্, পৃষ্ঠা ৩২৪

www.pathagar.com

ভেঙ্গে দেয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ কি দাঁড়াবে ? আবু হানিফা বললেন, হে রাসূল (স)-এর বংশধর, আমার তা জানা নেই। ইমাম জাফের সাদেক (রহ) বললেন ঃ আবু হানিফা তুমি খুব বুদ্ধিমান, তুমি বুঝি এটা জানো না যে, হরিণের সম্মুখ পাটিতে চার দাঁত হয় না, দাঁত থাকে মাত্র দুটো![১]

আল্লামা যুহরী মীযানুল ই'তেদালে মাসআব বিন আবদুল্লাহ্ থেকে দুটি বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, ইমাম মালিক উমাইয়া বংশের শাসন চলাকালীন ইমাম জাফর সাদেক থেকে কোন বর্ণনা করেননি। আব্বাসীদের শাসন শুরু হলে তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। হয়তো একথা সত্য, কিন্তু যে ভয়ে তিনি উমাইয়া শাসনামলে তাঁর থেকে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, সে ভয় তো আব্বাসী আমলেও বর্তমান ছিল! তাহলে এই রাজনৈতিক ভীতি শুধু ইমাম মালিকেরই হবে কেন ? এই দোষে দুষ্টতো আরও অনেকেই ছিলেন! সর্বোপরি তার যদি সে ধরনের কোন ভয়ই থাকতো তাহলে উমাইয়াদের আমলে তাঁর সামনে শিক্ষার্থী হয়ে বসতে ভয় পাননি কেন ? দ্বিতীয় বর্ণনা এরকম যে, ইমাম মালিক ইমাম জাফর সাদেকের বর্ণনার সাথে অন্য কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনার পরখ না করে এককভাবে তাঁর থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। অর্থাৎ ইমাম মালিক ইমাম জাফর সাদেককে পক্ষপাতদুষ্ট বা দুর্বল বর্ণনাকারী মনে করতেন। এ বর্ণনা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন। মুয়াত্তা আমাদের সামনেই পড়ে আছে। অধিকাংশ বর্ণনা এককভাবে ইমাম জাফর সাদেক থেকে অন্য কোন বর্ণনাকারীর বরাত ছাড়াই সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। আমরা একটু আশ্চর্য বোধ করছি এ কারণে যে, ইমাম যুহরীর মতো ব্যক্তিত্বও ব্যাপারটা একটু পরখ করে দেখলেন না! ১৪৮ হিজরী সালে ইমাম জাফর সাদেক (রহ) ইন্তেকাল করেন। কোন কোন বর্ণনায় ইমাম জাফর সাদেক মৃত্যু সজ্জায় ইমাম মালিককে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান।[২] কিন্তু নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে এমন কোন কথা আমি খুঁজে পাইনি।

মুহাম্মদ বিন আল মুনকাদির আল মাদানী ঃ মান্যবর তাবেয়ীন পিতা মুনকাদির বিন আবদুল্লাহ্। হযরত আয়শা (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু আইয়ুব (রা) এবং হযরত আবু হোরায়রাহ্ (রা) প্রমুখ সাহাবাগণের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, শো'বা, সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্, সুফিয়ান সাওরী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস ইমামগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মাধ্যম ছিলেন। ইবনে আইনিয়াহ বলেন ঃ মুহাম্মদ বিন মুনকাদির সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততার খনি ছিলেন। মদীনার সালেহীনগণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি। ১৩১ হিজরীতে ওফাত পান।

মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া ঃ মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া আনসারী, অত্যন্ত উঁচু স্তরের তাবেয়ী ছিলেন। পিতা ইয়াহ্ইয়া বিন হাব্বান এবং চাচা ওয়াসে' বিন হাব্বান ছাড়া রাসূল (স)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আনাস (রা) রাফে বিন খাদিজ (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম লাইছ ইবনে ইসহাক তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। মাসজিদে নববীতে দরস দিতেন এবং তার একটি স্বতন্ত্র মাজলিস হতো। তাঁর ফতোয়া মাদীনায় কার্যকর ছিল। নাসাঈ, ইবনে মুয়ীন, আবু হাতেম তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হিসেবে গণ্য করতেন। ১২১ হিজরীতে ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আবু হাযেম ঃ আবু হাযেম সাহাবাগণের মধ্যে সালমাহ্ বিন দীনার (রা) এবং মদীনার সর্বশেষ সাহাবী যিনি ৮৮ হিজরীতে একশত বছর বয়স বয়সে ইন্তেকাল করেন, সেই সহ্ল

১. ইবনে খালকান, ইমাম যাফর সাদেকের জীবনী
২. মানাকিব ইমাম মালিক, ঈসা আয্যারাবী।

www.pathagar.com

বিন সো'ওদ (রা)-এর মুখ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা), বিন আস এবং ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা প্রচলিত নিয়মে প্রমাণিত নয়। তাবেয়ীগণের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মুনকাদির, সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, উম্মুদ দারদা ওয়াস্‌সোগরা, আবু আওরিস খোলানী (রা) প্রমুখের শিক্ষাপ্রাপ্ত। ইমাম যুহরী জ্ঞান ও মর্যাদায় তাঁর থেকে বড় ছিলেন, কিন্তু তবু তিনি তার কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন। ইমাম মালিক, ইবনে আইনিয়াহ্, ছাওরী, হাম্মাদ (রহ) প্রমুখ তাঁর ছাত্র।

মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য এবং অধিক হাদীস জানেন বলে মান্য ছিলেন। মাঝে মাঝে মাসজিদে নববীতে ভাষণ দিতেন। তাঁর শিক্ষামূলক জলসায় কখনো কখনো এমন ভিড় হতো যে, লোকেরা বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। এরকম এক সভায় ইমাম মালিক গিয়েছিলেন। বসার জায়গা না পেয়ে ফিরে এলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর বাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিখবো! ব্যাপারটা আমার কাছে অরুচিকর মনে হয়েছে, তাই চলে এসেছি। তাছাড়া অতদূর থেকে ঠিকঠাক মতো সব শুনতে পাবো কি না তাই বা কে জানে? আবু হাযম ১৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ (রহ) ঃ আবু সাঈদ ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আনসারী (রহ) হযরত আনাস (রা) আদী বিন ছাবেত, আলী বিন জয়নুল আবেদীন বিন হুসাইন (রা) প্রমুখ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ইমাম মালিক, শো'বা, ছাওরী, ইবনে আইনিয়াহ্, হামাদ বিন জায়েদ, হামাদ বিন সালমাহ্ (রহ) প্রমুখ তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। মদীনার বিচারপতি ছিলেন। ইবনে মাদীনীর পর্যবেক্ষণে তাঁর বর্ণনার ৩০০ হাদীস রয়েছে। ইবনে ফা'আদ তার সম্পর্কে লিখেছেন ঃ ثقة كثير الحديث حجة ثبتا —তিনি বড়ই নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, বেশি সংখ্যক হাদিস বর্ণনাকারী, অকাট্য, প্রমান্য ও প্রতিষ্ঠালব্ধ ছিলেন। সুফিয়ান ছওরী ও সুফিয়ান আইনিয়াহ্ তাঁকে হাদীসের হাফেযগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ سعيد اثبت الناس —সাঈদ নির্ভরযোগ্য লোকদের অন্তর্গত। ১৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

শায়খগণের সংখ্যা

মদীনার অন্যান্য শায়খগণ, মক্কা, বসরা, খোরাসান এবং উপদ্বীপের বহু সংখ্যক শায়খের কাছ থেকে ইমাম মালিক (রহ) বর্ণনা করেছেন। মুয়াত্তায় যাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী তাদের সংখ্যা লিখেছে পঁচাত্তর (৭৫)। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে মুয়াত্তার বর্ণনাকারী শায়খের সংখ্যা ৯৪ বেরিয়েছে। এই সংখ্যা মুয়াত্তার ৭২০ হাদীস ও আছার এর। তা না হলে ইমাম মালিকের সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা শুদ্ধ-অশুদ্ধ মিলে দশ হাজার। ছাঁটাই-বাছাই এবং চুলচেরা বিশ্লেষণের পরে আট হাজার বাতিল করে দিয়েছেন।

ইলমুল ফিকাহ্

একজন শায়খ বা মুহাদ্দিসের দায়িত্ব হাদীস ও বর্ণনা পরম্পরা জমা করা। তারপরে বর্ণনার শুদ্ধতা ও দুর্বলতার বাছাই, সংযোগসূত্র এবং বিচ্ছিন্নতা সন্ধান, তুলে নেয়া অথবা সরিয়ে রাখা, বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণের বিশ্বাসযোগ্যতা ও দুর্বলতার যাচাই ইত্যাদির পরে বর্ণনাকারী কি রকম এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। একজন ফকীহ্‌র সাম্রাজ্যের সীমানা এরপর থেকে শুরু হয়। হাদীসসমূহের পরস্পর বিরোধিতা এবং সামঞ্জস্যশীলতা, বাতিল করা অথবা সমন্বয় সাধন করা এবং তা

www.pathagar.com

থেকে বিধানের উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও শাখা-প্রশাখা বেরকরণ, তার ফরয ও সুন্নত এবং করণীয়সমূহের বিভাজন, মূল সূত্র অনুযায়ী সুস্পষ্ট বিধানের সঠিক নির্ণয় একজন ফকীহ্‌র কাজ ও দায়িত্ব।

এটা বুঝতে নিশ্চয়ই এখন আর ভুল হওয়ার কথা নয় যে, একজন মুহাদ্দিসের চাইতে একজন ফকীহ্‌র অবস্থান অনেক ওপরে এবং একজন ফকীহ্‌কে সবকিছুর আগে মুহাদ্দিস হতে হবে। কেননা যদি সে হাদীসের শুদ্ধতা-দুর্বলতা আরোহণ ও অবরোহণ, সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য, বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণের নির্ভরযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা ও সামর্থ্য এবং অন্যান্য কারণসমূহের পর্যবেক্ষণ এবং অতঃপর সুবিন্যস্তকরণ ইত্যাদি জানা না থাকে তাহলে সে উদ্ভাবন ও সূত্র সন্ধান, প্রয়োগ ও বাতিল এবং অন্যান্য অর্থগত বুনিয়াদ কোন ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবে? এখন খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, কোন হাদীসে অজ্ঞ ফকীহ্‌র চিন্তা-ভাবনা কতোটা নিম্ন পর্যায়ের হতে পারে।

শায়খুল ফিকাহ্ রাবী' আর্ রায় (রহ) ঃ যদিও ইমাম মালিক নাফে' এবং অন্যান্য শায়খদের কাছে ফিকাহ্‌র তালিম নিয়েছেন, কিন্তু উচ্চতর বিশেষ শিক্ষাটা তিনি পেয়েছেন আবু উসমান রাবীয়া আর্ রায়-এর কাছে। রাবিয়া মদীনার বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। হযরত আনাস (রা)-এর সঙ্গ এবং শিক্ষা দুটোই তিনি পেয়েছেন। ইমাম মালিক, ইয়াহ্ইয়া আলী-আনসারী, শো'বা, আওযায়ী, লাইস (রহ) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানের আধার তাঁর ছাত্র। রাবিয়া'র সাথে ইমামের সংশ্লিষ্টতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, ইতিহাস এবং জীবনী গ্রন্থসমূহে "শায়খে মালিক" তাঁর নামের অংশ হয়ে গেছে। ইজতেহাদ, উদ্ভাবন, শাখা-প্রশাখা বের করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক রায় বিষয়গুলোর যথাযথ প্রয়োগে তিনি এতোটা পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত "রায়"ই তার উপাধী হয়ে গেছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ) তাঁকে "বিশ্বাসযোগ্য এবং আস্থাভাজন" বলেছেন। ইবনে শাইবার বক্তব্য— "তিনি আস্থাশীল, নির্ভরযোগ্য এবং মদীনার মুফতিগণের অন্যতম ছিলেন"। খতীব লিখেছেন ঃ كان فقيهًا عالمًا حافظًا للفقة والحديث —তিনি ফকীহ্ আলেম এবং ফিকাহ্ ও হাদীস উভয়েরই হাফেয ছিলেন।

রাবী আর-রায়, বিশেষভাবে মাসজিদে নববীতে দরস দিতেন। ইমাম মালিক, হাসান বসরী, শো'বা, আওযায়ী, লাইস মিস্‌রী, ইয়াহ্ইয়া আনসারী (রহ) প্রমুখের মতো জ্ঞানের দিশারীগণ তাঁর মাজলিসে বসে দরস শুনতেন। সোনালী যুগের মদীনায়, যেখানে হাজার হাজার মুহাদ্দিসীন ফকীহ্ গিজ গিজ করতো সেখানে বসে ফতোয়া দেয়া কতোটা যোগ্যতার প্রয়োজন তা খুব সহজেই অনুমেয়। রাবী আর-রায় সেই বিশেষ ক্ষমতা এবং যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং সামগ্রিকভাবে সেইসব বড় বড় মুহাদ্দিসীন ও ফকীহ্‌গণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যাদের মাদীনাতুর-রাসূলে মুফতি হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আব্বাসী শাসনের প্রথম শাসক 'সাফাহ্' যখন রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ বণ্টন করছিল তখন বিচার বিভাগীয় দায়-দায়িত্ব তাঁর হাতে সোপর্দ করে দেয়। আব্বাসী শাসনের প্রথম প্রশাসনিক সদর দফতর ছিল 'আনবারে' ১৩৬ হিজরী সালে, সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

রাবী আর রায়-এর মাসায়েল এবং ইজতিহাদ মানুষের কাছে প্রচণ্ড গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। ইমাম মালিক তখন নিজের প্রতিষ্ঠিত দরসের মাজলিসে রীতিমত দরস দিয়ে যাচ্ছেন। একদিন হঠাৎ রাবী আর রায়-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তার বর্ণিত হাদীস, তার ইজতিহাদের ধরন ইত্যাদি

www.pathagar.com

বিষয়ে কথা বলছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি যখন থামলেন উৎসুক শ্রোতা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অনুরোধ জানালো— তার সম্পর্কে আরও কিছু বলুন। তিনি আরও কিছুক্ষণ বললেন। শ্রোতাদের আগ্রহ আরও বেড়ে যাচ্ছিল, বললো থামবেন না, আরও কিছু বলুন। ইমাম বললেন, তোমরা তাকে দিয়ে কি করবে? দেখো ওই যে ওইখানে তিনি শুয়ে আছেন। লোকেরা দৌড়ে সেখানে গেল। ইমাম মালিক বলতেন, 'রাবী আর রায় চলে যাবার সাথে সাথে ফিকাহ্‌র স্বাদও চলে গেছে'।

তার জীবনের একটা আজব ঘটনা, তখন তিনি মায়ের গর্ভে, পিতা ফররুখ খোরাসানের যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে চলে গেলেন। যাবার সময় মায়ের হাতে তিরিশ হাজার দীনার রেখে গেলেন। ভাগ্যের পরিহাস ২৭ বছর পরে তার ঘরে ফেরার সৌভাগ্য হলো। এর মধ্যে রাবিয়া গায়ে পায়ে বড় হওয়ার সাথে সাথে বরেণ্য আলেম হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। মাসজিদে নববীতে রীতিমত তাঁর দরস চলতো। মা তার সকল সম্পদ ছেলের শিক্ষার পেছনে ব্যয় করে ফেলেছিলেন। ফররুখ নিজের বাড়ি চিনতে পেরে নির্দ্বিধায় ঘরে ঢুকে পড়ছিলেন। রাবিয়া এক আগন্তুককে ঘরে ঢুকতে দেখে রে রে করে তেড়ে এলেন। ফররুখ দেখলেন অচেনা এক লোক তাকে তার ঘরে ঢুকতে বারণ করছে। রাগে উন্মত্ত হয়ে মারতে উদ্দ্যত হলেন, ছেলেও কম যায় না, এ কোন পাগলরে বাবা! বলা নেই, কওয়া নেই, সোজা ঘরে ঢুকতে চাইছে? পাগল নাকি? রুখে দাঁড়ালেন রাবী— খবরদার এক পাও আর আগাবে না। বাপ-বেটার হল্লাচিল্লায় মহল্লাবাসী ছুটে এলো। ইমাম মালিক খবর পেয়ে ছুটে এলেন। ইমামকে দেখে লোকেরা চুপ হয়ে গেলো। তিনি বললেন, বড় মিয়া! এটাতো একজনের ঘর, আপনি অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিন। ফররুখ চিৎকার করে বলে উঠলেন, এটা আমার ঘর আমার নাম ফররুখ। নাম শোনার সাথে সাথে পর্দার আড়াল থেকে কণ্ঠস্বরও যেন চিনতে পারলেন রাবিয়ার মা, ছুটে বেরিয়ে এলেন। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন— এ তোমার বাবা।

কয়েকদিন পরে স্ত্রীর কাছে রেখে যাওয়া টাকার হিসাব জানতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, অত্যন্ত হেফাযতের সাথে দাফন করে রেখেছে। ফররুখ মাসজিদে নববীতে নামায পড়তে গিয়ে ছেলের মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান দেখে অত্যন্ত আনন্দিত এবং তৃপ্ত হৃদয় নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। স্ত্রী সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের অবস্থা কেমন দেখলে। ফররুখও জবাব দিলেন সুবহানাল্লাহ্। স্ত্রী বললেন, তাহলে বলো এখন তোমার সেই তিরিশ হাজার দীনার চাই না ছেলের এই মর্যাদা চাই। ফররুখ বললেন, এখন শুধু আমার ছেলের মর্যাদা চাই। স্ত্রী বললেন, আমি এই মাটিতেই তোমার সকল সম্পদ দাফন করে দিয়েছি।[১]

ইমাম মালিকের শায়খ নির্বাচন

ইমাম মালিকের শায়খ এবং উস্তাদগণের সংখ্যা সেকালের অত্যধিক শায়খ-স্মরণাপন্ন হওয়ার প্রচলিত প্রবণতা অনুযায়ী খুবই কম। সংখ্যার মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠত্ব খোঁজেন তারা যে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে হতাশ হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এর মধ্যেও আসলে ইমাম

১. ইবনে খালকান ও ইস্ আকুল্ মুব্‌তা'আ, রাবীয়া'র জীবনী

www.pathagar.com

মালিকের জন্য একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লুকানো। সাহাবাগণের পরে তাবেয়ীন যুগের সূচনা, এই দ্বিতীয় পর্যায় বা দ্বিতীয় শতাব্দীটি যদিও সার্বজনীনতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে কল্যাণ ও মঙ্গলময় যুগ এবং সত্য ও পবিত্রতার সময়কাল ছিল! তবে 'কালের কোন পর্যায় কখনো এমন কাটেনি আর না কাটতে পারে, যখন গোটা জনগোষ্ঠী দুর্ভাগ্যজনক কোন কলঙ্কের দাগ থেকে মুক্ত ছিল'। সময়ের ভালো অথবা মন্দ হওয়ার বিচার শুধুমাত্র আপেক্ষিকভাবে হতে পারে। সাহাবাগণের প্রথম যুগ, তার পূর্ব যুগের এবং পরবর্তী যুগের তুলনায় শ্রেষ্ঠ যুগ ছিল। তথাপি সে যুগও তার শ্রেষ্ঠত্বের মুখে কালিমা লেপনকারীদের উৎপাত থেকে মুক্ত ছিল না। যদিও সেই ব্যক্তিত্বগণ পরবর্তী যুগের যুগ-শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবানদের মহৎ সান্নিধ্য, ঈমানী শক্তি, খোদাভীতি এবং অনুতাপ-অনুশোচনায় তাদের তুলনায় উন্নত ছিলেন। আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন।

সাহাবাগণের পরে তাবেয়ীনদের যুগও তাদের পরবর্তী যুগের তুলনায় কল্যাণের প্রাচুর্য এবং উৎকর্ষতার প্রশ্রবণ ছিল। এমন সোনালী যুগও পৃথিবীর মাটি কামড়ানো লালসার রোগে আক্রান্ত রুগী মানুষদের পদচারণা থেকে মুক্ত ছিল না। অসংখ্য মানুষ জেনে-শুনে মিথ্যাচার করতো। অপরদিকে অগণিত মানুষ নিজের সহজ-সরল আন্তরিকতা নিয়ে বক্তাদের সত্যবাদী জ্ঞান করে তাদের কাছে যেতো। তারা যা বলতো তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করে নিতো। এভাবে অসতর্ক এবং অজ্ঞাতসারে মিথ্যাচারীদের মিথ্যাচারের মধ্যে জড়িয়ে পড়তো মানুষ। হাজারো ফকীহ্ এমন সব নিয়ম-কানুনের কথা বলে ফেলতো যার দায়-দায়িত্ব এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার নিজেরই জানা ছিল না। সময়টাই এমন ছিল যখন কোন হাদীসের বর্ণনা বা রাসূল (স)-এর কোন কথা জানা বা বলতে পারাটাই একটা কৃতিত্ব এবং মান-সম্মানের ব্যাপার ছিল। একারণে সত্যের ধারক পুণ্যবানদের ফাঁকে ফাঁকে ভেক ও মিথ্যাচারীরাও তাদের জাল বিছিয়ে দিয়েছিল। বহিরাগত সহজ-সরল লোকেরা (যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ইরাকী) চক্‌চকে করতে দেখেই সোনা মনে করে সব গাছের তলা থেকেই কিছু না কিছু কুড়িয়ে নিয়ে নিজের শূন্য বস্তা ভরে নিতো। সত্য-মিথ্যায় উপচে পড়া এই বস্তা নিয়ে যখন নিজের ঘরে ফিরত তখন নিজেকে সবচাইতে বড় সংগ্রহের মালিক মনে করে নিজের মনে নিজেই আপ্লুত হয়ে থাকতো।

ইমাম মালিকের বাড়ি-ঘর ছিল মদীনাতেই। ছেলেবেলা থেকেই সত্যপন্থী আলেমগণের কোলে-পিঠে চড়ে বেড়ে উঠেছেন। বড় বড় মুহাদ্দিসগণের সঙ্গ-সান্নিধ্যে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। সত্য সন্ধানী, জ্ঞান তাপসদের এমন কেউ বাদ ছিলেন না যার জাত-বংশ, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা সম্পর্কে না জানতেন। নিজ দেশের ভাল-মন্দটা কে না জানে?

ইমাম মালিকের উস্তাদগণের বৈশিষ্ট্য

ইমাম মালিক সনামধন্য যোগ্যতম উস্তাদগণের কাছ থেকেই যা শেখার শিখেছেন। ফিকাহ্, হাদীসের হাফেয, সত্য সন্ধানী, পবিত্রতা ও পুণ্যবান সাধক হিসেবে যাঁরা সুপরিচিত ছিলেন বেছে বেছে সেই সব শায়খগণের দরসগাহে বসতেন। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে তিনি বলতেন, ফিকাহ্‌র অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছাড়া আমি অন্য কারো মজলিসে কখনো বসিনি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহ) বলতেন যে, "এটা আল্লাহ তা'আলার একটা বিশেষ অনুগ্রহ যা শুধুমাত্র ইমাম

www.pathagar.com

মালিকের ভাগ্যে জুটেছে"। ইমাম মালিক বলতেন, মসজিদে নববীর চত্বরে, এই স্তম্ভগুলোর কাছে আমি এমন সত্তরজন শায়খকে পেয়েছি যারা ক্বালা রাসূলুল্লাহ ক্বালা রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন, কিন্তু তাদের কারো কাছেই আমি কখনো বসিনি। আরো বলেছেন, মদীনায় অসংখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাদের কাছ থেকে মানুষ হাদীস শিখতো, কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে কিছু শিখিনি— এদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞাতসারে ভুল বলতেন। কতিপয় মূল বক্তব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল এবং কতিপয় ছিল সম্পূর্ণ জাহেল।

ইমাম মালিকের স্বনামধন্য ছাত্র ইবনে ওয়াহাব বলেছেন যে, ইমাম সাহেব বলেছেন, মদীনায় আল্লাহ্ তা'আলার এমন কিছু বান্দাও ছিলেন যারা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে আসতো। হাদীস ও মাসায়েলও তাঁরা অনেক জানতেন, কিন্তু আমি এরকম তাপসদের কাছ থেকে কিছু নেইনি। কেননা তাঁরা শুধুমাত্র সংসার ত্যাগী এবং আল্লাহ্‌র প্রেমেই মশগুল থাকতেন। হাদীস বর্ণনা ও ফতোয়ার কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ভীতি, পবিত্রতা এবং তপস্যা দিয়ে হয় না। এজন্য এসবের সঙ্গে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিপক্কতার প্রয়োজন। তাঁরা শুধু এটা জানেন যে, তাদের মুখ থেকে কি বেরুচ্ছে এবং কেয়ামতের দিন ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। যে তপস্যার সাথে দার্শনিক পরিপক্কতা থাকে না, তা এ পথের উপযোগী নয়। সে নির্ভরযোগ্য কোন দলিলও নয় আর না তার কাছ থেকে কোন বরাত নেয়া উচিত।

ইমাম মালিকের বোনের ছেলে ইসমাঈল বিন আবী আওইস্ বর্ণনা করেন যে, আমি আমার মামা মালিককে বলতে শুনেছি যে, "এই ইল্‌মে হাদীস এটাই দ্বীন, একটু দেখে নাও যে, তা তুমি কার কাছ থেকে নিচ্ছ। আমি এই খাম্বাগুলোর পাশে পাশে সত্তরজনকে দেখেছি যারা ক্বালা রাসূলুল্লাহ, ক্বালা রাসূলুল্লাহ (স) বলতো কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে একটি অক্ষর শেখার আগ্রহও কখনো বোধ করিনি। অথচ তাদের প্রত্যেকেই ব্যক্তি হিসেবে এমন ছিলেন যে, এক ধনভাণ্ডারও যদি তাদের কোন একজনের হাতে তুলে দেয়া হতো তাহলে তাদের ঈমানদারী এবং আমানতদারীর মধ্যে একচুল পরিমাণ অবিশ্বাসের ছায়া রেখাপাত করতে পারতো না। কিন্তু কি ? আসলে তারা এই 'বিষয়ের' লোকই নয়।

মুত্‌রেফ বিন আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আমি ইমামের মুখ থেকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, "আমি এই শহরে অনেক পবিত্র চরিত্রের মহান ব্যক্তি পেয়েছি, কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে কখনো হাদীস শুনতে চাইনি"। কারণ জানতে চাইলে বললেন, "তারা যা বলতেন তা তারা নিজেরা বুঝতেন না"।

ইরাকবাসীর কাছ থেকে কেন তিনি বর্ণনা গ্রহণ করেননি

ইমামের বর্ণনা সূত্রে ইরাকের অধিবাসী কেউ নেই। ইমাম মালিকের ছাত্র এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু মুসআফ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাহেবের কাছে কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল, "আপনি ইরাকের কারো কাছ থেকে কোনো বর্ণনা নেননি কেন ? জবাবে তিনি বলেছেন ঃ আমি তাদের কাছ থেকে কি বর্ণনা করবো ? আমি তাদের দেখেছি, তারা এখানে এসে এমন সব লোকের কাছে হাদীস শিখতো যাদের ওপর কিছুতেই নির্ভর করা যায় না। আবু মুসআবের বর্ণনা, "আমি বলছি যে, তারা তাদের দেশেও এমনি সব লোকের কাছে বর্ণনা করে থাকে"।

এ ধরণেরই একটা প্রশ্ন একবার শুয়াইব বিন হারব ইমাম মালিকের কাছে করেছিলেন যে, আপনারা ইরাকের কোন লোকের কাছ থেকে কেন কোনো বর্ণনা নেন না ? ইমাম মালিক কি সুন্দর জবাব দিয়েছেন! বলেছেন, "আমাদের পূর্বসূরীগণ তাদের পূর্বসূরীগণের কাছ থেকে কোনো বর্ণনা করেননি এজন্য আমাদের উত্তরসূরীরাও তাদের উত্তরসূরীদের কাছ থেকে বর্ণনা করেননি।

ইমাম মালিক যখন কোন অ-মাদানী শায়খের কাছ থেকে কিছু শিখতে চাইতেন তখন আগেই তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষত সম্পর্কে জেনে নিতেন। ইমামের ইরাকী কোন শায়খের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে একমাত্র বসরার বিখ্যাত তাবেয়ী আইয়ুব মুখতিয়ামী (রহ)। ওফাত ১৩১ হিজরী। যাঁর সম্পর্কে ইবনে সো'ওদ বলেন ঃ كان حجة ثقة ثبتًا فى الحديث جامعًا كثير العلم —"তিনি ছিলেন অকট্য, প্রামান্য, নির্ভরযোগ্য, হাদিসের ক্ষেত্রে সু-প্রতিষ্ঠিত, বহু পূন্যত্ব এবং অধিক জ্ঞানের অধিকারী। যাকে শো'বা সাইয়েদুল ফুকাহা উপাধী দিয়েছেন এবং যার নাম জীবনী গ্রন্থে احد الائمة الاعلام -বিজ্ঞ ইমামদের একজন এর বৈশিষ্ট্য সহকারে নেয়া হয়ে থাকে। প্রথম দিকে তাঁর কাছ থেকে কোন হাদীস আমি লিখে নেইনি। তৃতীয় বছর যখন তাকে দেখলাম, তখন দেখি জমজমের পাশের চত্বরে বসে আছেন। যখনই রাসূলে কারীম (স)-এর নাম নেয়া হতো তখনই তিনি ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠতেন। তাঁর সেই কান্না দেখে আমার হৃদয় হয়ে গেল। আমি তারপর তার কাছ থেকে হাদীস লিখে নিয়েছি।

নিজের দাদা এবং ফুকাহায়ে সাব'আর থেকে কেন বর্ণনা করেননি ঃ ব্যাপারটা একটু অবাক করার মতো। ইমাম যখন বয়োপ্রাপ্ত হলেন তখনো তাঁর দাদা মালিক বিন আবী আমের বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে তার বয়স বার বা তের বছরের। ফকীহ সপ্তকের সালেম বিন আবদুল্লাহ্ যখন ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন তখন ইমামের বয়স ১৬ বছর। সুলাইমান বিন ইয়াসার যখন ১০৭ হিজরীতে ওফাত পান তখন ইমামের বয়স ১৭ বছর। তবুও সেই মহাত্মনদের কাছ থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়া তিনি কোনো বর্ণনা করেননি। তার কারণ খোদ ইমাম নিজেই বলেন যে, মদীনার কিছু ব্যক্তিত্বের সাক্ষাত-সান্নিধ্য আমি পেয়েছি, কিন্তু তাঁদের বয়স তখন ১০০-১০৫ বছরে পৌঁছে গিয়েছিল। এ ধরনের অশিতীপর বৃদ্ধের কাছ থেকে কোনো বর্ণনা নেয়া সঙ্গত নয়। যদি কেউ নিয়ে থাকে তাহলে তা সন্দেহজনক হিসেবে ধরে নেয়া উচীৎ। ব্যাপারটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কেননা বার্ধক্য মানুষের স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধির ওপর কি মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে তা কে অস্বীকার করতে পারে ?

ইমাম মালিকের এই সাবধানতা এবং সতর্ক বাছ-বিচারের ফলে পরিণতি এই হয়েছে যে, তিনি তাঁর বর্ণনা-মাধ্যম হিসেবে যেসব ব্যক্তিত্বকে বেছে নিয়েছিলেন, তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা, আস্থাশীলতা এবং স্মরণশক্তির ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন এক-একটি দৃষ্টান্ত। হাদীস পর্যবেক্ষণে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেন, "ইমামের সামনে আমরা কোন ছাড়? আমরা তো শুধু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। যখনই কোন শায়খের প্রসঙ্গ আসে আমরা সবার আগে দেখি ইমাম মালিক তাঁর কাছ থেকে নিয়েছেন কি না। যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে আমরাও তাকে গ্রহণ করি না। আহমাদ বিন হাম্বালকে একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন— আমার কাছে সে গ্রহণযোগ্য, কারণ ইমাম মালিক তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

১. মুকাদ্দামাহ্ আস্ সাফ।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত শক্তিশালী স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। নিজেই বলতেন, "আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে কোনো কিছু প্রবেশ করলে তা আর হারিয়ে যায় না।[১] সমসাময়িক অন্যান্যরাও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবু কিলাবা বলেন,[২] كان مالك احفظ اهل زمانه —ইমাম মালিক সমসাময়িক যুগে অত্যন্ত শক্তিশালী স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার উস্তাদ রাবিয়ার সাথে ইমাম যুহরীর মজলিসে উপস্থিত হলেন, ইমাম যুহরী সেদিন চল্লিশটির বেশি হাদীস শ্রুতলিপি করেছেন। দ্বিতীয় দিন একইভাবে ইমাম মালিক তাঁর উস্তাদের সাথে যুহরীর মাজলিসে গেলেন। ইমাম যুহরী (রহ) কাউকে নির্দেশ দিলেন, কলমের লেখাটা দাও আমি পড়ে শোনাই, যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচনা করা যাবে। উস্তাদ রাবিয়া বললেন, এই মাজলিসে এমন একজন ব্যক্তি আছে যে কালকের হাদীসগুলো সব মৌখিক শুনিয়ে দেবে। যুহরী প্রশ্ন করলেন, এমন লোকটি কে ? রাবিয়া বললেন, ইবনে আবী আমের। যুহরী ইশারা করে সামনে আসতে বলে বললেন, শোনাও, ইমাম মালিক পুরো চল্লিশখানি হাদীস শুনিয়ে দিলেন। যুহরী আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি মনে করতাম শুধু আমি ছাড়া আর কারোই বুঝি মনে নেই।[৩]

জ্ঞানের ক্ষুধা এবং মুক্ত হৃদয়— এ সমন্বয় বিরল। ইমাম বুখারীর জীবনে এমন তিনটি দিন কেটেছে যখন জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে জীবন বাঁচাতে হয়েছে। এটা তার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইমাম মালিকও কিছু কম জান না। চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে, ছাদের কড়িকাঠ খুলে বিক্রি করে জীবন বাঁচাতে হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান অন্বেষায় এতোটুকু ব্যত্যয় হতে দেননি।[৪] যে কারণে ইমাম মালিক বলতেন ঃ

لايبلغ احديريدمن هذا العلم حتى يضربه الفقر وثره على كل حال

এই জ্ঞান সাধনায় ততোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা আসে না যতোক্ষণ পর্যন্ত অভাব-অনটন এবং দারিদ্রতা এসে সম্পূর্ণ ঘিরে না ধরবে এবং তারপরেও তার কাছে তার সাধনাই একমাত্র কাজ হয়ে থাকবে।[৫]

জ্ঞান অন্বেষণে ইমাম মালিক (রহ)-কে মদীনার বাইরে যেতে হয়নি। তার মানে এই নয় যে, খুব আরাম-আয়েশে থেকেই ঘরে বসে বসে সব পেয়ে গেছেন। ইবনে সো'ওদ ইমাম মালিক থেকে একজন মাধ্যমের বরাত দিয়ে বর্ণনা করছেন যে, নাফে'র কাছ থেকে হাদীস শেখার তাঁর জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ঠিক দুপুরের সময়। আরব দেশে ঠিক দুপুরবেলা কি রকম অবস্থা থাকে তা ভুক্তভোগী ছাড়া অনুমান করাও সম্ভব নয়। সেই সময় তাকে উস্তাদের বাড়ি শহরের উপকণ্ঠে 'বাকী' অঞ্চলে যেতে হতো। মদীনার একজন ফকীহ্ ইবনে হরমুজের বাড়িতে তিনি সকালে আসতেন এবং রাতে ফিরে যেতেন।[৬]

---

১. তাযকেরা যুহবী, ইমাম মালিকের জীবনী
২. তায্ঈনুলমা মালিক, পৃষ্ঠা ৯
৩. তায্ঈনুল মালিক, পৃষ্ঠা ১০
৪. তায্কেরাহ যুহবী।
৫ তাযঈনে নাফালান আনিল হুলিয়াহ
৬. তব্কাত

www.pathagar.com

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উন্নত মর্যাদা

ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি, ইমাম মালিকের দক্ষতা-যোগ্যতার স্বীকৃতি সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত। অবস্থার প্রেক্ষিতে ইমামের শায়খগণের জীবদ্দশায়ই ইমামের অনুরাগীদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো।[১] শায়খুল ফিকাহ্ রাবিয়া বেঁচে থাকতেই ইমাম মালিক ফিকাহ্র মাসায়েল এবং ফতোয়ার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন।[২] রাবিয়ার ইন্তেকালের পরে পরিপূর্ণভাবে ফকীহ্ এবং মুজতাহিদের আসনে আসীন হলেন। মিশরের বিখ্যাত শায়খুল হাদীস ইবনে লাহিয়া শায়খে মদীনা আবুল আসওয়াদ নাঈম বিন উরওয়াহ্ বিন যুবায়েরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "রাবিয়ার পরে মদীনার ফিকাহ্ ও ইজতিহাদের ইমাম বর্তমানে কে আছে" ? তিনি জবাব দিয়েছেন, "নওজোয়ান আসবাহী মালিক বিন আনাস আসবাহী"।[৩]

হযরত ইবনে উমর (রা)-এর মজলিস

হাদীস বিষয়ে ইমামের বিশিষ্ট শায়খ হযরত নাফে' মাওলা ইবনে উমর (রা) ছিলেন। সাহাবাগণের মধ্যে রাসূলে কারীম (স)-এর কাজ-কর্ম এবং নিয়ম-নীতি সম্পর্কে সবচাইতে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা)। আমীর মুয়াবিয়া ও হযরত আলী (রা)-এর বাদানুবাদ এবং চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকটকালীন সময়ে অনেক সাহাবা মত দিয়েছিলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তিনি বলেছিলেন ঃ কোন মুমিন মুসলিমের এক ফোটা রক্ত ঝরবে এমন খিলাফত আমার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ সাহাবাগণ সাধারণভাবে বলাবলি করতেন, রাসূলে কারীম (স)-এর ওফাতের পরে ইবনে উমর (রা) ছাড়া প্রতিটা লোক কিছু না কিছু বদলে গেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) রাসূল (স)-এর পরে ষাট বছর পর্যন্ত হাদীস, ফিকাহ্ এবং ফতোয়ার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন।

নাফে'র মাজলিস

হযরত নাফে' পরিপূর্ণ তিরিশটি বছর সফরে-অবস্থানে, ওঠা-বসায়, নির্জনে-সমাবেশে, দিবস-রজনী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর ছায়া সঙ্গী হয়ে কাটিয়েছেন। তারপরে তাঁর দরসের মাজলিসে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ১১৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম মালিক কমপক্ষে বার বছর হযরত নাফে'র দরস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

ইমাম মালিক (রহ)-এর মাজলিস

হযরত নাফে'র ওফাতের পর ইমাম মালিক (রহ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কুফার মুহাদ্দিস শিরোমণি শো'বা (রহ) বর্ণনা করেন যে, নাফে'র ওফাতের এক বছর পরে মদীনায় এসে দেখি একটি দরসের মাজলিসে ইমাম মালিক (রহ) উস্তাদের আসনে উপবিষ্ট।[৪] এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব ১১৮ হিজরীতে নিজের দরসের মাজলিস কায়েম করেন।

১. তায্ঈনুল মামালিক, ২. ইবনে খালকান।
৩. তায্ঈনুল মামালিক ৪. তায্কেরাতুল হুফ্ফায।

www.pathagar.com

ইমাম মালিকের দরসের মাজলিসে সবসময় আরামদায়ক বিছানা এবং দামী দামী কার্পেট বিছানো থাকতো। মাজলিসের কেন্দ্রস্থলে রাজকীয় আসন। শুধুমাত্র হাদীসের আলোচনায় তিনি ঐ আসন আলোকিত করে বসতেন। মেহমানদের জন্য এখানে-সেখানে হাতপাখা পড়ে থাকতো। হাদীসের দরস শুরু হবার আগেই সুগন্ধী আগর কাঠ এবং লোবানের ধোঁয়ায় গোটা পরিবেশ মৌ মৌ পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতার এমন একটি আবহ উপস্থিত সবাইকে উন্মুখ করে তুলতো। ইমাম অযু অথবা গোসল করে, দামী কাপড় পড়ে, সুন্দরভাবে চুল আঁচড়ে, সুগন্ধী লাগিয়ে ঐশী জ্ঞানের আলোচনা সভায় 'প্রধানের' আসন অলংকৃত করার জন্য বেরিয়ে আসতেন।[১]

সভায় উপস্থিত সকলেই অবনত মস্তকে আন্তরিক বিনয়ের সাথে নিশ্চুপ বসে থাকতেন। এমনকি ইমাম আবু হানিফা (রহ) যখন এই মাজলিসে আসতেন তখন অন্যান্য সভাসদগণের মতো এই সভার শিষ্টাচার রক্ষা করে অত্যন্ত বিনীত হয়েই বসতেন।[২] সেই সময় ইমামের অভিব্যক্তিতে এক ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ আভিজাত্যের প্রকাশ ঘটতো। গোটা সভাস্থল এক ভাবগম্ভীর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন[৩] ঃ আমরা তখন কিতাবের পাতাও উল্টাতাম না কোন শব্দ হওয়ার ভয়ে। ভাবগাম্ভীর্য এবং শান-শওকতে ইমামের আসন সম্রাটের উপস্থিতিতে শাহী দরবার বলে ভ্রম হতো। ছাত্রদের সমাগম, জ্ঞান পিপাসুদের আনাগোনা, রাজন্যবর্গের পদার্পণ, ওলামায়ে কেরামের আগমন-নির্গমন, উপস্থিতির বিনীত মনোযোগী আসন, বাহিরাঙ্গণে শত শত অশ্বের বিচিত্র হ্রেসা ধ্বনি। সব মিলিয়ে বিশাল কোনো সাম্রাজ্যের অধিকারী সম্রাটের দরবার। কোন এক কবি গোটা ব্যাপারটা দেখতে দেখতে মুগ্ধ বিস্ময়ে আপন মনে বলছিল[৪] ঃ

يدع الجواب فمايراجع هيبة - والسائلون نواكس الاذقان
ادب الوقار وعز سلطان التُّقى - فهو المهاب وليس ذاسلطان

ইমাম যদি জবাব না দেন তাহলে—
ভয়ে আবার প্রশ্নটা করা যেতে পারে না
প্রশ্নকারী মাথা নীচু করেই থাকে।
মর্যদার শিষ্টাচার আর আল্লাহ্ আনুগত্যের
মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থান,
মানুষ তাকে ভয় পায়, অথচ সে শাহান শাহ নয়।

হ্যাঁ ইমাম সাহেব সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন না, কিন্তু সম্রাট তার আস্তানায় এসে নত হয়ে সম্মান জানাতো।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) নিজের শিক্ষার জন্য ইমাম সাহেবের কাছে মদীনার প্রশাসককে একটু সুপারিশ করতে অনুরোধ জানালে তিনিও অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন ঃ "সেখানে আমার কোনো প্রভাব চলে না"। খলিফা হারুন আর-রশীদ মদীনায় এসে ইমামের 'মুয়াত্তা' শোনার আগ্রহ প্রকাশ করে সংবাদ পাঠালেন। ইমাম সাহেব বলে দিলেন, 'আগামীকাল তার জন্য রইল'।

১. তায্ঈনুল মালিক। ২. তায্কেরাতুল হুফ্ফায।
৩. তাওয়ালা আত্তাসীস ৪. তায্ঈন নাক্লান আনিল খতীব।

www.pathagar.com

হারুন আর-রশীদ অপেক্ষায় থাকলেন, ভেবেছিলেন ইমাম সাহেব দরবারে এসে শুনিয়ে যাবেন। পরের দিন সময়মতো ইমাম সাহেব তাঁর দরসের মজলিসে এসে বসলেন। সংবাদ বাহকের কাছে সম্রাট জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার সময় হলো তিনি কেন আসছেন না। সে ছুটে গিয়ে দেখলো ইমাম সাহেব তাঁর আসনে বসে আছেন। জানতে চাইলো দরবারে যাবেন কি না! ইমাম সাহেব জবাব দিলেন ঃ

العلم يزار ولا يزور –

"জ্ঞানের কাছে মানুষ আসে, মানুষের কাছে জ্ঞান যায় না"।

অগত্যা সম্রাটকেই তার অহংকার ভেঙ্গে ইমামের মজলিসে আসতে হলো। মজলিসে সাধারণ-অসাধারণের কোন পার্থক্য নির্ণীত ছিল না। সম্রাট এলে বাইরে থেকে খবর পাঠানো হলো, সাধারণ লোকজনকে বের করে দেয়া হোক। ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, "ব্যক্তি স্বার্থের জন্য সমষ্টির স্বার্থকে খুন করা যায় না"।[১] সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ্ তা'আলার সত্যিকারের কোনো বান্দার মর্যাদা আসলে এ রকমই।

দরসের মজলিস

হাদীসের আলোচনা মসজিদে নববী অথবা তাঁর নিজের দরসের মজলিস ছাড়া অন্য কোথাও করতেন না। খলিফা মাহদী এবং হারুন, দু'জনেই শাহী তাবুতে হাদীস আলোচনার প্রস্তাব করলে ইমাম তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাড়াহুড়ার মধ্যে অথবা অন্য কোন কাজের মধ্যে অথবা পথে চলতে চলতে কখনো হাদীস বর্ণনা করতেন না। কারণ তাতে হাদীসের মর্যাদাহানি করা হয়। বস্তুত হাদীস শোনা এবং বুঝে তাকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য মানসিক স্থিরতা এবং প্রশান্ত হৃদয়ের প্রয়োজন। মজলিসে জোরে জোরে কথা বলাকেও বেআদবী মনে করতেন। একবার খলিফা মনসুর ইমামের সাথে মসজিদে বসে বিতর্ক করছিল। তার কণ্ঠস্বর একটু উচ্চকিত হওয়ার সাথে সাথে ইমাম ধমক দিয়ে এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَا تَكُمه فوق صَوْتِ النبى –

নবীর কণ্ঠস্বরের ওপরে তোমার কণ্ঠস্বর উঁচু করোনা।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

ফযরের নামাযের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাযে বসে দরূদ ও তাসবীহ্তে মশগুল থাকতেন। সূর্যোদয়ের পর থেকে লোকদের আনাগোনা শুরু হতো। ইমাম সাহেব আগতদের দিকে ফিরে বসতেন। কুশল বিনিময়ের পরে বিক্ষিপ্ত কিছু কথাবার্তা চলতো। দরস শুরুর আগে বলে দিতেন বোদ্ধা ছাত্রগণ যেন সামনে এসে বসে। আলোচনা অত্যন্ত ধীর-স্থির এবং শান্তভাবে শুরু করতেন এবং সেভাবেই চলতে থাকতো। একখানি হাদীস সম্পূর্ণ হলে আর একখানি উত্থাপন করতেন।

বিভিন্ন শায়খগণের মাজলিসে দরসের ধরনও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। অধিকাংশ মাজলিসের রীতি ছিল শায়খ নিজে কোন উঁচুস্থানে বসতেন, অথবা দাঁড়িয়ে থেকে লিখিত হাদীসের কাগজ হাতে নিয়ে অথবা মৌখিকভাবে আলোচনা করতেন। ছাত্ররা দোয়াত-কলম, খাতা নিয়ে মেঝেতে

১. মানাকিব মালিক, ইবনে মাসউদ আয্যাওয়াদী।

www.pathagar.com

বসে বসে লিখতো এবং শুনতো। মাঝে মধ্যে শ্রোতার ভীড় বেশি হলে যোগ্য ছাত্রদের মধ্য থেকে বেছে বেছে দরাজ কণ্ঠের অধিকারীদের প্রতিধ্বনিকারী দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো, যেন শায়খের বলা কথা শেষ কাতারের লোকটি পর্যন্ত পৌছানো যায়। ইমাম মালিকের জলসাও এই রীতিতে চলতো। তাঁর জলসায় প্রতিধ্বনিকারীদের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন ইবনে আলীয়া।

মদীনার অধিকাংশ শায়খগণের রীতি ছিল— হাদীস, ফতোয়া এবং আনুষাঙ্গিক কথাবার্তা লিখে অথবা লিখিয়ে নিতেন তার কোনো যোগ্য ছাত্রের দ্বারা এবং লিখিত সেই বিষয় ও বক্তব্য শায়খের উপস্থিতিতে মজলিসে দাঁড়িয়ে পড়তে বলা হতো। পড়তে গিয়ে কোথাও কোন ভুল করলে শায়খ তা শুধরে দিতেন। ইমাম মালিকের মজলিসে এ রকম দু'জন ছাত্র ইবনে হাবীব এবং মো'ওন বিন ঈসা। পরবর্তীকালে উভয়ই অনেক বড় মাপের মুহাদ্দিস হয়েছিলেন। আর একজন ছাত্র ইয়াহ্ইয়া। যার বর্ণনা বুখারীতে দেয়া হয়েছে এবং একারণেই তাদের বর্ণনায় قرأت على مالك —আমরা মালিকের কাছে পড়ে শুনিয়েছি, অথবা اخبرنا مالك। —আমাদেরকে খবর দিয়েছেন মালিক, বা حدثنا مالك —মালিক আমাদের বর্ণনা করেছেন, পাওয়া যায়।

"নিজে না পড়ে ছাত্রদের দিয়ে পড়ান" একারণে ইয়াহ্ইয়া বিন সালাম অভিমান করে ইমামের মাজলিস থেকে চলে গিয়েছিলেন। অথচ এই ব্যাপারটা তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে রেওয়াজ করেছিলেন। ইয়াহ্ইয়া বিন সালাম তো যা হোক একজন সাধারণ ছাত্র, খোদ খলিফা হারুন আর-রশীদ, আমীন ও মামুনের জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করে বলেছিলেন, "আপনি পড়ুন, ওরা শুনবে"। তখন মদীনার অন্যান্য বিখ্যাত শায়খগণের নাম নিয়ে ইমাম জবাব দিয়েছিলেন, "আমাদের শহরের শায়খগণের এটাই রীতি ছিল"।[১] কি আশ্চর্যের কথা! ব্যাপারটা নিয়ে সেকালের লোকেরা এতো পীড়াপীড়ি করতো, এতো শতাব্দী ধরে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেটাই সাধারণ রেওয়াজ হয়ে চলে আসছে।

এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

মদীনার শায়খগণের এই পদ্ধতি বিশেষ কয়েকটি দিক দিয়ে উত্তম এবং কার্যকর। কোনো সমাবেশে যখন কোনো ব্যক্তি কিছু বলার জন্য দাঁড়ায় তখন সাধারণতঃ দ্বিধা-সংকোচের কারণে কিছুটা এলোমেলো হয়ে যায়। একই কথা হয়তো বার বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অনেক সময় উল্টো-পাল্টা বলতে থাকে। সেখানে যদি আগে থেকেই লেখা কোনো বিষয় শুধুমাত্র নির্ভুল পাঠের দায়িত্ব থাকে তাহলে ভুল-ভ্রান্তির কোনো বিশেষ অবকাশ থাকে না। মুহাদ্দিস নিজে না পড়ার কারণ হলো, সে তার লেখা মুসাবিদা বা পাণ্ডুলিপি অন্যের মুখের পাঠ শুনে অভিব্যক্তির দিকটা আরো বেশি কার্যকর করে শুধরে দিতে পারেন। কেননা অনেক সময় এমনও হয় যে, মুখ এবং দৃষ্টি নিজের স্মৃতির ওপর নির্ভর করে হাতে লেখা ভুলটাকেও শুদ্ধ করে পড়ে যাচ্ছে। অপরদিকে যে পড়ছে সে ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলে একই বাক্য বার বার পড়ছে! তাতে লেখকের কোনো ভুল থাকলে তা আরো ভাল করে দেখার সুযোগ বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কার্যকারীতা এর মধ্যে এই যে, অধিকাংশ ফকীহ্-মুহাদ্দিসগণ হাদীস এবং সাহাবাগণের অনুশিলন ইতিহাসের সাথে সাথে নিজের বিশ্লেষণে বুঝ এবং মতামত অথবা কোনো প্রয়োজন হলে ভাষাতাত্ত্বিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও দিয়ে যেতে থাকতেন। ইমাম যুহরীও এই রীতি অনুসরণ করতেন। কিন্তু এই রীতির একটা বড় সমস্যার দিক হলো বেশিরভাগ ছাত্র মূলপাঠ এবং অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-এর মধ্যে

১. তায়্ঈন নাক্লান, ফাযায়েলে মালিক, ইবনে ফাহার

www.pathagar.com

পার্থক্য নির্ণয় করে উঠতে পারতো না। হাদীসের মূলপাঠ TEXT এবং শায়খের বক্তব্য অধিকাংশ শ্রোতাই গুলিয়ে ফেলতো। ইমাম মালিক (রহ)-এর পদ্ধতি ছিল বেশ নিরাপদ: মূল পাঠ ছাত্ররা পড়তো এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি নিজের মুখে করতেন। ফলে শ্রোতাবৃন্দ এবং ছাত্রগণ খুব সহজেই মূল পাঠ এবং অতিরিক্ত ব্যাখ্যা আলাদা করে বুঝে নিতে সক্ষম হতো।

এমনিতে মদীনা মুনাওয়ারা দ্বীন ইসলামের লালনভূমি। তদুপরি বংশ পরম্পরায় ইল্‌মে দ্বীনের চর্চা কেন্দ্র। ইমাম মালিক (রহ)-এর পরিবার সেই শুরু থেকেই এই জ্ঞানচর্চার অন্যতম ধারক-বাহক। এহেন পরিবেশের কোলে ইমাম মালিকের মতো যুগশ্রেষ্ঠ প্রতিভা সোনালী প্রভাতের মতো এমনভাবে বিকশিত হয়েছিল যে, ইসলামী জগতের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর খ্যাতির আলো পৌঁছে গিয়েছিল এবং ইমামের দরসগাহ মধ্য গগণের সূর্যের মতো এমন এক আলোকবর্তীকা হয়ে উঠলো যা দ্বিতীয় শতাব্দীর ইসলামী সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্ত সীজান এবং পশ্চিম প্রান্ত কুরতবাহ্ পর্যন্ত মদীনাতুর রাসূলের এই জ্ঞান-সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আরব দেশের— মদীনা, মক্কা, সানাআ, আইলাহ্, সীরাক, আদন, তায়েফ, ইমামা, হিজর, হাযরামাওত, জুবেদ, ফাদার, বলকা, শামের দামেস্ক, আসফান, খিলাত, মাহ্‌দীদাহ্, বৈরুত, হামাস, তারসুস, রামাল্লা, নাসীবাইন, হামসর, বাইতুল মুকাদ্দিস, জর্ডান, সিরিয়া, আনতাকিয়া। ইরাকের বাগদাদ, বসরা, কুফা, হাররান, মসূল, জাজিরাহ্, ওয়াসেত, আনবার, রাক্কাহ্, রাহ্‌হা। আজম দেশীয়— জুরযান, কিরমান, হামাদান, রে, তালেকান, নিশাপুর, তিবিরিস্থান, তুস, মাদায়েন, কাযুইন, কোহিস্তান, সগান, আমাদ, কুরুস্তান, দীনওয়ার, সাজিস্তান— তুর্কী দেশসমূহ। হারাত, বুখারা, সমরকন্দ, খাওয়ারিজিম, মারু, সারখাস, তারমুয, বাল্‌খ, ফিসাআ। মিশরীয় দেশসমূহ— মিসর, এসকানদারীয়াহ্, ফিউম, আসওয়ান, হাতিনাস। আফ্রিকার দেশসমূহ— তিউনিসিয়া, কিরওয়ান, বারকাহ্, সারকাস্ত (ইটালী) সিসিলী। এশিয়ার— আজমীর, সমরনাথ। মোটকথা এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের ইসলামী জ্ঞান-পিপাসু মানুষের অবিরাম কাফেলা রাসূল (স)-এর মদীনার দিকে আসতে লাগলো এবং এভাবেই সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের জীবন বিধান নিয়ে প্রেরিত প্রিয় রাসূল (স)-এর ভবিষ্যত বাণী সত্যে পরিণত হলো।

عَنْ اَلبِیْ هُرَیْرَةَ عِنْدَ التِرمذِی واَبِن حبان واَلطبرانِیْ، وَعَنْ اَبِیْ مُوْسی الاشْعری عنْد الحاکم عَنْ النَبِی صَلی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلمْ یُوْشك اِنْ یَخربَ الناس اکباد الابل فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینة واللفظ للقری قال الترمذی هذا حدیث حسن-

আবু হোরায়রাহ্ বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন যে, অতিশীঘ্রই এমন যুগ আসবে যখন জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ উটের সওয়ারী হাঁকাবে কিন্তু মাদীনার আলেমের চাইতে বড় আলেম সে কোথাও কাউকে পাবে না।

ভৌগোলিক বিস্তৃতির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একবার যদি আমরা ছাত্র এবং সাধারণ জ্ঞান-পিপাসু মানুষের সংখ্যার দিকে তাকাই তাহলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না যে, একজন মাত্র মানুষ, আক্ষরিক অর্থেই তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনা করতেন কেমন করে?

১. তায্‌ঈনুল মালিক, সুয়ূতী

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের ছাত্র এবং শিষ্যগণ

এই দরসের মজলিস কি ধরনের মানুষ তৈরী করেছে ? এবং তার কল্যাণময় প্রভাব কতোদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে ? এর জবাব ইমামের ছাত্র ও শিষ্যগণের একটা তালিকা প্রস্তুত করতে পারলেই পাওয়া যাবে। মুহাদ্দিস যুহরী লিখেছেন—

وَحدث عَنْ اصم لايـكادون ليحصون -

ইমাম মালিকের কাছ থেকে কতো লোক বর্ণনা করেছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।[১] তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে তারাও অন্তর্ভূক্ত যারা অন্যান্য ওলামাগণের মজলিস থেকে শিক্ষা এবং সনদপ্রাপ্ত। এমনকি ইমাম যেসব শায়খগণের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন তাঁরাও কোন না কোনভাবে ইমামের সামগ্রিক জ্ঞানের আলো থেকে উপকৃত ছিলেন। খোদ ইমাম মালিক বলেন, "এমন খুব কম ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁদের কাছ থেকে আমি শিখেছি এবং শেষ পর্যন্ত আমার কাছে তাঁদের কিছু জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয়নি।"[২]

ছাত্রগণের বৈশিষ্ট্য

ইমাম তাঁর ছাত্র-শিষ্যগণের দিক থেকেও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যে পরিমাণ, যে মান এবং যে স্তরের ব্যক্তিবর্গ ইমামের দরসের মজলিসে যোগদান করেছিলেন অন্য কোন মুহাদ্দিস, কোন ফকীহ্‌র ভাগ্যেই তা জোটেনি।

وذالك فضل الله يوتيه من يشاءَ والله ذوفضل عظيم

আর উহা হলো আল্লাহ্‌র বিশেষ করুণা যা আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। আর আল্লাহ হলেন দয়াবান মহান।

পরিমাণের আধিক্য

সংখ্যার দিক থেকে ইমাম মালিকের ছাত্র এবং শিষ্যদের পরিমাণ এক হাজার তিনশ'র বেশি। আমরা জানি ইমাম বুখারীর ছাত্রদের সংখ্যা নব্বই হাজার। কিন্তু যদি সাধারণ এবং বৈশিষ্ট্যের আধিক্য ও স্বল্পতা মান নির্ণয়ের কোন মানদণ্ড হয়ে থাকে তাহলে এই নব্বই হাজার সাধারণ মানুষের মুকাবিলায় নির্বাচিত ঐ তেরশ' জনকে অনায়াসে দাঁড় করিয়ে দেয়া যায়। যাঁদের মধ্যে নেহায়েত ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই এই বিষয়ের বিজ্ঞানী এবং অত্যন্ত উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। কথায় বলে সুশিক্ষিত একজন যোদ্ধা সাধারণ হাজার জনের সমান।

খ্যাতি এবং পরিচিতি

ইমাম বুখারীর নব্বই হাজার ছাত্রদের মধ্যে ৫ অথবা ১০ জন ছাড়া বাদবাকী সবই প্রায় বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন। অপরদিকে ইমাম মালিকের উল্লেখিত ছাত্র সংখ্যার এক

১. তায্‌কেরাহ যুহবী, ২. তাক্‌রীব আত্‌তাহযীব

www.pathagar.com

একজন তাদের আপন আপন অবস্থানে অত্যন্ত পরিচিত এবং বিখ্যাত। আবু বকর, খতীব বোগদাদী, ইবনে বাশকাওয়াল, আন্দালুসী, কাজী আইয়াজ, শামসুদ্দীন দামেস্কী, হাফেয সুয়ূতী প্রমুখ তাঁদের প্রতিজনকে সনাক্ত করেছেন এবং সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসহ পর্যায়ক্রমে 'হিজারে মাসায়েলে' একত্রিত লিখে করে দিয়েছেন افشتان بينهما।

সাধারণভাবে অন্য সব মুহাদ্দিসীনগণের ছাত্র সমাগম এতোটা বিশাল ভৌগোলিক বিস্তৃতি নিয়ে গড়ে উঠেনি, যে রকমটা ইমাম মালিকের ক্ষেত্রে হয়েছে। এর আগের অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন দেশ-মহাদেশের প্রতিটি শহরের নাম লিখে দিয়েছি। ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর ছাত্রগণ সকল আরব এবং পারস্য দেশসমূহে ছড়িয়ে আছে কিন্তু আফ্রিকা ও স্পেনে কেউ নেই। ইমাম আওযায়ী (রহ)-এর চিন্তাধারা এবং জ্ঞানের আলো গোটা স্পেন আলোকিত করেছেন, কিন্তু পারস্য দেশসমূহ তা থেকে উপকৃত হতে পারেনি। অথচ ইমাম মালিকের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকচ্ছটা ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি কোন্‌কে উদ্ভাসিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতা

আমাদের পর্যবেক্ষণে পৃথিবীর দুই-তিনটি মহাদেশের বিশাল অঞ্চল থেকে আগত অগণিত ছাত্র সংখ্যার চাইতে ব্যক্তি ইমাম মালিকের উচ্চ মর্যাদা, সামগ্রিক পরিপূর্ণতা এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে তিনি তাঁর সমসাময়িকগণের তুলনায় অনন্য ব্যতিক্রম। যাকে স্রেফ বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ বলা যেতে পারে এবং তার পরে বলতে হয় যে, তা শুধুমাত্র মদিনাতুর রাসূল (স)-এর আলেমের জন্যই নিয়তির এই নির্ধারণ। ইমাম মালিকের শায়খগণের মধ্যে ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম যুহরী, ইমাম জাফর সাদেক, জাফর বিন মুহাম্মদ, ইমামুল হাদীস ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আনসারী তাবেয়ী, ইমামুল কেরাআত নাফে বিন আবী নঈম, মদীনার ফকীহ্ হিশাম বিন উরওয়াহ। এছাড়া ইমাম আবু হানীফা[১] (রহ), ইমাম শাফেয়ী (রহ) নাক্কেদুল হাদীস ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাতান, কুফার ইমাম সুফিয়ান সাওরী, কুফার ফকীহ্ ইমাম আওযায়ী, ইমাম মুহাম্মদ, কাজী আবু ইউসুফ, ওয়াকী বিন আল জেরাহ্, মদীনার ফকীহ্ ইবনে আবী যাহাব, আবদুল্লাহ্ বিন দীনার তাবেয়ী, ইমামের শায়খ, আহলে হাদীসের ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়া, হুজ্জাতুল হাদীস শো'বা বিন আল হাজ্জায, ইমামুসসীর মূসা বিন ওকবা (ইমামের শায়খ), নাফেদুল হাদীস আবদুর রহমান বিন মাহদী, ইমামুল হাদীস ইবনে জারিয প্রমুখ বড় বড় ইমাম এবং বিষয়সমূহের বিশেষজ্ঞগণ ইমাম মালিকের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে ঋণী অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে তার কাছে কিছু শিখেছেন এবং এর মধ্যে অনেকেই সরাসরি তার ছাত্র অথচ প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থানে সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

সবচাইতে বড় বিস্ময়কর ঘটনা হলো, ইমামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এতো বিচিত্র ধরন এবং শ্রেণীর সার্বক্ষণিক এমন এক মহাসম্মিলন জারী হয়েছিল, যা হাজার পথের লক্ষ্যস্থল কোনো মহাতীর্থ-ভূমির সাথে তুলনা করে বলা যায়— বয়স, যোগ্যতা, মান-সম্মান নির্বিশেষে এ প্রতিষ্ঠান এক মহা জ্ঞান-তীর্থে পরিণত হয়েছিল। এদের শ্রেণী বিন্যাস করলে প্রথমেই শাসক খলিফাদের দিয়ে শুরু করা যায়।

১. রাওয়াহ্ মালিক। খতীব বোগদাদী, ইবনে আসাকের, মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা ইবনে খসরু। দারে কুত্নী, কিতাকুয যাবায়েহ। বদরুদ্দীন যারাক্শী ফীন্নকাত আলী হবনুস্সলাহ। আকমালুল কামাল। শরহে যারকানী। তায্ঈনুল মামালিক, সুয়ূতী। শরহে মুয়াত্তা ইত্যাদি কিতাবসমূহে ইমাম আবু হানীফার ইমাম মালিক থেকে হাদীস শেখার কথা উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

খলিফা আবু জাফর মনসুর, খলিফা মাহদী, খলিফা মূসা, খলিফা হাদী, খলিফা হারুন আর-রশীদ, খলিফা মুহাম্মদ আমীন ও আবদুল্লাহ্ মামুন।

বিভিন্ন শহরের প্রশাসকগণ

খুরাসানের আমীর হাসান বিন মাহ্তাব শীবানি, আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান উমুরী, আফ্রিকার বারকাহ্র আমীর হাশেম বিন আবদুল্লাহ্ আল তাজ্বী।

ইমামের তাবেয়ী শায়খগণ

ইবনে শিহাব যুহরী, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আবুল আসওয়াদ, শো'বা, নাফে' আল কারী, জাফর সাদেক, হিশাম বিন উরওয়া, বারী আর রায়, আবু সুহেইল নাফে', সুফিয়ান সাওরী, হাম্মাদ, আইয়ুব, সুখতিয়ানী, মুহাম্মদ বিন মাতরাফ, আবু ইমাম, আবদুল্লাহ বিন দীনার, ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ্ (রহ) প্রমুখ।

হাদীসের ইমামগণ

মুহাম্মদ বিন আজলান, হায়াত বিন শারীহ, ছালাম আল তাইমী, ইয়াহ্ইয়া বিন বাকীর, ইয়াহ্ইয়া মাহমুদী, জায়েদ বিন আসলাম, আদহীব বিন খালেদ, ইবনে আবী যাহাব, ওয়াকী বিন জেরাহ্, ওলীদ বিন মুসলিম আদদামাশ্কী, খুরাসানের ইমাম খালেদ, মুসলিম বিন খালেদ আয জানজী, সুলাইমান আ'মাশ, যুবায়ের বিন বুকার, মাছিছাহর ইমাম ইবরাহীম, আবদুর রহমান বিন মুসলিমাহ্ তাবানী, ইবনে লাহিয়া, আবদুর রহমান বিন মাহ্দী, আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মদ আদ দারদারদী, আবু নঈম ফজল বিন ওয়াকীন, আবদুল মালিক বিন জারিজ, আবদুর রজ্জাক বিন হাম্মাম, লাইস বিন সো'ওদ, শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন মুবারক, আনতাকীয়ার মুহাদ্দিস হিসাম বিন জামিল, খুরাসানের মুহাদ্দিস কাইতাবাহ, হাফেজুল হাদীস আবু মুহাম্মদ যাহরানী, সুলাইমান বিন দাউদ তায়ালিসি, মো'ওন বিন ঈসা, আবু মুসআব যুবায়রী, আবু হুযাফা সাহ্মী (রহ) প্রমুখ।

মুজতাহিদ ইমামগণ

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম ইবনে কাসেম মালিকী (রহ) প্রমুখ।

ফকীহ্গণ

হাসান বিন জিয়াদ লু'লুই (আবু হানিফার সঙ্গী), মিশরের মুফতি আবদুল্লাহ বিন ওহাব, আবু উমর, মিশরের ফকীহ্ আশহার, আফ্রিকার ফকীহ্ আসাব বিন ফুরাত (রহ) প্রমুখ।

বিচারপতিগণ (কাজী)

মিশরের কাজী ইব্রাহীম বিন ইসহাক, কাজী আইয়ুব বিন সুইয়াদ, কাজী আসাদ বিন উমর, হামাদানের কাজী আ'মার বিন হোশাব, মাছীছার কাজী দাউদ বিন মনসুর, শারীফ বিন আবদুল্লাহ্, কিরওয়ানের (আফ্রিকা) কাজী শাযারাহ বিন ঈসা, আফ্রিকার কাজী আবদুল্লাহ্ বিন আমরুদ বিন খানম, আফ্রিকার কাজী ইয়াহ্ইয়া, আফ্রিকার কাজী ইয়াহ্ইয়া বিন বাকীর, কিরমানের কাজী ইবনে আসরাছ আল আমরী, তারসুসের কাজী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল

www.pathagar.com

কিনানী, সিসিলীর (ইটালী) কাজী আসদ বিন ফুরাত, স্পেনের তালিতালহার কাজী যিয়াদ বিন বাসিত, স্পেনের বাজাহার কাজী মুহাম্মদ বিন সাঈদ (রহ) প্রমুখ।

সূফী সাধকগণ

ইব্রাহীম বিন আদহাম, আবু নাসর বাশার বিন হারেস আয যুহ্দ, সাবেত বিন মুহাম্মদ আয্ যাহেদ আল কুফী, হাসান বিন্ হুসাইন বিন আত্ত্বীয়া আসসুফী, যু'আননূন মিশরী, ফারেহ্ বিন রাহমান যাহেদ, মুহাম্মদ বিন ফাদিল বিন আইয়ায যাহেদ (রহ) প্রমুখ।

কবি ও সাহিত্যিক

কবি আবুল আতাহিয়াহ্, কবি ওয়াবাল, কবি মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক আল কা'নাবী, আভিধানিক আবদুল মালিক আসমায়ী, বসরার ব্যাকরণবিদ ওমর বিন সোহল আল মাযানী (রহ) প্রমুখ।

ঐতিহাসিকবৃন্দ

মক্কার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন ওলীদ আল আযরাকী, নবী চরিত (স) রচয়িতা মূসা বিন উক্ববা, বহু গ্রন্থকার লেখক মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকেদী, বংশ পরম্পরা গবেষক আলী বিন মুহাম্মদ মাদাইনী (রহ) প্রমুখ।

তাফসীরকার ঃ মুক্বাতিল বিন সুলাইমান (রহ)।

দার্শনিক ঃ বাগদাদের বায়তুল হিকমাহ্র পরিচালক দার্শনিক আহমদ বিন মুহাম্মদ (রহ)।

এই সময়কাল বা আমলের পরে সকল বরেণ্য মুহাদ্দিসীনগণ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ইমাম মালিকের প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্তরের ছাত্রগণের মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদসমূহ ও শুদ্ধ সংকলনের এই সকল রচয়িতাগণ ইমাম মালিকের পরে মাত্র একটি স্তরের ব্যবধানে রয়েছেন এবং তাতেই তাঁরা নিজেদের অত্যন্ত গর্বিত এবং ভাগ্যবান মনে করেন। আত্মিক পরম্পরার এই ধারাবাহিকতা অষ্ট শতাব্দীর শিষ্যগণের মধ্যেও একইভাবে অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মহান হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন যুহরী গর্বিত ভাবে লিখেছেন ঃ "আমি ইমামের সপ্তম স্তরের ছাত্র"। সপ্তম শতাব্দীর ইমাম নূদীও এই ধারাবাহিকতার সংস্পর্শে আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছেন। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা-বিস্তৃতির ভূমিকায় নিজের দালিলিক ভিত্তি প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

قدوقع لنا اعلى من هذه الكتب وان كانت عاليتمؤطا الامام مالك بن انس وهو شيخ الشيوخ المذ كورين كلهم -

একখানি কিতাবের সনদ আমার কাছে সবচাইতে উত্তম বলে মনে হয়েছে তা বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ নয়, ইমাম মালিকের মুয়াত্তা— যিনি এই সকল মুহাদ্দিসীনের শায়খ ছিলেন।

বড়দের সাথে ছোটদের নাম একসাথে নেয়া যদি বেআদবী না হয় তাহলে বলতে পারি, পরমাণু সমান এই অধমেরও সেই জ্ঞান-সূর্যের দূরাতিদূরের কিঞ্চিত আলোচ্ছটা প্রাপ্তির সৌভাগ্য হয়েছে। (গ্রন্থকার)

www.pathagar.com

ফকীহ্ ও মুফতি হিসেবে ইমাম মালিক (রহ)

ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসের মধ্যে পার্থক্য

একজন মুফতি-ফকীহ্র দায়-দায়িত্ব একজন মুহাদ্দিসের চাইতে অনেক বেশি। মুহাদ্দিস একজন পুঁজিপতি, সঞ্চিত সম্পদের মালিক। আর ফকীহ্ সেই সম্পদ বা পুঁজিকে নিয়ে আসেন ব্যবহারিক বাজারে। সেখানে ভাল-মন্দের পার্থক্যকরণ, বিধানসমূহের শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবন, সাধারণকে বিশিষ্টকরণ, বিশিষ্টকে সার্বজনীনকরণ, বাধাহীন ও মুক্তকে রীতি-নীতির বন্ধনে আবদ্ধকরণ, বন্দীকে মুক্তকরণ, রহিতকারী ও রহিতের পার্থক্যকরণ, আদর্শ ও রীতি-নীতির বিন্যস্তকরণ, অনির্ধারিত বিধানসমূহের যুক্তিভিত্তিক জরিপ, বিধানসমূহের কারণ এবং তার কল্যাণের অনুসন্ধান, মানবীয় চাহিদা অনুযায়ী শরীয়তী আদেশ-নিষেধের ঘোষণা, রাষ্ট্রীয় শাসন-প্রশাসনের জন্য বিধানসমূহের প্রয়োগিক বিন্যাস ইত্যাদি কর্মসমূহ একজন ফকীহ্ ও মুফতির ওপরে বর্তানো সাধারণ দায়িত্ব। যা যে-কোন অর্থে একজন নিছক মুহাদ্দিসের তুলনায় অনেক অনেক উন্নত মর্যাদার অধিকারী।

নবুয়তের সময়কাল

রাসূলে কারীম (স)-এর জীবদ্দশায় মুসলমানদের সংখ্যা কমবেশী ৬০ হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে ছিল। এর মধ্যে প্রায় তিরিশ হাজার ছিল শুধু মদীনায়[১] স্থায়ীভাবে বসবাসকারী। বাকীরা বাহরাইন, ইয়ামান, মক্কা, তায়েফ এবং তার আশপাশের অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

আসহাবে সুফ্ফা

মাদীনার বাইরে অন্যান্য শহরে এবং শহরতলীর গোত্রগুলোর জন্য যেসব ফকীহ্ সাহাবাগণকে পাঠানো হতো সেই সময় তাঁদেরকে 'কেরাআ' বা আবৃত্তিকারী বলা হতো, যাদের অধিকাংশই আসহাবে সুফ্ফাহ ছিলেন। অথবা সেই শহর এবং গোত্রগুলোর দু'একজন লোককে নবীজী (স) তার সঙ্গ-সান্নিধ্যে কয়েকদিন রেখে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ এবং তা পালনের রীতি-নীতি শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতেন। মদীনার মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (স) নিজেই সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। রেসালাতের আগমনকালে মদীনার তিরিশ হাজার আসহাবের মধ্যে অন্ততঃ একশতজন সংসার ত্যাগী সাহাবী দিন-রাত মদীনার মাসজিদে নববীর ছাপড়ার তলায় রাসূল (স) থেকে পাওয়া ঐশী বিধি-বিধানের চর্চায় মগ্ন থাকতেন। রাসূল (স)-এর ওফাতের পরে ২৪/২৫ বছর পর্যন্ত ইসলামের মূল কেন্দ্র ছিল মদীনা মুনাওয়ারাহ্। সব ধরনের বিধান ও ফতোয়ার ফয়সালা এখানেই হতো। বড় বড় সাহাবাগণ এই মদীনা কেন্দ্রিক জীবন যাপন করতেন।

১. মুকাদ্দামাহ ইবনুস্ সালাহ্

www.pathagar.com

ফকীহ্ সাহাবাগণের মান ও স্তর বিন্যাস

সর্বজনমান্য এবং সর্বোচ্চ স্বীকৃত ফতোয়া ও মতামত প্রদানকারী ফকীহ্ সাহাবী ছিলেন ছয়জন। যাদের এক-একজনের মতামত, রায় ও ফতোয়াসহ ফিকাহ্ রচনা করলে তা বিশাল গ্রন্থের আকার ধারণ করতে পারে। তাঁরা হলেন উমর বিন খাত্তাব (রা), আলী ইবনে আবী তালিব (রা), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), উম্মুল মু'মেনীন আয়শা (রা), যায়েদ বিন সাবেত (রা), আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) এবং আবদুল্লাহ বিন উমর (রা)।

এঁদের পরের স্তরে যেসব ব্যক্তিত্বগণ রয়েছেন তাঁদের মতামত, রায় এবং ফতোয়া সংকলন করে অন্ততঃ এক একখানা পুস্তিকা তৈরী হতে পারে। তাঁরা হলেন সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা), আনাস বিন মালিক (রা), আবু সাঈদ খুদরী (রা), আবু হোরায়রাহ্ (রা), ওসমান বিন আফফান (রা), আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) এবং আবদুল্লাহ বিন আস (রা), আবদুল্লাহ্ যুবায়ের (রা), আবু মূসা আশআরী (রা), সো'ওদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা), সালমান ফারসী (রা), জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা), মুয়ায বিন জাবাল (রা), তালহা (রা), যুবায়ের বিন আল আওয়াম (রা), আবদুর রহমান বিন আওফ (রা), ইমরান বিন হুসাইন (রা), আবু বাক্‌রাহ (রা), উবাদাহ্ বিন সামেত (রা), মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা)।

তৃতীয় স্তরে যারা রয়েছেন তাঁদের সবার সম্মিলিত মত-অভিমত এবং রায় ও ফতোয়াসমূহ মিলিয়ে ছোটখাটো একখানা পুস্তক রচিত হতে পারে।[১] এর মধ্যে রাসূল (স)-এর সকল সাহাবাগণ অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।

মদিনার স্থানীয় সাহাবী এবং মদীনার বাইরের সাহাবী

হযরত আলী (রা) তাঁর খিলাফতকালীন সময়ের চার বছর কুফায় স্থায়ীভাবে কাটিয়েছেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রা)। 'ফেতনার' পরে হযরত আনাস (রা) এবং ইবনে মাস্‌উদ (রা) শেষ বয়সে কুফায় চলে গিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে বসরার প্রশাসক হয়েছিলেন। হযরত ইবনে যুবায়ের (রা) এই খিলাফতকালে মক্কা এবং তায়েফে ছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন উমর ও বিন আল আস তাদের শেষ সময়গুলো মিশরে কাটিয়েছেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) আগাগোড়া শামে ছিলেন। এছাড়া সেইসব মহাত্মনগণ যাঁদের নাম আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরের তালিকায় উল্লেখ করেছি। তাঁরা তাদের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মদীনাতুর রাসূলেই কাটিয়েছেন।

মদীনার তাবেয়ী ফকীহ্গণ

সাহাবাগণের সময়কাল শেষ হয়ে যাবার পর তাবেয়ীগণের যুগ শুরু হয়। তাবেয়ী মুহাদ্দিসীন ছিলেন অনেক, যাঁদের অধিকাংশের নাম ইমাম মালিকের শায়খগণের তালিকায় পূর্বেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফকীহ্ যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে খালেজাহ্ বিন যায়েদ বিন সাবিত (রহ), সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন উমর বিন খাত্তাব (রহ), কাসেম বিন আবী বকর সিদ্দিক

১. মুকাদ্দামাহ্ আলামুল মাওকিঈন, ইবনুল কাইয়্যেম।

www.pathagar.com

(রহ), উরওয়াহ বিন যুবায়ের (রহ), উবায়দুল্লাহ্ বিন উৎবাহ্ (রহ), আবু বকর বিন হারেস (রহ), সুলাইমান বিন ইয়াসার, আবু সালমাহ্ (রহ), আবু বকর বিন আবদুর রহমান (রহ), আবু বকর বিন আমরুন্দ (রহ) খলিফা উমর বিন আবদুল আজীজ (রহ) এবং সাহদ বিন আল মুসাইয়্যিব (রহ) প্রমুখ মহাত্মনগণ একই সময় মদীনায় বসবাস করতেন। যতো রকম বিচার-ফয়সালা, রায় এবং ফতোয়া এঁদের বিশেষ বিশেষ মজলিসে সমাধান হতো।[১] হযরত উমর বিন আবদুল আজীজ যখন মদীনার প্রশাসক পদে সমাসীন হলেন, তখন তিনি এই মজলিসকে আরও কার্যকর এবং সক্রিয় করার ব্যবস্থা নিলেন। উরওয়াহ বিন যুবায়ের, উবায়দুল্লাহ্ বিন উৎবাহ্, আবু বকর বিন আবদুর রহমান, আবু বকর বিন সুলাইমান, সুলাইমান বিন ইয়াসার, কাসেম বিন মুহাম্মদ, সালেম বিন আবদুল্লাহ্ (রহ) প্রমুখকে এই সভার সদস্য হিসেবে নিয়োগ করলেন।[২] সকল নীতি-নির্ধারণী বিষয়সমূহ এবং মামলা-মুকদ্দমার ফয়সালা এই সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকর হতো এবং তাঁরা মদীনার নীতি নির্ধারণ সভার সদস্য হিসেবে বরেণ্য এবং সম্মানিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ বিষয়ে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বিচার এবং শাসন-প্রশাসনিক ব্যবস্থা আদর্শ হিসেবে ধরা হতো। কেননা তার শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের নতুনভাবে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশের প্রেক্ষিতে অসংখ্য অভিনব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। হযরত উমর (রা)-এর সেসব ফয়সালা ফকীহ্-সাহাবাগণের মজলিসে এবং তাঁর দোহিত্র উমর বিন আবদুল আজীজের সভাপতিত্বে তাবেয়ীনগণের মজলিসে সুশৃংখলভাবে বিন্যাস করা হয়েছিল।

ইমাম মালিকের ফিকাহ্ ঃ হযরত উমর (রা)-এর দোহিত্র হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের সাহাবা-সংসদ ও তাবেয়ীন-সংসদে রচিত মদীনার নীতি-শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপরেই ইমাম মালিকের ফতোয়া এবং ফিকাহ্র ভিত্তি স্থাপিত। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ) তাঁর 'মুসাউয়া'র ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

> মুয়াত্তার দলিল উপস্থাপন এবং হাদীস ও সাহাবাগণের কর্মপ্রনালী গভীর অধ্যয়ন যিনি করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে একথা স্বীকার করবেন যে, ইমাম মালিকের ফিকাহ্ ও ফতোয়াসমূহের মূল বুনিয়াদ তাই ছিল এবং সেই আদর্শের উপর ভিত্তি করেই ইমাম মালিক নীতি শাস্ত্রীয় (ফতোয়ায়ে ফিকহী) যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দিতেন।

ইমাম মালিকের মর্যাদা এবং তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে মদীনার সর্বস্তরের আলেম, বিশেষজ্ঞ এবং শায়খগণের মধ্যে কোনো বিতর্ক ছিল না। এককথায় তিনি ছিলেন 'সর্বজন মান্য'। এ ব্যাপারে ইমাম মালিকের বিনয় ও সতর্কতাও কম ছিল না। যতোদিন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর স্বীকৃত সত্তুরজন আলেম বিশেষজ্ঞ তাঁর দক্ষতা-যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ ফতোয়া ঘোষণা করেননি![৩] ততোদিন তিনিও উচ্চতর এই আসনে নিজে গিয়ে বসেননি। তাঁর একটি অভ্যাসের মধ্যেই এ বিনয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। যখনই কোনো ফতোয়ার রায় ঘোষণা করতেন তখন প্রথমেই বলতেন ঃ

---

১. ফাত্হুলগীস।
২. আখবারুত্ তাআল
৩. তায্ঈমুল মামালিক, ইবনে নঈম।

www.pathagar.com

ماشاء الله لاحول ولاقوة الابالله -

আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা তা করেন, সুতরাং ক্ষমতা ও শক্তিমত্তার অধিকারী আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই।

রাষ্ট্রীয় ঘোষণা

ইমাম মালিকের যোগ্যতা ও মর্যাদার স্বীকৃতি শুধু মদীনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যে তাঁর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। হজ্বের মৌসুমে যখন গোটা ইসলামী বিশ্বকে আরাফাতের প্রান্তরে এক করে দিতো এবং ওলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনি পণ্ডিতগণ একত্রিত হতেন, মক্কা মোয়াজ্জমায় তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করা হতো ঃ ইমাম মালিক এবং ইবনে আবী যাহাব (রহ) ছাড়া আর কেউ যেন কোনো ফতোয়া না দেন।[১]

রাষ্ট্রীয় প্রভাব উপেক্ষা

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির সম্মান ও প্রতিদান স্বরূপ নিজের কিছু মতামতের সাথে আপোস করে রাষ্ট্রীয় পরামর্শ অনুযায়ী কিছু ফতোয়া দেয়া। অন্যের বেলায় এর সম্ভাবনা কিছুটা থাকলেও ইমাম মালিকের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনি তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো প্রভাবকে প্রশ্রয় দেননি। যদি কোনো লোককে জবরদস্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করা হয় এবং ভয় পেয়ে সে তালাক দিয়েও দেয়, এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ) এবং অন্যান্য কিছু ইমামগণের কাছে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে, কিন্তু ইমাম মালিক এবং হাদীস ঘনিষ্ঠ অধিকাংশ ইমামের মতে, "এ তালাক কার্যকর নয়"। খলিফা মনসুরের চাচাতো ভাই মদীনার প্রশাসক জাফর বিন সুলাইমান আব্বাসী ইমাম মালিককে এই ফতোয়া না দিতে আদেশ করেছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর এই অভিমত প্রকাশ ও প্রচার করে দেন। যার পরিণতি তাঁর মতো মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে দণ্ড হিসেবে 'বেত্রাঘাত'ও সহ্য করতে হয়েছে।

লা আদরী

স্বাধীন মতামত প্রকাশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে উপেক্ষা করার দৃষ্টান্ত আমরা দেখলাম। কিন্তু তার চাইতেও বড় শক্তি নিজের সম্মান এবং অহংকারের বিরুদ্ধে সত্যের সাক্ষ্য দেয়া। 'সত্যের সাক্ষ্য' একজন মুফতির জন্য প্রথমটা যেমন প্রয়োজন দ্বিতীয়টাও তার চাইতে বেশি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইমাম সাহেব প্রথম মুকাবিলায় যেমন জয়ী ছিলেন দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও তিনি কখনো পরাজিত হননি। যেমন ঃ ইমাম সাহেবের কাছে কোনো ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হলো এবং ইমাম সাহেব তাঁর অবগতির মধ্যে তার জবাব খুঁজে পেলেন না। তখন এতোটুকু দ্বিধা না করে সুস্পষ্টভাবে জবাব দেবেন "লা আদরী" অর্থাৎ এটা আমার জানা নেই। ইমাম সাহেবের ছাত্র ইবনে ওহাব বলেন ঃ আমি যদি ইমামের 'লা আদরী'গুলো লিখে রাখতাম তাহলে অনেক পাতা ভরে যেতো।[২]

দূর দেশের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে আপত্তি

অনেক দূরের কোন দেশ থেকে ফতোয়া জানতে আসা লোকদেরকে তিনি পরিষ্কার অপারগতা জানিয়ে দিতেন। ইবনে আবদুল্লাহ্‌র একটি বর্ণনা এরকম ঃ অনেক অনেক দূর দেশ

১. ইবনে খালকান। ২. তায্ঈনুল মামালিক, আবী নঈম।

www.pathagar.com

থেকে এক লোক এসে ইমাম সাহেবের কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে, ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, "এর জবাব ভালভাবে আমার জানা নেই"। প্রশ্নকারী বললো ঃ আমি দীর্ঘ ছয়মাসের পথ অতিক্রম করে শুধু এই মাসআলাটির রায় জানতে আপনার কাছে এসেছি। আমাকে যারা পাঠিয়েছে আমি ফিরে গিয়ে তাদেরকে কি জবাব দেবো ? ইমাম সাহেব বললেন, "বলে দিও যে, মালিক বলেছে যে, আমি জবাব দিতে পারি না"। এ ধরনেরই একটি ঘটনা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক একটি ফতোয়া জানতে চাইলে তিনি জবাব দিয়ে দিলেন যে, "আমি এটা ভাল করে বলতে পারবো না"। সে বললো ঃ আমি এতোদূর থেকে শুধু এজন্যই এসেছি। ইমাম সাহেব বললেন, নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে বলবে, "মালিক বলেছেন, আমি ভাল করে বলতে পারি না"।

ইমামের ছাত্র আবদুর রহমান বিন মাহদীর জবানীতে আবু নঈম আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক একটি ফতোয়ার জবাব জানতে এসে কয়েকদিন যাবত ইমামের মেহমানখানায় অবস্থান করছিল। একদিন সুযোগমতো সে ইমাম সাহেবের কাছে এসে বললো, আমি কাল চলে যাবো, আমার প্রশ্নটির যা জবাব হয় দয়া করে বলে দিন! কথাটা শুনে ইমাম সাহেব মাথাটা ঝুঁকিয়ে ফেললেন, কিছুক্ষণ পরে মাথা উঠিয়ে বললেন যে, আমি ঐ মাসআলাটির জবাব দিচ্ছি, তার মধ্যে কিছু ভাল যতোটুকু জানি তাহলো তোমার এই মাসআলাটি আমি ভাল করে জানি না"।

ইমাম সাহেবের এই আপত্তি-অস্বীকার মূলত চূড়ান্ত আল্লাহ্ভীতি এবং অতি সূক্ষ্ম, অথচ কঠিন একটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফতোয়াদাতার বাস্তব অবস্থা এই যে, আজ সে একটি মাসআলার উত্তরে একটি রায় দিলো, কালই দেখা যায় তার মনে সেই প্রশ্নটির এমন একটি জবাব উঠে এসেছে, তা আগের জবাবের চাইতে অনেক ভাল এবং শুদ্ধ। এমতাবস্থায় শহর এবং তার আশেপাশের অঞ্চল হলে নিজের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে খুব সহজেই জানান দেয়া যায়। কিন্তু যোগাযোগ এবং যাতায়াতের 'পায়ে-হাঁটা' যুগে দূর দূর দেশে তার নিজের করা ভুল-ভ্রান্তি শোধরাবার সহজ এবং দ্রুত কোন পথ আছে কি ? নেই।

ইমাম সাহেবের এক মিশরী বন্ধু অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, এতো দূর দূর থেকে সফরের মারাত্মক সব কষ্ট-দুঃখ সহ্য করে আসা প্রশ্নকারীদের কেমন করে আপনি এতো সহজে ফিরিয়ে দিতে পারেন ? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, মিশরী মিশর থেকে, শামী শাম থেকে, ইরাকী ইরাক থেকে আসে এবং জিজ্ঞেস করে। এমনও তো হতে পারে যে, আজ আমি তাকে যে জবাবটা দিলাম, কাল তার চাইতেও ভাল কোন জবাব আমি জানতে পারলাম। তখন আমি তাকে কোথায় খুঁজে পাবো ? হযরত লাইস মিশরী যখন ইমামের এই কথাটি শুনতে পেলেন, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন ঃ মালিক, লাইসের চাইতে অনেক শক্তিশালী এবং উন্নত আর লাইস তার চাইতে দুর্বল এবং অনুন্নত।

কোন ফতোয়ার জবাব দিতে গেলে ইমাম সাহেব সব সময় বলতেন, قال رسول الله كذ রাসূলুল্লাহ্ (স) এইভাবে বলেছেন। প্রশ্নকারী বলতো আপনার অভিমত কি ? তিনি তার জবাবে এই আয়াত পাঠ করতেন।[১]

---

১. তাযঈনূল্ মামালিক, আবু নঈম।

www.pathagar.com

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِه اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে। অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।

যখন কোন মাসআলা নিজের বিচার-বুদ্ধির রায় অনুযায়ী দিতেন তখন এই আয়াত পড়ে নিতেন—

اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ -

আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই।[১]

চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দিতেন ঃ অত্যন্ত গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করেই তিনি এক-একটি ফতোয়া এবং মাসআলার জবাব দিতেন। ইবনে আবী আওয়ীস বলছেন, ইমাম সাহেব বলেছেন, কখনো কখনো এমন সব মাসআলা সামনে আসে যাতে আমার আহার-নিদ্রা হারাম হয়ে যায়। ইবনে আবী আওয়ীস বললেন ঃ আপনার কথা তো মানুষ পাথরে লেখা বাণীর মতো জ্ঞান করে! তারপরেও আপনি কেন এতো কষ্ট সহ্য করবেন ? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, "ইবনে আবী আওয়ীস! তাহলে তো আমার আরো বেশি ভাবনা-চিন্তা করা উচিত"![২]

ন্যায়পরায়ণতা

কোন মাসআলায় ভুল হয়ে গেলে কেউ যদি তা শুধরে দিতো, সাথে সাথে তা স্বীকার করতেন এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। একজন প্রশ্ন করলো ঃ অযুর মধ্যে পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা কি জরুরী ? ইমাম জবাব দিলেন ঃ ليس ذلك على النَّاسَ —আঙ্গুল খিলাল করা মানুষের ওপর জরুরী নয়। ইমামের ছাত্র ইবনে ওহাব সেখানে বসেছিলেন, মাজলিস ভেঙ্গে গেলে সে বললো ঃ খিলাল করার একটি হাদীস আমার জানা আছে। ইমাম সাহেব তা শুনলেন এবং বললেন, এটা উত্তম হাদীস (হাদীসে হাসান) এবং তারপর থেকে সে অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।[৩] ইমাম মালিক প্রায় ষাট বছর একনাগাড়ে ফিকাহ্ এবং ফতোয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ছাত্রগণ তাঁর ফিকহী মাসায়েল এবং ফতোয়াসমূহ লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। সেই লেখা অনুযায়ী প্রথম কিতাব আফ্রিকার কাজী আসাদ বিন আল ফুরাতের "আশদিয়াহ" এবং সবচাইতে বড় সংকলন ইবনে কাসেমের (ওফাত ১৯১ হিজ) "আল মুদাওয়ানাহ্"— যা ইমাম বেঁচে থাকতেই সংকলিত হচ্ছিলো। মুদাওয়ানাহ্ এখন মিশরে প্রকাশিত। তৃতীয় কিতাব ইবনে ওহাব মিছরীর (ওফাত ১৯০ হিঃ) "কিতাব আল মাজলিসাত আন মালিক"। এসব কিতাবের মধ্যে ইমামের হাজার হাজার ফতোয়া সংকলিত আছে। মুদাওয়ানাহ্র রচয়িতা ইবনে কাসেমের ব্যাপারে একটা প্রবাদের মতো কথা প্রচলিত আছে যে, তার স্মৃতির ভাণ্ডারে ইমামের দেয়া ৪০ হাজার মাসায়েল সংরক্ষিত ছিল অর্থাৎ মুখস্ত ছিল।

১. মনাকিবে মালিক, সাঈদ বিন সুলাইমান।
২. আয্ যাওয়াদী, রহমান বিন আবদুল আযীয আল-আমরী
৩. আয্ যাওয়াদী, ইবনে শুহাব

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের কৃতিত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি

পৃথিবীতে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞের স্বীকৃতি, যদি মর্যাদার কোন মাপকাঠি হয়ে থাকে তাহলে বলা যেতে পারে যে, সেই মানদণ্ডে ইমাম মালিকের অবস্থান অনেক উচ্চে। ইমাম মালিক একজন দার্শনিক এবং দার্শনিক মতামতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য। মুহাদ্দিসীনগণ দার্শনিক মতামতের খুব একটা স্বীকৃতি দেন না। কিন্তু ইমাম মালিক দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে সেই অবস্থানেই রয়েছেন যা তাদের বিষয়ের অনুসরণীয়-অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের অবস্থান। হাদীস ও জীবন চরিত সমীক্ষক বিশেষজ্ঞ ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেন, "মালিক হাদীস শাস্ত্রে আমীরুল মুমিনীন"। বরেণ্য মুহাদ্দিস সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ বলেন, "মালিকের সামনে আমরা কিছুই না! আমরা তো শুধু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি। ইমাম মালিক যদি কোন শায়খের কাছ থেকে বর্ণনা করেন আমরাও তার কাছ থেকেই করি আর তা না হলে ছেড়ে দেই"।

আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, এই ধরণীর বুকে মালিকের চাইতে বড় হাদীসে রাসূল (স)-এর আমানতদার আর কেউ নেই। ইমাম শাফেয়ী বলতেন, "হাদীসের প্রসঙ্গ এলে তো 'মালিক' সেখানে নক্ষত্র"। মুহাদ্দিস ইবনে নুহীক বলেছেন, "শুদ্ধ হাদীসের ক্ষেত্রে আমি মালিকের ওপরে কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না"। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালকে কেউ একজন প্রশ্ন করলো, "যদি কেউ কোন হাদীস মুখস্ত করে রাখতে চায় তাহলে কার কাছ থেকে নিয়ে করা উচিত ? জবাব দিলেন, মালিক বিন আনাস থেকে। মুহাদ্দিস ইবনে মাহদীর কাছে এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, "আমি শুনেছি যে, আপনি ইমাম আবু হানিফার চাইতেও ইমাম মালিককে বড় ফকীহ্ মনে করেন ? তিনি বললেন, আমি তো এটা বলিনি! আমি বলেছি, মালিক আবু হানিফার উস্তাদ (হামাদ)-এর চাইতে বড় ফকীহ্। সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ ইমাম মালিকের মজলিসে বসে ইমামের আলোচনা শুনতেন এবং ফিরে গিয়ে নিজের দরসগাহে দরস দিতেন। সুফিয়ান সাওরী হজ্ব পালনে ইমামের অনুসরণ করতেন। ইবনে মুঈন বলেন, যুহরীর ছাত্রদের মধ্যে মালিকের মতো কেউ প্রতিষ্ঠিত নয়। ইবনে মুঈনের আর একটি মন্তব্য ঃ সৃষ্টি জগতে মালিক আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ নিদর্শন। ইমামে হাদীস ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাতান বলেন, "মালিক এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ ছিলেন। ইবনে আবী হাযেম হাদীস সমীক্ষক দরআওয়ারদীকে প্রশ্ন করলেন, "এই কা'বা ঘরের মালিকের কসম" এ পৃথিবী মালিকের চাইতে বড় আলেম দেখেছে কি ? জবাব দিলো, "আল্লাহ্‌র কসম না দেখেনি"।

www.pathagar.com

কাজ-কর্ম, ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব

শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাজলিস থেকে উঠে এসে আমরা এবার শাহী দরবারে চলে যাবো। ইমাম মালিক ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। দামেস্কের খলিফার মসনদে তখন অলীদ সমাসীন। কিন্তু ২৫ বছর পরে ১১৭ হিজরীতে শিক্ষা জীবন শেষ করার পর আলেম হিসেবে চারিদিকে যখন ইমামের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন দামেস্কে উমাইয়া শাসনের দব্‌দবে সূর্যটা অস্তাচলের পথে নিজের তাপ আলো গুটিয়ে নিয়ে পরাজয় ও গ্লানির কালচে লালিমা মাখানো মুখটা নিয়ে টুপুস করে ডুবে যাবার অপেক্ষায় আকাশের শেষ প্রান্তে ঝুলছিল। সেটা হিশাম বিন আবদুল মালিকের শেষ সময়। ১২৫ হিজরীতে তার দেহ ত্যাগ করার পর থেকে মাত্র আট বছর সময়কালের মধ্যে অলীদ বিন অলীদ, ইব্রাহীম বিন অলীদ এবং মারওয়ান বিন মুহাম্মদ, বিন মারওয়ান এই চারজন দুর্ভাগা বাদশাহ্‌র শাসন আমল সেই জ্বলন্ত সূর্যটার মতো নিজেদের মলিন অস্তিত্বটা দেখাতে না দেখাতে চিরদিনের জন্য ডুবে গেলো।

এরপর ইসলামী খেলাফতের নামে আর এক কলঙ্কিত রাজতান্ত্রিক শাসনের সূর্যোদয় ঘটলো ১৩৩ হিজরীতে। শুরু হালো ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়।

আব্বাসী খিলাফত

তথাকথিত খিলাফতের নামে বংশীয় শাসনের এ পর্যায়ের প্রথম মুকুটধারী বাদশাহ হয়ে এলেন আবুল আব্বাস সাফাহ্। এর শাসনকালের মেয়াদ মাত্র সাড়ে চারটি বছর। যা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অনুগত লোকজন বসানো এবং বিদ্রোহ দমনের অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেই কেটে গেছে। তার শাসনের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৩৬ হিজরীতে তার ভাই আবু জাফর মনসুর হজ্ব প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে হিজাযে গিয়েছিল এবং এই পূণ্যময় সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথেই সে খিলাফতের উত্তরাধিকারী হবার সুসংবাদ পেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৩৮ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ আবু মুসলিম খুরাসানী নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত সে খলিফা হতে পারেনি। ১৩৯ হিজরীতে বাগদাদের পুনঃনির্মাণ শুরু হয় এবং বাগদাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সাথে সাথে আব্বাসী শাসনের বুনিয়াদও সে এক শক্ত মাটির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও ১৪০ হিজরীর হজ্বের সময় হজ্ব ও জিয়ারতের জন্য মক্কা মুয়াজ্জমা ও মাদীনা মুনাওয়ারায় এসে পৌছায়।[১]

'আব্বাসী বংশের খিলাফত' যা এখন ক্ষমতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। মাত্র কয়েকটি বছর আগে শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত কুরায়েশের একটি পরিবার ছিল। যে কারণে মনসুর শিক্ষা-দীক্ষা, উস্তাদগণের সঙ্গ-সাহচর্য, জ্ঞান চর্চার মজলিসসমূহে এমনভাবে একাকার ছিল যেভাবে কুরায়েশী অন্যান্য পরিবারের প্রতিভাবান ছেলেরা তাদের অধ্যয়ন নিয়ে মশগুল থাকতো। ক্ষমতার এই

১. ইমাম মালিক ও খলীফা মনসূরের ব্যাপারে ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহ অসংখ্য ঘটনা এবং কথা-বার্তার উল্লেখ রয়েছে, আমরা সেইসব গ্রন্থ থেকে অত্যন্ত সংক্ষেপে অল্প কিছু উল্লেখ করেছি।

www.pathagar.com

পট-পরিবর্তনের আগে মনসুর মদীনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্র এবং ইমাম মালিকের তত্ত্বাবধানে কোন একটি শ্রেণীর বিশেষ সদস্য ছিল।

খিলাফতে আসীন হওয়ার পর মনসুর এই প্রথম হজ্বে এলেন। শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এলেন। সুফিয়ান সাওরী, সুলায়মান এবং ইমাম মালিক (রহ) প্রমুখ আসতে আসতে বলাবলি করছিলেন— এই সেদিন পর্যন্ত তো সে আমাদের হাদীসের সহপাঠী ছিল, দেখা যাক এখন এ অবস্থায় তার পরিবর্তন কতোটা হয়েছে! দরবারে হিজাযের সকল আলেম, ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ উপস্থিত। খলিফা মনসুর ইমাম মালিককে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন— আবু আবদুল্লাহ্ (ইমামের ডাক নাম)! আমি নীতি শাস্ত্রীয় (ফিকহী) বিতর্ক দেখে ভয় পেয়ে গেছি, ইরাকে তো কিছুই নেই, শামে শুধু জিহাদের চর্চা, জ্ঞান চর্চার বড় কোন উৎস সেখানে নেই। যা কিছু আছে তা এই হিজাযেই আছে এবং হিজাযের জ্ঞানীকূল শিরোমণি আপনি। আমার বর্তমান অবস্থানের প্রেক্ষিতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি আপনার রচিত 'মুয়াত্তা' কা'বার চত্বরে প্রতিষ্ঠিত করে দেই যেন মানুষ এখানে এসে একমুখী হয় এবং এর অনুলিপি তৈরী করে সাম্রাজ্যের সব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পাঠিয়ে দেই, যাতে যে কেউ কোন ফতোয়া দিতে গেলে তা এই কিতাব অনুযায়ী দেয়।

এই ঘটনাটি কোনো কোনো বর্ণনায় এভাবেও আছে যে, মনসুর এমন একখানি কিতাব রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো যা ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে মাস্উদ (রা) ও ইবনে উমর (রা)-এর আদর্শ অনুসরণ করে নতুনভাবে তৈরী করা হবে। এর পরে ইমাম মালিক মুয়াত্তা রচনায় উদ্যোগী হন।

ইমামের অস্বীকার

দরবারী আলেমদের জন্য এর চাইতে উত্তম প্রস্তাব আর কি হতে পারে ? কিন্তু খোদ খলিফার এতোবড় লোভনীয় প্রস্তাবও ইমামের পদস্খলন ঘটাতে পারেনি। তিনি বললেন, রাসূল (স)-এর সাহাবাগণ ইসলামী দেশসমূহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের ফতোয়া এবং বিধানসমূহ স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী স্থানীয় আলেম ও ফকীহ্গণ ধারাবাহিক পরম্পরায় চর্চা করে যাচ্ছেন। নিজ নিজ পরিবেশে সেই সবই সাধারণ্যের কাছে গ্রহণযোগ্য। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি— যে ভুল এবং শুদ্ধ দু'টোই করতে পারে— তার একার বিচার-বিবেচনার ওপর গোটা সাম্রাজ্যের মানুষকে বাধ্য করা কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। মনসুর বললেন, "আপনি যদি আমার সাথে একমত হতেন তাহলে আমি এটাই করতাম"।[১]

অন্য এক অবকাশে মনসুর ইমাম মালিককে প্রশ্ন করলেন। হে আবু আবদুল্লাহ্, আপনার চাইতে বড় কোন আলেম আছে কি ? ইমাম বললেন, হ্যাঁ আছে। সে জিজ্ঞেস করলো, সে কে ? বললেন, "তার নাম আমার মনে নেই"! মনসুর বললেন ঃ আমি বনী উমাইয়ার যুগে লেখাপড়া করেছি, আমি সবাইকে জানি।

ইমাম মালিকের যোগ্যতা এবং আলেম হিসেবে তাঁর মান ও মর্যাদার স্বীকারোক্তি শুধু যে কেবল ইমামের সম্মুখেই মনসুর করতেন তা নয়, বরং তাঁর পেছনে আরো বেশি করতেন। সুফিয়ান সাওরী ও সুলাইমান একবার মনসুরের সাথে দেখা করতে গেলেন। রাজকীয় তাঁবুর

১. তায্কেরাতুল হুফ্ফায, ইমাম যুহবী। কিতাবুল ইমামাহ্, ইবনে কুতইবাহ্, মানাকিবে মালিক আয্ যাওয়াদী।

www.pathagar.com

ভেতর থেকে মনসুর স্বাদরে আহ্বান জানালেন। সুফিয়ান ভেতরে উঁকি দিয়ে বলে উঠলেন, এই মূল্যবান কার্পেট না তুললে আমি তো আসতে পারবো না! মনসুরের নির্দেশে কার্পেট তুলে ফেলা হলে হযরত সুফিয়ান (রহ), مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى —"এই মাটি দিয়েই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এবং এর মধ্যেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং এখান থেকেই একদিন তোমাদেরকে তোলা হবে— এই আয়াত পড়তে পড়তে মাটির ওপরে গিয়ে বসে পড়লেন। মনসুর আবেগপ্রবণ হয়ে গেলে সুফিয়ান সাওরী অত্যন্ত কঠিন ভাষায় অনেক নসীহত করলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নিজেই উঠে চলে গেলেন। দরবারী আবু উবায়দাহ্ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো— "আমীরুল মুমিনীন! এই রকম বেআদব লোককে হত্যা করার আদেশ কেন দেন না ? খামোশ, মনসুর গরজে উঠলেন! "সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম মালিক বিন আনাস এই দু'জনের সাথে বেআদবী করা যায় না"।

ইতিহাসের পাতায় লেখা এই ঘটনা হয়তো সবারই জানা আছে যে, হযরত আলী (রা)-এর পরে হাশেমীদের বিপরীতে বনু উমাইয়ারা যখন সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন করলো তখন বনু হাশেম, যার মধ্যে বনু আব্বাস, বনু ফাতেমা এবং সাধারণভাবে হযরত আলীর বশংধরগণ সবাই মিলে হাশেমী খিলাফত প্রতিষ্ঠার গোপন তৎপরতায় লিপ্ত হলো। প্রথম প্রথম এই তৎপরতার কেন্দ্র ছিল ফাতেমী ও আলীর বংশীয় ইমামতের মারকাজগুলো। ইমাম হুসাইন (রা)-এর পরে হযরত আলীর অন্য স্ত্রীদের সন্তান যেমন মুহাম্মদ বিন হানিফা (রহ) ইমাম হলেন, এর পরে আবু হিশাম আবদুল্লাহ উলুই। আবু হিশাম শামে ইন্তেকাল করেন। সেখানে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রহ) ছাড়া আর কোন হাশেমী উপস্থিত ছিল না। যে কারণে আবু হিশাম তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মুহাম্মদ আব্বাসীকে অসীয়ত করে যান। এটাই সেই দিন, যেদিন খিলাফতের শাসনদণ্ড আলী (রা)-এর বংশধর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আব্বাসী বংশের হাতে চলে আসে।

মুহাম্মদ বিন আলী আব্বাসী ১২৪ হিজরীতে মারা যান। তাঁর ছেলে ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ আব্বাসী ইমাম হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। উমাইয়া বংশের মারওয়ানের হাতে ইব্রাহীম বন্দী হয়ে ইন্তেকাল করেন অথবা তাকে হত্যা করা হয়। আব্বাসী উপদল (শিয়া) সেই শোকে প্রত্যেকে কালো পোশাক পরিধান করে। সেই সময় থেকে কালো রং আব্বাসীয়দের একটা বিশেষ চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইব্রাহীমের পরে আবুল আব্বাস সাফাহ্ বনু হাশেমের ত্রাণকর্তা হয়ে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত ১৩২ হিজরীতে সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফল বেরিয়ে আসে। সাফাহ্ এই কৃতকার্যতার সুফল বনু হাশিমের বিশাল বংশ ধারার মধ্যে শুধুমাত্র বনু আব্বাসের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়।

খিলাফতের দণ্ড হাতে নিয়েই নতুন বাদশাহ্ উমাইয়াদের প্রতিশোধ নিতে মৃত উমাইয়াদের কবর খুঁড়ে হাঁড়গোড় তুলে জ্বালিয়ে ফেলার আদেশ জারী করে দিলো এবং উমাইয়া ও মারওয়ানী, যাকে যেখানে যেভাবে পাওয়া যায়, খুঁজে বের করে হত্যা করার আদেশ দিলো। খুরাসানের হিংস্র সৈন্যবাহিনী প্রদেশগুলোর আনুগত্য আদায়ে এবং বিদ্রোহ দমন করে নতুন শাসন প্রতিষ্ঠায় হত্যা, নির্যাতন যা কিছু প্রয়োজন তা করে যাচ্ছিলো। অপরদিকে কেবলমাত্র আব্বাসী পরিবারে খিলাফত কুক্ষিগত করার কারণে ফাতেমী ও উলুয়ীরা প্রচণ্ডভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। পরিণতি এই হলো যে, ভাগ্য নিয়ন্তাদের কাছে দেশের মানুষের যে কল্যাণ এবং

www.pathagar.com

ন্যায়বিচারের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। তবে সাফাহ্‌র শাসনামলে কার্যত কোন অসন্তোষ প্রকাশ পায়নি, কিন্তু মনসুর অতি সাবধানতা এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ফাতেমী ও উলুয়ী কোরেশদের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন শুরু করে দিলো। শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে ১৩৫ হিজরীতে নবী বংশধর নফ্‌সে জাকিয়া মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন। অধিকাংশ লোকেরা তার পক্ষ অবলম্বন করলো। কিন্তু ভাগ্য তার স্বপক্ষে ছিল না, তাই সরকারী সৈন্যদের সাথে বীরের মতো লড়াই করতে করতে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শহীদ হন। এর পরে তার ভাই ইব্রাহীম, এতোটা ব্যাপক আয়োজন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন যে, মনসুর তা দেখে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু এখানেও ভাগ্য তাদের পক্ষে প্রসন্ন রায় দেয়নি তাই ইব্রাহীমও সুদীর্ঘ চার মাস লড়াই করে অবশেষে পরাজয় বরণ করে এবং নিহত হন। তার ইন্তেকালের সাথে সাথে বিদ্রোহের আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভে যায়। মনসুর তার চাচাতো ভাই জাফরকে মদীনার প্রশাসক নিয়োগ করে।

ইমাম মালিক মনসুরের হাজার তোষামোদীর পরেও বিদ্রোহের প্রতিটি চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিয়ে গেছেন। খিলাফতের প্রশ্নে প্রকাশ্যে ফতোয়া দিয়েছিলেন— "নফসে জাকিয়া খিলাফতের সত্যিকারের হকদার"। লোকেরা প্রশ্ন করেছিল, আমরা তো মনসুরের বাইয়াতে 'হলফ' করেছি। ইমাম জবাব দিয়েছিলেন[১]— মনসুর জবরদস্তি বাইয়াত নিয়েছে এবং যে কাজ জবরদস্তি করানো হয় শরীয়তে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। হাদীস রয়েছে যে, জোর করে কাউকে দিয়ে যদি তালাক দেওয়ানো হয় তাহলে সে তালাক কার্যকর হবে না।

জাফর মদীনায় এসেই নতুন করে জনগণ থেকে 'বাইয়াত' গ্রহণ করে এবং ইমাম মালিকের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, ভবিষ্যতে তিনি যেন জবরদস্তি তালাকের অশুদ্ধতার রায় না দেন, তাতে লোকেরা বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয়-বাইয়াতের বিরুদ্ধে সনদ পেয়ে যাবে। ইমামকে সত্য-বিচ্যুত করার কি দুঃসাহসিক প্রস্তাব! ইমাম সাহেব যথারীতি সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে জবরদস্তিমূলক যাবতীয় কাজের অশুদ্ধতার ফতোয়া দিতেই থাকলেন। রাগে অন্ধ হয়ে সুলাইমান ইমামকে সত্তুর ঘা বেত মারার আদেশ জারী করে বসে। দারুল হিজরতের ইমামকে সাধারণ অপরাধীর মতো দরবারে আনা হলো। দণ্ড কার্যকর করার জন্য দেহের কাপড় খুলে ফেলা হলো এবং মানবীয় ইমামতের মূর্ত প্রতীকের ওপর বিষাক্ত বেতের সত্তুরটি আঘাত পূর্ণ করা হলো। সমস্ত পৃষ্ঠদেশ রক্তাক্ত। মাথার ওপরে বাঁধা হাত দুটো খুলে দেয়া হলো। জালিমের অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাচ্ছিলো না তাই সেই আঘাতে জর্জরিত রক্তাক্ত দেহটি উঁটে চড়িয়ে জালিম শাহীর বিরুদ্ধে কথা বলার পুরস্কার হিসেবে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করে দেখাবার আদেশ হলো। শহরের অলিতে-গলিতে সম্মানিত ইমামের লাঞ্ছিত দেহটি নিয়ে ধীরলয়ে উট চলছে আর সত্যের সাক্ষ্যদাতার কণ্ঠচিরে বেরিয়ে আসছিল— "যে আমাকে জানে সে তো জানেই আর যে জানে না সে জেনে নিক আমি মালিক বিন আনাছ আগের মতোই ফতোয়া দিচ্ছি, "জোর করে তালাক আদায় করা শুদ্ধ নয় শুদ্ধ নয়"।[২]

সেই রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মাসজিদে নববীতে এলেন ইমাম এবং পিঠের রক্ত সাফ করে দুই রাকা'আত নামায আদায় করলেন। নামাযান্তে উৎসুক জনতার দিকে ফিরে বললেন ঃ সাঈদ

১. কিতাবুল ইমামাহ্‌, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬। ইবনে খালদুন, ৩য় খন্ড ১৯ পৃষ্ঠা
২. তব্‌কাত ইবনে সোওদ, মানাকিবে মালিক লিয্‌যাওয়াদী।

www.pathagar.com

বিন মুসাইয়্যিবকে যখন বেত্রাঘাত করা হয়েছিল তখন তিনিও এই মাসজিদে নববীতে এসে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের দরবারে সত্যের সাক্ষ্য দানের পার্থিব পুরস্কার পাওয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে নামায আদায় করেছিলেন।[১] সম্মানিত ইমামকে অপমানিত করার স্বৈরাচারী কার্যক্রম অপমানের সমস্ত কালিমা নিজের মুখে লেপন করে ইমামের মর্যাদাকে এতোটা উচ্চে উঠিয়ে দিলো যা ওদের ভাবনারও অতীত ছিল। ঘটনাটি ১৪৭ হিজরী সালের।[২]

মনসুরের অজ্ঞতা ও অনুশোচনা

ইবনে কুতাইবাহ্‌র (মৃত্যু ২৭৬ হিজঃ) বর্ণনানুযায়ী (কিতাবুল আয়েম্মাহ্‌) খলিফা মনসুরের মদীনার প্রশাসক জাফরের এই কুকীর্তির কথা জানতে পেরে ভয়ঙ্করভাবে রেগে গিয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে আদেশ দিলো— জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে লাঞ্ছনার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে গাধার পিঠে চড়িয়ে মদীনা থেকে বাগদাদে নিয়ে আসা হোক এবং ইমামের কাছে স্বহস্তে চিঠি লিখে নিজের অজ্ঞতার কথা জানিয়ে ক্ষমা চাইলো।

পরের বছর ইরাক এবং হিজাযের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত হলে মনসুর হজ্ব করতে এলো। ইমাম মালিক তার সাথে দেখা করতে এলেন। কোন কোন বর্ণনা মতে ইমামকে বাগদাদে স্বসম্মানে তলব করা হয়েছিল। সে যাই হোক, মনসুর অত্যন্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানালো এবং বিনীতভাবে নিজের অজ্ঞতার কথা জানিয়ে বললো, এ দণ্ডের আদেশ আমার নয় আর না আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি। ইমাম সাহেব বললেন, হ্যাঁ, হয়তো আপনি তা জানেন না। এরপরে মনসুর বলতে শুরু করলো, হে আবু আবদুল্লাহ্‌! যতোদিন আপনি বেঁচে আছেন, হারামাইনবাসীর আপনিই আশ্রয়স্থল, আপনিই তাদের অভিভাবক। যেসব বিপদের সম্মুখীন তাদের হওয়া উচিত ছিল শুধুমাত্র আপনার অবস্থানই তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করে যাচ্ছে। যতোদূর আমি জানি, এই দুই শহরের লোকেরাই ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ, অথচ তাদের সেই শক্তি-সামর্থ্যও নেই যে, তারা বীরত্বের সাথে কোন কিছুর মুকাবিলা করবে। আমি আল্লাহ্‌র দুশমনকে (জাফর) পদচ্যুত করেছি এবং আদেশ করেছি, নিকৃষ্টতম অপমানে লাঞ্ছিত করে গাধার পিঠে চড়িয়ে বাগদাদে পাঠিয়ে দিতে।

ইমাম সাহেব বললেন, এই প্রতিশোধের প্রয়োজন নেই আমীরুল মুমিনীন এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর ভালবাসার প্রতি আমার ক্ষোভকে উৎসর্গ করে তাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।[৩]

মনসুর সম্মানসূচক পোশাক 'খিলাত' পেশ করার আদেশ দিলো। দরবারের প্রথা অনুযায়ী খাদেম তা এনে সম্মানিতের কাঁধে ঝুলিয়ে দেবে। যথারীতি খাদেম তা করতে গেলে ইমাম সাহেব দু'পা পিছিয়ে নীরবে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। বাদশাহ্‌ মনসুরের বুঝতে দেরী হলো না। মুহূর্তে নিজের অভিব্যক্তি পরিবর্তন করে খাদেমকে ধমক দিয়ে বললো ঃ আবু আবদুল্লাহ্‌র এই উপহার তাঁর অবস্থানস্থলে পৌছে দাও।

দরবারের এই নাটকীয় দৃশ্যের অবকাশে আমরা মনসুরের বলা কথাগুলোকে আর একবার একটু দেখে নেই। তা হলেই বুঝতে পারবো যে, ইমামকে দেয়া দণ্ডাদেশ কোন্‌ সব কারণের

১. তায্‌ঈনুল মামালিক, আবী ওহার
২. কিতাবুল আনসাব আস্‌সাম্‌ আলী
৩. কিতাবুল উম্মাহ্‌, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯০-২৯৭

পরিণতি। দুই 'হারাম' অঞ্চলের বসবাসকারীরা বিদ্রোহী মানসিকতার লোক। আপনি তাদের নেতা এবং ইমাম। আপনার অনুমতি-ইশারা ছাড়া ওখানে কিছুই হতে পারে না। মনসুরের সুচতুর কৌতুকপূর্ণ নিপীড়ন দেখে অবাক হতে হয় যে, ইমাম নবী বংশের অভিভাবক তা জানা থাকা সত্ত্বেও মদীনায় বিদ্রোহের অপরাধে বন্দী সৈয়দদের কাছে খোদ ইমামকে খলিফার পক্ষ থেকে দূত হিসেবে পাঠাবার প্রস্তাব করে বসে।[২]

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মনসুর জানতে পারলো যে, সারা দেশের জ্ঞানী-গুণী, আলেম-মুহাদ্দিসগণ তার শাসনে সন্তুষ্ট নয়। তাই হঠাৎ একদিন রাতের বেলা ইবনে আবী যাহাব ও ইবনে ছামআনসহ হিজাযের বড় বড় ফকীহ্ এবং ইমাম মালিক (রহ)-কে দরবারে তলব করলো। রাতের অন্ধকারে অস্বাভাবিক এই দরবারী তলব, ইমাম সাহেব মৃত্যুর পরোয়ানা হিসেবেই গ্রহণ করলেন। প্রশান্ত মনে গোসল করে, কাফন পরে, মৃতের জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধী লাগিয়ে দরবারে এলেন।

মনসুর বললো ঃ হে ফকীহ্‌বৃন্দ! আমি কিছু কথা জানতে পেরেছি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। অথচ আপনাদের উচিত ছিল সর্বপ্রথম আমার আনুগত্য করা এবং আমাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা। আমাতে যদি এমন কোন দোষ থেকে থাকে তা তো সবার আগে আমার জানা উচিত। ভাল-মন্দ যা বলার আমাকে বলতেন!

ইমাম সাহেব মুখ খুললেন, বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَافَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ -

হে বিশ্বাসী লোকেরা ! কোন ফাসিক যদি তোমাদের কোন খবর দেয় তাহলে তা খুব ভাল করে অনুসন্ধান করে বুঝে নিও। এমন না হয় যে, তোমাদের অপরিণামদর্শিতার জন্য কোন নিরাপরাধ শাস্তি পায় এবং তোমরা তার পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হও।

মনসুর এবার বললো ঃ তাহলে বলুন আপনাদের চোখে আমি কি রকম ? ইমাম সাহেব আর্তনাদ করে উঠলেন, "আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে একথার জবাব থেকে ক্ষমা করুন। মনসুর ইবনে ছামআনের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি বলুন, আমি কি রকম ? ইবনে ছামআন গড় গড় করে বলা শুরু করলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি, হজ্জ্ব করছেন, জিহাদ করছেন, নির্যাতিতকে সাহায্য করছেন, সুবিচারক, ন্যায়পরায়ণ। আপনি ইসলামের বড় পৃষ্ঠপোষক।

এবারে মনসুর আবী যাহাবের দিকে তাকালো। বললো, ইবনে আবু যাহাব আপনি আমাকে কি রকম মনে করেন। ইবনে আবু যাহাব নির্ভীক কণ্ঠে বলে উঠলেন, তুমি পৃথিবীর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি, মুসলমানদের সকল সম্পদ তুমি তোমার ভোগ-বিলাসে ব্যয় করো। নিঃস্বকে ধ্বংস করে দিচ্ছ আর ধনীকে অস্থির করে তুলেছ। বলো, কাল তুমি আল্লাহ্‌র সামনে কি জবাব নিয়ে দাঁড়াবে ? মনসুর বললো, তুমি কি দেখোনি তোমার সামনে এগুলো কি ? ইবনে আবী যাহাব বললেন ঃ হ্যাঁ, তাতো দেখতেই পাচ্ছি, জালিমের নাঙ্গা তরবারী, কিন্তু তুমিও জেনেনাও আজকের মৃত্যু কালকের মৃত্যুর চাইতে উত্তম!

২. মিতাবুল ইব্‌র, ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৯

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরে ইবনে ছামআন ও ইবনে আবী যাহাব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু ইমাম সাহেব নড়লেন না। মনসুর বললো ঃ আপনার কাপড় থেকে মৃতকে দেয়া সুগন্ধীর ঘ্রাণ পাচ্ছি। ইমাম সাহেব বললেন ঃ অসময়ের অস্বাভাবিক তলবে আমি মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলাম। মনসুর বললো ঃ সুবহানাল্লাহ্, আবু আবদুল্লাহ্! আমি কি আমার নিজের হাতে ইসলামের স্তম্ভগুলো ফেলে দেবো ?[১]

মুহাম্মদ আল মাহদী

এই সফরেই হজ্বের আগে ৬ যিলহজ্ব ১৫৭ হিজরীতে মনসুর পরলোক গমন করে এবং মুহাম্মদ আল মাহদী তার স্থলাভিষিক্ত হয়। দুই বছর পরে ১৬০ হিজরীতে মাহদী খিলাফতের উত্তরাধিকারী দুই শাহজাদা মূসা ও হারুনকে নিয়ে হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে হিজাযে আসে। হজ্ব সমাপনান্তে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছালে শহরের গণ্যমান্যগণ নতুন খলিফাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন। ইমাম মালিকও সেখানে উপস্থিত। মাহদী ইমামকে দেখেই সালাম করে বুকে জড়িয়ে ধরলো। এ বছর হজ্বের মৌসুমে দুর্ভিক্ষ চলছিল। ইমাম বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি এখন যে শহরে প্রবেশ করছেন সেখানে মুহাজেরীন ও আনসারগণের বংশধররা বসবাস করে। তারা নবীর রওযার প্রতিবেশী। মাহদী ইমামের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলো। ২৫ লাখ দেরহাম ইমাম সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বিতরণ করে দিতে অনুরোধ জানালো। ইমাম সাহেব তাঁর বিচক্ষণ ছাত্রদের হাতে দিয়ে বললেন, প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন করে দাও।[২]

তিন হাজার দীনার দিয়ে নিজের বিশেষ দূত রাবী'কে পাঠিয়ে নতুন খলিফা তার ইচ্ছা জানালো যে, তিনি যেন দয়া করে বাগদাদের পথে খলিফার সহযাত্রী হন। ইমাম সাহেব সরাসরি অস্বীকার করে বললেন, টাকার থলি ঐভাবেই পড়ে আছে, ইচ্ছা হয় নিয়ে যাও, কিন্তু মালিক মদীনার বাইরে কোথাও যাবে না। রাসূল (স) বলেছেন ঃ المدينة خير لهم لوكانو ايعلمون —মদীনা তাদের জন্য উত্তম যদি তারা তা জানতে পারে![৩]

মাহদী সাওয়ারী পাঠিয়েছিল যেন ইমাম তাতে চড়ে দরবারে আসেন। সাওয়ারীকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে পাঠালেন, "আমি মদীনায় কোন কিছুতে চড়ে বের হই না। কেননা সৃষ্টিকূলের জন্য অনুগ্রহ রাসূলে কারীম (স) এই শহরের অলিতে-গলিতে পায়ে হেঁটে বেড়াতেন।"

ইমাম এমনিতেই একটু অসুস্থ ছিলেন, দরবারে এসে আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মদীনার অন্যান্য কয়েকজন আলেমের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন। মাহদী এ দৃশ্য দেখে বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ্ "আমি (খলিফাও) যদি ওনাদের কাছে এরকম সেবা চাইতাম, তা করতে একজনও বোধহয় রাজি হতেন না। মুগীরা বললো, আমীরুল মুমিনীন মালিক যাদের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে সেটা তাদের জন্য মর্যাদার ব্যাপার।[৪]

মাহদী এবার তার মূল প্রসঙ্গে চলে এলো— একখানি এমন কিতাব রচনা করুন যে অনুযায়ী সব কাজ করতে আমি সারাদেশের মুসলমানদের বাধ্য করতে পারি। ইমাম মালিক

১. কিতাবুল ইমামাহ্, আস্ সিয়াসাহ্ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৬।
২. কিতাবুল ইমামাহ্ ও মানাকিব লিয্‌যাওয়াদী।
৩. তায্‌কেরাহ্ যুহবী। ৪. যাওয়াদী, আবী মুস্‌আব

www.pathagar.com

আফ্রিকার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ ঐদিকের সব ঝামেলা থেকে আমিই তো তোমাকে মুক্ত করেছি। শামে একজন ব্যক্তিত্ব আছেন (ইমাম আওযাযী)। আর ইরাকবাসী তো ইরাকবাসীই, তাদের কথা আর কি বলবো![১]

এই সফরেই মাহদী সম্পূর্ণ 'মুয়াত্তা' শুনে নেয়। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মাহদীর জন্যই ইমাম মালিক মুয়াত্তা রচনা করেছিলেন। যদিও একথা সত্য নয়। মাহদী তার দুই পুত্র মূসা ও হারুনকে মুয়াত্তা শুনে নেয়ার আদেশ করে। শাহজাদারা ইমাম সাহেবকে খবর পাঠালো। ইমাম সংবাদদাতাকে বলে দিলেন, "জ্ঞান অমূল্য বস্তু, যে জানতে চায় সে তার কাছে আসে"। মাহদীর অনুমতি নিয়ে দুই শাহজাদা ইমামের মজলিসে হাজির। শাহজাদাদের তত্ত্বাবধায়ক বললো ঃ পড়ে শোনান! ইমাম সাহেব বললেন, আমাদের এখানকার আলেমদের নিয়ম হলো, ছাত্ররা পড়বে আর উস্তাদ শুনবে। মাহদীকে খবর দেয়া হলে সে বলে পাঠালো— এখানে আলেমগণ যা যা বলছে ঠিক ঠিকভাবে তা পালন করো। সুতরাং শাহজাদারা পড়লো এবং ইমাম তা শুনলেন।[২]

মাহদী ১৬৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করে। বড় ছেলে হারুন 'হাদী' উপাধী ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করে। মূসার খেলাফতকাল সর্বসাকুল্যে মাত্র একটি বছর। সেই শাহজাদা থাকা কালে ছাত্র হয়েছিল এছাড়া ইমামের সাথে তার আর সাক্ষাৎ হয়নি।

হারুন আর-রশীদ

হাদীর পরে ১৭০ হিজরীতে আব্বাসী খিলাফতের মসনদে বীরত্ব ও মহত্ত্বের এমন এক মহা মহীম আত্মপ্রকাশ করলো কবির ভাষায় তাকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে —

فمن يطلب لقاءك اويرده - فبالحرمين اواقصى الثغور
ففى ارض العدوعلى طمر - وفى ارض السبرية فوق كور

হে হারুন,
যে তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থী হবে— সে 'হারামাইনে' তো তোমাকে পাবে।
অথবা শত্রুর সীমানায়—
সেই শত্রু দেশের বুকের উপর হাওয়াই বেগের ঘোড়ার ওপর
আর নয়তো হারামভূমির ডুলির ওপর!

ইতিমধ্যে ইমাম মালিকের রচনাবলী সারা দেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে গেছে। খিলাফতের মসনদে আরোহণ করে প্রথম বছরেই হজ্জেএলো হারুন আর-রশীদ। মদীনায় তার আগমন উপলক্ষে শহরের নাগরিকবৃন্দ স্বাগতম জানাতে এগিয়ে এলো। ইমাম মালিকও ডুলিতে চড়ে এগিয়ে এলেন। হারুন আর-রশীদ তাঁকে দেখে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলো। এগিয়ে এসে উৎসাহের সাথে বললো ঃ আপনার রচনাবলী দেশের সব জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি এবং আমাদের বংশের প্রত্যেকটি ছেলের জন্য বাধ্যতামূলক পাঠ্য করে দিয়েছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগে, আপনার সংকলনে ইবনে আব্বাস (রা) ও আলী বিন আবী তালিবের

১. যাওয়াদী, ইবরাহীম বিন হামাদী আয্‌যুহরী।
২. তায্‌ঈনুল মামালিক, ইবনে ফাহার।

www.pathagar.com

কোন বর্ণনা কেন স্থান পেলো না। ইমাম বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এ দুজন মহাত্মন আমাদের শহরে ছিলেন না'।

১৭৪ হিজরীতে আমীন ও মামুন এই দুই শাহজাদাকে সাথে নিয়ে হারুন আর-রশীদ হজ্জে এলো। মুয়াত্তা শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করে ইমাম সাহেবকে মদীনার রাষ্ট্রীয় ভবনে আহ্বান করলো। ইমাম সাহেব যথারীতি অস্বীকার করলেন এবং মুয়াত্তা ছাড়া নিজেই দেখা করতে এলেন। হারুন মুয়াত্তা না আনার জন্য অনুযোগ করলে ইমাম সাহেব বললেন ঃ হারুন আর-রশীদ! বিদ্যা তোমার ঘর থেকে বেরিয়েছে, চাওতো অপমান করো নয়তো সম্মান করো। হারুন রশীদ লজ্জিত হলে মুহাম্মদ আল আমীন ও আবদুল্লাহ আল মামুন দুই শাহজাদাকে নিয়ে সোজা দরসের মজলিসে হাজির। অনেক ছাত্রদের ভীড় দেখে হারুন আর-রশীদ বললো ঃ এদেরকে একটু সরে যেতে বলুন! ইমাম সাহেব বললেন ঃ ব্যক্তিস্বার্থের জন্য বৃহত্তর স্বার্থকে খুন করা যায় না। হারুন আর-রশীদ ইমামের মসনদে বসে পড়লো। এবারেও ইমাম বললেন, আমীরুল মুমিনীন 'বিনয়' এখানে খুবই প্রয়োজন! হরুন আর-রশীদ নীচে নেমে বসলো।

মজলিসের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল পড়া এবং শোনা। হারুন বললো ঃ তাহলে আপনি এবার পাঠ শুরু করুন! এটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ হারুনকে একথা বলে মো'ওন বিন ঈসাকে পড়তে ইশারা করলেন। মো'ওন পাঠ শুরু করলো এবং হারুন অতঃপর তার দুই শাহজাদা নিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনলো। মো'ওন ইমামের ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত মেধাবী এবং যোগ্য, পরবর্তীকালে অনেক বড় মুহাদ্দিস হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

খলিফার এই সফরে শাম, ইরাক ও হিজাযের সব আলেমগণ একত্রিত হয়েছিলেন। কাজী আবু ইউসুফও এঁদের অন্তর্ভূক্ত। হারুন আর-রশীদ রাষ্ট্রীয়ভাবে এক ওলামা সম্মেলনের ব্যবস্থা করলো। উদ্দেশ্য মুয়াত্তার সার্বিক সত্যায়ন। ইমাম সাহেব প্রধান অতিথির আসনে বসেছিলেন। মুয়াত্তার পাঠ শুরু হলো। প্রত্যেকটি মাসআলা সমাপনান্তে উপস্থিত জ্ঞানীমণ্ডলী নীরবে মাথা দুলিয়ে তার শুদ্ধতার সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন। ইসলামী নীতি শাস্ত্রের এক অভূতপূর্ব সম্মেলন। উপস্থিত পণ্ডিতগণ ইমামের শাস্ত্রীয় জ্ঞান-সাগরের তীরে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আর ইমামতের গুরুগম্ভীর কণ্ঠ থেকে বিধানের ঢেউগুলো উছলে উঠে উন্মুক্ত হৃদয়গুলোর বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছিল। মজলিসের সমাপ্তি ঘোষিত হলে ইমাম সাহেব কিছুক্ষণের জন্য মজলিসের বাইরে গেলেন। হারুন আর-রশীদ এবার উপস্থিতির প্রতি সম্বোধন করে বললো ঃ

ইরাক ও হিজাজের সম্মানিত ফকীহবৃন্দ! মালিক বিন আনাস এতোক্ষণ যেসব মাসায়েল আপনাদের শুনিয়েছেন এ ব্যাপারে আপনাদের কি কিছু বলার আছে? সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন— একটি মাসআলা ছাড়া আমাদের বলার কিছুই নেই। হারুন আর-রশীদ বললো ঃ এমনও হতে পারে যে, মাসআলাটি কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে! যাই হোক সে ইমাম সাহেবকে খবর পাঠালো। তিনি এলে খলিফা বললো ঃ আবু আবদুল্লাহ! মুয়াত্তার একটি মাত্র মাসআলার ব্যাপারে ওনাদের কিছু বলার আছে, আপনি একটু পরিস্কার করে দিন। ইমাম সাহেব কুরআন-হাদীস থেকে মাসআলাটি আবার প্রমাণ করে দিলেন। উপস্থিত ওলামাবৃন্দ অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ইমামকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানালেন। হারুন আর-রশীদ এমনিতেই ইমামের ভক্ত-অনুরক্ত, তার ওপরে গোটা সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ওলামাগণের সম্মুখে তার গুরুর এই

www.pathagar.com

নিষ্কলুষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হওয়ায় আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। খলিফার এই আনন্দিত মুখাবয়ব দেখে ইমাম সাহেব বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, আজ আপনি আমাকে এখানে যেভাবে আহ্বান করেছেন, আপনার পিতাও একদিন এখানে আমাকে ডেকেছিলেন। আজকের মতো সেদিনও আমি তাকে হাদীস শুনিয়েছিলাম। আপনার পিতা আমার অনুরোধে মদীনার দুঃস্থ জনগণের জন্য বড় রকমের একটা নগদ সাহায্য দিয়েছিলেন। হারুন আর-রশীদ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, ব্যাস, আর কিছু আপনাকে বলতে হবে না। সেবারে হারুন আর-রশিদও মোটা অংকের নগদ অর্থ বরাদ্দ করে যায়।

মাসজিদে নববীতে একটা মিম্বর ছিল, যার ওপর বসে আল্লাহ্‌র রাসূল খোৎবা দিতেন। তখন মিম্বরটির তাক বা সিঁড়ি ছিল তিনটি। আমীর মুয়াবিয়া সেখানে আরও কয়েকটি তাক সংযোজন করেছিল। হারুন আর-রশীদ পুনরায় তাকে তার আসল তিন তাকওয়ালা অস্তিত্বে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছিল। ইমাম সাহেবের কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন ঃ এখন এমন কিছু করতে যাবেন না, কারণ মিম্বরের কাঠ অত্যন্ত পুরানো হয়ে গেছে, ঠিক করতে গেলে সে কাঠগুলো ভেঙ্গেচুরে যেতে পারে। তার চাইতেও বড় কথা নবীজির ওফাতের পরে মদীনা নগরী রেসালাতের স্মৃতিচিহ্নে ভরপুর ছিল— রাসূলের বিছানা, পেয়ালা, ছড়ি, চুল, পায়ের জুতা ইত্যাদি অনেক কিছুই মদীনায় ছিল কিন্তু একটি একটি করে সব হারিয়ে মদীনা এখন নিঃস্ব। লুট হয়ে যাওয়া সম্পদের মধ্যে এই মিম্বরটি শুধু বাকী রয়ে গেছে। ভীষণ ভারী হওয়ার কারণে মসজিদ থেকে কখনো ওটাকে বের করা হয়নি। এখন আমার আশংকা হয় যে, যদি আবার ওটাকে তিন তাকওয়ালা করে দেয়া হয় তাহলে এমনও হতে পারে যে, তা খিলাফতের দরবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কেউ না কেউ এটাকেও নিয়ে যেতে পারে। হারুন আর-রশীদ ব্যাপারটা বুঝতে পারলো এবং তার পরিকল্পনা ত্যাগ করলো।[১]

আবু নঈম খোদ ইমাম মালিকের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হারুন আর-রশীদের ইচ্ছা ছিল মুয়াত্তাকে কা'বা শরীফে স্থাপন করা হোক এবং গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যকে ফিক্‌হী মাসায়েলের ব্যাপারে এই গ্রন্থ অনুসরণে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হোক। সম্মান-সন্ধানী ব্যক্তি বা আলেমের জন্য এর চাইতে বড় আয়োজন আর কি হতে পারে, কিন্তু ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, এমন যেন না করা হয়। কেননা খোদ সাহাবাগণ মৌলিক ব্যাপারে এক থাকলেও অভিব্যক্তি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল এবং তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, যিনি যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন সেখানকার স্থানীয় জনগণ তাঁরই অনুসারী হয়ে গড়ে উঠেছে। এখন এটাই ভেবে নিতে হবে যে, তাঁরা যদি তাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে থাকে তাহলে তারা সঠিক পথেই আছে।

হারুন আর-রশীদকে লেখা চিঠি ঃ হারুন আর-রশীদের খেলাফত আমলেই ইমাম মালিক (রহ) ইন্তেকাল করেন। শাহজাদা আমীন ও মামুন তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিল। হারুন আর-রশীদকে লেখা ইমামের একটা চিঠি আছে। তার মধ্যে ব্যক্তি হারুনের জন্য শিক্ষামূলক কিছু কথা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন নসীহত রয়েছে। ১৩২২ হিজরীতে চিঠিটি মিশরে প্রকাশিত হয়। তার কিছুদিন পরে লাহোরে তার উর্দূ তরজমা প্রকাশ পায়।

---

১. কিতাবুল ইমামহ্‌, আস সিয়াসাহ্‌, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৭।

www.pathagar.com

পরপারের যাত্রা

ইমাম মালিকের বয়স তখন ৮১ বছর। অত্যন্ত দুর্বল এবং প্রায় অক্ষম হয়ে গিয়েছিলেন। মাসজিদে নববীতে নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়া, সভা-সমিতি বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি বেশ আগে থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা অনুযোগ করলে বলতেন, "সবাই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে উঠতে পারে না"। সহীহ্ হাদীস সংকলনের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমামের প্রিয় ছাত্র মো'ওন বিন ঈসা (ওফাত ১৯৮ হিঃ) শেষদিনগুলোতে ইমামের সেবা করেছেন। ইমাম সাহেব তার ওপরে ভর করে চলাফেলা করতেন এবং এই মারাত্মক দুর্বলতার মধ্যেও দরসের কার্যক্রম বন্ধ করেননি। মুসলিম স্পেনের ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া আন্দালুসী মাছমুদী দ্বিতীয়বার মিশর থেকে ফিরে 'মুদাওয়ানার' সনদ নিতে যখন এসেছিলেন, ইমাম সাহেব তখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়।

রোববার দিন প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় তিন সপ্তাহ কোন পরিবর্তন ছাড়াই কেটে যায়। এতোটুকু উপশমের কোন লক্ষণ নেই। লোকেরা ধরেই নিলো এ শেষ সময়। মদীনার সকল জ্ঞানী-গুণী, আলেম-মুহাদ্দিস, আমীর-ওমরাও শেষ সাক্ষাতের জন্য এসে জমা হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া আন্দালুসী বলেছেন, আমার দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার জন্য কান্না ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। ইমামের দীর্ঘদিনের সেবক, কর্মচারী ও ছাত্ররা আকুল হয়ে কাঁদছিল। এছাড়া বড় বড় ওলামা-মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণ কান্নাভরা ছল ছল চোখে এখানে-সেখানে বসেছিলেন। শরীরের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমে আসছিল। দু'টি চোখ থেকে অশ্রুরধারা গড়িয়ে পড়ছে। ইমামের আর এক প্রিয় ছাত্র 'কা'আম্বী ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত। ইমামের কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে করে বললো ঃ আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন ? ইমাম বললেন, কা'আম্বী! আমি কাঁদবো না তো কাঁদবে কে ? হায়রে! আমার প্রতিটা ক্বিয়াসী ফতোয়ার জন্য যদি একটা করে বেত্রাঘাত করা হতো! আর আমি আর ফতোয়া না দিতাম! চোখের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, ঠোঁট দু'টি থরথর করে কাঁপছিল, ঠিক এমন সময় পবিত্র রূহ দেহের পিঞ্জর ছেড়ে মহাজগতের দিকে উড়ে চলে গেলো।

নিত্যদিনের মতো ছাত্র-জনতা এবং ওলামাদের ভীড় চারিদিকে চাপা গুঞ্জন-কোলাহল। কিন্তু তাদের প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধা নিবেদনের কেন্দ্রবিন্দু মহাপ্রস্থানের পথে চিরনিদ্রায় শয়ান।

ইমাম মালিক ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১ রবিউল আউয়াল ১৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ৮৬ বছরের পবিত্র হায়াতে জিন্দেগী পেয়েছিলেন। ১১৮ হিজরীতে দরসের মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন এবং সুদীর্ঘ ৬২ বছর পর্যন্ত ঐশী জীবন বিধানের সেবায় জীবনপাত মগ্ন ছিলেন।

জানাযায় লোক সমাগম তৎকালীন মদীনার ইতিহাসে বিরল। মদীনার প্রশাসক আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ হাশেমী জানাযা এবং মাইয়াতের খাট কাঁধে নেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকেনি। মদীনার সম্মানিত কবরগাহ্ যেখানে শুধুমাত্র পবিত্রতম ব্যক্তিত্বগণের সমাধি রয়েছে

www.pathagar.com

সেই জান্নাতুল বাকী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা (রা), হযরত ওসমান (রা), ইমাম হুসাইন (রা), হযরত ফাতেমা (রা), হযরত হাফসা (রা) প্রমুখের সাথে মদীনার ইমাম মহাপ্রাণ ইমাম মালিককে চিরনিদ্রায় সমাহিত করা হয়েছে।

উমর বিন সো'ওদ আনসারী (রহ) স্বপ্নে কোন এক কবিকে কবিতার এই দু'টি চরণ আবৃত্তি করতে দেখেন —

لقداصبح الاسلام زعزع ركنه - غداة ثوى الهادى لدى ملحد القبر
امام الهدى مازال للعلم مائنا - عليه سلام الله فى اخر الدهر

ইসলামের স্তম্ভগুলো নড়ে গেছে
যে সকালে তার রক্ষক কবরে সমাহিত হয়েছে
যে ছিল সঠিক পথের দিশারী
আর জ্ঞান ভাণ্ডারের রক্ষক
পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত বর্ষিত হোক
তার ওপরে বিধাতার দয়া আর প্রশান্তির বর্ষণ

দূর দূর দেশে যেখানেই তার ইন্তেকালের খবর পৌঁছেছে সেখানেই হয়েছে মর্সীয়া ক্রন্দন। কূফার সুফিয়ান আইনিয়া মৃত্যু সংবাদ শুনে সম্পূর্ণ বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যখন বলতে শুরু করলেন তখন বললেন : ماترك على وجه الارض مثله —পৃথিবীর বুকে তার মতো আর কাউকে তিনি রেখে যাননি। হামাদ বিন জায়েদ বলেছেন, رحمة الله كان من الدين بمكان —আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অনুগ্রহ করুন, ইসলামী জগতে তাঁর মর্যাদা অনেক ওপরে ছিল।

যে হৃদয়গুলো পবিত্র অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছে সর্বকালে সে হৃদয়গুলো তাঁর বিরহ ব্যথা অনুভব করতে পারবে। ৫০০ হিজরী সালে ইন্তেকাল করা কবি আবু মুহাম্মদ জাফর কারী বাগদাদী লিখেছেন[১]—

مقى جدثاضم البقيع بمالك — من المزن مر عادالسحائب مبراق
امامـو طاه الذى طبقت بـه — اقاليم فى الدنيافساح وافاق
اقام بـه شرع النّبى محمد — لـه حذرمن ان يضام داشفاق
لـه سند عال صحيح وهيبـه — فلكل منه حين يرويه اطراق

মেঘের গর্জন আর বিদ্যুৎ চমক নিয়ে অঝোর ধারার বৃষ্টি
সেই কবরকে যেন ভিজিয়ে দেয় যে কবর মালিককে বুকে ধরে আছে
সেই ইমাম যার রয়েছে সেই মুয়াত্তা বিশাল পৃথিবী যার ওপরে ঘোষণা করে একতা
সে তো সেই যে তার মুয়াত্তা দিয়ে নবীর দেয়া ঐশী বিধানকে করেছে সুসংহত

১. ইবনে খালকান, তায়ঈনুল মামালিক, বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন।

www.pathagar.com

এই বিধানের যেন কোন ক্ষতি না হয় সারা জীবন এই ভয়ই সে পেতো
তার দেয়া সনদ সব উন্নত নির্ভুল যখন সে তা বর্ণনা করে তখন সবাই
নিশ্চুপ একাগ্র বিমোহিত।

তাঁর অগুনতি গুণমুগ্ধ শিষ্য ও ছাত্র পরবর্তীকালে প্রায় প্রত্যেকেই খ্যাত-বিখ্যাত হন। যদি ইমাম শাফেয়ী ছাড়া আর কেউ তার শিষ্য হতো তাহলে তার জন্যও তা যথেষ্ট গর্বের বিষয় ছিল। হ্যাঁ সৌভাগ্যও একটা অর্জনই বটে!

ইমামের জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে লেখা—

فخر الائمة مالك نعم الامام لسالك
مولد نجم هدى وفاته فاز مالك

মালিক ইমামগণের অহংকার

তাঁর 'জন্মদিন' পথপ্রদর্শনের নক্ষত্র

অনুসরণের জন্য উত্তমতম নেতা

আর তাঁর মৃত্যু ইতিহাস এই যে, 'সফল হয়েছে মালিক'

www.pathagar.com

আচরণ ও কর্ম এবং ব্যক্তি- জীবন

সম্মানিত গুরুজনের চারিত্রিক অবস্থার ওপর অতিরঞ্জিত এতো প্রলেপ লাগানো হয় যে, আসল সত্য চেহারাটা তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ পূর্বসূরী মহাত্মনগণের জীবন ইতিহাসে এটা এমন একটা অধ্যায় যা উত্তরসূরীদের জন্য অপরিহার্য দিক-নির্দেশনা। এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কৃপায় চিরকৃতজ্ঞ যে, ইমাম মালিকের জীবনেতিহাসকে তিনি সবরকম অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত রেখেছেন।

আল্লাহ্‌র আনুগত্য

ইবাদতের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক ব্যক্তিত্বগণের একজন তিনি।[১] দরস ও ফতোয়া ইত্যাদির পরে যতোটুকু অবকাশ পাওয়া যেতো তার অধিকাংশই ব্যয় হতো ইবাদত এবং তেলাওয়াতে। ইমামের বোনের কাছে কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল, তিনি যতোক্ষণ ঘরে থাকেন, কি করেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন: المصحف والدراسة —পবিত্র গ্রন্থের অধ্যয়ন'। ইমাম সাহেবের কন্যার বর্ণনানুযায়ী তিনি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত অর্থাৎ শুক্রবার রাতটি গভীর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ইবনে আবী ইউনুস থেকে বর্ণনা এরকম যে, তিনি মাসের প্রথম তারিখের রাতটি জেগে কাটাতেন।[২]

রাসূল প্রেম

রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর মন-মানসের সবটা জুড়ে। যখনই রাসূল (স)-এর নাম মুখে আসতো সাথে সাথে তাঁর চেহারার রং পাল্টে যেতো। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে জবাব দিতেন, আমি যেসব পবিত্র আত্মার মহাত্মনগণের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাঁদের প্রতিক্রিয়া আমার চাইতে অনেক বেশি।[৩]

মাসজিদে নববী যার পাশে নবীজীর রওজা মুবারক। সেখানে কোনো ধরনের হট্টগোল এমনকি উচ্চকণ্ঠে কথা বলাকেও তিনি চরম ধৃষ্টতা মনে করতেন। অজু অথবা গোসলের পরে অত্যন্ত বিনীত প্রশান্ত-আসন ছাড়া রাসূলের কোন বাণীকে তিনি মুখে আনতেন না। ইমামের 'আস্তাবলে' পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘোড়া এবং খচ্চর রাখা ছিল, কিন্তু মদীনার মধ্যে তার পিঠে সওয়ার হয়ে কোনদিনই তিনি বের হননি। লোকেরা জানতে চাইলে, বলতেন, আমার ভীষণ লজ্জা হয়। যে মাটির ধুলিকণা রাসূল (স)-এর পবিত্র পদচুম্বনে ধন্য তাকে আমি জন্তু-জানোয়ারের খুরের আঘাতে জর্জরিত করবো? রাসূলে পাক (স)-এর স্মরণ এবং তাঁর বাণীসমূহের আলোচনা-পর্যালোচনা ছিল তাঁর দিবারাত্রির কাজ। ফলে এমন রাত খুব কমই যেতো যে রাতে স্বয়ং নবীজীর স্বপ্ন-দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকতেন।[৪]

১. কিতাবুল ফাহারসাত, ইবনে নাদীম। ২. মানাকিবে মালিক লিয্‌যাওয়াদীন আন আবী যাহাব।
৩. তায্‌ঈনুল মামালিক, আল খতীব। ৪. ইবনে খালকান।

www.pathagar.com

নিজ শহর মদীনার প্রতি ইমামের ভালবাসা ছিল অন্তহীন। শুধুমাত্র হজ্বের প্রয়োজন ছাড়া মদীনার বাইরে কখনো যাননি। খলিফা মনসুর রাজধানী বাগদাদে বসবাসের আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হন। মাহদী তিন হাজার দীনার উপঢৌকনসহ বাগদাদ নিবাসের প্রস্তাব করলে উত্তর মেলে, "তোমার টাকার থলি চাওতো নিয়ে যাও, কিন্তু মালিককে মদীনা থেকে আলাদা করতে পারবে না।" মদীনাপ্রীতির চরম পরাকাষ্ঠা এই যে ইমাম, মক্কা-মুয়াজ্জামার চাইতে মদীনা মুনাওয়ারার মর্যাদা বেশি বলে মনে করেন।[১]

উদারতা

আজকের আলেমদের দৈন্যদশা দেখলে কার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব যে, এঁদের পূর্বসূরীরা শুধুমাত্র ঐশী দ্বীনের জ্ঞানার্জন করতে অকাতরে তাদের সঞ্চিত ধন ব্যয় করতেন। রবীয়াহ নিজের শিক্ষার জন্য বত্রিশ হাজার দীনার ব্যয় করেছেন। ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভাবী ছাত্রদের হাতে দিরহাম এবং দীনারের পুটলি গুঁজে দিতেন। ইমাম লাইস তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সকল সম্পদ শিক্ষা-দীক্ষার পেছনে ব্যয় করেছেন। ইমাম মালিকের বদান্যতার কথাও ইতিহাস হয়ে আছে। ইমাম শাফেয়ীকে নিয়ে একবার নিজের আস্তাবল দেখতে গিয়েছিলেন। দেখতে দেখতে ইমাম শাফেয়ী কয়েকটি ঘোড়ার খুব তারিফ করছিলেন। হঠাৎ ইমাম মালিক তার হাত ধরে বলে দিলেন এগুলো সব তুমি নিয়ে নাও। আমি তোমাকে দিলাম।[২] এছাড়া প্রতিবছর ইমাম শাফেয়ীকে তিনি এগার হাজার দীনার অনুদান হিসেবে দিতেন।

আতিথেয়তা

অতিথী সেবা এমনিতেই আরবদের উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম একটি। তার ওপরে মুমিনদের জন্য এটা এক ধরনের 'ফরজ'। ইমাম মালিকের অতিথী পরায়ণতা এর ওপরেও আরো কিছু। ইমাম মালিকের দরসে অংশগ্রহণ করার জন্য ইমাম শাফেয়ীকে এখানেই থাকতে হতো। এই মহান শিক্ষার্থীর জন্য ইমাম নিজের হাতে খাবার নিয়ে আসতেন এবং নিজে পরিবেশন করে খাওয়াতেন। ফযরের অজুর পানি নিজ হাতে এনে দিতেন। বাড়িতে ফেরার সময় হলে ছাত্রের সঙ্গে বাজার পর্যন্ত হেঁটে এসে সওয়ারী ভাড়া করে দিতেন এবং রাহা খরচের জন্য আলাদা করে একটা পোটলি হাতে গুঁজে দিতেন।[৩]

আত্মনিয়ন্ত্রণ

পায়ের মোজার মধ্যে বিচ্ছু ছিল লক্ষ্য করেননি। তা পরেই দরসে এসেছেন। আটকাপড়া বিচ্ছু উপর্যুপরি দংশাচ্ছিল। ইমাম যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু মজলিসের মনোযোগ নষ্ট হবার আশংকায় এতোটুকু নড়েননি। প্রতিটি দংশনের যন্ত্রণা সয়ে নিচ্ছিলেন। শরীরে তার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না বটে, কিন্তু মুখের রং প্রতিবারই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। ছাত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারকের দৃষ্টি এড়ায়নি ব্যাপারটা। দরস সমাপনান্তে কাছে এসে কষ্টের কারণ জানতে চাইলে বললেন, "মোজার মধ্যে বিচ্ছু ছিল"।[৪]

---

১. মানাকিবে মালিক ২. ইবনে খালকান
.৩. তাযঈন আন নঈম ওয়াক খতীব
৪. তায্‌কেরাহ্‌ যুহবী

জ্ঞান ও ক্ষমাশীলতা

আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সাথে জ্ঞান ও ক্ষমাশীলতার সমন্বয় খুব কমই দেখা যায়। ইমাম মালিকের চরিত্রের মধ্যে এসবের এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তিনি মনসুর ও হারুন আর-রশীদের মতো স্বৈরাচারী সুলতানদের তিরস্কার করতে এতোটুকু ভীত হচ্ছেন না, অপরদিকে নির্দোষ পবিত্র দেহে যখন জালিমের ঘৃণিত হাতের বেত্রাঘাত পড়ে তখন তা অবলীলায় সহ্য করে যান। প্রতিকার হিসেবে খলিফা যখন অপরাধীকে শাস্তি দেবার কথা বলেন ঃ ইমামের পরিষ্কার জবাব, "আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি"।[১]

বিশিষ্ট ছাত্র মো'ওন বিন ঈসা একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে সারহুন নামের একজন কবি এসে একদিন ইমামকে বলছেন ঃ আমি আমার এক-দুটো কবিতায় আপনার নামোল্লেখ করেছি। এই অনধিকার চর্চার জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি। ইমাম ভাবলেন, হয়তো তাঁকে ব্যঙ্গ করে কিছু লিখেছে! বললেন, যাক, কোন সমস্যা নেই। কবি বললো ঃ আমি তা আপনাকে শোনাতেও চাই! এবার ইমামের মুখখানা লাল হয়ে গেলো, তবু ভদ্রতার খাতিরে বললেন, বেশ, শোনান! কবিতার ভাষা ছিল ঃ মদীনার মুফতি মালিককে জিজ্ঞেস করে দেখো—ভালবাসা কি কোন 'পাপ' হতে পারে? ইমাম সাহেব স্থির এবং দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমি এই ফতোয়া দেইনি"।[২]

স্বাধীনতা ও সত্য ভাষণ

পূর্বসূরী মনীষীগণের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাঁরা সত্য কথনের বেলায় অত্যন্ত বেপরোয়া ছিলেন। ন্যায়ের সঙ্গত আদেশ-উপদেশ এবং অন্যায়ের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ এবং প্রতিকার তাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ ছিল। আগের পৃষ্ঠাগুলোতে ইমাম সাহেবের দরবারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক এবং সেখানে যাতায়াতের কথা বলে এসেছি। ইমামকে যারা ভালবাসতেন তাঁদের অনেকেই নিজের সম্মান ক্ষুণ্ন করে দরবারে যাবার ব্যাপারে অনুযোগ করতো। ইমাম সাহেব হেসে বলতেন, "যদি সেখানেই না যাই তো সত্য বলার সুযোগ কোথায়"![৩]

গভীর রাতে বিশিষ্ট কয়েকজনকে ডেকে মনসুরের সেই নাটকীয় জিজ্ঞাসার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন ইবনে আবী যাহাব। ইমাম সাহেব বলেছিলেন, এর জবাব থেকে আমাকে ক্ষমা করো। এই নীরবতা ও মৌনতা সত্য ভাষণের চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। বেত্রাঘাত খেয়েছিলেন কেন? রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে। মসজিদে নববীতে খলিফা মনসুরকে ধমক দিয়ে আল্লাহ্র আয়াতের মাধ্যমে তিরস্কার করেছিলেন সত্যেরই জন্যে। আব্বাসীদের বিরুদ্ধে নফসে জাকিয়ার বিদ্রোহকে সমর্থন করে রায় দিয়েছিলেন কেন? সঙ্গত সত্যের জন্য। আব্বাসীরা ক্ষমতার অহংকারে তাকে উপেক্ষা করে নিষ্ঠুরভাবে সে বিদ্রোহকে দমন করে সত্যকেই দাফন করেছিল।[৪]

আত্মনির্ভরশীলতা

জ্ঞানের মহত্ত্বকে তার উচ্চতর অবস্থানেই ধরে রাখা উচিত। তাহলে একদিকে যেমন জ্ঞানীগণ সাধারণের কাছে সম্মানিত হবেন, অপরদিকে সাধারণের মনেও ঐ উন্নত অবস্থানে

---

১. আলাম উলাম আল আলাম,আবদুল করীম মুহিবুল্লাহ মক্কী।
২. তাওয়ালা আত্ তাসীস, মা'আনি ইবনে ইদরীস বিল ইবনে হাজার
৩. মেরা'আতুল আওরাফ, ইবনে হুজ্জাহ্ হামুবী ৪. ইবনে খালকান।

www.pathagar.com

পৌঁছাবার একমাত্র বাহন জ্ঞান চর্চার প্রতি একটা প্রবল বাসনা জেগে থাকবে। ইমাম মালিক সবসময় এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ইমাম সাহেব তাঁর দরসের মজলিসে যে আত্মমর্যাদা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জাঁকজমকের সাথে বসতেন তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা আগেই করেছি। জ্ঞান চর্চার জগতে এই শাহেনশাহী চলন দেখে অনেকেই প্রশ্ন করতো। তিনি তাদের জবাব দিতেন— এসব কিছুর পেছনে আমার উদ্দেশ্য একটাই! এ পৃথিবীর সবকিছুর ওপরে যেন জ্ঞানের মর্যাদা সমুন্নত থাকে।

বড় বড় আমীর-ওমরাওরা ইমামতের দরবারে আসতে ভয়ে কাঁপতো। খোদ খলিফা হাদীস শোনার জন্য তার তাঁবুতে ইমামকে ডেকে পাঠালে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "জ্ঞানের কাছে মানুষ যায়, মানুষের কাছে জ্ঞান যায় না।" হারুন রশীদ নিজেই অতঃপর শুনতে এলে বলেছিলেন— বিনয় এখানে অপরিহার্য। হারুন আর-রশীদ নেমে গিয়ে মাটিতে বসেছিল। ইমামকে পড়তে বললে তিনি জবাব দিয়েছেন, আমি এভাবে অভ্যস্ত নই। খলিফার দরবারে সাক্ষাতপ্রার্থী এলে 'খলিফার হস্ত চুম্বন' ছিল দরবারী শিষ্টাচার। ইমাম এটাকে ভ্রষ্টাচার মনে করতেন, তাই এ কাজটি তিনি কখনো করেননি।[১]

ন্যায়পরায়ণতা

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, সত্য প্রকাশে অবিচল দৃঢ়তা, কোন শক্তির কাছে মাথানত না করা, জ্ঞানীর উচ্চতম মর্যাদায় আপন অবস্থান তৈরী করে নেয়া। এসব গুণাবলীর পরে ন্যায়পরায়ণতাকে সম্পূর্ণতার মাথার মুকুট হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। কেননা এটা অর্জন করতে গেলে নিজের আত্মঅহংকারের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হয়। যা ছিল ইমাম মালিকের জন্য অত্যন্ত সহজসাধ্য কাজ। যেসব মাসায়েল তাঁর কাছে স্পষ্ট হতো না, সেসবের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে দিতেন, "এটা আমার জানা নেই"। ব্যাপারটাকে খুব সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারবো না, কিন্তু যদি প্রেক্ষিতটা একবার দেখে নেয়া যায়, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়? একজন মানুষ নাম-সুনাম, মান-মর্যাদার উচ্চ আসনে আসীন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণ-অসাধারণ সবার কাছে প্রশ্নাতীত গ্রহণযোগ্যতা। ফতোয়া দানের সর্বজনমান্য যোগ্যতার অধিকারী। হাজার হাজার শিক্ষার্থী শত শত আলেম যার দরসের মাজলিসে বসতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করতো, এরকম একজন ব্যক্তিত্বের কাছে কোন মাসআলা বা কোন ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হলো এবং তিনি সোজাসুজি বলে দিলেন— আমি জানি না! একজন মানুষ কতোটা ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যনিষ্ঠ হলে এই রকম অবস্থানে থেকেও নিজের বাহ্যিক মর্যাদাকে তুচ্ছ করে নিজের সীমাবদ্ধতাকে এতো সহজে প্রকাশ করতে পারেন? ইমাম মালিক (রহ)-এর মতো পবিত্র আত্মার সত্যের সাধকের পক্ষেই তা সম্ভব ছিল। তাঁর এক ছাত্র বলেছেন, ইমাম কতোবার 'আমি জানি না' কথাটি বলেছেন তা যদি আমি লিখে রাখতাম তাহলে অনেকগুলো 'তখতি' ভরে যেতো। ইমামের এক ছাত্র ইবনুল কাসেম বললো, মিশরের আলেমগণ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসায়েলে অত্যন্ত পারদর্শী। ইমাম জানতে চাইলেন, তারা কার কাছ থেকে তা শিখেছেন? ইবনুল কাসেম বললো ঃ আপনার কাছ থেকে! ইমাম বললেন ঃ আমারই তো ওসব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নেই![২]

১. তবকাত
২. মুখতাসার জামে বায়ানুল ইল্‌ম, ইবনে আবদুল বার

www.pathagar.com

আলেমগণের মর্যাদা

খলিফা হারুন আর-রশীদ ইমামের মসনদ থেকে নেমে মাটিতে বসতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ ইমাম আবু হানিফা যখন তাঁর মাজলিসে এসেছিলেন— একজন শিক্ষার্থীর মতো কিছু জানতেই তিনি এসেছিলেন— কিন্তু ইমাম নিজের গায়ের চাদরখানা বিছানার ওপর বিছিয়ে দিয়েছিলেন আবু হানিফা (রহ)-এর বসার জন্যে। তিনি চলে যাবার পর ছাত্রদেরকে বললেন ঃ এইমাত্র যিনি উঠে গেলেন তিনি ইরাকের আবু হানিফা। এই খুঁটিগুলোকে সোনার খুঁটি প্রমাণ করতে চাইলে তা তিনি করতে পারেন। এরপরে একবার কূফার মুহাদ্দিস সুফিয়ান এসেছিলেন, ইমাম তাকেও যথেষ্ট সম্মান-যত্ন করলেন, কিন্তু আবু হানিফার চাইতে একটু কম যা ছাত্রদের দৃষ্টি এড়ায়নি। সুফিয়ান চলে যাবার পর ছাত্রদের নীরব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বললেন ঃ মানুষকে তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

আবদুর রহমান বিন কাসেম তার ছাত্র অথচ তাকে কোনো চিঠি লিখতে সম্বোধন করতেন— 'মিশরের ফকীহ্'। তাঁর আর এক ছাত্র প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 'কা'আম্বী'র মদীনায় আগমন উপলক্ষে দরসগাহের তৎকালীন ছাত্রদেরকে নিয়ে স্বশরীরে নিজে মদীনার বাইরে এসেছিলেন অভ্যর্থনা জানাতে।[১]

দেহাবয়ব

দেহের রং লালচে ফর্সা, উচ্চতায় মাঝারী, ভারী দেহ, প্রশস্ত ললাট, বড় বড় চোখ, উঁচু নাসা, ঘন লম্বা দাড়ি, প্রাকৃতিকভাবে ঝরে যাওয়া চুলহীন মাথা, খুব ছোট করে মোছ কাটা পছন্দ করতেন না এবং খেযাব ব্যবহার করতেন না।

পোশাক

পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর প্রাকৃতিক স্বভাব। উন্নতমানের দামী কাপড়-চোপড় পরতেন। লোকেরা এ ব্যাপারে কিছু বললে বলতেন, আমি মদীনা শহরে যতো আলেম দেখেছি, প্রত্যেককে ভালো পোশাক পরতে দেখেছি। তার পোশাকের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল যা চোখে পড়ার মতো। এডেন-এর ইয়েমেন কাপড় ছিল সেকালে অত্যন্ত দামী এবং বিখ্যাত।[২] মারু-এর বানানো কাপড়ও মাঝে মাঝে পরতেন।[৩]

সুগন্ধীর ব্যবহার

সুগন্ধী ব্যবহার করতেন। সবসময় 'উদ' কাঠের ধুম্র-পাত্র জ্বলন্ত থাকতো। পরিধেয় কাপড়-চোপড় সব গন্ধে ভুর ভুর। যে গলি দিয়ে হেঁটে যেতেন দীর্ঘক্ষণ সে পথে খুশবু ছড়িয়ে থাকতো। সব সময়ই বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যে 'নেয়ামত' দান করেছেন তার প্রভাব তার ওপরে যেন ততোটা প্রকাশ না পায়— আমি তা পছন্দ করি না। কখনো কখনো লম্বা চাদর ব্যবহার করতেন। সেকালে আলেমদের বিশেষ পরিধেয় ছিল এই চাদর। মাথায় পাগড়ি পরে চাদরটা গলায় পেঁচিয়ে এক প্রান্ত ঝুলিয়ে দিতেন ডান অথবা বাম কাঁধে। রূপার একটা আংটি পরতেন যার কালো পাথরটার বুকে খোদাই করা ছিল حَسْبُنَا اللّٰه وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আল্লাহই নীতি নির্ধারকের জন্য যথেষ্ট।

১. তাযকেরাহ্ যুহবী। ২. ইবনে নদম।
৩. মারাত্তুক জামান ইয়াকাঈ।

ইমাম সাহেব যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তার মধ্যে এটাই বা কম কিসে যে, মদীনার পবিত্র মাটির নির্যাস দিয়ে ইমামের অস্থিমজ্জা, রক্ত-মাংশ তৈরী হয়েছে। আরো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি যে বাড়িতে বসবাস করতেন সেটা ছিল আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা)-এর বাড়ি। যেখানে বসে তিনি দরস দিতেন, ছাত্র পড়াতেন অর্থাৎ তাঁর মজলিস যেখানে বসতো, সেটি ছিল হযরত উমর ফারুক (রা)-এর রাষ্ট্রীয় কোষাগার। এখানেই চর্চা হতো সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের বিশেষ অনুগ্রহ, সৃষ্টিকূলের সেরা সৃষ্টি মানবতার মুক্তির নিদর্শন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে বলে যাওয়া বাণীসমূহের। ইমাম মালিক শুধু যে কেবল জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় হযরত উমর ফারুক (রা)-এর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাই নয়— তার বৈষয়িক সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকেই বানিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ইমাম মালিকের রচনাবলীর ওপরে সাধারণ আলোচনা

সময়টাকে বিষয় ভিত্তিক লেখালেখি এবং তাকে গ্রন্থাবদ্ধ করার একেবারে সূচনাকাল বললে বেশি বলা হবে না। ইমাম সাহেব নিজ হাতে যেসব কিতাব লিখেছেন অথবা বলা যায়, তিনি লিখেছেন বলে বলা হয়ে থাকে, তার নামসমূহ নীচে দেয়া হলো ঃ (১) মুয়াত্তা, (২) রেসালাতে মালিক ইলা রাশীদ, (৩) আহকামুল কুরআন, (৪) আল মুদাওয়ানাতুল কাবীর, (৫) রেসালাতে মালিক আবী ইবনে মুতরাফ, (৬) রেসালাতে মালিক আবী ইবনে ওয়াহাব, (৭) কিতাবুল আক্বদীয়াহ, (৮) কিতাবুল মানাছেক, (৯) তাফসীর গারীবুল কুরআন, (১০) কিতাবুল মাজালিসাত আন মালিক, (১১) তাফসীরুল কুরআন।[১]

(১) মুয়াত্তা ঃ মুয়াত্তা এবং তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম যে পার্থক্যটি তাহলো মুয়াত্তার বর্ণনা তাঁর সকল ছাত্রগণই করেছেন, কিন্তু অন্যান্য রচনাবলীর কথা তাঁর কতিপয় ছাত্রগণের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। যাই হোক, মুয়াত্তার আলোচনা আমাদের সম্মুখে এমনিতেই চলে আসবে।

(২) রেসালাতে মালিক ইলা রাশীদ ঃ এটা খলিফা হারুন আর-রশীদের কাছে লেখা চিঠিগুলো নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। ২২ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট পুস্তিকার মধ্যে দ্বীন দুনিয়া ও ঐশী বিধান অনুযায়ী রাজ্য শাসন প্রণালী ইত্যাদি সম্পর্কিত নানান কথামালা রয়েছে। তবে চিঠিগুলোর বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত প্রাচীন, যা মুয়াত্তার বর্ণনা ভঙ্গির সাথে মেলে না। তাই অনেক বিশেষজ্ঞ এটাকে ইমাম মালিকের লেখা বলে স্বীকার করতে নারাজ। এছাড়া এর মধ্যে এমন কিছু দুর্বল হাদীসের উল্লেখ রয়েছে যা মুয়াত্তার রচয়িতা ইমাম মালিক (রহ) কোন কারণে উল্লেখ করতে পারেন তা ভাবাই যায় না। কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাবে মুহাদ্দিসীনগণ ততোটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি বলে ইবনে নাদীম আল ফাহারসাতে ইমামের নামেই ঐ পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে অনুমান করা যায় যে, চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই পুস্তিকার অস্তিত্ব ছিল। এই পুস্তিকা এখন বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

(৩) আহকামুল কুরআন ঃ এটা খোদ ইমামের রচনা নয়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত কুরআন বিশারদ আল্লামা আবু মুহাম্মদ মক্কী বিন আবী তালেব আল আন্দালুসীর (ওফাত ৪৩৭ হিঃ) রচনা। আল কুরআনের বিধান পর্যায়ের যেসব আয়াতের ইমাম মালিকের করা তাফসীর তার কাছে ছিল সেসবকে এর মধ্যে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। এ কারণে কিতাবের নামকরণ করা হয়েছে, কিতাবুল মা'ছুর আন মালিক ফী আহকামুল কুরআন।'[২]

(৪) আল-মুদাউয়ান্নাতুল কাবীর ঃ মালিকী ফিকাহ্র একখানা বিশাল কিতাব। কেউ কেউ তাকে ইমাম মালিকের রচনা বলে মনে করেন। আসলে তা ইমামের ছাত্র আবদুর রহমান বিন কাসেম (ওফাত ১৯১ হিঃ)-এর রচনা। তবে তাকে ইমামের রচনা বললেও ভুল হবে না এই কারণে যে, তা মূলত ইমাম মালিকেরই 'ফিকাহ্' অর্থাৎ তাঁর নির্ধারিত নীতি-শাস্ত্রীয়

১. এই কিতাবসমূহের নাম বিভিন্ন সংকলনকারীগণের দেয়া।
২. ইবনে খালকান, প্রসঙ্গ মক্কী বিন আবী তালেব

www.pathagar.com

বিধি-বিধানের সংকলন। ইমাম বেঁচে থাকতেই ইবনে কাসেম মদীনা থেকে ফিরে এসে ইমামের যাবতীয় ইজতিহাদী ফিকহী মাসায়েলের একখানা কিতাবী রূপ দেবার জন্য সংকলন শুরু করেছিলেন এবং অল্প দিনেই তা শেষ করতে পেরেছিলেন। কেননা ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া মাসমুদী দ্বিতীয়বার মিশর থেকে মুদাওয়ানা ইবনে কাসেমকে খোদ ইমামের কাছ থেকে শুনতে এসেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, ইমাম তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত।[১] মুদাওয়ানা এখন মিশরে সহজলভ্য।

(৫) রেসালাতে মালিক ইলা ইবনে মুতরাফ : গাস্সাল বিন মুহাম্মদ বিন মুতরাফের নামে লেখা বিভিন্ন 'ফতোয়া'সমূহের একটি ক্ষুদ্র সংকলন। খালেদ বিন তারার ও মুহাম্মদ বিন মুতরাফ ইমামের এই দুইজন ছাত্র তা বর্ণনা করেছেন।

(৬) রেসালাতে মালিক ইবনে ওয়াহাব : ইমামের ছাত্র ইবনে ওয়াহাবের নামে দণ্ডবিধি বিচার ও রায় ইত্যাদি সম্পর্কে একখানা বিখ্যাত পুস্তক রয়েছে। কাজী আইয়াজ তার প্রশংসা করে লিখেছেন :

وهو من خيار الكتب فى هذا الباب دال على سعة علمه هذا الشان

আর এটি ছিল এই অধ্যায়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোর মধ্যে একটি যা এই বিষয়ে তার জ্ঞানের বিশালতা সম্পর্কে নির্দেশ করে।

(৭) কিতাবুল আকদীয়াহ্ : কয়েকজন বিচারপতির জন্য ইমাম এই পুস্তিকা লিখেছেন। বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন আইন-বিধান এবং তা প্রয়োগের মৌলিক দিক-নির্দেশনামূলক রচনা। ইমাম মালিকের ছাত্র আবদুল্লাহ্ বিন জলিল এই রচনার কথা বর্ণনা করেছেন।

(৮) কিতাবুল মানাসেক : ইমামের এক বন্ধু আবু জাফর যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মালিকের সবচাইতে বড় রচনা এই কিতাবুল মানাসেক। যার মধ্যে হজ্বের যাবতীয় মাসায়েল ও বিধান রয়েছে।

(৯) তাফসীর গারীবুল কুরআন : এই কিতাবের কথা খালেদ বিন আবদুর রহমান মাখযুমী ইমামের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

(১০) কিতাবুল মাজলিসাত আন মালিক : ইমামের সুযোগ্য ছাত্র ইবনে ওয়াহাব ইমামের মজলিস এবং তার সান্নিধ্যে থেকে হাদীস, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং নীতি শাস্ত্রীয় বিক্ষিপ্ত আলোচনাসমূহকে একত্রিত করেছেন। হাফেয সুয়ূতী এ পুস্তিকা দেখেছিলেন।

(১১) তাফসীরুল কুরআন : প্রমাণিত হাদীসসমূহের বর্ণনা সম্বলিত কুরআন মজীদের তাফসীর। হাফেয সুয়ূতী এই কিতাবও দেখেছিলেন এবং তার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তাঁর এই কিতাব সম্পর্কে একটি সন্দেহ রয়েছে যে, তা কি খোদ ইমাম লিখেছেন, না তাঁর কোনো ছাত্র ইমামের ব্যাখ্যাসমূহকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

(১২) কিতাবুল মাসায়েল : উল্লেখিত পুস্তিকা এবং কিতাবসমূহ ছাড়াও ইমামের আরও রচনা রয়েছে। মুহাদ্দিস খতীব তারিখে বাগদাদে লিখেছেন, আবুল আব্বাস সাফাহ্র সামনে অসংখ্য লিখিত পৃষ্ঠার স্তূপ পড়েছিল। সেগুলোর দিকে ইশারা করে সে বলেছিল এখানে ইমামের সত্তুর হাজার লিখিত মাসআলা রয়েছে।[২]

১. ইবনে খালকান, জীবনী আবদুর রহমান বিন কাসেম ও ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া বিন কাছীর আল মাসমূদী
২. তযেঈনুল মামালিক।

www.pathagar.com

মুয়াত্তা ইমাম মালিক

আল্লাহ্‌র কিতাবের পরে শুদ্ধতম কিতাব 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক'। ইমাম মালিক (রহ্)-এর আসল সৃষ্টি এই 'মুয়াত্তা'। ইসলামী কিতাবের জগতে কিতাবুল্লাহ্‌র পরে দ্বিতীয় মর্যাদাময় অবস্থান এই কিতাবের। প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী সমষ্টি এবং তার পরে রাসূল (স)-এর বাণী সমষ্টি। হিজরতের প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত রাসূলে পাক (স)-এর বাণীসমূহ তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীগণের পবিত্র অন্তরে গাঁথা হয়েছিল এবং বিভিন্নভাবে আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্বগণের স্মৃতিভিত্তিক বর্ণনা সংগৃহীত ছিল।

প্রথম স্তরের অনুসারীগণের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিদায়ের পরে দ্বিতীয় প্রজন্মের অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের অনুসারীগণের (তাবেয়ীন) উত্থানের পালা। খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ (ওফাত ১০১ হিঃ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেন। তিনি যে মানের খলিফা ছিলেন, ততোধিক মর্যাদার মুহাদ্দিসও ছিলেন।

আল্লামা যুহরী হাদীসের হাফেযগণের মধ্যে তাঁকেও গণ্য করেছেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের জ্ঞানগত যোগ্যতার পরিমাপ করা যেতে পারে ইমাম মালিকের মুয়াত্তায় দলিল হিসেবে তাঁর ফতোয়ার প্রয়োগ দেখে। হাদীসের গ্রন্থরূপ সংকলনের গোড়াপত্তন এই মহান খলিফার ইঙ্গিতেই শুরু হয়েছিল। সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনকারী ছিলেন আবু বকর বিন হাজম (ওফাত ১০০ হিজরী)।

আবু বকর বিন হাজ্‌মের পরে মুহাম্মাদ বিন শিহাব আয যুহরী (রহ্) যিনি সকল মুহাদ্দিসীনগণের আদি গুরু, ইমাম। তিনি হাদীসের দ্বিতীয় নির্মাণকারী। রাবী'ই বিন সাবীহ্ ও সো'ওদ বিন আরবাহ্ তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছেন। আবু বকরের হাতে তৈরী প্রথম পান্ডুলিপি সাধারণভাবে সাহবাগণের ফতোয়াসমূহের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। ইমাম যুহরীর সংকলনে বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস ছিল না। রাবী'ই এবং সো'ওদের সংকলনে অধ্যায়ের বিভক্তি ছিল।

১৩৩ হিজরী এক নতুন যুগের সূচনা। উমাইয়া খিলাফতের বিলুপ্ত পটভূমির ওপর আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। তাদের ক্ষমতারোহণের প্রাথমিক পর্যায়ের দিনগুলোতে হাদীসের অসংখ্য সংকলন তৈরী হয়েছিল। মুয়াত্তা সংকলনের সময়কালও এটাই। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূলে কারীম (স)-এর ওফাতের পরে অধিকাংশ সাহাবা (রা) জিহাদ এবং দাওয়াতের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বিজিত রাজ্যসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। হযরত যাবের (রা) মক্কায়, হযরত আবু দারাদ (রা) এবং আবু যার (রা) ও কবা বিন আমের (রা) মিশরে, বুরাইদাহ (রা) খোরাসানে, হযরত আলী (রা) এবং আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা) কুফায়। এভাবে আরও অনেকে অনেক দিকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ সাহাবাগণের বড় একটা দল মদীনাতেই থেকে যান। সম্মানিত এইসব ব্যক্তিগণ যে যেভাবে যেখানেই ছিলেন রাসূল (স)-কে ঘিরে তাঁদের জীবনে ঘটিত ঘটনা, দেখাশোনা স্মৃতিগুলোর রোমন্থন যে কোন

প্রসঙ্গেই এসে যেতো। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁরা উল্লেখ করতেন রাসূল (স) দেখানো অথবা বলে যাওয়া বাণীসমূহের। এককথায় এসব মহাত্মনগণের ব্যক্তি মানসে স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (স) ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের জীবনাচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই রাসূল (স)-এর স্মরণ-অনুসরণ এবং অনুকরণ প্রচেষ্টাই ছিল তাঁদের জীবনে বেঁচে থাকার একমাত্র নিয়ামক। রাসূল (স)-এর নিয়ে আসা ঐশী বিধানের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের জীবন। তাঁরা যখন তাঁদের যার যার পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ড সাঙ্গ করে বিধাতার আহ্বানে পরপারের স্থায়ী জীবনে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁদের শূন্য স্থানগুলো পূর্ণ করতে এগিয়ে এলেন তাঁদেরই একনিষ্ঠ অনুসারী তাবেয়ীনগণ। তাঁরা উত্তরাধিকারী হলেন তাদের গুরুজনদের সঞ্চিত জ্ঞান, প্রত্যক্ষ স্মৃতি এবং রাসূল (স)-এর রেখে যাওয়া বাণীসমূহের বর্ণনার।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই জ্ঞানভাণ্ডার বর্ণনা ভিত্তিক এবং বিক্ষিপ্ত রচনা ভিত্তিক চর্চা হতে থাকে। প্রধান কেন্দ্র মদীনা এবং কুফা, বসরা, দামেস্ক, ও মক্কা মুয়াজ্জামা ছিল দ্বিতীয় স্তরের চর্চা কেন্দ্র। ইমাম শাফেয়ী (রহ) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রহ) প্রথম ব্যক্তিত্ব যাঁরা তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও ইমাম বুখারী (রহ) রচনা ও নিবন্ধনের মাধ্যমে এইসব কেন্দ্রগুলোকে একীভূত করেন।

ইমাম মালিকের সময়কালটা ঠিক তখন, যখন এইসব তথ্যসমূহ ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলোতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে ইমাম মালিকের সময়ে হাদীসসমূহের যেসব সংকলন হয়েছে, তা শুধুমাত্র নিজ নিজ দেশীয় সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ইবনে জারিজ মক্কায়, আওযায়ী শামে, সুফিয়ান সাওরী কুফায়, আবু সালমা হামাদ বসরায়, হালছিম মধ্যপ্রাচ্যে, মো'মার ইয়ামানে, ইবনে মুবারক খুরাসানে এবং জারির বিন হামিদ রে'তে। এঁরা সবাই হাদীসসমূহের সংগ্রহ ও সংকলন করেন। কিন্তু নবুয়তের কেন্দ্রভূমি এবং অহী'র অবতরণস্থলের হাদীসসমূহ সংগ্রহ ও বিন্যাস যে উলুমে নববী অর্থাৎ নবুয়তী জ্ঞানের সবচাইতে বড় ভাণ্ডার ছিল, তা যে সৌভাগ্যবানের ভাগ্যে জুটেছে তিনি ইমাম মালিক (রহ)।[১]

মুয়াত্তা

মাদীনার জ্ঞানসমূদ্র সিঞ্চিত মানিক রাসূলে পাক (স)-এর ঘনিষ্ঠতম সাহাবাগণ এবং তৎপরবর্তী মহান তাবেয়ীনগণের আবাস-নিবাস এই পবিত্র নগরী। রাসূল (স)-এর স্পর্শধন্য এই পবিত্র পরিবেশে বসবাসকারী মহাত্মনগণের বর্ণনা এবং ফতোয়াসমূহের ওপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে মানব রচিত কোন শুদ্ধতম কিতাব। সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য এই গ্রন্থে রয়েছে মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের দেয়া একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলামের বিধানসমূহ।[২]

রচয়িতা ইমাম মালিক যেহেতু তাঁর আয়ুষ্কালে মাদীনার বাইরে কখনো যাননি, সেহেতু এই গ্রন্থ রচনার স্থান সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত যে, তা মাদীনা মুনাওয়ারা। সময়কালের সঠিক কোন তথ্য না থাকার প্রেক্ষিত অনুযায়ী অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় ১৩০ হিজরী থেকে ১৪০ হিজরী সালের মধ্যে।

১৩০ হিজরী থেকে উমাইয়া খিলাফতের পতনের ইতিহাস শুরু হয়ে যায়। এর আগে লেখালেখি বা গ্রন্থ রচনার সাধারণ কোন প্রচলন ছিল না। ১৪৪ জিরীতে মনসুর যখন হজ্ব

১. মুকাদ্দামাহ্ ফাতহুল বারি
২. মুকাদ্দামাহ্ 'মাসওয়া', শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী

www.pathagar.com

করতে আসে মুয়াত্তার খ্যাতি তখন জ্ঞানচর্চাকারীদের মুখে মুখে।[১] এ কারণে এই দু'টি সময়ের মাঝামাঝি সময়কে আমরা এর রচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

একটা বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইমাম মালিক খলিফা মনসুরের অনুরোধে মুয়াত্তার রচনা শুরু করেছিলেন এবং রচনার ধরনটা নির্ধারণ করতে গিয়ে খলীফা বলেছিল যে, এই সংকলনের বিধানসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করবেন যাতে না ইবনে উমরের (রা) আপোসহীন কাঠিন্য থাকে না ইবনে আব্বাসের আপোসকামী সারল্য এবং না ইবনে মাসউদের অপ্রচলিত বিরল ব্যতিক্রম।[২]

ইমাম মালিক হাদীসের সংকলন রচনা করছেন। একথা ছড়িয়ে পড়লে মদীনার অন্যান্য আলেমগণও নিজ নিজ সংগ্রহের নিবন্ধন শুরু করে দেন। কেউ একজন কথাটা ইমামকে জানালে তিনি বললেন, আমি শুনেছি, তবে "সৎ এবং মহৎ উদ্দেশ্যই টিকে থাকে"। ইমামের ভবিষ্যত বাণীটি কতো বড় সত্য হয়ে বেরিয়ে এসেছিল যে, 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' ছাড়া আর কোন মুয়াত্তা এই পৃথিবীতে টিকে থাকেনি। কোন কোন লোক প্রতিহিংসার জ্বালা অন্যভাবে মিটিয়েছেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক রাসূল (স)-এর জীবনী ও যুদ্ধনীতি বিশেষজ্ঞ, বলেন ঃ

ایتونی بکتبه حتی ابین عیوبه فانابیطارکتبه -৩

মালিকের কিতাবখানা আমার কাছে নিয়ে এস

আমি তার ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দি

মালিকের কিতাবগুলোর সমালোচক তো আমি।

ইমাম মালিক তাঁর রচনা শেষ করে শায়খুল হাদীসগণের সামনে পেশ করেন। তাঁদের সবাই ভূয়সী প্রশংসা করেন। মদীনার মালিক অনুরাগীদের জন্য সে দিনটি অত্যন্ত আনন্দের ছিল, যেদিন তাদের প্রিয় ইমামের গুণ-বৈশিষ্ট্যের মুকুটে আরও একটি যোগ্যতার পালক পরানো হলো।[৪]

কবি সা'দুন মুয়াত্তার প্রশংসায় লিখেছেন ঃ

اقول لمن يروى الحديث ويكتب - ويسلك سبل الفقه فيه ويطلب

ان اجبت ان تد عى لدى الخلوعالما - فلا تعد مايحوى من العلم يشرب

اتترك داراكت بين بيوتها - يدح ريغد وجبريل المقرب

ومات رسول الله فيها وبعده - بسنته اصحابه قد فادبوا

فبادرموطا مالك قبل فلوته - فما بعده ان فات للحق مطلب

ودع للموط كل علم تريده - فان الموطا الشمس والغير كوكب

আমি তাকে বলি যে হাদীসের বর্ণনা করে আর তাকে লেখে—

এবং ফিকাহ্র পথে চলে আর তার সন্ধানে ঘর্মাক্ত হয়।

১. কাশফুয়্যুনুন এবং জামে বায়ানুল, ইমাম ইবনে আবদুল বার

২. কিতাবুল উম্মাহ্ ওয়াস সিয়ামহ ৩. তাহযীবুল কামাল। ৪. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন

www.pathagar.com

যদি তুমি চাও যে পৃথিবীতে জ্ঞানী হিসাবে তোমাকে ডাকা হোক
তাহলে সেই জ্ঞানের বাইরে যেও না ইয়াছ্রেব যার ধারক হয়।
তুমি কি সেই এলাকাটা ছেড়ে দেবে যেখানকার ঘরে ঘরে
বিধাতার কাছ থেকে তাঁরই ঘনিষ্ঠ জিবরীল আসা-যাওয়া করতো ?
আর যেখানে আল্লাহ্র রাসূল (স) ইন্তেকাল করেছেন
এবং তাঁর পরে তাঁর প্রিয় সঙ্গীরা তাঁর নিয়মে চলে
সুযোগ্য সুপণ্ডিত হয়েছেন!
তাহলে মালিকের মুয়াত্তাকে তাড়াতাড়ি ধরো যেন হারিয়ে না যায়
যদি হারিয়ে যায় তাহলে সত্য সন্ধানের আর কোন জায়গা নেই!
মুয়াত্তার জন্য অন্য যে কোন জ্ঞানকে তুমি যদি চাও ছেড়ে দাও
কেননা মুয়াত্তা সূর্য আর অন্যসব কিতাব আলোহীন তারকা।

নামকরণ ঃ মুয়াত্তা শব্দটি তাওতীহ্-এর কর্মপদ। যার মানে 'পদচারণা' এবং কোনো কিছুর ওপরে চলা। মুয়াত্তার আভিধানিক অর্থ পদচারণা করা হয়েছে অথবা 'চলা হয়েছে' এমন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী 'মুসাউয়াতে' লিখেছেন যে, পদচারণা হয়েছে বা 'চলা হয়েছে', এর বাহ্যিক সরল অর্থ হলো যার ওপরে আলেমগণ, ইমামগণ এবং সাহাবাগণ চলেছেন এবং যাকে তাঁদের সবার বিবেচনা দিয়ে দলিত-মথিত করেছেন। অর্থাৎ সবাই তাকে নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং শেষে একমত হয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এর মানে 'ঐকমত্য' এবং সামঞ্জস্য। যেহেতু রচনার পরে সকল শায়খুল হাদীসগণ এর সাথে ঐকমত্য ও সঙ্গতি ঘোষণা করেছেন, এ কারণে এর নাম 'মুয়াত্তা' স্থির হয়ে গেলো।[১] কিন্তু আমার কাছে এর চাইতেও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় 'মুয়াত্তা' সেই পথকে বলা হয় যে পথ ধরে অনেক মানুষ চলে যায়। সুন্নতের মানেও 'পথ'ই। এটা সেই পথ, যে পথে রাসূলে কারীম (স) চলেছেন। 'মুয়াত্তা' সেই সুস্পষ্ট পদচিহ্নযুক্ত পথ, যার ওপরে স্বয়ং রাসূল (স) এবং তার পরে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীগণ চলেছেন। সর্বোপরি মুয়াত্তা শব্দটি নিজের মূল তাৎপর্যের নিজেই ব্যাখ্যাকার। অর্থাৎ এটা সেই সব মাসায়েল নিয়ে সংকলিত যার বাস্তবায়ন খোদ সাহাবাগণ করেছেন এবং সাধারণভাবে আমাদের পূর্বসূরীগণ যার অনুসরণ করেছেন।

বর্ণনাসমূহের সংখ্যা ঃ প্রথম পর্যায়ে মুয়াত্তায় দশ হাজার হাদীস ছিল। কিন্তু ইমামের সত্য সন্ধানী বিবেকের বিচারে প্রায় আট হাজার হাদীস ছাঁটাই হয়ে গেছে। বাকী ১৭২০ খানি হাদীসের মধ্যে মুসনাদ ও মরফু ৬০০, মুরসাল ২৩৫, মাওকুফ ৬১৩, তাবেয়ীগণের বক্তব্য ও ফতোয়া ৬৮৫, মালিকের প্রতিবেদন ৫টি।[২]

মুয়াত্তার বিষয়বস্তু ঃ মুয়াত্তার বিষয়বস্তু ইসলামের নীতিশাস্ত্রীয় (ফিকহী) বিধি-বিধান। এ কারণে তা বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদির মতো অসংখ্য বিষয় এবং অধ্যায় থেকে মুক্ত। কেননা নীতিশাস্ত্রের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাদ্দিসীনদের রীতি অনুযায়ী তাকে "কিতাবুস সুনান" বলা উচিত।

১. মুকাদ্দামাহ্ মুসাউয়া শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ)

২. মুকাদ্দামাহ্ মুসাউয়া।

www.pathagar.com

মুয়াত্তা এবং অন্যান্য মুজতাহিদ ফকীহ্গণের হাদীস সংকলন ঃ মুজতাহিদ ফকীহ্ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের নামে একখানি করে হাদীসের সংকলন রয়েছে। মুসনাদে আবী হানিফা মুসনাদে শাফেয়ী, মুসনাদে ইবনে হাম্বাল। এইসব কিতাবসমূহ সসম্মানে বিরাজিত। ফকীহ্, চতুষ্টয়ের রচনাবলীকে তার ওপরে কি প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে ? এর জবাব দিতে গেলে একটা কথা বলেই ফেলতে হয় যে, ইমাম মালিক ছাড়া কোন মুজতাহিদ-ইমামের কলম থেকে ইলমে হাদীসের ওপরে কোন রচনা বেরিয়ে আসেনি— وَذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ আর এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

মুসনাদে আবী হানিফা নামে বেশ কয়েকখানি কিতাবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত এইসব কিতাব ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর শত শত বৎসর পরে ইমাম মামদুহ্-এর ছাত্রদের রচনা এবং অখ্যাত সূত্রসমূহ থেকে নিয়ে মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব ও হুসাইন বিন মুহাম্মদ খসরু ও অন্যান্যরা রচনা করে মুসনাদে আবু হানিফা ও মুসনাদে ইমাম আজম ইত্যাদি নামে নামকরণ করেছে।

মুসনাদে ইমাম শাফেয়ীর প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) তাঁর যাবতীয় রচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু জাফর বিন মুহাম্মদ বিন মাতার নিশাপুরী অথবা আবুল আব্বাস নামের একজন শাফেয়ীর অনুসারী, সেইসব হাদীসসমূহকে একত্রিত করে 'মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী' নাম দিয়ে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। তবে মুসনাদে ইবনে হাম্বাল-এর রচনা নিঃসন্দেহে ইমাম আহমদ নিজেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল যখন তার খসড়া তৈরী করেছেন তখনই পরপারের আহ্বান চলে আসে। পরে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ তার গ্রন্থণা ও বিন্যাস করেন। কিন্তু এ জগতে তার যোগ্যতা প্রমাণ হয়নি। মাদানী ও ইরাকী সনদসমূহ গুলিয়ে মিলিয়ে গেছে। সে কারণে তাকে মুসনাদে আহমাদ না বলে মুসনাদে আবদুল্লাহ্ বলাই শ্রেয়। সর্বোপরি হাদীস সমীক্ষকগণের দৃষ্টিতে এর মধ্যে সহীহ হাদীসসমূহের বাধ্যবাধকতা নেই।

মুয়াত্তা এবং তার সমকালীন কিতাবসমূহ

মুয়াত্তার কিছু আগে এবং তার সমসায়িককালের পণ্ডিতগণ বহু মুয়াত্তা এবং মুসনাদ লিখেছেন। যাদের কিছু কিছু এখনও মওজুদ আছে। তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে তখন বোঝা যায় যে, মুয়াত্তা ও সমকালীন অন্যান্য কিতাবের পার্থক্যটা ঠিক সহীহ বুখারীর সাথে ইবনে আবী শাইবার এবং বাইহাকীর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে। খোদ ঐসব কিতাবের মধ্যেই তাদের ব্যর্থতা এবং গ্রহণ যোগ্যতা না পাওয়ার কারণ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এছাড়া তিনটি বিশেষ কারণ এমন রয়েছে যা দিয়ে মুয়াত্তার স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে।

(১) মুয়াত্তার আগে হাদীসের যেসব কিতাব লেখা হয়েছে তাদের অধিকাংশ সাহাবা এবং তাবেয়ীনগণের ঐতিহ্য ও ফতোয়াসমূহের ওপর ভিত্তি করে রচিত। ইমাম মালিক (রহ) মুয়াত্তায় শুদ্ধ হাদীস ও মুসনাদসমূহ বা মুনকাতে ও মুরসালকে প্রথম ভিত্তি এবং সাহাবাগণের কর্মপ্রনালী ও ফতোয়াসমূহকে দ্বিতীয় ভিত্তির স্বীকৃতি দিয়েছেন।

(২) দ্বিতীয় যে বড় পার্থক্য, তাহলো ঐসব কিতাবে শুদ্ধতার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু মুয়াত্তায় শুধুমাত্র সেইসব হাদীস এবং ফতোয়াসমূহ স্থান পেয়েছে যাদের সত্যতা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

(৩) তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, মুয়াত্তা মদীনায় রচিত হয়েছে। এর মধ্যে বর্ণনাকারীগণ সবাই হিজাজী। অন্যান্য মুসনাদ ও মুয়াত্তাসমূহের কুফা, বসরা, ওয়াসেত, শাম, ইয়ামান, খুরাসান ও রে ইত্যাদি জায়গায় রচিত হয়েছিল। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের সর্বসম্মত রায় হলো— শক্তিশালী শুদ্ধতা এবং শ্রেষ্ঠ দলিল-প্রমাণের দিক দিয়ে হিজাযের হাদীসসমূহ অন্য সবার ওপরে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে মুয়াত্তার স্তর

ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি যে, হাদীসের পণ্ডিতগণ হাদীসের কিতাবসমূহকে শ্রেণীর দিক দিয়ে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে কেবলমাত্র সেইসব রচনা স্থান পেয়েছে যাদের রচয়িতাগণ হাদীসের ইমাম এবং এ বিষয়ের বরণ্যে সমীক্ষক ছিলেন এবং যাঁদের রচনা বিশুদ্ধতা, দলিল প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে মুহাদ্দিসীনগণের দৃষ্টিতে সবচাইতে উত্তম এবং যাদের বর্ণনাকারীগণ হাদীসের হাফেয, এছাড়া দলিল প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসাবে খ্যাত ও পরিচিত। উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের দিক দিয়ে যে যতোটা কম স্তরে, মানের দিক দিয়ে ঠিক সেভাবেই দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী।[১] এই দুই স্তরের ছয়খানি কিতাবকে "সিহাহ্ সিত্তাহ্" বলা হয়ে থাকে। ইবনে আসীর (ওফাত ৬০৬ হিঃ) জামিউল উসূলে এই ছয়খানা কিতাবকে একত্রিত করেছেন।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে 'মুয়াত্তার' অবস্থান ঃ মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম প্রথম শ্রেণীর এই তিনের মধ্যে মুয়াত্তার অবস্থান প্রশ্নে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাধারণ আলেমগণ তাকে মুসলিম এমনকি তিরমিযীরও পরে স্থান দিয়ে থাকেন। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ প্রাচীন এবং সাধারণ পূর্বসূরীগণের মধ্যে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী ও শাহ্ আবদুল আজীজ প্রমুখ মুয়াত্তাকে বুখারীর চাইতেও উন্নত মানের বলে মনে করেন।

আমাদের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা এই দুই মহাত্মনের মতামতকে অনুসরণ কে:

বুখারী ও মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্ব যদিও অধিক বর্ণনা, অধিক মরফুযাত এবং মুরসাল ও মওকুফ হাদীসসমূহ থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে তা ঠিক আছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তো শুধু শুদ্ধতা, সনদসমূহের উৎকৃষ্টতা এবং খ্যাতির ভিত্তিতে। এটা সত্য কথা যে, মুয়াত্তায় মুরসাল মওকুফ ও মুনকাতে হাদীস রয়েছে। যা নীরেট শুদ্ধতার ক্ষেত্রে বাঞ্চনীয় নয়। কিন্তু তার রেসাল, ওয়াক্ফ এবং ইনফেতা মুয়াত্তার বর্ণনা অনুযায়ী সঙ্গত, তবে বাস্তবতার দৃষ্টিতে এই সকল মুরসাল মওকুফ ও মুনকাতে, মুত্তাসেল মরফু ও সনদসম্মত এবং খোদ তার এই রফা' ও ইত্তেসাল এবং এ সনদের ওপরে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী প্রমুখের সত্যায়িত করা সীলমোহর লাগানো আছে। এমতাবস্থায় লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, মুয়াত্তার শুদ্ধতার অবস্থান তাহলে কোথায় গিয়ে পৌছায় ?

মুয়াত্তার সবচাইতে বড় যে মর্যাদা! তাহলো তা ইসলামের সর্বপ্রথম কিতাব। কালামুল্লাহ্র পরে দ্বিতীয় যে শুদ্ধ কিতাব কালামুর রাসূল (স) তা মুয়াত্তার অবয়ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাশফুয্যুনুনে বলা হয়েছে ঃ

---

১. হুজ্জাতুল্লাহেল কফেগাহ্। প্রসঙ্গ ইমাম বাদীস।

www.pathagar.com

اول كتاب وضع فى الاسلام مؤطا مالك بن انس

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে কিতাব লেখা হয়েছে তা 'মুয়াত্তা'।

কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী (ওফাত ৫৪৬ হিঃ) মুয়াত্তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

هذا اول كتاب الف فى شرايع الاسلام -

এটাই প্রথম কিতাব যা ইসলামী শরীয়তের ওপর লেখা হয়েছে।

হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ

اول من صنف الصحيح مالك والفضل للمتقدم -

সর্বপ্রথম মালিক 'শুদ্ধকে' লিপিবদ্ধ করেছেন।

সময়ের প্রাচীনতাই মুয়াত্তার অগ্রবর্তিতার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তার পরের কিতাবসমূহ, যদিও তা মুয়াত্তারই দ্বিতীয় সংস্করণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু সমকক্ষতার দাবি করতে পারে না। সুতরাং তার ব্যাপারে মুজতাহিদীন ইমামগণ এবং হাদীসের বিশেষজ্ঞগণের অত্যন্ত শক্তিশালী সাক্ষ্যসমূহ বর্তমান! ইমাম শাফেয়ী (ওফাত ২০৪ হিঃ) বলেন ঃ

ماعلى وجه الارض من كتاب بعد كتاب الله اصح من مؤطا مالك ابن انس

পৃথিবীর বুকে কিতাবুল্লাহ্‌র পরে কোন কিতাব মুয়াত্তা মালিক বিন আনাসের চাইতে শুদ্ধতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।

আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন ঃ

هـذا اول كتاب وضع فى الاسلام وهوا اخره التى لم يؤلف مثله -

এটা ইসলামের সর্বপ্রথম কিতাব এবং সব শেষেরও বটে! কেননা পরে এই রকম আর কোনো কিতাব লেখা হয়নি।

ইমাম নুদী 'মুসলিমের' ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে তার ভূমিকায় নিজের নির্ভরতার কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

وقد وقع اعلى من هذاه الكتاب وان كانت عالية مؤط لامام مالك ....

وهو شيخ الشيوخ المذرو رين كلهم -

একখানি কিতাব আমি পেয়েছি যা এই সকল কিতাব (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী) থেকে উত্তম। ঐসব কিতাবও ভালো! তবে তা মুয়াত্তা নয়। যার রচয়িতা ইমাম মালিক। যিনি সকল মুহাদ্দিসীনদের শায়খগণের শায়খ।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ) লিখছেন ঃ কিতাবুল ঈমানে ইমাম শাফেয়ীর (রহ) এবং কিতাবুল আছারে ইমাম মুহাম্মদের যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়, তা মুয়াত্তারই অবদান।

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম যাঁদের কাছ থেকে সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমের জন্য হাদীসের বর্ণনা নিয়েছেন যদিও তাঁরা বর্ণনা পরম্পরার মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছেন কিন্তু ইমাম মালিকের মুয়াত্তার বর্ণনাকারীগণ যে পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব তা বুখারী এবং মুসলিমের নেই। এজন্য বিশিষ্ট ও সাধারণের বর্ণনা ও বলায় যে পার্থক্য রয়েছে নিশ্চিতভাবে তা মুয়াত্তা এবং অন্যান্য কিতাবের বর্ণনার মধ্যে বিরাজমান।

মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ এবং মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তিত্ব ইমাম মালিক থেকে মুয়াত্তার বর্ণনা করেছেন। এঁদের মধ্যে ইমাম আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক, মুহাদ্দিস আলতাকিয়াহ্ হাছীম জামিল, ইমাম মনসুর বিন সালমাহ্, মুহাদ্দিসে বাগদাদ আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব, মুহাদ্দিস মিশর ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া, ইমাম মুসলিমের উস্তাদ কুতাইবা ইবনে সো'ওদ প্রমূখ রয়েছেন। ফকীহ্গণের মধ্যে ফকীহ্ হিশাম বিন আবদুল্লাহ্ বিন কাসেম রচয়িতা মুদাওয়ানাতুল কুবরা। সুফীগণের মধ্যে হযরত যিন্নুন মিস্রী, খলিফার মধ্যে হাদী, মাহদী, হারুন, মামুন, আমীন এবং সাধারণ ওলামাদের মধ্যে প্রায় এক হাজার লোক মুয়াত্তা ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতী 'তানবীরুল হাওয়ালিক'-এ লিখেছেন যে, ইমাম মালিক থেকে বর্ণনাকারীর সংখ্যা এতো বেশি যে, ততোটা কোন ইমামের বর্ণনাকারীর নেই।

একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার যে, রাসূল (স) এবং হাদীস সংকলনকারীর মধ্যে স্তর মাধ্যম যতো কম হবে ততোটাই তার রচনা মূল্যমানের দিক থেকে বেশি হবে। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাসমূহ সাধারণভাবে পাঁচ-ছয়টি স্তর মাধ্যম সম্বলিত। মুয়াত্তার স্তর মাধ্যম দুই অথবা তিনটির থেকে বেশি নয়। ইমাম বুখারীর নিজের বিশটি তিন স্তরীয় সংগ্রহের উপর আত্মাভিমান রয়েছে অথচ মুয়াত্তার বুনিয়াদই তিন স্তরের ওপরে। এছাড়া এর মধ্যে চল্লিশখানি দুই স্তরীয়ও আছে। অর্থাৎ এমন হাদীস যাতে সংকলনকারী এবং রাসূল (স)-এর মধ্যে ব্যবধান মাত্র দু'টি স্তর মাধ্যমের।

মুয়াত্তার অনুলিপি ঃ অসংখ্য লোক বিভিন্ন কথা ও ভাষায় ইমাম সাহেবের কাছ থেকে মুয়াত্তা সংগ্রহ করেছেন। এতো অধিক সংখ্যা এবং অবস্থার বিভিন্নতা অনিবার্যভাবে যেসব সমস্যার সৃষ্টি করেছে তাহলো– প্রত্যেকটি বর্ণনার মধ্যে কোন না কোনভাবে শব্দগত বা বাক্য বিন্যাসে পার্থক্য অথবা অধ্যায়গুলো আগে-পরে উল্টো-পাল্টা হয়ে গেছে। এভাবে মুয়াত্তা ইমাম মালিক তিরিশটি ধরন নিয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যার মধ্যে ১৬টি অনুলিপি প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে আবার নির্ভরযোগ্যতার বিবেচনায় এগারটি প্রথম শ্রেণীর এবং এর চাইতেও বিশেষ বিবেচনার অধিকারী চারখানি। অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া, ইবনে বাকীর, আবু মুসআব এবং ইবনে ওয়াহাবের অনুলিপি। এই চতুষ্টয়ের মধ্যে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনাটি সর্বোত্তম। এর অধ্যায় বিন্যাসের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে 'কিতাবুল জানায়েয' দিয়ে (আন্ত্যেষ্টিক্রিয়া)। তার পরে কিতাবুস সালাত, কিতাবুয যাকাত, কিতাবুস সিয়াম। এর পরে অন্য সমস্ত অনুলিপি কিতাবুল হজ্বের পর থেকে বিভিন্ন ধারাবাহিক বিন্যাস। এ ধরনের পার্থক্য বুখারী মুসলিমসহ সবার মধ্যেই আছে।

১. ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহইয়া মাছমুদী ঃ আন্দালুসী বারবার নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন।[১] তাঁর দাদা তাদের বংশের প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কুরতুবাহ্তে

১. কাশফুয যুনুন, মুয়াত্তা প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র আবু আবদুল্লাহ্ যিয়াদ বিন আবদুর রহমান বিন যিয়াদ লাখমী দর্স দিতেন। ইয়াহ্ইয়া সর্বপ্রথম তার কাছ থেকেই সম্পূর্ণ মুয়াত্তার পাঠ শোনেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাংখা তাকে কুরতুবাহ্ থেকে বের করে ইমামের দরসগাহে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের কাছ থেকে সম্পূর্ণ মুয়াত্তা পড়ে নেয়ার সৌভাগ্য তার হয়নি। সে বছরই ইমাম সাহেব ইন্তেকাল করেন। এ কারণে ইয়াহ্ইয়ার অনুলিপিতে সকল হাদীস 'হাদ্দাছ্না মালিক' দিয়ে শুরু হয়। কিন্তু 'খুরুজ আল মু'তাকেফ ইলাল ঈদ', 'কাযা' আল ই'তেকাফ', নিকাহ্ ফিল ই'তেকাফ ইত্যাদি অধ্যায়গুলোতে 'হাদ্দাছনা যিয়াদ আন মালিক রয়েছে। অর্থাৎ মাঝখানে একটি মাধ্যম রয়েছে।[১]

ইমাম সাহেব ইয়াহ্ইয়াকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। মুসলিম স্পেনে সরকারীভাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত। মাত্র চারটি বিষয় ছাড়া বাদবাকী সব মাসআলায় তিনি ইমামের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন। ১৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮২ বছর জীবনকাল কাটিয়ে ২৩৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. **আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবের সংকলন ঃ** তিনি ছিলেন মিশরের অধিবাসী। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস লাইস ইবনে সো'ওদ মিছরীর কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। ইমাম সাহেবের সুখ্যাতি তাকে মিশর থেকে মদীনায় টেনে নিয়ে আসে। ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে সংকলন বা রচনা ইত্যাদির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার মন-মস্তিষ্ককে নির্বাচন করেছিলেন। "মাছমুআতে ইমাম মালিক" নামে তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সকল রচনাবলীতে মোট একলাখ বিশ হাজার হাদীস নিয়মসিদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে— যার সবই শুদ্ধ। যিলক্বাদ ১২৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শাবান ১৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. **আবদুল্লাহ্ বিন মস্লিমাহ্ কাআম্বীর অনুলিপি ঃ** মুহাদ্দিসীনগণ ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে হাদীস অনুধাবনের ব্যাপারে তাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেন। উস্তাদ ইমাম মালিকের সাথে আট বছর সময় কাটিয়েছেন। কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লে ইমাম সাহেব নিজে তার দেখাশোনা করতেন। মুহাররম ২২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. **মালিকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ্ ইবনুল কাসেমের অনুলিপি ঃ** মালিকী মাযহাবের প্রথম নথিভুক্তকরণ তাঁর দ্বারাই শুরু হয়েছিল। 'আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা' তাঁর লেখা। 'ফতোয়ায়ে ইমাম মালিককে' তিনি এক বিশাল গ্রন্থের রূপ দিয়েছিলেন। পরকালাকাঙ্ক্ষী খোদাভীরু এই মহান ব্যক্তিত্ব জ্ঞান জগতে কলম চালাতে যতোটা পারদর্শী ছিলেন জিহাদের ময়দানেও সমানভাবে তলোয়ার চালাতে পারতেন। রোম, বরবর, জান্জ প্রভৃতি যুদ্ধের ময়দানে জীবনের এক চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন। ১৯১ হিজরীতে মিশরে ইন্তেকাল করেন।

৫. **মো'ওন বিন ঈসা ঃ** ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী প্রমুখের শায়খ ছিলেন। ইমাম মালিক তাঁকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। খলিফা হারুন আর-রশীদ ইমামের মাজলিসে তারই পাঠ শুনেছিল। ইমাম সাহেবের চল্লিশ হাজার ফতোয়া তার মুখস্ত ছিল। মদীনায় ১৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, শাহ্ আবদুল আজীজ

www.pathagar.com

৬, আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ ঃ তিনি দামেস্কে জন্মগ্রহণ করলেও আন্দালুসিয়ায় বসবাস করতেন। ইমাম বুখারীর শায়খ ছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গুণমুগ্ধ প্রশংসাকারী।

৭. ইয়াহ্ইয়া বিন বাকীর ঃ ইমাম বুখারী সরাসরি এবং ইমাম মুসলিম একটি মাধ্যমের বরাতে তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিকের কাছে চৌদ্দবার মুয়াত্তা পড়েছেন। ইমাম মালিকের 'দ্বিতীয়া' সমূহ অর্থাৎ রাসূল (স) থেকে মাত্র একটি মাধ্যম পরে পাওয়া হাদীসসমূহের আলাদা একটি ক্ষুদ্র সংকলন তৈরী করেছিলেন। মুসলিম স্পেনের আলেমগণ (আন্দালুসিয়া) তাদের ছাত্রদের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে বরকতের আশায় এই সংকলন পাঠ করতেন। কতিপয় লোক তাদের অজ্ঞতার জন্য তাঁর খ্যাতির ওপর নানানভাবে আঘাত করেছে।

৮. সাঈদ বিন আফীর ঃ মিশরের বিখ্যাত আলেমদের অন্যতম। লাইস মিছরী এবং ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইলমে হাদীস ছাড়া ইতিহাস, জীবনী, সাহিত্য, বংশ পরম্পরা বিদ্যা এবং কাব্য রচনায় তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। ১৪৬ হিজরীতে জন্ম এবং ২২৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৯. আবু মুসআব যুহরী ঃ মদীনার শায়খগণের অন্যতম। যতোদিন তিনি বেঁচেছিলেন হিজাযের লোকেরা ইরাকী আলেমদের দিকে ফিরেও তাকাতো না। 'সিহাহ্ সিত্তায়' তাঁর বর্ণনা রয়েছে। সর্বশেষ যে মুয়াত্তা ইমাম সাহেবকে শোনানো হয়েছে তা তাঁরই বর্ণনা করা। ২৪০ হিজরীতে যখন তিনি ইন্তেকাল করেন তখন মদীনায় বিচারক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

১০ . মুসআব বিন আবদুল্লাহ্ ঃ মুয়াত্তার একজন নিবন্ধনকারী।

১১ . মুহাম্মদ বিন মুবারক ঃ মুয়াত্তার একজন নিবন্ধনকারী।

১২. সালমান বিন বারদ ঃ বারটি পাণ্ডুলিপি একত্রিত করে বিশাল এক কিতাব রচনা করেন।

১৩ . ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়ার পাণ্ডুলিপি

১৪ . আবু হুযাফাহ্ ছাহ্মী ঃ মুহাদ্দিসীন তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে সবার শেষে ২৫৯ হিজরীতে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেছেন।

১৫. আবু মুহাম্মদ সুইয়াদ বিন সাঈদ হারুবী ঃ মুসলিম এবং ইবনে মাজাহ্ তার থেকে বর্ণনা করেছেন। শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ২৪০ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন।

১৬. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাছান শাইবানী ঃ হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম। মুয়াত্তার তিনিও একজন সংকলক। শামে পৈতৃক নিবাস, জন্ম ওয়াসেতে, কুফায় বসবাস। ইমাম মালিকের কাছে হাদীস এবং ইমাম আবু হানিফার কাছে ফিকাহ্ শিখেছেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, হিসাব বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। ২৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মুহাম্মদ যেহেতু নিজের মতো করে মুয়াত্তার বিন্যাস করেছিলেন। তাই প্রত্যেকটি হাদীসের পরে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত মাসলাটিকে প্রমাণ করতে চেষ্টা পেয়েছেন এবং ইমাম মালিক ছাড়া ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত হাদীসও তিনি প্রাসাঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে এই সংকলনকে মুয়াত্তা ইমাম মালিক না বলে মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা

কোন রচনার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার সবচাইতে বড় প্রমাণ— ব্যাখ্যাকার, টিকাকার সমালোচক, পর্যালোচকদের একটা বড় অংশ তার পক্ষে চলে আসা। মানের প্রশ্নটা যেখানে বড়, পরিমাণের ব্যাপারটা সেখানে কোন ব্যাপার নয়। অর্থাৎ কৃতিত্ব ও সফলতায় তা কোন পর্যায়ে ছিলো! মুয়াত্তা এই দুটো দিক দিয়েই অত্যন্ত ভাগ্যবান। প্রায় পঁচিশজন বরেণ্য আলেম তার ব্যাখ্যা-পর্যালোচনা এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর কাজ করেছেন। এতো গেলো পরিমাণের দিক। এবার মানের দিক একটু দৃষ্টি দেয়া যাক!

এঁদের মধ্যে ইবনে হাবীব মালিকী, ওফাত ৪৩৯ হিজরী; ইমাম আবু সুলাইমান আলবাস্তি আল খেতাবী ওফাত ৩৮৮ হজিরী; ইবনে রশীক কিরওয়ানী, ওফাত ২৫৬ হিজরী; মুহাদ্দিস ইবনে আবদুল বার, ওফাত ৪৬৩ হিজরী; ইমাম বাজী আন্দালুসী, ওফাত ৪৭৪ হিজরী। কাজী আইয়াজ, ওফাত ৫৪৪ হিজরী; কাজী আবু বকর বিন আল আরাবী (রহ) ওফাত ৫৪৬ হিজরী; হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী; ওফাত ৯১১ হিজরী; আল্লামা জারক্বানী মিছরী, ওফাত ১১২২ হিজরী; শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ), ওফাত ১১৭৬ হিজরী; প্রমুখগণ অন্তর্ভূক্ত।

ইমাম খেতাবী, হাফেয সুয়ূতী, ইবনে আবদুল বার, ইবনে হাজ্‌ম, আবু আল অলীদ বাজী (রহ) প্রমুখগণ মুয়াত্তার ফতোয়াসমূহকে বাদ দিয়ে শুধু হাদীসসমূহের সংক্ষেপণ করেছেন। হাফেয সুয়ূতী মুয়াত্তার বর্ণনাকারী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বগণকে আলাদা করেছেন। আহমাদ বিন ইমরান, আখ্‌ফাশ বসরী ও কাজী আইয়াজ মুয়াত্তার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। বাজী এবং দারে কুতনী মুয়াত্তার বাতিল বা রহিতকরণ বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবু হাসান বিন মুহাম্মদ কাবেসী মুয়াত্তার শুধুমাত্র ধারাবাহিক সনদ সম্বলিত হাদীসমূহ একত্রিত করেছেন। ইবনে বাশকুল ও খতীব বাগদাদী শুধু তাঁদের ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন যারা ইমাম মালিকের কাছ থেকে মুয়াত্তার বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

ময়াত্তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, পৃথকিকরণ, সনদ সূত্র ও বর্ণনাকারী

এ পর্যায়ে আমরা তাদের সম্পর্কে একটা তালিকা তৈরী করেছি যারা কোন না কোনভাবে মুয়াত্তার খেদমত করেছেন।

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার বা রচয়িতা	বিবরণ বৈশিষ্ট্য
শরাহ্ মুয়াত্তা	আবু মারওয়ান বিন আবদুল মালিক বিন হাবীব মালিকী, ওফাত ২৩৯ হিজরী	মুয়াত্তার সবচাইতে পুরানো ব্যাখ্যা গ্রন্থ
আল তামহীদ লিমানীল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়া আল আসানীদ।	হাফেয বিন আবদুল বার কুরতুবী, ওফাতা ৪৬৩ হিজরী	মুয়াত্তার মানে বা অর্থের ব্যাখ্যা। তাতে ব্যবহৃত সনদসমূহের বিশ্লেষণ এবং এ প্রসঙ্গে ফিকাহ্ ও হাদীসের তথ্যসমূহ উপস্থাপন করেছেন।
আল ইসতেয্কার	হাফেয বিন আবদুল বার কুরতুবী, ওফাতা ৪৬৩ হিজরী	যার বিন্যাস বর্ণনাকারীর নাম অনুযায়ী, বর্নানুক্রমিক বিন্যাসের মাধ্যমে খোদ রচয়িতা তার গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করেছেন।
আল মুনতাক্বা (১) আল আয়েম্মা (২) আল ইনতিফা'আ (৩)	আবুল অলীদ সুলাইমান আল বাজী, ওফাত ৪৭৪ হিজরী	তিনখানিই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কিতাব।
আল ইনতিফা'আ	ইবনে রশীক কীরওয়ানী, ওফাত ২৫৬ হিজঃ শায়খ জাইনুদ্দীন ওমর হালাবী	ইবনে আবদুল বার-এর ভূমিকার সারসংক্ষেপ। ইবনে আবদুল বার-এর ভূমিকার সারসংক্ষেপ
শরাহ্ মুয়াত্তা	ইবনে আবী সাফরাহ্	ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ
শরাহ্ মুয়াত্তা	আল কাজী আবু আবদুল্লাহ বিন আলহাজ্জ্ব	ব্যাখ্যা
শরাহ্ মুয়াত্তা	আল অলীদ বিন আলউদ	ব্যাখ্যা

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার বা রচয়িতা	বিবরণ বৈশিষ্ট্য
শরাহ্ মুয়াত্তা	আবুল কাসেম বিন আল জাদ্ আল কাতেব	ব্যাখ্যা
শরাহ্ মুয়াত্তা	আবুল হাসান আল আশবীলী	ব্যাখ্যা
শরাহ্ মুয়াত্তা	আবু ওমর আল তলীতলী	ব্যাখ্যা
আল ক্বাবীস	কাজী আবু বকর বিন আল আরাবী আল গারবী, ওফাত ৫৪৬ হিজরী	ব্যাখ্যা
আল মুক্বতাবেস	আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বাত্লিউসী, ওফাত ৫২১ হিজরী	ব্যাখ্যা
আল মাও'আব	আবুল অলীদ বিন সাফার	ব্যাখ্যা
আল মুসতাক্সা	ইয়াহ্ইয়া বিন মাজীন	ব্যাখ্যা
আল-ক্বার্ব	মুহাম্মদ বিন জুমনাইন	ব্যাখ্যা
আল মাসালিক	আবু বকর বিন সাবেক্ব আসসাক্বলা	ব্যাখ্যা
শরাহ্ মুয়াত্তা	ক্বাজী মুহাম্মদ বিন সুলাইমান বিন খলিফা	ব্যাখ্যা
কাশফুল মুনতাআ আন আল মুয়াত্তা	হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিজরী	ব্যাখ্যা
তানবীরুল হাওয়ালিক আল মুয়াত্তা মালিক	হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিজরী	ব্যাখ্যা
তাজরীদ হাদীস মুয়াত্তা	হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী	ব্যাখ্যা
শরাহ্ জারক্বানী	মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাক্বী জারক্বানী মালেকী। ওফাত ১২২ হিজরী	তিন খণ্ডের মুয়াত্তার শুধু হাদীস সংকলন
শরাহ্ মুয়াত্তা	বীরী জাদাহ্ হানাফী মুফতী মক্কা	ভূমিকা মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ মওলানা আবদুল হাই

www.pathagar.com

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার বা রচয়িতা	বিবরণ বৈশিষ্ট্য
শরাহ্ মুয়াত্তা	শায়খ আলী ক্বারী হানাফী	ভূমিকা, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, মওলানা আবদুল হাই
আল মুসফা	শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ওফাত ১১৭৬ হিঃ	পর্যালোচনা। আরবী ভাষায় লেখা। ফিকহী মতপার্থক্যের বিস্তারিত বর্ণনা
আল মাসওয়া	শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) ওফাত ১১৭৬ হিজরী	ফার্সী ভাষায় লিখিত মুয়াত্তার দার্শনিক বিশ্লেষণ
আল মুজাল্লা[1]	শায়খুল ইসলাম হানাফী দেহলভী, ওফাত ১২৫২ হিঃ	অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা। মূল পাণ্ডুলিপি বাঁকিপুর লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।
তাজরীদ ও ইসমাদ		
মুসনদে আহাদীস আল মুয়াত্তা	আবুল কাসেম আবদুর রহমান আল গাফেক্বী আল মাসরী, ওফাত ৩৮১ হিঃ	মুয়াত্তার মুসনাদ ও মুত্তাসাল হাদীসমূহের বাছাই, বিন্যাস ও বর্ণনা
মূলখাস মুয়াত্তা	ইমাম আবু সুলাইমান আল খেতাবী আল বাস্তী। ওফাত ৩৮৮ হিজরী	”
আলতাগতা বেহাদীস আল মুয়াত্তা।	ইবনে আবদুল বার আল কুরতুবী। ওফাত ৪৬৩ হিজরী	”
আল মুখলাস	আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ ক্বাবুসী ওফাত ৪০৩হিঃ	মুয়াত্তার মুসনাদ ও মুত্তাসাল হাদীসের নির্বাচন, বিন্যাস ও বিবরণ
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	কাসেম বিন আসবাগ	”
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	আবুল কাসেম আল জাওয়াহিরী	”
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	আবু যার আল হারুবী	”
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	আবুল হাসান আলী বিন হাবীব আল সিলজুমাসী	”
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	আল মুতরায	”
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	আহমাদ বিন কাহ্‌রা'আ	”
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	আল ফারেসী	”
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	আল কাজী ইবনুল মুফরাজ	”

১. এই তালিকায় কোন সন্দেহ সংশয় থাকলে দেখতে হবে কাশকুয্যুনুন, তায্ঈনুল মামালিক ক্বাজী আইয়ায্।

www.pathagar.com

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার বা রচয়িতা	বিবরণ বৈশিষ্ট্য
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	ইবনুল আ'রাবী	মুয়াত্তার মুসনাদ ও মুত্তাসাল হাদীসের নির্বাচন, বিন্যাস ও বিবরণ
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	আবু বকর আহমাদ বিন সাঈদ বিন নাউদাহ্ আল আখমীমী	”
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	আবু ওমর আল তলীতলী	মুয়াত্তায় কা'আম্বীর বর্ণিত হাদীসসমূহের বিন্যাস ও বিবরণ
মুসনাদ আল মুয়াত্তা	ইব্‌রাহীম বিন নসর আসসার -কাস্‌তী	”
ইখতেলাফুল মুয়াত্তা'আত		
ইখতেলাফুল মুয়াত্তা'আত	হাফেয আবুল হাসান আদ দারে কুৎনী	মুয়াত্তার বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা এবং পাণ্ডুলিপিসমূহের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ।
ইখতেলাফ আল মুয়াত্তা	আবুল অলীদ সুলাইমান আল বাজী	”
রিজাল আল মুয়াত্তা		
রিজাল আল মুয়াত্তা	আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া আল খুদা'আ	মুয়াত্তার বর্ণনাকারী ব্যক্তিত্ব গণের সার্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ
”	আবু আবদুল্লাহ্ বিন আল মুফরাজ	”
”	আল বারতী	”
”	আবু ওমর আল তলীতলী	”
ইসআফ আল মুবতা বেরিজাল আল মুয়াত্তা	হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী	”
গারীবুল মুয়াত্তা		
গারীবুল মুয়াত্তা	আহমদ বিন ইমরান আল আখফাস্	মুয়াত্তার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
”	আবুল কাসেম আল উসমানী আল মাসরী	”
”	আলবারতী	”
মাশারেক আল আনওয়ার	কাজী আইয়াজ	বুখারী মুসলিম এবং মুয়াত্তার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা

www.pathagar.com

মালিক থেকে মুয়াত্তার বর্ণনাকারীগণ		
তাসমিয়াহ্ মিন রাওয়া আল মুয়াত্তা আন মালিক	আবুল কাসেম বিন বাশকুল আন্দালুসী	ইমাম মালিক থেকে যারা মুয়াত্তার বর্ণনা করেছেন তাদের সার্বিক অবস্থার বিবরণ।
রাওয়াহ্ মালিক	মুহাদ্দেস খতীব বোগদাদী	„
„	কাজী আইয়াজ	„
ইযাবুল মাসালিক বেরাওয়াহ্ আল মুয়াত্তা আন মালিক	হাফেয শামসুদ্দীন দামেস্কী	„
বিবিধ		
আত্তাক্সা	ইবনে আবদুল বার আন্দালুসী	মুয়াত্তার মুনকাতে, মুরসাল স্বতন্ত্র অলংকারসমূহের সংযক্তি, উথাপন এবং সনদ প্রদান
আতরাফুল মুয়াত্তা	আবু বকর বিন সাবেত আল খতীব	„
তাওজীহুল মুয়াত্তা	আবু আবদুল্লাহ্ বিন ঈশওন আল তলী তলী	„
আস্সাফের আন্ আসারুল মুয়াত্তা	আযেম বিন মুহাম্মদ বিন জাযেম	চল্লিশ পর্বে মুয়াত্তার ইতিহাস ঐহিত্যের আলোচনা
তাজুল হুলিয়া	আবু মুহাম্মদ বিন ইয়ারবু	মুয়াত্তার সনদসমূহ নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা
জামা'আ আল মুয়াত্তা	ইবনে জুছা	মুয়াত্তার বিভিন্ন সংকলনের সম্মিলিত রূপ
মাশায়েখে মালিক	ইমাম মুসলিম	ইমাম মালিকের উস্তাদগনের বিস্তারিত বিবরণ।

মুয়াত্তার আরও একটি শ্রেষ্ঠত্ব ঃ খলিফা-সুলতানদের মধ্যে এমন অনেকেই গত হয়েছেন যারা অশি এবং মশি অর্থাৎ কলম ও তলোয়ার সমান দক্ষতার সাথে চালাতে জানতেন। জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসন এবং অতি সাধারণ কাষ্ঠ নির্মিত মসজিদের মিম্বর দুটোর ওপরেই তাঁরা সমানভাবে সম্মানিত হতেন। কিন্তু কারো ব্যাপারে এমন কোন ইতিহাস নেই যে, তিনি জ্ঞান ও হাদীসের সনদের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেরিয়েছেন এমতাবস্থায় যে, স্বয়ং তাঁর নিজের প্রাসাদ সময়ের সকল উস্তাদ এবং আলেম সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। একমাত্র 'মুয়াত্তা' সেই সম্মানিত কিতাব যার জন্য— মাহদী, হাদী, রশীদ, মামুন এবং আমীনের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী খলিফাগণ পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল-মুরুভূমি সব একাকার করে ফেলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী বীর মহান সুলতান সালাহ উদ্দীন আইউবীও কাহের থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র এই মুয়াত্তার জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ পথ পরিক্রমার কষ্ট স্বীকার করেছিলেন।[১]

১. তায্ঈনুল মামালিক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী (রহ)

জন্ম ১৫০ হিজরী, ওফাত ২০৪ হিজরী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যসমূহ

▼ বংশকূলের উর্ধ্বগতি রাসূলে পাক (স)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। হাশেমী এবং মুত্তালেবী ছিলেন হাদীস বিষয়ের অদ্বিতীয়, অনন্য। ফিকাহয় كتاب الام তাঁর অবদান। এক অর্থে নিজের তুলনা নিজেই।

▼ দুর্গম সত্য পথের অবিচল অভিযাত্রী। বিপদ, মুসীবত, দুঃখ-কষ্টের একান্ত আপনজন।

▼ বড় মাপের তর্কবাগীশ ছিলেন। সত্য সন্ধানে শহর বন্দর ঘুরে বেড়িয়েছেন। বড় বড় মনীষীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন সত্য উদঘাটনের জন্য।

▼ তাঁর মাযহাব কিছুকালের জন্য মিশরের রাষ্ট্রনীতি ছিল। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব জনগণের মধ্যে আজও বিদ্যমান। শাফেয়ী মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা মিশরে প্রচুর।

www.pathagar.com

জন্ম, বাল্যকাল এবং প্রতিপালন

নাম মুহাম্মদ। ডাক নাম আবু আবদুল্লাহ্। উপাধী নাসেরুল হাদীস। শাফেয়ী তার প্রো-পিতামহের নাম শাফে' থেকে চলে এসেছে।

বংশ পরম্পরা মুহাম্মদ বিন ইদরিস বিন আব্বাস বিন উসমান বিন শাফে' বিন সায়েব বিন ওবায়েদ বিন আরদ বিন হাশেম বিন আবদুল মুত্তলেব বিন আব্দে মানাফ আল কুরাইশী আল হাশেমী আল মুত্তালেবী। সপ্তম পুরুষে উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে মিলে যায়। বংশ পরিচয়ের দিক থেকে এর চাইতে মর্যাদার আর কি হতে পারে! আল্লামা তাজুদ্দীন সাব্কি (রহ) তাঁর মাতাকে 'হাশেমীয়াহ্' হিসেবে সনাক্ত করেছেন।

কিন্তু আসলে তাঁর মাতা 'আয্দ' নামে ইয়েমেনের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গোত্রের মেয়ে।

পিতা ইদরীস বিন আব্বাস মদীনার কাছে উপশহর 'তাবালাহ'র বাসিন্দা ছিলেন। পরে মদীনায় চলে আসেন। রুটি রুজির খোদাই অনুগ্রহ সন্ধানে শামেও এসেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আস্কালানে স্থায়ী হয়ে যান। ইমাম শাফেয়ীর প্রো-পিতামহ এবং তাঁর বাবা সাহাবী ছিলেন।

السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف المطلبى جدامام الشا فعى رضى الله عنه ذكر الخطيب فى ترجمة الشافعى بغير اسنادان السائب اسلم يوم بدروكان صاحب رايته بنى هاشم مع المشركين فاسر فقد انفسه واسلم قال البيهقى فالسائب بن عبيد صحابى وابنه شافع صحابى واخوه عبد الله بن السائب صحابى -

সায়ব বিন উবায়েদ বিন আব্দে ইয়ায়িদ বিন হাশেম বিন মুত্তালবে বিন আবদে মানাফ মুত্তালেবী ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাদা। কোন সনদ ছাড়াই খতীব ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে লিখেছেন যে, বদর যুদ্ধের সময় সায়েব ঈমান এনেছিলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকদের পতাকা বহনকারী। পরাজিত হয়ে বন্দী হলে তার মুক্তিপণ আদায় করে ছাড়িয়ে নেয়। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বাইহাকী বলেছেন, সায়েব বিন উবায়েদ সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর পুত্র শাফে সাহাবী। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ বিন আস সায়েবও সাহাবী।[১]

১. আসাবা ফী মা'বেকাতুস্ সাহাবা

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ

সম্মানিত পরিবারে রজব ১৫০ হিজরীতে ইজ্‌জায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাঁর জন্মের অল্প কিছুদিন পূর্বে মারা যান। তিনি বলতেন ঃ আমি ইজ্‌জায় জন্মেছি তারপর আমার মা আমাকে আসকালানে নিয়ে চলে গেছেন।

লালন-পালন ঃ পিতার স্নেহ-ছায়া জন্মের পূর্বেই উঠে গিয়েছিল। মা দুধ খাওয়ানোর দু'টি বছর কাটিয়ে নিজ গোত্রের নিবাস ইয়েমেনে চলে আসেন। মামার স্নেহ-যত্নে পূর্ণ আট বছর এখানেই কাটান। সাত বছর বয়সে কুরআনের হেফ্‌য শেষ করেন এবং দশ বছর বয়সে মুয়াত্তা ইমাম মালিকও মুখস্ত করে ফেলেন।[১]

একটি স্বপ্ন এবং তার তাবীর ঃ তিনি বলেন, একদিন স্বপ্নে দেখলাম, রাসূল (স) আমাকে বলছেন, হে বালক কোন বংশের ছেলে তুমি ? আমি বললাম, আমি আপনার বংশের ছেলে। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে এসো। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তিনি তাঁর মুখের লালা আমার জিহ্বা, ঠোঁট এবং মুখে মাখিয়ে দিলেন, বললেন, যাও আল্লাহ্ তোমার ওপর কল্যাণের দরজা খুলে দেবেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, সেই বয়সে আবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, রাসূলে কারীম (স) কাবা শরীফে নামায পড়াচ্ছেন। নামায শেষ হলে লোকদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক ভাষণ দিচ্ছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম— ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) আমাকেও কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি তাঁর আস্তিনের ভেতর থেকে একটা দাড়ি পাল্লা বের করে বললেন, তোমাকে আমি এটা দিলাম।

একজন বিখ্যাত স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীর কাছে গিয়ে স্বপ্নের কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র রাসূল (স) প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতির বিকাশ এবং প্রচারের তুমি একজন বড় মাপের ইমাম হবে।[২]

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ

লেখাপড়া শিখে বংশের মর্যাদা অনুযায়ী মানুষ হবার জন্য মা ছেলেকে মক্কায় চাচার কাছে পাঠিয়ে দেন। বংশ মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি আরব সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বয়স মাত্র দশ কি এগার। চাচার আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। শুধু শিক্ষার পেছনে সময় কাটানো সম্ভব হয়ে উঠছিল না। একজন বংশ বিশারদের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে। তিনি পরামর্শ দিলেন আগে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করো, তারপর লেখাপড়া শিখো! অথচ মনপ্রাণ ঝুঁকে আছে লেখাপড়ার দিকে। শুধুই জানতে ইচ্ছা করে। কখনো কোন আলেমের কাছে কোন হাদীস বা মাসলা শুনলে সাথে সাথে তা হাড্ডির উপরে লিখে ফেলতেন এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে সেই হাড্ডিটা একটা মাটির কলসিতে রেখে দিতেন। ইতিমধ্যে তা মুখস্তও হয়ে যেতো। এভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

মক্কার মুফতি এবং ইমাম মুসলিম বিন খালেদ যনজী ফিকাহ্ এবং হাদীসের বড় আলেম। তিনি মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরী, আমরুদ বিন দীনার ও ইবনে জারীহ্-এর কাছ থেকে ইল্‌ম

১. তাওয়ালা আত্‌তাসীস, ইবনে হাজার
২. আকমাল

www.pathagar.com

শিখেছেন। মক্কার পরিবেশে থেকে এসব কথা শাফেয়ীর জানা হয়ে গেছে। একদিন মনস্থির করে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুসলিম বিন খালেদ যন্‌জী প্রতিভা চিনতে ভুল করেননি। রেখে দিলেন শাফেয়ীকে নিজের কাছে। পুরো তিনটি বছর। ফিকাহ্‌ ও হাদীসের শিক্ষা খালেদ যন্‌জীর দরসগাহে যতোটুকু ছিল তা সম্পূর্ণ হলো।

ইমাম মালিকের জ্ঞান-গরিমার চর্চা এ প্রতিষ্ঠানে নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই চর্চা থেকেই শাফেয়ীর (রহ) মনে ইমাম মালিকের দর্শন এবং সান্নিধ্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। উস্তাদ মুসলিম বিন খালেদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মনের গোপন বাসনা ব্যক্ত করেন। মালিক ভক্ত উস্তাদ সাথে সাথে একখানা সুপারিশপত্র ইমামের বরাবরে লিখলেন। যে যুবককে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি, সে এখন আপনার মতো মহাত্মনের ছাত্র হওয়ার জন্য মনেপ্রাণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি তার মধ্যে এক অসাধারণ প্রতিভার স্ফূরণ দেখেছি। দেখেছি ঐশী জ্ঞানের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ।

আর্থিক সঙ্গতি বলে নিজের কাছে কিছুই নেই। নেই চাচার কাছে ভ্রাতুষ্পুত্রকে এতোটুকু সাহায্য করার মতো সঙ্গতি। শেষ পর্যন্ত মুসআব বিন যুবায়েরের কাছে বিত্তান্ত খুলে বললো। নিজের কাছে না থাকলেও সে অন্য একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির শরণাপণ্ন হলো। যা হোক, সাহায্য হিসেবে তিনি একশত দীনার সত্যি সত্যিই দিয়ে দিলেন। এরপরে শাফেয়ী (রহ)-এর আয়োজন এবং যাত্রা করতে আর দেরী হয়নি। দেরী যা তা মদীনা পৌঁছাতে যে কয়দিন। লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে সোজা ইমাম মালিকের বাড়িতে এসে হাজির। পরিচারিকার মুখে এক আগন্তুকের খবর পেয়ে ইমাম সাহেব বসার ঘরে এসে দেখলেন, এক নব্য যুবক। কুশলাদি বিনিময়ের পর শাফেয়ী (রহ) খালেদ যান্‌জীর পত্রখানী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ইমামের হাতে দিলেন। ইমাম চিঠিখানা পড়ে দুমড়ে-মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। রেগে আগুন হয়ে গজ গজ করতে করতে অনেকটা আপন মনেই যেন বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্‌! রাসূল আইলাইহিস সাল্লামের ইল্‌ম আজ এ পর্যায়ে নেমে গেছে যে, তাকে শেখার জন্য কারো সুপারিশপত্র লাগবে ? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়া বেচারা শাফেয়ী তখন খুব অনুনয়-বিনয় করে তাঁর নিজের প্রচণ্ড আগ্রহের কথা বললেন। ইমাম সাহেব আগন্তুক যুবকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখলেন। নীরব দৃষ্টি বুলিয়ে কি যেন বুঝে নিলেন! শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম ? শাফেয়ী (রহ) অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে জবাব দিলেন ঃ মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস। ইমাম সাহেব বললেন, اتق الله فسيكون لك شان —'আল্লাহ্‌ তা'আলার ভয়কে মনে জাগরূক রেখো, তোমার জন্য অনেক বড় মর্যাদা অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

শিক্ষা এবং বিভিন্ন বিষয়ের উস্তাদ ও শায়খগণ

শায়খগণের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন। অধিকাংশ শায়খের পদ্ধতি ছিল, কোন উঁচু জায়গায় তাঁরা বসতেন অথবা দাঁড়াতেন। ছাত্র সম্মুখের মেঝেতে হাঁটু পেতে বসতো। উস্তাদ লিখিত বর্ণনা পড়তেন অথবা মুখে বলতেন, সাথে থাকতো সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ছাত্ররা তা শুনতো এবং লিখে নিতো। কিন্তু মদীনার শায়খগণের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তাঁরা তাদের সংগৃহীত হাদীস, তদীয় মাসলা এবং ইজতিহাদী ফতোয়া ও পর্যালোচনা নিজেরাই লিখতেন। শ্রেণীকক্ষে কোন যোগ্য ছাত্রকে পড়তে দিতেন এবং শায়খ তার ওপরে যেখানে যা ব্যাখ্যা বা আলোচনা প্রয়োজন তা করতেন। ইমাম মালিকের দরসগাহে ইবনে হাবীব, মো'ওন বিন ঈসা, ইয়াহ্ইয়া প্রমূখ এই পাঠের দায়িত্ব পালন করতেন। যে কারণে বুখারী শরীফে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনাসমূহে 'হাদ্দাসনা' বা আখবারনার পরিবর্তে 'কারাআতু আলা মালিক' অর্থাৎ ইমাম মালিকের সম্মুখে আমি পড়েছি।

ইমাম মালিকের দরসের মজলিস অত্যন্ত পবিত্র ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। পবিত্র দেহ, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা শিক্ষার্থীগণ। সম্মান ও মর্যাদার প্রতিমূর্তি উস্তাদ। তাঁর চাইতে অনেক বেশি সম্মানিত বিষয়, মানবতার মুক্তি দূত সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল (স)-এর বাণীসমূহ শেখা ও শিক্ষাদানের কর্মশালা। আগর কাঠের পবিত্র গন্ধযুক্ত ধোঁয়া উড়ছে আগরদানী থেকে। ঐশী জ্ঞানের আলোকধারায় উদ্ভাসিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় অবনত হৃদয়গুলো নীরব অথচ সচেতন সজাগ। শাফেয়ী (রহ) বলেন, আমাদের খাতার একটা পাতা উল্টাতেও আমরা ভয় পেতাম, কি জানি তাতে যদি এই পরিবেশের ধ্যানভঙ্গ হয়! ইমাম মালিক (রহ) এক পর্যায়ে শাফেয়ী (রহ)-কেও শ্রেণীকক্ষে 'পাঠের' সুযোগ দিয়েছিলেন।

দরস শেষে ছাত্রদের মৃদু কোলাহল, ফতোয়া নিতে আসা লোকদের ভীড়, রাজদরবার থেকে বিভিন্ন পরামর্শ নিতে আসা রজন্যবর্গ, সাক্ষাত ও বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আসা সমসাময়িক ওলামায়ে কেরাম, সব মিলিয়ে সে এক শাহী দরবারের ব্যস্ততা।

শাফেয়ী (রহ) এই মহান জ্ঞান চর্চার শাহী দরবারে একটানা তিন বছর পর্যন্ত হাদীস, সাহাবাগণের ঐতিহ্য, তাবেয়ীনগণের ফতোয়া এবং বিশেষ করে ইমাম মালিকের ফিকাহ্ ইত্যাদি বিষয়সমূহ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আত্মস্থ করেছিলেন। এরপরে মদীনার অন্যান্য শায়খগণ, যেমন হযরত ইব্রাহীম বিন সো'ওদ আনসারী, আবদুল আজীজ বিন মুহাম্মদ দরাদরদী, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল ফাদীক, আবদুল্লাহ্ বিন নাফে' আস্সায়েগ (রহ) প্রমুখের কাছ থেকে অসংখ্য বর্ণনা, সাহাবাগণের কর্মপ্রক্রিয়া এবং তাদের ফতোয়াসমূহ অধ্যয়ন করেছেন। ফলে বর্ণিত হাদীসের ক্রটি বিচ্যুতি নির্ণয় ও সংস্কার অর্থাৎ ছাঁটাই-বাছাই করার নীতি-পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝে নিয়েছিলেন।

ইমাম মালিক (রহ)-এর সংগ্রহ সংরক্ষণে দশ হাজার হাদীস ছিল, কিন্তু এর মধ্যে সাহাবাগণের উক্তি ও ফতোয়াসমূহ এবং তাবেয়ীনগণের উক্তিসহ মুরসাল মওকুফ ও মুসনাদ

বর্ণনাসমূহও ছিল তার অন্তর্ভুক্ত।[১] শাফেয়ী (রহ) ইমাম মালিক (রহ)-এর সঙ্গ-সান্নিধ্যে থেকে এর সবই আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। এছাড়া ওপরে উল্লেখিত মাদানী আলেমগণের কাছ থেকেও সাহাবাগণের কর্মপদ্ধতি (আসার) ও মুসনাদ বর্ণনাসমূহের আর এক বিশাল ভাণ্ডার এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনগণের বিভিন্ন মতপার্থক্যের বিষয় ও ফতোয়াসমূহকে ভাল করে জেনে-বুঝে নিয়েছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর সূক্ষ্মদর্শিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা

ইমাম মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) যখন মদীনায় তাঁর ছাত্রজীবন শেষ করেছেন সেই সময়ে একদিন ইমাম মালিকের মজলিসে এসে এক আগন্তুক নিবেদন করলো যে, আমি ময়না পাখির ব্যবসা করি। একজন লোকের কাছে আমি একটি ময়না বিক্রি করার সময় বলেছিলাম যে, আমার ময়না খুব সুন্দর ডাকে। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এসে বললো— কই, তোমার ময়না তো কিছুই বলে না। আমি বললাম, বলে তো! সে বললো না, বলে না। এভাবে একপর্যায়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেলো। রাগের মাথায় আমি বলে ফেললাম, আমার ময়না কখনো চুপ থাকে না, যদি থাকে তাহলে আমার বউ তালাক হয়ে যাবে। এখন দয়া করে বলুন, বউ তালাক হয়নি তো! ইমাম মালিক (রহ) বললেন ঃ তোমার বউ তালাক হয়ে গেছে। বেচারা নিরাশ হয়ে বাড়ির পথ ধরলো। শাফেয়ী (রহ) এতোক্ষণ সব দেখছিলেন, ইমামের ফতোয়া শুনে লোকটি বেরিয়ে যাবার পর তিনিও নীরবে লোকটির অনুসরণ করলেন। কিছুদূর এগিয়ে এসে পেছন থেকে লোকটিকে ডাক দিলেন, সে থামলো। শাফেয়ী (রহ) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পাখিটা কি বেশির ভাগ সময় ডাকাডাকি করে আর মাঝে মাঝে চুপ থাকে! নাকি বেশিরভাগ চুপ থাকে আর মাঝে মাঝে ডাকে। লোকটি বললো না, সে বেশিরভাগ সময় ডাকাডাকি করে আর মাঝে মাঝে চুপ করেও থাকে। শাফেয়ী (রহ) বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার বউ তালাক হয়নি বলে ফিরে এসে আবার জলসায় বসে গেলেন। লোকটি আবার ফিরে এলো। ইমাম সাহেবের কাছে এসে অনুনয় করে বললো ঃ জনাব, আমার ব্যাপারটা আবার একটু ভেবে দেখুন। ইমাম মালিক (রহ) বললেন, আমার জবাব একই, তোমার বউ তালাক হয়ে গেছে। লোকটি শাফেয়ী (রহ)-এর দিকে ইশারা করে বললো, আপনার মজলিসের এই নওজোয়ান একটু আগে আমাকে গিয়ে বললো, তুমি নিশ্চিত থাকো তোমার বউ তালাক হয়নি। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার পাখি বেশি ডাকে না বেশি চুপ থাকে ? আমি বললাম, বেশি ডাকে। তখন সে বললো, যাও তালাক হয়নি। ইমাম মালিক ভয়ানকভাবে রেগে গিয়ে বললেন, বেশি আর কমের এখানে কি প্রশ্ন ? ইমাম শাফেয়ী (রহ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনিই আব্দুল্লাহ্ বিন জিয়াদের একটি বর্ণনা থেকে বলেছেন যে, ফাতেমা বিনতে কায়স রাসূলুল্লাহ্‌র (স) কাছে এসে বলেছিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) মুয়াবিয়া ও আবু জাহান যে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এখন আপনি বলে দিন, এই দু'জনার কাকে আমি বিয়ে করবো ? রাসূল (স) বললেন, মুয়াবিয়া তো নিঃস্ব আর আবু জাহান কখনো তার কাঁধ থেকে কাঠের বোঝাই নামায় না! অথচ রাসূল (স) খুব ভাল করেই জানতেন যে, আবু জাহান খায়-দায় ঘুমায় এবং অন্যান্য কাজও করে। এ থেকে আমি অনুমান করেছি যে, রাসূল (স) আসলে যা বলতে চেয়েছেন তাহলো আবু জাহান অধিকাংশ সময়ই কাঠের বোঝা বয়ে বেড়ায়।

১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

www.pathagar.com

সে অনুযায়ী আমি ফতোয়া দিয়েছি যে, ময়না যেহেতু বেশিরভাগ সময় ডাকাডাকি করে সেহেতু তোমার কথাই ঠিক আছে এবং তোমার বউ তালাক হয়নি।

ইমাম মালিক (রহ) এবার লোকটির দিকে ফিরে বললেন, যাও ভাই, তোমার বউ সত্যি সত্যিই তালাক হয়নি। শাফেয়ী (রহ)-এর যুক্তি ছিল অকাট্য, তার এই সূক্ষ্মদর্শিতা এবং বিষয় অনুধাবনের বিদ্যুৎগতি ইমাম মালিক (রহ)-কে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ যাও, আমি অনুমতি দিলাম। তোমার মধ্যে ফতোয়া দেয়ার মতো যোগ্যতা তৈরী হয়ে গেছে, এখন তুমি তা দিতে পারো। মদীনার অন্যান্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণও তাঁর এই যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

মক্কায় প্রত্যাবর্তন এবং অন্যান্য সফর

শিক্ষা সমাপনান্তে যথাযথ স্বীকৃতি নিয়ে ইমাম শাফেয়ী ফিরে এলেন মক্কায়। অল্প কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর মাতৃকূলের নিবাস ইয়েমেনে চলে এলেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাষার শুদ্ধতা এবং সৌন্দর্যের জন্য 'হাজিল' গোত্র ছিল সমগ্র আরবভূমিতে বিশেষভাবে সম্মানিত। শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তারা উন্নত। শাফেয়ী (রহ) তাদের মধ্যে থেকে আরো বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও কলা বা বিদ্যা শিখে নিলেন। ভাষা বিজ্ঞান, ইতিহাস, বংশ বিদ্যা, ব্যাকরণ, ছন্দ-বিজ্ঞানসহ জ্ঞানগত বিষয়াবলীর সামগ্রিক নিরীক্ষণ ও আশ্বারোহণ তীর চালনা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে এমন অসাধারণ যোগ্যতা অর্জন করলেন যে, সমসাময়িক আরব দেশীয় বিজ্ঞজন সর্বসম্মতিক্রমে সময়ের যোগ্যতম ইমাম হিসেবে তাঁকে মেনে নিলেন।

ভাষা এবং সাহিত্য জ্ঞানে পরিপূর্ণতা

দুর্ধর্ষ আরব সমাজে তীরন্দাজী একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যোগ্যতা হিসেবে গণ্য। তাছাড়া সে যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় নেতার যুদ্ধ বিদ্যায় পরাদর্শিতাও ছিল অপরিহার্য। ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইতিমধ্যেই তা অর্জন করে নিয়েছিলেন।[১] বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের পেছনে লেগে ছিলেন। হাজিল গোত্রের নিজস্ব সংস্কৃতিক সম্পদ দশ হাজার কবিতা ভাষার দুর্বোধ্যতাসহ মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।

ভাষাবিদ মব্‌রর বলেন, ইমাম শাফেয়ীর (রহ) বক্তব্যসমূহ ভাষাতাত্ত্বিক দলিলও বটে। বিখ্যাত সাহিত্যিক 'জাহেয' বলেন, ইমাম শাফেয়ীর রচনার চাইতে উন্নত রচনা আমি আর দেখিনি। তাঁর রচনাভঙ্গী যেন মুক্তোর মালা গাঁথা। আবুল আব্বাস তালিব বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ী ভাষাতত্ত্বের খনি বিশেষ। তিনি এমন যোগ্যতার অধিকারী যে, তাঁর কাছ থেকে ভাষার অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝে নেয়া যায়। ইমাম আবু মনসুর আয্হার ভাষাতত্ত্বের ইমাম এবং যার ভাষা জ্ঞান সর্বজন স্বীকৃত। তিনি বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর ভাষা জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করা যায় না। তিনি ইমাম শাফেয়ীর শুধুমাত্র কথোপকথনগুলোর একটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, তাঁর মতো ভাষা, সাহিত্য এবং জাহিলী যুগের অলঙ্কার শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব আর কাউকে আমি দেখি না। ভাষা তত্ত্বের আর এক পণ্ডিত ইমাম আবু সুলাইমান হানাতী ইমাম শাফেয়ীর প্রিয় ছাত্র। তিনি বলেন, ইমাম

১. মানাকি বুশ্ শাফেয়ী, ইমাম রাযী

www.pathagar.com

সাহেবের বাচনভঙ্গী ও বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। রূপকালঙ্কার এমন তুলনাহীনভাবে প্রয়োগ করেন, যা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আরবী সাহিত্যের অহংকার 'কাশ্‌শাফের' রচয়িতা আল্লামা জামাখ্‌শারী বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ) জ্ঞানের পূর্ণতা পাওয়া একজন মনীষী। শরীয়তের ইমাম এবং মুজতাহিদগণের শিরোমণি। তাঁর বক্তব্য এমন, যা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণার দাবি রাখে। সাধারণভাবে তা সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। কোন ভুল সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না! আরবী ভাষার এই সুপণ্ডিত বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী। তাঁর যোগ্যতা এতোটা উন্নত পর্যায়ের যে, ভাষাতাত্ত্বিক কোন জটিলতা তার কাছে লুপ্ত থাকতে পারে না। ইমাম রাযী (রহ) বলেন, ভাষাবিদগণ সর্বসম্মতভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) এ বিষয়ের মুকুটহীন সম্রাট। হযরত আলী (রহ)-এর বীরত্ব এবং 'হাতেম'-এর দানশীলতা যেমন দু'টি সন্দেহহীন ঐতিহাসিক সত্য, ঠিক তেমনি ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর ভাষা সাহিত্য তথা ভাষাতাত্ত্বিক পূর্ণ পাণ্ডিত্যও একটি ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

ইতিহাস

'আরবী সাহিত্য' নিজেই আরবের এক বিস্তৃত ইতিহাস। যিনি জাহিলীয়াতের রীতি-নীতি এবং জাহিলী যুগের উত্থান-পতনের ইতিহাস জানেন, নিঃসন্দেহে তিনি একজন ঐতিহাসিক। ইমাম শাফেয়ী (রহ) মেরাআ'তুল জেনানে বলেন ঃ وكان الامام الشافعى اعرف بالتوا ريخ অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী ইতিহাস বিষয়টিকে সবার চাইতে বেশি জানতেন। খলীফা হারুন আর-রশীদ ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন আল হাসানের বিতর্কের কথা জানতে পেরে ইমাম শাফেয়ী কে দরবারে আহ্বান করেছিলেন। কুরআন, হাদীস, ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি নানান বিষয়ের বিভিন্ন প্রশ্ন করলো খলীফা এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের পরিপূর্ণ জবাব তিনি দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভাষা সাহিত্যের প্রসঙ্গটি যখন এলো তখন এমন একটি সামগ্রিক জবাব তিনি দিয়েছিলেন যা আজও স্মরণে রাখার মতো। "আরবের মাটি দিয়েই আমাদের তৈরী করা হয়েছে, এই ভাষা আমাদের অস্তিত্বের ধ্বনি এবং এটাই আমাদের বাপ-দাদাদের ভাষা।"

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ইমাম শাফেয়ী (রহ) চন্দ্র-সূর্যের অবস্থানসমূহ, আবর্তন, স্থিরতা, গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী মঙ্গল-অমঙ্গল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঋতু পরিবর্তনের কারণ ইত্যাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে খুব ভালভাবে শিখেছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) "তাওয়ালা আত্‌তাসীস বামানাকিবে মুহাম্মদ বিন ইদরিসে" কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে একটি ঘটনা ঃ এক বন্ধুর 'রাশিচক্র' দেখে তিনি বলে দিলেন, আগামী সাতাশ দিনের মধ্যে তোমার ঘরে একটি শিশু জন্ম নেবে, তার বাম উরুতে কালো তিল থাকবে, চব্বিশ দিন বেঁচে থাকার পর হঠাৎ করে সে মারা যাবে। যেভাবে যা বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই তা হয়েছিল। ইমাম শাফেয়ী (রহ) নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের যেসব বই পুস্তক যোগাড় করেছিলেন সব একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। এরপর আর কোনদিন তিনি এ ধরনের কোন প্রশ্নের জবাব দেননি।

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞান

অত্যন্ত দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন তিনি। গ্রীক ও রোমীও চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয় গ্রন্থাদি তাঁর সংগ্রহে ছিল। তৎকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের তিনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলতেন মানুষ দু'টি জিনিসের সমন্বয়— রূহ এবং দেহ। ইল্‌মও এই রকম দুটি মৌলের সমন্বয়। ইল্‌মে তীব্‌ ও ইল্‌মে দ্বীন অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং মানবীয় জীবন পরিচালনার জন্য সৃষ্টিকর্তার দেয়া ঐশী বিজ্ঞান। মুসলমানরা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অবহেলায় নষ্ট করে দিয়েছে, ফলে জ্ঞানের এই অর্ধাংশের উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়াহুদী খ্রিস্টানরা। তিনি বলতেন, যে শহরে কোন আলেম এবং চিকিৎসক নেই সে শহরে বসবাস করা অপরাধ।

মনোবিজ্ঞান

অন্তর্দর্শনের শক্তি সবাই অর্জন করতে পারে না। বিশাল জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি প্রচুর অভিজ্ঞতার আলোকে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তা অর্জন করতে পারে। পূণ্যবান জ্ঞান-তাপস ব্যক্তিত্বগণের অনেকেই এই শক্তি অর্জন করেছিলেন। হাদীস রয়েছে যে ঃ

اتقوافراسته المومن فانه ينظر بنور الله -

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর কারণ সে আল্লাহ্‌র আলো দিয়ে দেখে।

ইমাম শাফেয়ীর (রহ) প্রখর অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ হিসেবে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) তাওয়ালা আততাসীস এবং ইমাম রাযী (রহ) মানাকিবুশ শাফেয়ীতে কিছু ঘটনার বর্ণনা করেছেন।

(১) ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম হামিদী (রহ) বলেছেন, আমি এবং ইমাম শাফেয়ী একদিন মক্কার বাইরে বেরিয়েছিলাম। আব্‌তাহায় একজন লোকের দেখা পেলাম। আমি ইমাম শাফেয়ীকে বললাম, বলুনতো এই লোকটির পেশা কি ? কাছে আসতে আসতে কয়েক মুহূর্তে লোকটিকে তিনি দেখলেন। বললেন, লোকটি হয় কাঠমিস্ত্রী, নইলে দরজী। আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই তুমি কি কাজ করো ? সে বললো, আগে কাঠের কাজ করতাম, কিন্তু এখন দরজির কাজ করি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর নিজের মুখে বলা একটা ঘটনা

মনোবিজ্ঞানের পড়া শেষ করে আমি যখন ইয়েমেন থেকে ফিরছিলাম, এক শহরতলীতে এসে রাত হয়ে গেলো। একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম কোথায় রাত কাটানো যায়। একটা ঘরের সামনে চওড়া কপাল এবং নীল চোখের একজন লোককে পায়চারী করতে দেখলাম। অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ ধরনের লোক অত্যন্ত হীনমনা নিকৃষ্ট চরিত্রের হয়ে থাকে। কিন্তু কি আর করা! অগত্যা বলে কথা! জিজ্ঞেস করলাম, ভাই রাত কাটানো যায় কোথায় ? লোকটি খুব বিনিত বিগলিতভাবে আমাকে পাশেই একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলো এবং আগরদানীতে সুগন্ধী জ্বালিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে বেশ উন্নতমানের খাবার নিয়ে এসে হাজির। যাত্রা পথের ক্লান্ত পথিক আমি, বেশ তৃপ্তির সাথে খাওয়া-দাওয়া করলাম। এরপরে শোবার ব্যবস্থা, তাও অত্যন্ত আরামদায়ক। আমার ঘোড়ার জন্য ছোলা এবং ঘাসের ব্যবস্থা করলো। মোটকথা আমি তার এতো সুন্দর পরিপূর্ণ মেহমানদারী দেখে রীতিমতো বিস্মিত। মনে মনে ভাবছিলাম,

www.pathagar.com

চরিত্র বিজ্ঞান যা বলে, এ লোক তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হয় এই বিজ্ঞান ভুল, নইলে কিছুক্ষণ পরেই এই লোক তার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যাই হোক ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে খাদেমকে রওয়ানার প্রস্তুতি নিতে বললাম। বিদায়ের সময় লোকটির আতিথিয়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। বললাম, কখনও যদি মক্কায় আসেন তাহলে যী'তাওয়াতে মুহাম্মদ বিন ইদরিসের বাড়িটা খুঁজে নেবেন এবং ইনশাআল্লাহ্ সেখানেই আপনি থাকবেন। জবাবে লোকটি বললো ঃ আপনি অত্যন্ত স্বজ্ঞান ব্যক্তি, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা কথা বলুন তো! আপনার কোন আমানত কি আমার কাছে ছিল ? অথবা আপনি কি আমার কোনো উপকার কখনো করেছিলেন ? আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, না তো! না আমার কোন আমানত আপনার কাছে ছিল আর না আমি আপনার কোনো উপকার কোনোদিন করেছি! সে বললো, জনাব, তাহলে এবার বলুন রাতে আমি আপনার যে সেবা-যত্ন করলাম, আপনার খাদেমেরও খেদমত করলাম, আপনার সাওয়ারীর ঘাস-পানির ব্যবস্থা করলাম, এতোসব কিছুর মজুরী কি দিলেন ? এবার আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলাম ভাই, কতো দিতে হবে ? সে প্রত্যেকটি জিনিসের আলাদা আলাদা দাম হাঁকালো। আমি খাদেমকে তার দাবি অনুযায়ী পরিশোধ করতে বললাম। তারপর হেসে বললাম, ভাই, আপনি খুশী তো! আর তো কিছু বাকী নেই ? বললো ঃ হ্যাঁ জনাব খুব খুশী, তবে বাড়ি ভাড়াটা তখন বলা হয়নি, শুধু এটা বাকী রয়ে গেছে। খাদেমকে তাও দিতে বললাম, বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে বেশ হালকা অনুভব করলাম। মনে মনে মনোবিজ্ঞানকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, নাহ্ তুমি আসলে জ্ঞানই বটে!

(৩) ইমাম হাকেম, মুহাম্মদ বিন মনযার বিন সাঈদের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, আমি রবী'র কাছে শুনেছি যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেছেন যে, এক লোক আমার কাছে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি 'সানা'আর অধিবাসী ? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি কি লৌহ কর্মকার ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। রবী' আরও একটি ঘটনা বললো ঃ জামে মসজিদে নামাযের পর আমার ভাই শাফেয়ী (রহ)-এর সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, রবী, এতো তোমার ভাই, তাই না ? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ, কিন্তু এর আগে আপনিতো কখনো তাকে দেখেননি!

(৪) ইমাম বায়হাকী মুয্নীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, আমি জামে মসজিদে ইমাম শাফেয়ীর সাথে ছিলাম। হঠাৎ একজন লোক মসজিদে ঢুকে ঘুমন্ত লোকগুলোর মধ্যে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো। ইমাম শাফেয়ী (রহ) রবী'কে ডেকে বললেন, রবী, ওই যে একটি লোক কাকে যেন খুঁজছে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো আপনি কি আপনার একচোখ নষ্ট হাব্শী গোলামকে খুঁজছেন ? লোকটি থাবা দিয়ে রবী'র হাত ধরে বললো, হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, আপনি কি দেখেছেন ? রবী' তাকে ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে এলো। ইমাম সাহেবের কাছে এসে লোকটি বললো, আপনি বলতে পারেন ? ইমাম সাহেব বললেন, হয়তো জেলখানায় হবে! জেলখানার সম্ভাবনাটা মনে করিয়ে দেবার জন্য সে ইমাম সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে তড়িঘড়ি সেদিকে ছুটলো। মুজনী এবার ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তো অবাক হয়ে গেলাম, ব্যাপারটা একটু দয়া করে খুলে বলুন! বললেন, ঐ সন্ধানকারী লোকটি যখন মসজিদে ঢুকেছে তখনই আমার চোখে পড়েছিল। ওর ভাব দেখে বুঝতে পেরেছিলাম ও পালিয়ে আসা কাউকে খুঁজছে। এরপরে মসজিদের ঐ অংশে যখন বেশি খুঁজতে দেখলাম বুঝে নিলাম ও

www.pathagar.com

কালো চামড়ার কাউকে খুঁজছে, কারণ মসজিদের ঐ অংশে কালোরা সব জমা হয়। সে যার মুখের দিকেই তাকাচ্ছে তার চোখ দুটো ভাল করে দেখে নিচ্ছে। এসব দেখে আমার মনে হলো, লোকটি চোখে দোষওয়ালা কোন কালো গোলামকে খুঁজছে। আমি বললাম, আচ্ছা বেশ, এগুলো না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু সে জেলখানায় আছে এটা কেমন করে বুঝলেন। তিনি বললেন, আমার অভিজ্ঞতা এই যে, গোলাম যখন ক্ষুধার্ত থাকে তখন সে চুরি করে এবং তার পেটভরা থাকলে সে জ্বেনা করে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই এ দুটোর কোনো একটা করেছে তার গোলাম! পরে খবর নিয়ে জানা যায় যে, ঐ লোকটি তার গোলামকে জেলখানাতেই পেয়েছিল।

মোটকথা ইমাম শাফেয়ী (রহ) ছিলেন সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী। মুজতাহিদ ছিলেন, মুহাদ্দিস এবং মুফাস্‌সির ছিলেন, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ ছিলেন, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। সর্বোপরি এই সকল গুণ বৈশিষ্ট্য যা তার মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল তা অন্য কোন মুহাদ্দিস মুজতাহিদ বা আলেমের মধ্যে একত্রে দেখা যায় না। কাজেই নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, ইসলামের ইতিহাসে ইমাম শাফেয়ী (রহ) এমন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব যার তুলনা শুধুমাত্র তিনি নিজে।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ীর গ্রেফতারী এবং রেহাই

তাঁর নির্যাতিত হওয়ার প্রেক্ষাপট এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও আলোচনার দাবি রাখে। হযরত আলী এবং হাসান ও হুসাইন (রা)-এর পরে হাশেমীদের হাত থেকে যখন উমাইয়ারা ক্ষমতা দখল করে নিলো তখন বনু হাশেমের অন্তর্ভূক্ত বনু আব্বাস বনু ফাতেমাহ্র কিছু এবং সাধারণভাবে আলী (রা)-এর সমর্থকরা হাশেমী খিলাফতের পুনঃ প্রতিষ্ঠার গোপন চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ইমাম হুসাইন (রা)-এর পরে হযরত আলী (রা)-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াকে ইমাম হিসেবে বরণ করা হলো। তারপরে আবু হিশাম আবদুল্লাহ উলুই, তারপরে মুহাম্মদ বিন আলী বিন আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস প্রমুখকে নির্বাচন করা হয়েছে, কারণ শাম অঞ্চলে আর কোন হাশেমী ছিল না। এজন্য খিলাফত উত্তরাধিকারের দাবি হযরত আলীর বংশ থেকে পরিবর্তিত হয়ে আব্বাসের বংশে চলে এলো। ১২৪ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন আলী আব্বাসী ইন্তেকাল করেন। তারপরে তাঁর ছেলে ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ ইমামের আসনে স্থলাভিষিক্ত হন। উমাইয়া মারওয়ানের হাতে ইব্রাহীম বন্দী হন এবং সেই বন্দীদশায় ইহলোক ত্যাগ করেন। শোক প্রকাশের জন্য আব্বাসী উপদল তখন কালো পোশাক পরিধান করে। ইব্রাহীমের পরে আবদুল আব্বাস সাফাহ ১৩২ হিজরীতে কৃতকার্য হয় এবং খিলাফত বনু হাশেমের হাত থেকে স্থায়ীভাবে বনু আব্বাসের হাতে চলে আসে।

নবী বংশের ওপর আব্বাসীদের নির্যাতন

একদিকে এই নব্য ক্ষমতাসীনরা প্রতিশোধ নিতে বনী উমাইয়ার মৃত ব্যক্তিদের কবর থেকে হাঁড়গোড় তুলে জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। অপরদিকে বিশেষ একটি পরিবারে খিলাফত কুক্ষিগত করার কারণে বনু ফাতেমাহ্ এবং হযরত আলীর বংশধর ও সমর্থকরা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেল। পরিণতি এই হলো যে, নতুন ক্ষমতাসীনদের ওপর পুরো বংশের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তা সব ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। নিরংকুশ ক্ষমতায়নের ব্যাপারে সাফাহ্ তেমন কোন সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি, কিন্তু মনসুর অতি সাবধানতা এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ফাতেমী এবং উলুইদের ওপর পরোক্ষ নির্যাতন শুরু করে দিলো। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ১৩৫ হিজরীতে নবী বংশের মুহাম্মদ নফসে জাকিয়া মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো। জনগণ তার সঙ্গেই ছিল, কিন্তু সৌভাগ্য তার সঙ্গে ছিল না, তাই যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তারপরে তার ভাই ইব্রাহীমও শহীদ হয়ে গেলেন। ১৫৮ হিজরীতে মনসুরের মৃত্যুর পরে মেহ্দী তার স্থলাভিষিক্ত হয়। ১৬৯ হিজরীতে মেহ্দী মারা গেলে মূসা 'হাদী' উপাধী ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করে। তার খিলাফতের সময়কাল মাত্র একটি বছর। তারপরেই হারুন আর-রশীদ খিলাফতের তখ্তে আসীন হয়। সেই সময় আবদুল্লাহ্ বিন আল হাসান বিন আল হুসাইন বিন আলী (রা) হারুনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবার বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেয়। সর্বোপরি আব্বাসীদের যুগটাও 'নবী বংশের' জন্য দুঃখ-কষ্ট এবং নির্যাতনের মধ্যেই কেটেছে।

নাজরানের গভর্ণর

খলিফা প্রেরিত উচ্চ পর্যায়ের এক দূত মক্কায় এলে কোরেশী গণ্যমান্যরা ইমাম শাফেয়ীর ব্যাপারে অত্যন্ত জোরালো সুপারিশ করে বললো যে, এই ব্যক্তি অত্যন্ত যোগ্য আলেম, গবেষক, চিন্তাবিদ এবং রাজনীতিবিদ। বড় কোন সরকারী প্রশাসনিক পদে তাকে নিয়োগ করা যেতে পারে। তাদের সুপারিশের মর্যাদা রাখতে ছোট্ট একটি সরকারী পদে নিয়োগ করা হলো। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা, যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতার কথা সরকারী মহলে আলোচিত হতে লাগলো। পুরস্কার হিসাবে তাঁকে নাজরানের প্রশাসক বানিয়ে দেয়া হলো। নাজরানে বনু হারেস বিন আবদুল মাদান এবং মাওলা সাকীফ পূর্বের প্রশাসকদের রীতিমতো ঘুষ দিতো এবং সে কারণে প্রশাসনিক দরবারে তাদের একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। ইমাম শাফেয়ী (র) কেও যথারীতি এই নজরানা পেশ করা হলো, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালাগুলো অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে সমাধান হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর বিচার ব্যবস্থায়— আমাদের আজকের পঞ্চায়েতের মতো— স্থানীয় গণ্যমান্যদের ভেতর থেকে সাতজন আস্থাভাজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরী করে দিলেন। সাধারণ বিচার-আচারগুলো তারাই করতো। এভাবে আইন যখন তার নিজস্ব গতিতে চলতে লাগলো তখন প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের অবস্থা অত্যন্ত বেগতিক এবং সমূহ বিপর্যয়ের আশংকায় মক্কায় গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

ইয়েমেনে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। এতো বড় একজন মনীষী তাদেরই একজন, এটা ছিল তাদের একটা আত্মিক তৃপ্তি। জনসাধারণের শ্রদ্ধা-সম্মান এবং ভালবাসা শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে যাচ্ছিল।

প্রশাসনের সকল বিভাগে সততা ও ঈমানদারী প্রতিষ্ঠার জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহ) সব রকমের অন্যায় অর্থাৎ ঘুষ, প্রশাসনে অবৈধ প্রভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়ালেন, ফলে চরিত্রহীন সরকারী কর্মচারীরাও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যুক্ত হলো। মুতরাফ নামের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা রাজনৈতিক চক্রান্তমূলক এক গোপন পত্র পাঠালো খলিফা হারুন আর-রশীদের কাছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর ইতিবাচক যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সন্দেহপ্রবণ খলিফার কাছে সে এভাবে তুলে ধরলো— আপনি যদি ইয়েমেনের ভাল চান, তাহলে মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ীকে এখান থেকে সরিয়ে নিন এবং তার জন্য কঠিন কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এখানে সে দিন দিন প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং দেশের সব অঞ্চলেই 'নবী (স) বংশের' লোকেরা যে আবার খিলাফতের স্বপ্ন দেখছে, তা তো স্বয়ং খলিফার খুব ভাল করেই জানা আছে। শাফেয়ী নিজেই যেহেতু হাশেমী এবং এখানে প্রশাসনিক সাহায্য-সহযোগিতা সব তার বংশের লোকেরাই পাচ্ছে, কাজেই সার্বিক অবস্থা আমার কাছে ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

চিঠি পেয়ে হারুন আর-রশীদ তো অগ্নিশর্মা। সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে এই মর্মে রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করালো যে, মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ীসহ যতো সৈয়দ বংশের লোক আছে সব গ্রেফতার করে রাজধানীতে প্রেরণ করা হোক। পুলিশ প্রধান হাম্মাদ বারবারী গ্রেফতারী পরওয়ানা নিয়ে মাঠে নেমে পড়লো। সৈয়দ বংশের যতো লোক খুঁজে পাওয়া গেলো তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে ইমাম শাফেয়ী (রহ) সহ রিক্কায় হারুন আর-রশীদের কাছে

www.pathagar.com

পাঠিয়ে দিলো। কল্পিত শত্রু হাতে পেয়ে হারুন আর-রশীদ হুকুম দিলো— প্রতিদিন আমার সামনে দশজন করে হত্যা করবে। সম্রাটের আদেশ কার্যকর হচ্ছিলো প্রতিদিন দশজন করে রাসূল (স) কন্যা মা ফাতেমা এবং হযরত আলীর বংশধরদের শাহাদাতের মাধ্যমে। এভাবে একদিন ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর পালা। নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে রেখে ইমাম শাফেয়ী সেদিন যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা হারুন আর-রশীদের গোটা অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। খলিফা বাধ্য হয়ে হত্যার আদেশ রহিত করে শুধু বন্দী করে রাখতে বললো।

ইতিমধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর এক ইল্‌মী বিতর্কের বিস্তারিত বিবরণ হারুন আর-রশীদের কাছে কেউ একজন বর্ণনা করেছিল। হারছিমা বিন আঈন বলছে যে, হারুন আর-রশীদ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনছিল। ইমাম শাফেয়ীর যুক্তি প্রদানের ধরন শুনে তড়াক করে উঠে বসে পড়লো এবং বললো ঃ কথাটা আবার বলতো! সে তা আবার শোনালো। হারুন আর-রশীদ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকলো, তারপর বললো ঃ তাহলে তো দেখা যায় মুহাম্মদ বিন ইদরিস মুহাম্মদ বিন হাসানের চাইতেও বড় আলেম! এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তাঁকে পাঁচশত দীনার নজরানা দিয়ে জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করে দাও। হারছিমা বিন আঈন নিজের তরফ থেকে আরো পাঁচশত দীনার মিলিয়ে মোট এক হাজার দীনার নজরানাসহ বন্দীখানায় খবর পাঠালো যে, খলিফা আপনার জ্ঞান-গরিমার কথা শুনে এই এক হাজার দীনার নজরানাসহ মুক্তির আদেশ মঞ্জুর করেছে।

প্রত্যেকটি ভাল কাজ করার এবং মন্দ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন বিবেকের সচেতন উপলব্ধি এবং অন্তরে ভাল ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের সুতীব্র আবেগ ও অনুভূতি। এটা ধর্মানুরাগ বা সংযমশীলতা। তারপরে এই কাজকে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য যে কোন ধরনের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখা। এটা 'এখলাস' বা আন্তরিকতা এবং এটা করার জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতার ওপর যদি ভরসা রাখা যায়, তাহলে তা 'তাওয়াক্কুল'। এই কাজে যতো দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি সম্মুখে আসে অথবা তার সুফল আসতে বিলম্ব হয়, তাহলে অন্তরে অবিচল আস্থা এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেন ভেস্তে না যায় এবং এপথে নিজের শত্রুদেরও অমঙ্গল যদি না চেয়ে পারা যায়, তাহলে তা 'সবর'। এরপরে যদি সফলতার 'অনুগ্রহ' পাওয়া যায়, তাহলে তাতে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে বিধাতার এই বিশেষ দানকে স্মরণে রেখে দেহ-মন ও মুখের সকল অভিব্যক্তি দিয়ে যদি তার স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা যায় এবং তাতে এই ধরনের কাজের অনুপ্রেরণা আরো বেড়ে যায়, তাহলে তা 'শোকর'। এই ভূমিকাটুকু সামনে রেখে আমরা এখন দেখবো ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মধ্যে ঈমানের এই উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন পর্যায়ের ছিল।

সন্তুষ্টি

তিনি নিজেই বলতেন, আমি বিশ বছর পর্যন্ত কখনো পেট ভরে খাইনি এবং লোভ-লালসাকে কখনো কাছেও আসতে দেইনি। এ কারণে আমি সবসময় খুব ভাল থেকেছি এবং আমার সম্মান সবসময়ই অসম্মানের লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত থেকেছে। লোভ-লালসা এমন এক বিষাক্ত জিনিস যার ক্রিয়ায় অন্তরের সমস্ত দৈন্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এমন লোভ যার মধ্যে সংকীর্ণতা বা কৃপণতার সংমিশ্রণ থাকে। এটাকেই আরবরা 'শুহ্‌হা' বলে। এর বিষক্রিয়ার কথা কুরআন মজীদের বেশ কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলতেন,

www.pathagar.com

পারিবারিক অশান্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একারণেই হয়ে থাকে। ঘরের মালিক বেশি চায় না অথচ ঘরের লোকেরা বেশি চায়। স্বামীদের সম্পদের প্রতি ভালবাসা থাকে এবং স্ত্রীরা লোভের বশবর্তী হয়ে বেশি চায়, ফলে দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। তখন ঘর হয়ে যায় মানসিক যন্ত্রণার জাহান্নাম। তিনি বলতেন, কুরআনের এই আয়াতকে খুব ভাল করে বুঝে নাও, যার মধ্যে মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা নিজের চাইতে অন্যের প্রয়োজনটা বড় করে দেখে—

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفْلِحُوْنَ - (حشر)

এবং নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয় যদিও নিজেই তার প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী এবং যাকে অন্তরের লালসা বা সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হলো সে-ই সফল হলো।

(সূরা হাশর)

হারুন আর-রশীদ একবার যথেষ্ট অনুরোধ করে বলেছিল, আপনি যেখানে চাইবেন সেখানেই 'কাজীর' পদে বহাল করে দেবো। জবাব দিয়েছিলেন, আমাকে কোন পদের প্রলোভন থেকে ক্ষমাই করতে হবে।

উদারতা

তিনি বলতেন, উদারতার মানে হলো নিজের কোনো প্রাপ্তি বা কোনো বস্তুকে খুশী মনে কোন প্রতিদান ছাড়াই অন্যকে দেয়া। এর আবার কয়েকটি ধরন রয়েছে ঃ নিজের পাওনা কাউকে ক্ষমা করে দেয়া। নিজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে অন্যেরটা পূরণ করা। অন্যের জন্য নিজের মেধা ব্যয় করা। অপরের সাহায্যের জন্য নিজের মান-সম্মান এমনকি নিজের জীবনকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়া। তিনি বলতেন, কাউকে কখনো এমন কিছু দিও না যা কোনো কাজে আসে না, তাতে আত্মমর্যাদাবোধ ধ্বসে পড়ে। হীনমন্যতার বিষবৃক্ষ ডালপালা বিস্তার করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَالَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّااَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -

হে বিশ্বাসীগণ! তা থেকে যা তোমরা অর্জন করো এবং তা থেকেও যা আমরা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করি, তার ভাল জিনিসগুলো (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করো। তার নিকৃষ্ট অংশ দান করার ভাবনাও মনে স্থান দিও না। (সূরা বাকারা)

প্রাথমিক জীবনে তিনি অত্যন্ত অভাবের মধ্যে কাটিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষা জীবন শেষ করার পর থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সব রকম অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ের খলিফা এবং রাজন্যবর্গ তথা অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর কাছে নজরানা পাঠাতেন এবং তার সাথে থাকতো অত্যন্ত বিনীত নিবেদন, যেন তার এই সামান্য নজরানাটুকু প্রত্যাখ্যান করা না হয়। হারুন আর-রশীদ একবার পঞ্চাশ হাজার দেরহাম

www.pathagar.com

পাঠিয়েছিল যার চল্লিশ হাজার দেরহাম তিনি সাথে সাথে গরীব-দুঃখী, ইয়াতিম, বিধবা এবং দুঃস্থ আলেমদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এভাবে একদিন একসাথে এসে জড়ো হলো আবু হাসান যেয়াদীর পাঠানো ছয় হাজার দীনার, জাফর বিন ইয়াহ্ইয়া বারকীর এক হাজার দীনার এবং হারুন আর-রশীদের পাঠানো কয়েক হাজার দীনার। তিনি তাঁর নিয়ম অনুযায়ী এইসব অর্থের এক চতুর্থাংশ নিজের কাছে আপাতত রেখে বাকীটা সাথে সাথে গরীব ছাত্র, গরীব ওলামা এবং অন্যান্য নির্বাচিত অভাবী লোকদের মধ্যে গোপনে বিতরণ করে দিলেন এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন, দয়াময় প্রতিপালক! আমাকে তুমি এই পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা থেকে রক্ষা করো।

ইমাম মুয্নী (রহ) বলেন, ইমাম শাফেয়ীর চাইতে বড় দানশীল উদার মানুষ আমি আর দেখিনি। একবার ঈদের রাতে মসজিদে নামায আদায় করে তাঁর সাথে তাঁর বাড়ির দিকে ফিরছিলাম। একটা মামলা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ঘরের সামনে এসে দেখি একজন গোলাম দাঁড়িয়ে আছে, সে সালাম দিয়ে একটি থলে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার মালিক নজরানা হিসেবে আপনার জন্য এটা পাঠিয়েছে। তিনি ওটা হাতে নিয়ে বললেন, যাও তাকে আমার ছালাম দিও আর বলো আমি খুশী হয়ে তা গ্রহণ করেছি। গোলামটি চলে যেতে না যেতে হন্তদন্ত হয়ে আর এক লোক এসে হাজির। বললো, আবু আবদুল্লাহ্ আমার ঘরে একটা শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, অথচ আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। তিনি হাসতে হাসতে সেই থলেটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ্' এটা নিয়ে যাও।

এক ঈদের দিনে ঘরে তেমন কোন খাবারের আয়োজন না থাকায় স্ত্রী একটু খোঁটা দিয়ে বললেন, সারাদিন তো মানুষের উপকার করে বেড়ান, আজ ঈদের দিন, নিজের ঘরে যে খাবারের কিছুই নেই তা কি আপনার জানা আছে ? একটু লজ্জিত হলেন, ওদিকে নিজের পকেটেও কিছু নেই। অনন্যোপায় হয়ে এক পরিচিতজনের কাছ থেকে সত্তর দীনার ধার আনলেন। এদিকে ঈদ উপলক্ষে আশপাশের দরিদ্রজন এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। তাৎক্ষণিকভাবে পঞ্চাশ দীনার তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। বাকী বিশটি দীনার নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এক কোরেশী এসে হাজির। তিনি তার অবস্থা দেখে একটু ঘাগড়ে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, অভাব অভাব অভাব— আমার এখন পাগল হতে বাকী। শান্তনা দিয়ে বিশটি দীনার তার হাতে তুলে দিলেন। হাতে নিয়ে কোরেশী বললো, প্রয়োজন তো আরো ছিল। কিন্তু কি আর করা! ইমাম শূন্য হাতে স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। খুলে বললেন, সব ঘটনা! স্ত্রী একটু রাগ করেই বললেন, আপনার যা খুশী তাই করতে থাকুন। ঈদের দিনটি এভাবেই কেটে গেল। পরদিন সকালে হারুন আর-রশীদের মন্ত্রী জাফর বিন ইয়াহ্ইয়া বারমিকীর দূত এসে ইমামকে সঙ্গে করে দরবারে নিয়ে গেল। জাফর অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললো ঃ রাতে স্বপ্নে, হাতেফ আনিবী আপনার কিছু ঘটনা আমাকে বলেছে। আমি এখন আপনার কাছে আসল ঘটনা শুনবো বলে এখানে ডেকে এনেছি। ইমাম হাসতে হাসতে তার গত দিনের ঘটনাগুলো বললেন। জাফর অত্যন্ত বিনীতভাবে এক হাজার দীনারের একটা থলে হাতে দিয়ে বললো, আল্লাহ্র ওয়াস্তে এটা অস্বীকার করবেন না। তিনি তা অস্বীকার করেননি। গ্রহণ করেছিলেন।[১]

১. মানাকিবুশ্ শাফেয়ী, ইমাম রাযী

www.pathagar.com

বিনয়

তিনি বলতেন, বিনীত হওয়ার আদেশ এজন্য দেয়া হয়েছে, যেন কেউ তার শক্তি-সামর্থ্যের বাড়াবাড়ি ব্যবহার না করে বসে— যা অক্ষম, দুর্বল, অপারগদের দুঃখ এবং অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, তুমি মাটির মতো আচরণ গ্রহণ করো যেন কেউ কারো ওপর নির্যাতন করতে না পারে এবং কেউ কারো সম্মুখে অহংকার প্রকাশ করার দুঃসাহস না করে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামাজিক জীবনে মানবিক ভারসাম্য স্থাপনের জন্য তাঁর রাসূল (স)-কে বিনয় অবলম্বনের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াতে বলেছেন।

নিজের ছাত্র এবং বন্ধু-স্বজনদের জন্যে আপ্যায়ন-সামগ্রী তৈরী করার জন্য তাঁর বাড়িতে আলাদা এক সেবিকা রাখা ছিল। সে মহিলা অত্যন্ত মজাদার হালুয়া তৈরী করতে পারতো। পরিচিত-অপরিতি, নতুন-পুরাতন সবার সাথেই ইমামের আচরণ ছিল অত্যন্ত আপনজনের মতো। মেহমানদারী ছিল তাঁর আত্মিক সন্তুষ্টির বিষয়। কারো দ্বারা সামান্য একটু উপকৃত হলে তার চাইতে অনেক বেশি করে তার বিনিময় দিতে না পারা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না।

গুণী লোকদেরকে খুব কদর করতেন। একবার কোথাও যাবার পথে একজন তীরন্দাজকে অনুশীলন করতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তীর যখন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করলো ছোট্ট শিশুর মতো আনন্দে হৈ চৈ করে উঠলেন। পকেটে হাত দিয়ে তিনটি দীনার পেলেন তাই তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, আমার কাছে আরো থাকলে আমি তোমাকে আরো দিতাম।

রাসূল (স)-এর অনুসরণ

ইমাম শাফেয়ীর প্রিয় ছাত্র ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল বলেন ঃ একদিন এক লোক উস্তাদের কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তিনি তার জবাব দিয়ে দলিল হিসেবে একখানা হাদীসও বর্ণনা করলেন। লোকটি এবার প্রশ্ন করলো, আপনিও কি এই হাদীসের অনুসরণ করেন ? উস্তাদজী প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, তুমি কি আমাকে কোনো মন্দির থেকে বের হতে দেখেছ, নাকি আমার গলায় পৈতা দেখেছ ? শুদ্ধ হাদীস দিয়ে যা প্রমাণিত তাই আমার পালনীয়।

ইমাম আহমদ আরো বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর নীতি ছিল যদি কখনো তাঁর ফতোয়ার বিপরীতে কোনো শুদ্ধ হাদীস পেয়ে যেতেন সাথে সাথে প্রকাশ্যে বলে দিতেন, আমি আমার মতামত তুলে নিয়ে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। ইমাম মুয্নী ও রবী' বিন সুলাইমানসহ অন্যান্য ছাত্রদেরকে সবসময় বলতেন, আমি যা কিছু রচনা করেছি, তার সাথে আমার সাধ্য অনুযায়ী উপযুক্ত দলিলও দেবার চেষ্টা করেছি। তারপরেও আমি মানুষ! হতে পারে হাজার সাবধানতার পরেও ভুল থেকেই গেছে। যে কোন ধরনের ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তো শুধুমাত্র আল্লাহ্র কিতাব। এই জন্য আমার রচনাবলীর মধ্যে যে কোনো মাসআলা আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূল (স)-এর প্রমাণিত সুন্নতের বিপরীত কিছু প্রমাণিত হয়, তোমরা জেনে রাখো আমি তা থেকে সরাসরি সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এটা মনে রাখবে, যদি কোনো শুদ্ধ হাদীস আমার পর্যন্ত পৌঁছায়, আর আমি তা গ্রহণ না করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমার বোধের মধ্যে ত্রুটি প্রবেশ করেছে।

www.pathagar.com

তিনি কখনো নিজের মতামত ও বক্তব্যের ওপর অবিচল থাকতেন না। কোনো মাসয়ালায় ভুল প্রমাণিত হলে সাথে সাথে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে তা স্বীকার করে নিতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালকে সবসময় স্মরণ করিয়ে দিতেন, শুদ্ধ হাদীস চেনার ব্যাপারে আমার চাইতে তোমার দৃষ্টি অনেক প্রখর। আমার মতামতের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো শুদ্ধ হাদীস তোমার চোখে পড়লে সাথে সাথে আমাকে জানাবে। যেন আমি সেই হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারি এবং নিজের মতামতকে নিশ্চিতভাবে পরিত্যাগ করতে পারি।

সত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল সীমাহীন। বহস বা বিতর্কানুষ্ঠান সবসময় লেগেই থাকতো। বিপক্ষ দলের যে কোনো প্রশ্নের জবাব তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দিতেন। সবসময় বলতেন, আমি কোনোদিন কাউকে উদ্ধত ভঙ্গীতে নিজের বড়ত্ব জাহির করে কোনো প্রশ্নের জবাব দেইনি। কোনো বিতর্কেই নীরেট সত্যের ওপরে আমার ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানকে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেইনি। আমি বিশ্বাস করি, ব্যক্তি আমির চাইতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (স)-এর 'সত্য' প্রকাশই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মিথ্যার প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল সহজাত। তিনি বলতেন, আমি জ্ঞানত জীবনে কোনোদিন কোনো মিথ্যা কথা বলিনি। না কোনো ব্যাপারে সত্য বা মিথ্যা কসম খেয়েছি। নিজের রচনাবলী সম্পর্কে বলতেন, আল্লাহ্ চাইলে জাতি এসব বুঝতে পারবে এবং তার ওপর আমল করবে।

বড়দের সম্মান

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর কথা উঠলে বলেন, শোন! ফিকাহ্ বিষয়টি নিয়ে যারাই নাড়াচাড়া করছে তারা সব আবু হানিফা (রহ)-এর সন্তান। কেউ একজন ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ এবং ইমাম মালিক সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, এই দু'জন না হলে হিজাজ থেকে ইল্‌মে হাদীসের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেতো। যখন ইমাম মালিকের কোনো কথার উল্লেখ করতেন, বলতেন, এটা আমাদের মহান উস্তাদ ইমাম মালিকের বক্তব্য। অপর একজন বললো, আপনি ইমাম মালিকের মতো মানুষকে স্বচক্ষে দেখেছেন। বলেন, আমাদের কি এমন যোগ্যতা আছে যে, ইল্‌ম এবং আমলে তাঁর সাথে তুলনা করি! শোন! ইমাম মালিকের মতো মানুষ আমি আর দেখিনি।

সাহাবাগণ সম্পর্কে তিনি বলতেন, সাহাবাগণ ইল্‌ম ইজতিহাদ এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে অগ্রগামী।

একদিন এক লোক একটা মাসআলা জানতে চাইলো যে, কোনো লোক যদি কা'বা শরীফ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবার মানত করে এবং সে তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে কি করবে? বললেন, সে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করবে। এটা আমার চাইতেও বড় আলেম হযরত আ'তা বিন আবী রাবাহ্‌র মতামত।

দরসের মাজলিস

ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফিকাহ্‌র দরস দিতেন। তারপরে হাদীসের দরস শুরু হতো। এরপরে সাধারণ শিক্ষামূলক বক্তৃতা শুরু হতো। সেটাই একসময় বিভিন্ন

www.pathagar.com

ইল্‌মী আলোচনা-পর্যালোচনায় গড়াতো যোহর পর্যন্ত। যোহরের পরে কিছুক্ষণ সাহিত্য, কবিতা, ভাষাতত্ত্বের আলোচনা। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে আসর পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশ্রাম। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহ্‌র স্মরণে ধ্যানমগ্ন হতেন।

রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। একাংশ ঘুমাতেন। একাংশ হাদীস, ফিকাহ্ এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর পড়াশোনা করতেন। শেষাংশে তেলাওয়াত ও নফল নামায নিয়ে সুব্‌হে সাদেকে পৌঁছে যেতেন। কুরআনের তেলাওয়াত ছিল তাঁর সবচাইতে প্রিয় বিনোদন। হুসাইন বিন আলী কারামীসি (রহ) বলেন, আমি একনাগাড়ে তিনমাস তাঁর কাছে ছিলাম। রাতের এক তৃতীয়াংশ নফল নামায এবং কুরআন তিলাওয়াতে কাটাতে দেখেছি।

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল হাকীম বলেন ঃ আমরা একদিন দুনিয়া বিমুখ মুত্তাকীদের কথা আলোচনা করছিলাম। সেখানে যুন্নুন মিস্‌রী (রহ)-এর কথা বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছিল। এর মধ্যে আমরুদ বিন তাবাতা এসে গেল, সে বললো, বন্ধুরা! আমার দৃষ্টিতে ইমাম শাফেয়ী (র)-কে সবচাইতে বড় যাহেদ, আবেদ এবং মুত্তাকী মনে হয়। কুরআন মজীদের অধ্যয়ন এবং প্রচার-প্রসারে ব্যস্ত, পার্থিব পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। শাসক-প্রশাসকদের মুখাপেক্ষীহীন। শোন! একবার আমি এবং হারেছ সালেহ ও মুয্‌নীর গোলাম ইমাম শাফেয়ীর সাথে বেড়াতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হারেস এই আয়াত তিলাওয়াত করে উঠলো।

هذا يوم الفضل - بجمعناكم وَالأَ وَّلِيْنَ -

এটা বিচার দিবস আমি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের একত্রিত করেছি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমরা তাঁর দিকে ফিরে দেখি তিনি কাঁপছেন আর আকুল হয়ে কাঁদছেন। আল্লাহ্ তা'আলার ভয় তাঁর অস্তিত্বের ওপর এতোটা প্রভাবশালী ছিল।

রবী' বিন সুলাইমান বলেছেন, ইমামের সাথে হজ্বে গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম, তিনি প্রত্যেকটি চড়াই-উৎরাইতে কাঁদছিলেন আর করুণ কণ্ঠে এই কবিতার চরণ আবৃত্তি করছিলেন।

ال النبى ذريعتى، وهم اليه وسيلتى ارجوابان اعطى غدا بيد اليمين صحيفتى

'আহ্‌লে বাইত' ও রাসূলুল্লাহ (স) আমার অবলম্বন, আর আল্লাহ্‌র দরবারে আমার অসিলা। আমার অনেক আশা, আমার ডান হাতে আমার 'আমলনামা' দেয়া হবে।

এত দরদভরা আবেগময় কণ্ঠে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত করতেন যে, তিনি যখন নামাযের ইমাম হতেন তখন তাঁর পেছনে দাঁড়ানো নামাযীদের ফুপিয়ে কাঁদা ছাড়া বিকল্প পথ থাকতো না। পেছনে কান্নার আওয়াজ ভারী হয়ে উঠলে তিনি রুকূতে চলে যেতেন। কোন মজলিসে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করলে শ্রোতাদের বোবা কান্না চাপাতে গিয়ে হিচ্‌কি উঠে যেতো। অনেকেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতো। ইমাম রাযী বলেন, তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের সনদ এই ঃ

www.pathagar.com

قراء الشافعي القران على اسمعيل بن قستنطن حمين وكان شيخ مكة وهو على شبل بن عباد ومعروف مشكان وهما على عباد الله بن كثير وهو على سيد المفسرين عبد الله بن عباس وهو على سيد القراء ابى بن كعب وهو على صاحب لوحى محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم -

ইমাম শাফেয়ী ইসমাঈল বিন কুসতানতিন এর নিকট কুরআন তেলাওয়াত করেন যিনি মক্কার শয়খ ছিলেন। তিনি আবার শাবল বিন আব্বাদ ও মারুফ মেশকানের দুজনের নিকট তেলাওয়াত করেন। আর তারা উভয়েই আবদুল্লাহ্ বিন কাছিরের নিকট। আর তিনি মুফাসসিরিনদের সর্দার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিকট থেকে আর তিনি ক্বারীদের সর্দার হযরত উবাই বিন কা'ব (রা)-এর নিকট থেকে এবং তিনি ওহির ধারক-বাহক মুহাম্মাদুর রাসূল (স) থেকে কুরআন তেলাওয়াত করেন।

কাজী ইয়াহ্ইয়া বিন আকছাম বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর চাইতে বুদ্ধিমান কোন মানুষ আমি দেখিনি। ইমাম মুযনী বলেছেন, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের মেধা এবং ইমাম শাফেয়ীর মেধাকে দুই পাল্লায় ওজন করলে ইমাম শাফেয়ীর দিকটা ভারী থাকবে।

মুহাম্মদ বিন আল ফজল আল বারাজী বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা ফজল এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল একত্রে হজ্বে গিয়েছেন। দু'জনে একই জায়গায় অবস্থান করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল খুব ভোরে নীরবে উঠে চলে গিয়েছিলেন, আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই হযরত সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ (রহ)-এর দরসে যোগ দেবেন। তাই এতো ভোরে উঠে চলে গেছেন! কিছুক্ষণ পরে আমিও চললাম। সোজা সুফিয়ান বিন আইনিয়ার দরসে গিয়ে খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। 'হারাম' চত্তরের ইল্মী মজমাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম, পেলাম না। শেষকালে দেখি এক নওজোয়ান কোরেশীর জলসায় বসে আছেন। আস্তে করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, সুফিয়ান বিন আইনিয়ার দরস রেখে এখানে আপনি কি করছেন ? সুফিয়ান তো ইমাম যুহ্রীর এবং অন্যান্য বড় বড় তাবেয়ীনগণের বিশিষ্ট শিষ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল বললেন, চুপ করো, যদি হাদীস 'বা সনদে আলী' না পাওয়া যায় তো না পাওয়া যাক, 'হাদীসে সহীহ বা সনদে নাজেল' তো পাওয়া যাবে! (অর্থাৎ আর একটা স্তর মাধ্যম হয়তো বেড়ে যাবে)! কিন্তু এই বুদ্ধিমত্তার কথাগুলো যদি আমি সংগ্রহ করতে না পারি তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত এমন মানুষ আর খুঁজে পাবো না। এই নওজোয়ান কোরেশীর মতো কিতাবুল্লাহ্র অনুধাবনকারী আজ পর্যন্ত আমি আর দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম, ওনার নাম কি ? বললেন, এই সেই মুহাম্মদ বিন ইদরিস শাফেয়ী (রহ)।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম হামিদী (রহ) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর জ্ঞান-গরিমা এবং গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় মক্কার সকল শায়খগণকে আমি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত দেখেছি। ইমাম মালিকের মুখ থেকেও এরকমই একটা কথা বেরিয়েছে যে, মুহাম্মদ বিন ইদরিস শাফেয়ীর মতো প্রতিভাবানা কোন ছাত্র আমার জীবনে আমি পাইনি।

www.pathagar.com

আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সালাম বলেন, ইমাম মালিক (রহ) শাফেয়ী (রহ)-এর সুন্দর উচ্চারণ এবং তার চাইতেও সুন্দর পঠনভঙ্গীতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। খোদ ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলছেন, ইমাম মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে পাণ্ডুলিপি পড়া খুব সাধারণ ব্যাপার নয়, অনেক বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন। তিনি যখন আমাকে বলতেন, এবার তুমি পড়ো! আমি পড়া শুরু করতাম, কিছুক্ষণ পরে থেমে যেতাম, তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠতেন, আহ্, থামলে কেন ? পড়ো! আমি না বলা পর্যন্ত থামবে না। পড়ো! আমার পড়ার মধ্যে নিজে বোঝা এবং অন্যকে বোঝানোর একটা আলাদা ধরন ছিল, তার ওপরে আমার উচ্চারণ এবং ঝরঝরে পড়ার ধরনটা তিনি খুব পছন্দ করতেন। এটা আমি বুঝতে পারতাম।

ইমাম শাফেয়ীর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি

একবার ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ) ইমাম ইসহাক বিন রাহোইয়া, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন একসাথে মক্কা মুকাররমায় পৌছলেন। তিনজনই একমত হয়ে মুহাদ্দিসে মক্কা ইমাম আবদুর রাজ্জাক (রহ)-এর দরসে যোগ দেবেন বলে রওয়ানা হলেন। কা'বার চত্বরে ঢুকেই দেখলেন এক নওজোয়ান মসনদে বসে আছে এবং তাঁর চারপাশে প্রচুর লোক সমাগম। নওজোয়ান অত্যন্ত উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করছে, হে শাম ও ইরাকের অধিবাসীগণ! আমার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীস সম্পর্কে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আসো, আমি ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের সন্তুষ্ট করতে পারবো। ইমাম ইসহাক বলছেন, আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, কে এই দুঃসাহসী যুবক। বড়ই উদ্ধত মনে হচ্ছে ? লোকেরা বললো, এ মুহাম্মদ বিন ইদরিস শাফেয়ী মুত্তালেবী। ইমাম ইসহাক ইমাম আহমদকে বললেন, চলো এই লোকের কাছে সেই হাদীসের তাৎপর্যটা জিজ্ঞেস করি : مكنوالطيـورفى اوكـارهم —"পাখিরা তাদের বাসায় সু-দৃঢ় করল।" ইমাম আহমাদ বললেন, এ হাদীসের মানে তো পরিষ্কার, পাখিদের রাতের বেলা তাদের নীড়েই থাকতে দাও। সে যাই হোক, তুমি যখন বলছো তখন এর কাছেও জিজ্ঞেস করি দেখি এ কি বলে! ইমাম আহমাদ ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কাছে হাদীসটি উল্লেখ করে বললেন, হাদীসটির আসল তাৎপর্য আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ইমাম শাফেয়ী তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন। জাহিলী যুগে একটা নিয়ম ছিল, কারো যদি রাতের বেলা সফরে রওয়ানা দিতে হতো তাহলে সে পাখির বাসায় ঢিল মেরে শুভ-অশুভ দেখে নিতো। অর্থাৎ একটা পাখির বাসা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারতো, পাখিরা যদি ডানদিকে উড়ে যেতো তাহলে যাত্রা শুভ, সফর নির্বিঘ্নে সফল হবে। আর যদি পাখিরা বামদিকে উড়ে যায় তাহলে তা অশুভ লক্ষণ বলে ধরে নেয়া হতো। রাসূল (স) নবুয়ত লাভের পর এই নিষ্ঠুর প্রথাটি সম্পর্কে লোকদেরকে ডেকে বললেন, পাখিদেরকে তাদের নীড়ে শান্তিতে থাকতে দাও আর তোমরা সব ব্যাপারে বিধাতা প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ভরসা করো। ইমাম ইসহাক উৎফুল্ল হয়ে ইমাম আহমাদকে বললেন, আমরা যদি ইরাক থেকে হিজাজ পর্যন্ত এই একটি মাত্র হাদীসের সঠিক তাৎপর্য বোঝার জন্য এসে থাকতাম তাহলে আমাদের সফর সফল এবং বরকতপূর্ণ হতো। অতঃপর তিনজন ইমাম নওজোয়ান ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার স্বীকৃতি স্বরূপ অসংখ্য মোবারকবাদ জানালেন।

একটি বিশেষ জবাব

একবার এক আলোচনা বৈঠকের প্রশ্নোত্তর পর্বে বললেন, কার কি জিজ্ঞাসা আছে ? আমি কুরআন থেকেই তার জবাব দেবো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কেউ যদি ইহরাম বাঁধা

অবস্থায় কোনো বোলতা বা ভিমরুল মেরে ফেলে তাহলে তার প্রতি কুরআনের কি নির্দেশ? ইমাম শাফেয়ী (রহ) তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন ঃ

بسم الله الرّحمن الرحيم

ماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا -

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, রাসূল তোমাদেরকে যা করতে আদেশ করেন তা পালন করো আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।

এর পরে একখানি শুদ্ধ সনদযুক্ত হাদীস পাঠ করলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পরে তোমরা 'শায়খাইন' অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা)-এবং হযরত উমর (রা)-এর অনুসরণ করবে। এরপরে আর একখানি সনদ উপস্থাপন করে বর্ণনা করলেন যে, হযরত উমর (রা) ইহ্রাম পরা অবস্থায় বোলতা বা ভিমরুল আক্রমণ করলে তাকে মারার আদেশ দিয়েছেন।

মুফতি-এ-হারামের উচ্চ মর্যাদা

ওলামায়ে মদীনা এবং ইমাম মালিক (রহ) প্রমূখ তো সেই পাখি ব্যবসায়ীর ঘটনার পরেই তাঁকে ফতোয়া দেয়ার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র পনের বা ষোল। মক্কায় ফিরে আসার পরে মক্কার উস্তাদ মুসলিম বিন খালেদ যানজীও তাঁকে ফতোয়া দেবার অনুমতি দান করেন। কিন্তু তিনি আরো সাবধানতা এবং পরিপক্কতার জন্য ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ (রহ)-এর (যিনি ইমাম মালিকের মতো ইমামুল আয়েম্মা মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী (রহ)-এর ছাত্র এবং শিষ্য ছিলেন) শিস্যত্ব গ্রহণ করলেন। ইমাম সুফিয়ান আইনিয়াহ্ কয়েক বছর ধরে হাদীস, তাফসীর এবং ফিকাহ্র তালিম দিয়ে শাফেয়ী (রহ)-কে উচ্চতর জ্ঞানের এক শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। কোনো এক অবসরে শিষ্য শাফেয়ী (রহ)-কে বললেন, আচ্ছা বলো তো! ইমাম যুহরীর বর্ণনায় যে হাদীসটি বর্ণিত আছে— 'রাসূল (স) উম্মুল মুমিনীন হযরত সুফিয়াকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়েছেন। পথিমধ্যে দু'জন লোকের সাথে দেখা। তারা কিছু বলে ওঠার আগেই রাসূল (স) বললেন, আমার সাথে আমার স্ত্রী— বিশ্বাসীদের মাতা হযরত সুফিয়া রয়েছে। তিনি আরো বললেন, "শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহের মতো ধাবমান"। এই হাদীসটির তাৎপর্য কি তুমি বুঝতে পারো? শাফেয়ী (রহ) তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন, প্রথমত ঃ রাসূল (স) লোক দুটিকে একজন উচ্চ মর্যাদাবান রাসূলের সাথে একজন মহিলাকে দেখে শয়তানী প্ররোচণায় পড়ে কোন কিছু কল্পনা বা এমনকি ভেবে ওঠার আগেই মূল পরিচয়টি দিয়ে দিলেন, যেন তারা শয়তানী ভাবনার মধ্যে পড়ে না যায় এবং দ্বিতীয়ত ঃ তাঁর অনুসারীদের জন্য এটা একটা স্থায়ী শিক্ষা। সুতরাং রাসূল (সহ)-এর বক্তব্যের মূল তাৎপর্য হলো, আমি একজন রাসূল হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা আমার ব্যাপারেও মন্দ ভাবনায় লিপ্ত হতে পারতো। কাজেই তোমরা চিরদিনের জন্য সতর্ক হয়ে যাও এবং সব রকমের সন্দেহ বা অপবাদ থেকে সবসময়ই নিজেকে মুক্ত রাখো। কেননা শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহের মতো দ্রুত বিচরণশীল। হযরত সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ (রহ) হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, জাযাকাল্লাহ্! কি স্পষ্ট কথা বলেছো! আর এতো সুন্দরভাবে খুলে বলেছ যে, আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। যাও, বিনা দ্বিধায় আমি তোমাকে ফতোয়া দেবার অনুমতি দিলাম।

www.pathagar.com

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ)-এর সাক্ষ্যদান ঃ বড় বড় সমস্যা এবং জটিল থেকে জটিলতর মাসআলার সমাধান মুহূর্তের মধ্যে করে দিতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (রহ) বলেন, সঠিক চিন্তা, দ্রুত অনুধাবন এবং মাসআলাসমূহের প্রামাণিক দলিলসহ এরকম সুস্পষ্ট জবাব দেবার মতো মানুষ আমি আর দেখিনি।

সর্বমহলের আন্তরিক স্বীকৃতি নিয়েই তিনি ১৯৫ হিজরী পর্যন্ত মক্কার প্রধান মুফতি ছিলেন। তারপরে বাগদাদে চলে আসেন। হারুন আর-রশীদ একদিন তার প্রাসাদে ইমামকে ডেকে পাঠালো। ইমাম উপস্থিত হলে বললেন, আজ আমার দরবারে সবাই উপস্থিত। আমাদের জন্য উপদেশমূলক কিছু বলুন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) এমন এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করলেন, যাতে দরবারের সকলেই অভিভূত হয়ে পড়লো। খোদ খলিফা ডুকরে কেঁদে উঠলো। একসময় বক্তৃতা শেষ করে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন। খলিফা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে পঞ্চাশ হাজার দেরহামের উপঢৌকন পেশ করলো।[১]

রবী এবং মুযনী বলেছেন, পঞ্চাশ হাজার দেরহামের মধ্যে চল্লিশ হাজার দেরহাম গরীব-দুঃখী, ইয়াতিম, মিসকিন, দুঃস্থ আলেম এবং ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। কেউ একজন বললো, আপনি তো প্রায় সবি দিয়ে দিলেন! বললেনঃ وَفِىْ اموالهم حق للسائل —"আর তাদের সম্পদে গরিব লোকদের হক রয়েছে" —এটা অসহায়দের ভাগ্য হয়ে এসেছে এবং আমি তাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে একটা মাধ্যম বানিয়েছেন, যার মাধ্যমে এই সম্পদ তাদের কাছে পৌছে গেছে। আমি বিচারদিনের হিসেবের ভয়ে অস্থির হয়ে আছি, তাদের অধিকার আদায়ের যে দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে আমি সঠিকভাবে তাকে পালন করতে পারছি কি না! এরপর কিছুদিনের জন্য মক্কায় আসেন। ১৯৮ হিজরীর হজ্ব সম্পাদন করে আবার বাগদাদে ফিরে যান। এবারে মাত্র কয়েকমাস বাগদাদে কাটিয়ে মিশরে চলে যান। শেষ জীবনের দিনগুলো তিনি সেখানেই কাটিয়ে দেন এবং সেখান থেকেই স্থায়ী জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

---

১. তাওয়ালা আত্ তাসীস

www.pathagar.com

বহস-বিতর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর দক্ষতা

হিজাজ ও ইরাকীদের ফিকাহ্, হাদীস শাস্ত্র ও বেদুঈনদের বাগ্মীতা, এসবের এক অপূর্ব সমন্বয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রহ)। যে কারণে তাঁর বহস বা তর্কানুষ্ঠান গুলোও সৌন্দর্যমণ্ডিত এক আনন্দানুষ্ঠানে পরিণত হতো। এবিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সকল ইমামগণের মধ্যে তিনিই এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব যে গোটা ইসলামী সাম্রাজ্যের মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, ইয়েমেনের নিম্নাঞ্চল, ইরাক, শাম, মিশর এবং আলজিরিয়াসহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সফর করেছেন এবং অবস্থান করেছেন। এসব শহরের বুদ্ধিজীবী এবং আলেম সম্প্রদায়ের সাথে ইল্‌মে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত-বিনিময় করেছেন, বহস করেছেন এবং উদ্ভূত সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধানও করেছেন। শুধুমাত্র তাঁর একক প্রচেষ্টায় এইসব শহরের লোকেরা তাঁর ইজতিহাদী মাসআলাসমূহের সাথে পরিচিত হয়েছে। সাথে সাথে তারাও তাঁর যথাযথ সম্মান, নাসেরুল হাদীস, মুজাদ্দেদ, ইমামুল আয়েম্মা ইত্যাদি উপাধীতে ভূষিত করেছে। তাঁর যোগ্যতার নমুনা হিসাবে এখানে কয়েকটি বিতর্কের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য ঃ

১. ইয়াতিমের সম্পদে যাকাত

কুফার কতিপয় লোক তাঁর এই মাসআলা নিয়ে প্রশ্ন তুললো, "আপনি বলেছেন, ইয়াতিমের সম্পদে যাকাত রয়েছে। অথচ কুরআন মজীদে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আকীমুস্ সালাত ওয়া আতুয্ যাকাত' অর্থাৎ নামায আদায় করো এবং যাকাত দাও। এখন ইয়াতিম ও নাবালেগের ওপরে তো নামাযের বাধ্যবাধকতা নেই! তাহলে যাকাত দেবার ব্যাপারে তারা কেন বাধ্য হবে ? নাবালেগের ওপরে শাস্তিমূলক অপরাধের দণ্ডও কার্যকর হয় না এবং সে কাফের হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় জবরদস্তিমূলক আদেশও দেয়া যায় না। রাসূল (স) -এর বাণী, তিন ব্যক্তি দণ্ডবিধির বাইরে— নাবালেগ, উন্মাদ এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, তোমাদের দলিলের প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাছাড়া তোমাদের দেয়া দলিল অনুযায়ী কার্যক্ষেত্রে তোমরা নিজেরাই তার বিরোধিতা করো। এবার শরীয়তের মূল বক্তব্য শোন, যাকাত সম্পদের ওপরে ধার্য, বয়সের ওপরে নয়। শরীয়তে যে 'পরিমাণ' নির্ধারণ করা আছে তার ওপর দিয়ে একটি বছর পার হয়ে গেলেই যেমন সেই সম্পদের যাকাত ফরয হয়ে যায়, তেমনি নামায বালেগের ওপর ফরয, যেন সে তার জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতা এবং নামাযের মূল উদ্দেশ্য বুঝে নিতে পারে। তোমরা তোমাদেরই নির্ধারিত নীতির বাইরে গিয়ে কেমন করে কর্ম সম্পাদন করো এবার তা দেখিয়ে দিচ্ছি! অল্প বয়সী কোন মেয়ের স্বামী মারা গেলে তোমরা প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের মতো তার ওপরেও 'ইদ্দত' নির্ধারণ করো। অপরাধের দণ্ডে নাবালেগকে বালেগের মতো গণ্য করো। এছাড়া তোমরা নাবালেগের কাছ থেকে 'ওশর' আদায় করছো আর বলছো যে, এক্ষেত্রে বিধান বালেগের মতোই কার্যকর। এগুলো আসলে তোমাদের ফিক্‌হী জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা।

www.pathagar.com

আমি এবার তোমাদেরকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো! তা এই যে, তোমরা বলো! নামায এবং যাকাত একসাথে ফরয হয়েছে, তাহলে এ ব্যাপারে কি বলবে!— যার কাছে সম্পদ নেই তার ওপরে যাকাত নেই এটাতো ঠিক আছে, কিন্তু তার ওপর থেকে নামাযও কি মওকুফ হয়ে যাবে?

একজন লোক দীর্ঘদিন যাবত মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত, স্বাভাবিকভাবেই তার ওপরে নামাযের বাধ্যবাধকতা নেই! এখন সে যদি সম্পদশালী হয় তাহলে তার জন্য কি যাকাতও মওকুফ হয়ে যাবে?

একজন সম্পদশালী ব্যক্তি সফরে রয়েছে। এই সফরের মধ্যেই তার যাকাত আদায় করার সময় শুরু হয়ে গেল। সফরে নামাযকে তো সংক্ষিপ্ত করা যায়, এভাবে যাকাতকেও কি সংক্ষিপ্ত করা যাবে?

ঋতুকালীন সময়ে নারীর জন্য নামায মওকুফ! যাকাতের বেলায় তার জন্য কি এরকম কোন বিধান আছে?

এসব যুক্তি শুনে প্রশ্নকারীরা হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ইব্রাহীম নখ্য়ী এবং আমাদের কুফার অন্যান্য ফকীহ্গণ তো নাবালেগের জন্য যাকাত ফরয মনে করেন না! ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, সুবহানাল্লাহ্! একদিকে ইমাম আবু হানিফা বলেন যে, তাবেয়ীনগণ যে রকম মানুষ ছিলেন আমরাও সে রকমই মানুষ, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য হলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। তাহলে কুফার ফকীহ্ এবং তাবেয়ীনদের সাথে আমার মতপার্থক্য হতে বাধা কোথায়? আমার জানা মতে নাবালেগের যাকাত সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কুফার ফকীহ্গণ নাছোড়বান্দা! তারা বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) ফতোয়া তো আপনার বিরুদ্ধে যাবে। ইমাম শাফেয়ী বললেন, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রা) বিপরীতে রাসূল (স)-এর বাণী বিধেয়। তাছাড়া তিনি যা কিছু বলেছেন, আপনারা তা বুঝতে ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, ইয়াতিমের সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক তা আদায় করবে না বরং ইয়াতিম যখন বালেগ হয়ে যাবে তখন সে নিজে সব হিসেব করে আদায় করে দেবে। সর্বোপরি আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রা) নামে যে বর্ণনাটি আপনারা চর্চা করেন তার বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়, আর আমি যা বলছি তার দলিল সহীহ্ হাদীস এবং তা চারজন বিশিষ্ট সাহাবার (রা) ফয়সালা। তাদের নাম হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) এবং হযরত আয়েশাহ সিদ্দিকা (রা)।

২. ফিকাহ্ না তামাশা ?

একদিন ফকীহ্ 'রবী', ইমাম শাফেয়ীকে বলছেন, রমযানের একটি রোযা যদি কারো কাযা করতে হয় তাহলে তার বারোটা রোযা রাখতে হবে। কেননা রমযানের একটি দিন অন্য মাসের বারোটি দিনের সমান। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, এটা কি ফিকাহ্ না তামাশা? আপনার দৃষ্টিভঙ্গী যদি এই হয় তাহলে তো শবে ক্বদরের নামায ছুটে গেলে হাজার মাস ধরে তার কাযা আদায় করতে হবে, কারণ "কুরআনে রয়েছে ক্বদরের রাতটি হাজার মাসের চাইতে উত্তম।" রবী নিঃশব্দে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের সাথে বিতর্ক

ইমাম শাফেয়ী (রহ) একদিন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমি শুনেছি, তুমি নাকি বলো, এক ওয়াক্তের নামায ছেড়ে দিলে মানুষ কাফের হয়ে যায়, ইমাম আহমাদ বলেন, জ্বী হ্যাঁ। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, যদি এই রকম কাফের মুসলমান হতে চায় তখন কি করতে হবে ? তিনি বললেন, সে রীতিমতো নামায পড়তে শুরু করবে। ইমাম শাফেয়ী বললেন, তোমার মতে কি কাফেরের নামায শুদ্ধ হবে ? নাকি শুদ্ধ নামাযের জন্য আগে ঈমান এনে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে ?

৪. একটি তুচ্ছ বিতর্ক

ফজল বিন রবী' একবার ইমাম শাফেয়ীর কাছে বায়না ধরলো, হাসান বিন জিয়াদ লো'লোইর সাথে আপনার একটু বিতর্ক দেখার আমার খুব ইচ্ছা হয়। ইমাম হেসে বললেন, সে আবার বিতর্কের যোগ্য হলো কবে ? ফজল নাছোড় বান্দা। ইমাম তখন বললেন, তোমার যখন এতোই ইচ্ছা, তখন আমার এক ছাত্রকে বলে দেবো সে তোমার সামনে ওর সাথে বহস করবে— কি বলো ? ফজল তাতেই রাজী। হাসান বিন জিয়াদকে খরব দেয়া হলো। বহসের খবর পেয়ে সে হাজির। ইমামের ছাত্র বললো, জনাব, মদীনার আলেমগণ আমাদের কুফার আলেমদের বেশ কিছু ব্যাপারে শক্ত আপত্তি তোলেন। আপনার কাছ থেকে সেসব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই। হাসান বললো, বেশ, কি বলতে চাও বলো! ছাত্র বললো দেখুন, একটা প্রশ্ন একরম, কেউ যদি নামাযরত অবস্থায় কোন চরিত্রবতী মহিলার বিরুদ্ধে কুৎসা রটায় তখন কি হবে ? হাসান বললো, তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। ছাত্র বললো, তার অযু ? হাসান বললো, অযু বজায় থাকবে। ছাত্র বললো, আচ্ছা বেশ, বুঝলাম। কেউ যদি নামাযের মধ্যে খুব জোরে হেসে ওঠে ? তখন কি হবে ? হাসান বললো, নামায এবং অযু দুটোই বাতিল হয়ে যাবে। ছাত্র এবার জানতে চাইল, অট্টহাসি কি চরিত্রবতী কোন মহিলার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর চাইতেও ভয়ঙ্কর ? ফজল বিন রবী' হো হো করে হেসে উঠলো। ইমাম শাফেয়ী পুরো ঘটনা শুনে বললেন, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম হাসান বিন রবী কথা বলারও যোগ্য নয়। আসল ব্যাপার হলো হাসান বিন জিয়াদ লো'লোইকে সকল মুহাদ্দিসীনগণ যে কোনো ধরনের গ্রহণযোগ্যতার বাইরে রেখেছেন। একারণেই ইমাম শাফেয়ী (রহ) তার সাথে আলাপ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৫ . ইমাম মুহাম্মদের সাথে আলোচনা

একদিন ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইমাম মুহাম্মদ (রহ)-এর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে বললেন, কুয়ার পানি পাক হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের মতামত শুনলে তাজ্জব না হয়ে পারা যায় না। এটা কেমন কথা যে, একটা ইঁদুর কুয়ার পানিতে পড়ে মরলে সেখান থেকে মাত্র বিশ বালতি পানি ফেলে দিলেই সে পানি পাক হয়ে যাবে ? পুরো জিনিসটাই যেখানে নাপাক, সেখান থেকে কিছু অংশ তুলে ফেললেই তা পাক হয়ে যাবে এটা কেমনতরো যুক্তির কথা ?

এছাড়া আপনাদের আরো একটা অদ্ভুত মাসআলা হলো, অযু ছাড়া কুয়ার পানিতে কেউ হাত দিলে সব পানিটাই নাপাক হয়ে যায়। তখন পুরো কুয়ার পানি তুলে ফেলতে হবে। তারপর নতুন পানি এলে তাকে পাক ধরা হবে। কোন মৃত জন্তু অথবা নাপাক ময়লা পড়লে

www.pathagar.com

তা থেকে বিশ-তিরিশ বালতি পানি ফেলে দিলেই তা পাক হয়ে যায় আর অযু ছাড়া কোনো মানুষের হাত পড়লে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পাক হওয়ার কোনো উপায়ই থাকে না! এসব মাসআলা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষ মেনে নিতে পারে কি ?

৬. রাসূল (স)-এর কওল থেকে দলিল

ইমাম ইসহাক বিন রাহোইয়া বলেন ঃ আমি, ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন এবং আহমাদ বিন হাম্বাল— আমরা এক সাথে মক্কায় গিয়েছি এবং এক জায়গাতেই থাকতাম। ইমাম আহমাদের কাজ ছিল সারাদিন ইমাম শাফেয়ীর কাছাকাছি থাকা আর আমি ইমাম আহমাদের সঙ্গে এক জায়গা থাকতে পেরেই নিজেকে ধন্য মনে করতাম। একদিন ইমাম আহমাদ আমাকে বললেন, আবু ইয়াকুব! তুমি আমার সাথে ইমাম শাফেয়ীর মজলিসে যাওনা কেন ? আমি বললাম এখানে যখন সুফিয়ান বিন আইনিয়াসহ ইমাম শাফেয়ীর উস্তাদগণ বর্তমান তাদেরকে ছেড়ে এমন একজনের কাছে যাবো, যার বয়স আমাদের চাইতে একটু বেশি! আমি তো ভেবেই পাই না আপনি কেন সেখানে যান। আর আজ আমাকেও যেতে বলছেন ? ইমাম আহমাদ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নেক তওফিক দান করুন। ভাই শাফেয়ীর মতো জ্ঞানী আর কোথায় খুঁজে পাবো। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে আমিও গেলাম। সেখানে গিয়েই আমি একটা প্রশ্ন তুললাম, মক্কা মুকাররমার ঘর-বাড়ির ভাড়া উসূল করা নাজায়েয। অন্যান্য লোকদের সাথে এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হলো। শেষ পর্যন্ত ইমাম শাফেয়ীর মুখোমুখি হলাম। প্রথম সুযোগেই তার কিছু বিতর্কিত মাসলা নিয়ে সরাসরি তাকে প্রশ্ন করলাম। আমি থামলে পরে ইমাম শাফেয়ী (রহ) শান্তস্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার সাথে বহস করবে ? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ। ইমাম শাফেয়ী বললেন, শোনো! আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ অর্থাৎ 'সেইসব অসহায় লোকদের জন্য যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে'। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার মুহাজেরীনদেরকে তাদের ঘরগুলোর মালিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই আয়াত থেকে প্রমাণ হয়ে গেলো যে, মক্কার লোকেরাই তাদের ঘরের মালিক। ভাড়া ছাড়া অন্য কারো সে ঘরে থাকার কি অধিকার থাকতে পারে ? ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার মালিকের জন্য সংরক্ষিত। রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন ঃ

مِنْ اغلق بابه فهو امن ومن دخل دارابو سفيان فهوامن –

যে নিজের দরজা বন্ধ করবে তার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষিত এবং যে আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তার জন্যও নিরাপত্তা রয়েছে।

এখানে লক্ষ্য করে দেখ রাসূল (স) মক্কাবাসীদেরকে তাদের ঘরের মালিক হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। আরো বলছি শোনো, রাসূল (স) যখন মদীনা থেকে মক্কায় এলেন, তখন কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় আপনি থাকবেন কোথায় ? তিনি বললেন ঃ هَلْ تَرَكَ لنا عقيل دارا —আকীল কি আমাদের কোনো বাড়িঘর বাকী রেখেছে ? (অর্থাৎ সব বেচে দিয়েছে) এখন বলো কি বুঝলে ?

আমি জবাব দিলাম, কিন্তু আতা, হাসান, ইব্রাহীম এবং মুজাহিদ প্রমুখ তাবেয়ীনগণ তো মক্কা মুকাররমার বাড়ি-ঘরগুলোকে ভাড়া ছাড়া ব্যবহারকে বৈধ এবং সঙ্গত বলেছেন। ইমাম

www.pathagar.com

শাফেয়ী (রহ) এবার উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে ইসহাকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রশ্ন করলেন— এ, কে ? লোকেরা বললো, ইসহাক বিন রাহোইয়া। আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি সেই ইসহাক যাকে খোরাসানের লোকেরা ফকীহ্ বলে ? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, তুমি ছাড়া অন্য কেউ হলে আমি তাকে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলতাম। আমি বলছি রাসূল (স) এই বলেছেন আর তুমি বলছো আতা ও তাউসরা এটা বলেছে ! খোদ রাসূল (স)-এর কওলের বিরপীত তাদের কথার কি মূল্য দাঁড়াতে পারে ? আমি তারপরেও একটু চেঁচিয়ে বললাম, আচ্ছা যাক তাদের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু কুরআন মাজীদে রয়েছে যে, سواء ان العاكف فيه العابر—এর মধ্যে অবস্থানরত এবং আগত মুসাফির উভয়ই সমান। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, ভাই! এ আদেশ শুধুমাত্র মাসজিদুল হারাম এবং সংলগ্ন চত্বর সম্পর্কে। এরপরে আর কোন কথা থাকলো না এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমার আর কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকলো না। রীতিমতো তাঁর মজলিসে গিয়ে বসার একটা তীব্র আগ্রহ অনুভব করতাম এবং তাই করতাম।

৭. আরও একটি বহস

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর একটা ফতোয়া ছিল এরকম— কোনো মুসলিম গোলাম কোনো কাফিরকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এর দলিল হিসেবে তিনি দু'খানি বর্ণনা উল্লেখ করতেন। এক ঃ রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের দায়িত্ব সবার জন্য সমান। তাদের মধ্যে খুব নগণ্য কোন ব্যক্তিও যদি কাউকে নিরাপত্তা দিয়ে দেয়, তাহলে তা গোটা মুসলিম সমাজের দায়িত্ব বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, একজন মুসলিম গোলামকে যদি নগণ্য মুসলিম ধরা হয় তাহলে এই একখানি হাদীসই যথেষ্ট। দুই ঃ হযরত উমর (রা)-এর সময়ে একজন মুসলিম গোলাম কাফিরদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। হযরত উমর (রা) সেই গোলামের কথা অনুযায়ী তার দেয়া নিরাপত্তা বহাল রেখেছিলেন। একজন হানাফী ফকীহ্ প্রতিবাদ জানালো। বললো ঃ গোলামের রক্ত স্বাধীন ব্যক্তির সমান নয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, তোমাদের মুখে একথা শোভা পায় না, কারণ তোমরা গোলামের বদলে স্বাধীন ব্যক্তির কিসাস যথার্থ মনে করো।

এই সব বিতর্ক থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হিজরী দ্বিতীয় শতকে ফিকহী মাসায়েলের মধ্যে কি রকম সূক্ষ্মতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং অপ্রাসাঙ্গিক মাসায়েল ও তার জবাবগুলোর মধ্যে কতোটা অনুসন্ধিৎসা চালানো হয়েছে।

একদিন ইমাম মুহাম্মদ (রহ) ইমাম শাফেয়ী (রহ)-কে বললেন, আমি কিছু মাসায়েল নিয়ে তোমার সাথে বিতর্ক করতে চাই। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, বিসমিল্লাহ্, শুরু করুন। ইমাম মুহাম্মদ বললেন, মনে করো কেউ একজন অন্য একজনের 'শাহীতার' (চৌকাঠ জাতীয় কিছু একটা) চুরি করে নিজের ঘরে লাগিয়ে দিলো এবং নির্মাণ কাজে কয়েক হাজার দেরহামও খরচ করে ফেললো। কিছুদিন পরে শাহীতারের আসল মালিক এসে উপস্থিত এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ হয়ে গেল যে, ওটার আসল মালিক সে। এমতাবস্থায় তুমি কি ফতোয়া দেবে ? ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, জিনিসের মালিককে যে-কোনোভাবে রাজী করিয়ে তার দাম চুকিয়ে দিতে বলবো। আর যদি সে কোনভাবেই রাজী না হয় তাহলে যতোটা সম্ভব নির্মাণকে ঠিক রেখে তার জিনিস তাকে ফেরত দিতে হবে।

www.pathagar.com

ইমাম মুহাম্মদ বললেন, বেশ! তাহলে এবার বলো, একটা কাঠের তক্তা চুরি করে কেউ তার নৌকায় লাগিয়েছে। কোনো একদিন নদীর মাঝখানে তক্তার মালিক প্রমাণসহ তাকে ধরে ফেললো। তখন কি তুমি সেখানেই সেই তক্তা খুলে দিতে বলবে ? ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, না। এ জবাবে ইমাম মুহাম্মদ এবং তাঁর ছাত্ররা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং হেসে বললেন, তোমার এখনকার কথা আর আগের কথার মধ্যে তো অনেক পার্থক্য হয়ে গেলো! তা যাক! এবার অন্য মাসআলা বলো! মনে করো, কেউ একজন রেশমী সুতা চুরি করলো এবং নিজের পেট কেটে সেই সুতা দিয়ে তা সেলাই করলো। এখন এই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার ফতোয়া কি দাঁড়াবে ? ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, তার পেট আর কাটা যাবে না, কেননা সেই সুতা আর আগের অবস্থায় নেই, তদুপরি তার ক্ষতস্থানেও নতুন করে কোনো ক্ষতি করা যাবে না। এবারের উত্তরে ইমাম মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা আরো বেশি আনন্দিত হয়ে বললেন, তুমি কিন্তু তোমার কথার উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছো না! ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, একটু ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে আমার জবাব শুনুন। একটা কথার জবাব আগে দিন, ঐ সুতা যদি তার নিজের হতো তাহলে ঐ অবস্থায় নিজের ক্ষতস্থান থেকে সুতা আলাদা করা ফিক্‌হী দৃষ্টিকোণে হারাম ছিল! ঠিক কিনা ? ইমাম মুহাম্মদ বললেন, হ্যাঁ ঠিক। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, নৌকায় যে তক্তা লাগানো হয়েছিল সে তক্তা যদি নৌকার মালিকের নিজের হতো তাহলে নদীর মাঝখানে এভাবে নৌকার কোনো তক্তা খুলে ফেলা জায়েয— না হারাম ? ইমাম মুহাম্মদ বললেন, হারাম। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, এবার তাহলে বলুন, কোনো বাড়ির মালিক নিজেরই কোনো প্রয়োজনে তার সম্পূর্ণ ঘর ভেঙ্গে দিয়ে যদি আবার তৈরী করতে চায় তাহলে তা জায়েয না নাজায়েয ? ইমাম মুহাম্মদ বললেন, জায়েয! ইমাম শাফেয়ী এবার বললেন ঃ বৈধ ব্যাপারগুলোকে আপনারা অবৈধ ধরে নিয়েছেন কেন, আমি বুঝি না! ইমাম মুহাম্মদ বললেন, নৌকার মাসআলাটির ব্যাপারে তোমার মতামত বলো। শাফেয়ী (রহ) বললেন, মাঝ নদীর নৌকাটিকে পারে আনতে হবে তারপর তক্তার মালিককে তার দাম দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করা হবে। যদি কিছুতেই সে না মানে তাহলে সেই তক্তাই খুলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, "কারো কোন ক্ষতি করা যাবে না"। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, সে তো নিজেই তার ক্ষতি করে বসে আছে!

এবার ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইমাম মুহাম্মদ (রহ)-কে বললেন, এই মাসআলাটির ব্যাপারে আপনার কি রায় ? এক অভিজাত বংশীয় ব্যক্তি একটা 'হাবশীর' দাসীকে চুরি করে তার সাথে সহবাস করলো এবং তার কাছেই রেখে দিলো। দিনে দিনে তার গর্ভে কয়েকটি বাচ্চাও জন্ম নিলো। কালক্রমে সেই ছেলেরা অত্যন্ত দক্ষ এবং যোগ্য মানুষ হয়ে গড়ে উঠলো। দীর্ঘদিন পরে সেই হাবশী প্রমাণসহ এসে তার দাসীকে সনাক্ত করলো এবং দাবি করে বসলো। এখন ফতোয়া দিন এবং ফায়সালা করুন। ইমাম মুহাম্মদ বললেন, ঐ ছেলেদেরকে হাবশীর মালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে। এবার ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে আপনাকে বিবেচনা করতে বলবো এবং তারপর আপনি বলুন এই দুটোর কোনটার মধ্যে বেশি ক্ষতি রয়েছে ? সেই নৌকার তক্তা খোলার মধ্যে না এই অভিজাত ব্যক্তির ঔরশে জন্ম নেয়া সুযোগ্য মানব সন্তানদের গোলাম বানানোর মধ্যে ? ইমাম মুহাম্মদ (রহ) চুপ হয়ে গেলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, অপ্রাসাঙ্গিক মাসায়েল এবং সুনির্ধারিত অবস্থাগুলোর ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কেননা তা সাহাবায়ে কিরামের রীতি ছিল না। যেসব

অভিনব প্রেক্ষিতগুলো সামনে এসে যাবে তাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা-পর্যবেক্ষণ সবই করা উচিত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর ফতোয়া ছিল যে, মোহরানার কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই এবং না তার কোনো সীমারেখা টানা আছে। রাসূল (স) লোহার আংটি দিয়েও বিয়ে জায়েয রেখেছেন এবং হযরত উম্মে সেলিম হযরত তালহার সাথে শুধুমাত্র ঈমান গ্রহণ করার জন্য বিবাহ করেছিলেন। এ জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন যে, পারস্পরিক সমাঝোতার মাধ্যমে যা নির্ধারণ হবে সেটাই মোহরানার পরিমাণ। এ ব্যাপারে কয়েকজন ফকীহ্ তাঁর সাথে বিতর্কালোচনায় বসতে চাইলে তিনি শর্ত দিয়ে দেন যে, শুধুমাত্র রাসূল (স)-এর কোনো প্রমাণিত হাদীস যদি কারো কাছে থেকে থাকে তাহলে সে যেন বহস করতে আসে। একথার পরে কেউ আর এ প্রসঙ্গে অগ্রসর হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, মদীনার আলেমগণ কাযী আবু ইউসুফের সাথে একটি মাসআলা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। "বাদীর শপথ এবং আর একজন সাক্ষী হলেই ফয়সালা হয়ে যেতে পারে"। কাযী আবু ইউসুফ বলেন, আমি এই ব্যাপারটাকে এ কারণে ঠিক মনে করি না, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ استشهد واشهيدين من رجالكم। অর্থাৎ তোমাদের থেকে দু'জন পুরুষ সাক্ষী আনো। কেউ একজন প্রশ্ন করলো, সে দু'জন কেমন হতে হবে ? তিনি বললেন, সে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম হতে হবে। মদীনার আলেমগণ চুপ হয়ে গেলেন। আমি আস্তে করে তাকে বললাম, এই লোকেরা যদি এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে বসে, দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে আপনারা তো 'জিম্মীদের' সাক্ষী জায়েয রেখেছেন, তাহলে এখানে কেন দু'জন ভালো মুসলিমের শর্ত লাগিয়েছেন ? তাহলে আপনি কি জবাব দেবেন ? একথা শুনে কাযী আবু ইউসুফ অনেকক্ষণ মাথানত করে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপর মাথা তুলে হেসে আমাদের বললেন, এই লোকদের ভাবনা-চিন্তা এতোদূর কেমন করে পৌছাবে! আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, এই ব্যক্তি শুধু নাজানা আলেমদের মধ্যেই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইরাকের প্রখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিসগণ বহস বিতর্কে ইমাম শাফেয়ীর সমকক্ষ ছিলেন, কিন্তু তবু তাঁরা ইমাম শাফেয়ীকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও তাঁর তীক্ষ্ণ মেধার জন্য অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ)

ইমাম মুহাম্মদ একদিন হারুন আর-রশীদের দরবারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ইমাম শাফেয়ীর সাথে দেখা। সাথে সাথে ঘোড়া থেকে নেমে খাদেমকে বললেন, দরবারে গিয়ে বলে দাও যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) এসেছেন তাই আমি দরবারে আসতে পারলাম না। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, দরবারে যাচ্ছিলেন যান! আমি না হয় অন্য একসময় আসবো। ইমাম মুহাম্মদ বললেন, আপনার কাছে বসলে আমি যা পাবো, তার চাইতে মূল্যবান কিছু ওখানে নেই।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর অবয়ব-আকৃতি এবং পরিবার-পরিজন

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, তিনি ছিলেন সবদিক থেকে মানানসই মধ্যম আকৃতির। কিন্তু হাত দু'খানি ছিল লম্বা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। হাসিমাখা টানটান মুখ। ঘণ ভ্রু আলাদা আলাদা, ছোট কিন্তু চওড়া দাঁত, দাড়ি মাঝারী, শেষ বয়সে মেহদীর খেযাব লাগাতেন। লম্বা নাক, নাকের উপর হালকা বসন্তের দাগ, সব মিলিয়ে গোটা অবয়ব জুড়ে সুস্পষ্ট আভিজাত্যের ছাপ।

একজন স্ত্রী এবং একটি দাসী। স্ত্রী হযরত ওসমান (রা)-এর বংশের মেয়ে। তার বংশধারা এরকম— 'হামদাহ্' বিনতে নাফে' বিন আইনাহ্ বিন উমর বিন ওসমান বিন আফফান। তিন ছেলে, দুই মেয়ে। দুই ছেলে ছোটবেলায় মারা গেছে। এক ছেলে আবু ওসমান মুহাম্মদ এবং দুই কন্যা ফাতেমা ও যয়নবকে নিয়ে অত্যন্ত সুখের সংসার ছিল তাঁর। খরচের হাত ছিল উদার তাই এই আছে এই নেই এর মধ্যেও অত্যন্ত সচ্ছল জীবন যাপন করতেন। পারিবারিক অশান্তি বা ঝগড়াঝাঁটি তাঁর ছিল না।[১]

বড় ছেলে আবু ওসমানের পরিচয়

নাম মুহাম্মদ, ডাক নাম আবু ওসমান বংশ পরম্পরা, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইদরিস বিন আব্বাস বিন ওসমান বিন শাফে'। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর ইন্তেকালের সময় সে মক্কায় ছিল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের প্রিয় ছাত্র। ইমাম হাম্বাল তাকে বলতেন, তিনটি কারণে আমি তোমাকে এতো ভালবাসি। প্রথমতঃ তুমি আমার উস্তাদের ছেলে। দ্বিতীয়ত ঃ তুমি কোরায়শী এবং তৃতীয়ত তুমি আল্লাহ্‌র বিধানের একনিষ্ঠ অনুসারী। ছেলে আবু ওসমান বলছেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল আমাকে বলতেন, আমি ছয় ব্যক্তির জন্য সেজদায় পড়ে বিশেষভাবে দো'আ করি, তার মধ্যে একজন তোমার বাবা ইমাম শাফেয়ী (রহ)।

খেতাব বিন বাশার বলছেন, আমি ইমাম আহমাদকে কখনো কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি আবু ওসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মাসআলার এটা সেই জবাব যেটা আমাকে ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইমাম হামিদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, হামিদী শোনো, যারা 'আমলকে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত মনে করে না তাদেরকে কুরআন মজীদের এই আয়াতের দলিল কেন দাও না?

وَمَا أُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ -

এবং তাদেরকে তো এই আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, কায়মনো বাক্যে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে থাকবে, নামাযের ওপর দাঁড়াবে এবং যাকাত আদায় করবে— এটাই চিরন্তনী দ্বীন। (সূরা বাইয়্যেনাহ)

আবু ওসমান হালাব ও আলজিরিয়ায় কাযীর পদে আসীন ছিলেন। ২৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

---

১. তব্‌কাতে শাফেয়ীয়াহ্, আল কুব্‌রা

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) ছাত্র-শিষ্যগণ

হাফেয ইবনে আসকালানী (রহ) তাঁর শাগরেদগণের সংখ্যা ১২০ জন সনাক্ত করেছেন। রবী' বিন সুলাইমান বলেছেন, আমি তাঁর বহিরাঙ্গণে শত শত বাহন (ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর) দেখেছি। দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা তাঁর কাছে হাদীস এবং ফিকাহ্ শিখতে আসতো। তাঁর ছাত্র সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তাই তাদের মধ্যে অত্যন্ত খ্যাত-বিখ্যাত কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বিত্তান্ত বর্ণনা করতে চাচ্ছি।

ইমাম হামিদী (রহ) ইমাম বুখারীর উস্তাদ, হারমালাহ বিন ইয়াহ্ইয়া, সুলাইমান বিন দাউদ, আবু মুহাম্মদ হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আস্সবাহ আয্জাফরানী, আবু ইব্রাহীম, ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া, মুযনী, আবু ছুর ইব্রাহীম বিন খালেদ, ইউনুস বিন আবদুল আলা, রবী' বিন সুলাইমান, আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন ইয়াহ্ইয়া, বুইতী ইসহাক বিন রাহোইয়া, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ)।

ইমাম হামিদী ঃ নাম আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের, ডাক নাম আবু বকর। ইমামুল ইল্ম আবু বকর আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের কোরায়শী আসাদী হামিদী মক্কী, হাফেযে হাদীস এবং ফকীহ্। তিনি হযরত সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্, মুসলিম বিন খালেদ যন্জী ফযীল বিন আইয়ায দরাদরদী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর ছাত্রদের সবচাইতে বড়দের মধ্যে তাকে গণ্য করা হতো। ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি আমাদের কাছে ইমাম। আবু হাতেম বলেন, সুফিয়ান বিন আইনিয়ার ছাত্রদের মধ্যে হামিদী সবচাইতে বেশি আস্থাভাজন। ইমাম বুখারী, যুহরী, আবু যারআ, আবু হাতেম, বাশার বিন মূসা প্রমুখ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১]

ইবনে আদী বলেন, ইমাম হামিদী ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর সাথে মিশর গিয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত পছন্দনীয় মানুষ। ইমাম বুখারী তাঁর থেকে পঁচাত্তরটি হাদীস গ্রহণ করেছেন।

রবী বিন সুলাইমান বলেন, আমি ইমাম হামিদীর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, যখন ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইয়েমেন থেকে মক্কায় চলে আসেন তখন তার কাছে দশ হাজার দীনার ছিল। তিনি মক্কা নগরীর বাইরে তাঁর তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। লোকেরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসতো এবং তিনি অবস্থানুযায়ী লোকদের সাহায্য করতেন, যতোদিন সেই টাকা শেষ হয়নি ততোদিন তিনি মক্কায় প্রবেশ করেননি। সিরাজ বলছেন, আমি ইমাম বুখারীর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, হামিদী হাদীস শাস্ত্রের ইমাম। ইবনে সো'ওদ এবং ইমাম বুখারীর বক্তব্য অনুযায়ী ২১৯ হিজরীতে তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন।[২]

১. তায্কেরাতুল হুফ্ফায
২. তব্কতে শাফেয়ীয়াহ্, আল কুবরা

www.pathagar.com

হারমালাহ্ বিন ইয়াহ্ইয়া ঃ হারমালাহ্ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুল্লাহ্ বিন হারমালাহ্ আবু হাফ্স মিস্রী। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর বিশেষ ছাত্রদের মধ্যে একজন। ইমাম মুসলিম ইবনে মাযাহ্ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর লিখিত পাণ্ডুলিপির এক বিশাল সংগ্রহ তাঁর কাছে ছিল। ১৬৬ হিজরীতে জন্ম এবং মৃত্যু ২৪৪ হিজরীতে।[১]

সুলাইমান বিন দাউদ ঃ সুলাইমান বিন দাউদ, আলী বিন আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস আল হাশেমী। তিনি ইব্রাহীম বিন সো'ওদ, সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহ) কিতাবে খাল্ক আফ্আল আল ইবাদে এবং আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্ প্রমূখ হারুন জামালের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাসান বিন মুহাম্মদ জাফরানী বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি দুই ব্যক্তিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান পেয়েছি, তার একজন সুলাইমান এবং দ্বিতীয় আহমাদ ইবনে হাম্বাল। ইবনে সো'ওদের বর্ণনানুযায়ী ২১৯ হিজরীতে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।[২]

হাসান বিন মুহাম্মদ জাফরানী আবু আলী আল বাগদাদী ঃ তিনি সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ আবী মুয়াবিয়া এবং ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্ এবং ইবনে খাযীয়াহ্ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। জাফরানী বলেন, যখন আমি ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর চিঠি তার সামনে পড়লাম, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি আরবের কোন্ বংশের ছেলে ? আমি বললাম, আমি আরব নই। জাফরানিয়াহ্ নামের ছোট্ট একটি শহরে আমাদের বাড়ি। তিনি বললেন, তোমরা সেখানকার সরদার, তাই না! জাফরানিয়াহ্র ছেলেরাই ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর দরসগাহে পাঠের কাজটি করতেন।

ইবনে আবদুল বার বলেন, সেই সময় তাদের চাইতে শুদ্ধ এবং সুন্দর ভাষা আর কোনো এলাকার লোক জানতো না। তিনি প্রথমে কুফার ফিকাহ্ অনুসরণ করতেন, কিন্তু তারপরে স্থায়ীভাবে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর সামগ্রিক মতামতের অনুসারী হয়ে গিয়েছিলেন। ২৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৩]

আবু ইব্রাহীম-ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া মুযনী ঃ ১৭৫ হিজরীতে তাঁর জন্ম। তিনি ইমাম শাফেয়ী, নঈম বিন হাম্মাদ প্রমুখের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হাজীমাহ্ তাহাবী, যাকারিয়াহ সাজী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। ইমাম শাফেয়ী (রহ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "শয়তানের সাথে বিতর্ক বাধলেও সে-ই জয়ী হবে"। অত্যন্ত বড় মাপের মুজাহিদ, দুনিয়া ত্যাগী, একনিষ্ঠ আবেদ ছিলেন। এক ওয়াক্তের নামায জামাতের সাথে পড়তে না পারলে পঁচিশ ওয়াক্তের নফল পড়ে তার খেসারত দিতেন। খুঁজে খুঁজে মৃতদেহ গোসল দিতেন। বলতেন, এ কাজটা আমি করি এই জন্য যে, আমার মধ্যে যেন জীবনের প্রতি শক্ত কোনো মোহ জন্ম না নেয়।

---

১. তাহ্যীব আত্তাহ্যীব।
২. তাহ্যীব আত্ তাহযীব
৩. তাহ্যীব আত্ তাহযীব

www.pathagar.com

আবু ইসহাক বলেন, তিনি যাহেদ, আলেম, মুজতাহিদ এবং জটিল ইল্‌মী বহসে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের সমাধানদাতা। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলতেন, মুয্‌নী আমার মতামত প্রতিষ্ঠায় অনেক বড় সাহায্যকারী। তাকে উদ্দেশ্যে করে বলতেন, হে মুয্‌নী এই মিশরে তোমার মর্যাদা অনেক উচ্চে উঠবে। রবীকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, তুমি আমার রচনাগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে এবং তোমার দ্বারা তার অনেক প্রচার-প্রসার হবে। হে আবু ইয়াহ্‌ইয়া! উঠে দাঁড়াও এবং আমার এই দরসের মজলিস পরিচালনা করো। রবী বলেন, এভাবে ইমাম সাহেব যার সম্পর্কে যতোটুকু বলেছেন, তা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম 'মুয্‌নী' যখন তার কিতাব 'মুখতাসারে' কোনো আলোচনা বা গবেষণার বিষয় লিখতেন, সে লেখা শেষ করেই তিনি দু' রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তাঁর বিশাল রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- জামে সাগীর, জামে কবীর, আলমুখতাসার আল-মনসুর, সায়েল মু'তাবেরাহ্‌, আত্‌ তারগীব ফিল ইল্‌ম, কিতাব আল ওয়াছায়েক্‌ কিতাব আল-আকারেব, কিতাব নেহায়াহ্‌ আল ইখতেসার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্‌র দরবারে যাঁদের দো'আ কবুল হয় বলে স্বীকৃত তিনি তাঁদের একজন। ২৬৪ হিজরীর রমযান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১]

---

১. তাবকাতে শাফেয়ীয়াহ আল কুবরা

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থান ও মর্যাদা

সাহাবায়ে কিরামের সম্মুখে ছিলেন মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আলোর এই উৎস থেকে সাহাবায়ে কিরাম সরাসরি আলোকিত হয়েছেন। যে কারণে তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, চরিত্র, কর্মপ্রকাশ, ইবাদত, তপস্যা, নির্ভরতা, ধৈর্য এবং যথাযথ স্থিরতা ইত্যাদিতে সরাসরি 'রাসূল (স) অনুসরণ' ছাড়া মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি সঞ্জাত দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার কোনো সংমিশ্রণ ছিল না। তাবেয়ীনগণের অবস্থাও তাই। তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের হুবহু অনুসরণ, অনুকরণকে সর্বোত্তম প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাবে তাবেয়ীন এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আলোর সন্ধানী শ্রেষ্ঠ মানব সম্প্রদায় এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই নিজেদের জীবন পরিচালনার মূলমন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। একবিন্দু বেদআত অর্থাৎ সংযোজন-বিয়োজনে তাঁরা ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। যে কারণে প্রত্যেকের একনিষ্ঠ অনুসরণকারীর কাজকর্ম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সত্যিকারের অনুসরণটাই সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। একটি ব্যাপারে তাদের সতর্কতার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না যে, তাঁর কোনো অসাবধানতার কারণে শরীয়তের মূল বিধানের কোনো অসঙ্গতি প্রকাশ পাচ্ছে না তো ? 'আসমাউর রিজাল'-এর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করলে এই ব্যাপারটাই পরিষ্কার ভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, হাদীস শাস্ত্রের ধারক-বাহকগণ কোনো ধরনের কোনো ভয়-ভীতি বা কোনো ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে ভ্রূক্ষেপ না করে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি-মানুষের দোষ-ত্রুটিগুলোকে খোলাখুলিভাবে সামনে রেখে দিয়েছেন, যেন মানবতার মুক্তির একমাত্র অবলম্বন রাসূলে কারীম (স)-এর বাণীসমূহের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো আবিলতা স্পর্শ করতে না পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর পরিচ্ছন্ন জীবনের আর একটি দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্যতা, এই ছিল তাঁর প্রাথমিক জীবনের তিন অবলম্বন। সেই সময় কেউ একজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, একি অবস্থা তোমার ? জবাবে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, কেন রাসূলে কারীম (স)-এর সেই বাণীটি কি আপনি শোনেননি যা তিনি আবুযর (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ?

كن فى الدنيا كانك غريب اوعابرسيبل وعد نفسكم من اهل القبور –

পৃথিবীতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন দরিদ্র লোক, অথবা একজন পথিক এবং নিজেদেরকে কবরবাসীদের একজন বলে মনে করো।

এই হাদীসের কথাগুলো আন্তরিকভাবে ভাবতে গেলে পৃথিবীর প্রতি মায়া-মমতা বা কোনো ধরনের আকর্ষণ আর বাকি থাকে না। এটা না হয় দরিদ্র অবস্থার জবাব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন সচ্ছলতার সকল দুয়ার তাঁর জন্য খুলে দিয়েছিলেন, তখনও তার হাতে যা কিছু আসতো তার এক-চতুর্থাংশ নিজের জন্য রেখে বাদ বাকিটা গরীব-দুঃখী, বিধবা, ইয়াতিম, গরীব ছাত্র এবং আলেমদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। সে সময়ও বড় একজন মুহাদ্দিস প্রশ্ন করেছিলেন— এভাবে সব বিলিয়ে দিচ্ছেন ? তিনি জবাব দিয়েছেন, আমরা রাসূল (স)-এর জীবনকে অনুসরণ করি বলে দাবি করি কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য কি বাকি রেখেছিলেন ? কথাটি আমরা সবাই জানি। প্রশ্নটি যখন

খোদ রাসূল (স) তাকে করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাম।' তওহীদ অনুসারীদের জন্য এটা একটা দিক নির্দেশনা! তারপরে বললেন ঃ

وَلابى بكر رضى الله عنه معان اخر مما تعلق بها اهل الحقائق وارباب القلوب -

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে আরো কিছু গুণ ছিল যা সত্য সন্ধানী হৃদয়বান ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ধারণ করেছে।

এখন তুমি বলো এই চতুর্থাংশ আমি কেন রেখেছি। এটা নিয়েও আমি লজ্জিত এবং শংকিত। এমন যেন না হয় যে, হিসাবের দিনে এতোটুকু সুযোগ-সুবিধা ভোগও আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ?

শোন! সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা এজন্যই কাউকে দান করেন— যা বঞ্চিতদের পৌঁছে দিয়ে উভয়পক্ষই লাভবান হতে পারে। এই দান এবং আমানত যদি আমি নিজেই ভোগ করতে লেগে যাই, তাহলে কেয়ামতের দিন যখন রাসূলুল্লাহ (স) সুপারিশকারী হয়ে দাঁড়াবেন তখন আমার অবস্থা কি হবে ? এই কথাগুলো যখনই তিনি বলতেন তখন আকুল হয়ে কাঁদতেন।

তাঁর তপস্যা ও ইবাদতের প্রকৃতি

তাঁর নিজের মুখের কথা, এই বিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি কখনো সত্য বা মিথ্যা কসম খাইনি। রাতের এক-তৃতীয়াংশ ইবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে কাটাতেন। এক অংশ কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ ইত্যাদির অধ্যয়নে কেটে যেতো। কারো বিরুদ্ধে কোন কুৎসা রটনা বা গীবত ইত্যাদি থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। একান্ত অনুগত ছাত্র আমরুদ বিন তাবাতাহ্ বলেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মতো পরহেযগার মুত্তাকী আমি আর দেখিনি।

আল্লামা ইবনে জাওযীর বক্তব্য

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ) ইমাম ইবনে হাম্বালের ছেলে আবদুল্লাহ্র বরাত দিয়ে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, আমি আমার বাবা ইমাম ইবনে হাম্বালের কাছে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম শাফেয়ী (রহ) কি রকম মানুষ ছিলেন যার জন্য আপনি রোজ এইভাবে দো'আ-খায়ের করেন ? তিনি বলেন, দেখো বাবা, ইমাম শাফেয়ীর তুলনা ঠিক এই রকম— পৃথিবীর জন্য সূর্য যে রকম এবং মানুষের জন্য তার শারীরিক সুস্থতা যে রকম। এখন তুমিই বলো, এই দুটোর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীতে আর কি আছে ?[১]

ইমাম সাহেবের কারামত

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কয়েকটি কারামতের কথা প্রমাণিত সত্য ঃ

(১) ইমাম শাফেয়ী (রহ) যখন ইমাম মালিকের কিছু মাসআলার সমালোচনা করে একখানি কিতাব রচনা করলেন তখন মিশর অধিপতির কাছে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানানো হলো এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ)-কে দেশে বড় কোনো গণ্ডগোল সৃষ্টি হবার আগেই

---

১. সিকাতুস্ সুফুত, ২য় খণ্ড।

www.pathagar.com

দেশ থেকে বের করে দেবার দাবি পেশ করা হলো। শাসনকর্তা ইমামকে ডেকে দেশ থেকে চলে যেতে বললেন। কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে ইমাম শাফেয়ী (রহ) মিশর অধিপতিকে খুব গভীর মনোযোগে দেখছিলেন। বললেন, যদি কিছু অপরাধ না নেন তাহলে অন্ততঃ তিনটি দিনের সময় আমাকে দিন। প্রশাসক সাথে সাথে তা মঞ্জুর করলেন। তৃতীয় রাতেই হঠাৎ মিশরের শাসনকর্তা মারা গেলেন। লোকেরা ইমামের কাছে ভেদ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তাকে উৎখাত করেন এবং যাকে চান তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

(২) ইমাম রবী' বলছেন, আমরা সব ছাত্ররা ইমামকে দাফন করে এসে দরসগাহে একত্রিত হয়েছি। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে হাজির। বড় করে সালাম দিয়ে বললো, এই মজলিসের আসল ব্যক্তি কোথায় ? আমরা বললাম, তিনি তো ইন্তেকাল করেছেন। শোনার সাথে সাথে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। কাঁদছিল আর বলছিল, আল্লাহ্ তাঁর ওপর রহম করুন, আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। আহ্ হা, কথা যখন বলতো মনে হতো যেন মতি ঝরে পড়ছে, যুক্তি-প্রমাণ এমনভাবে দিতো যে, তাতে মাথা তুলে দ্বিতীয় কথা বলার কোন উপায় থাকতো না। লজ্জিত চেহারার লজ্জাকে সে দূর করে দিতো, অন্ধকারভরা অন্তরগুলোকে সে আলোকিত করে দিতো। হায়রে আজ সেই জ্ঞানের সূর্য কোথায় গিয়ে লুকালো ?

ইমাম শাফেয়ী (রহ) কে রাসূল (স) সুপারিশ করেছেন

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ) আবি বায়ান আল ইসফাহানীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করছেন যে, আমি রাসূলে কারীম (স) কে স্বপ্নে দেখেছি, আমি তাঁকে বলছি, হে রাসূলুল্লাহ্ (স) আপনার চাচার বংশধর মুহাম্মদ বিন ইদরিস শাফেয়ীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আপনি কি তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে কোনো সুপারিশ করেছেন ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ আমি করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করেছি হে আল্লাহ্ ! আলেম মুহাম্মদ বিন ইদরিসকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)! কি কাজ করলে আপনার এই রকম সুপারিশ পাওয়া যাবে ? বললেন, শাফেয়ী আমার ওপর এতো দরূদ পড়তো যা আজ পর্যন্ত কেউ পড়েনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) সে দরূদ কি রকম ? বললেন ঃ

اللّٰهُمَّ صَلّ على محمدٍ كل ماذكره الذّكرون وصل على محمد كل ما غفل عنه الغافلون –

হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (স)-এর ওপর রহম কর। স্মরণকারীরা তাকে যা স্মরণ করে এবং তার ওপর রহম করুন অবহেলাকারীরা যা অবহেলা করে তার থেকে।

এই ঘটনার পরে আমরা যদি সেই হাদীসটির দিকে লক্ষ্য করি যেটা হযরত আবু ইমামাহ্ রাহ্লী (রা) থেকে বর্ণিত এবং যা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রহ), ইমাম তিরমিযী এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু ইমামাহ্ (রা) বলছেন, আমি রাসূলে করীম (স) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমার উম্মত থেকে সত্তুর হাজার এবং প্রতি হাজারের সাথে সত্তুর হাজর এবং তিনজন আলেম (সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের আলেমদের মধ্যে) কোনো হিসাব-কিতাব ছাড়াই জান্নাতে যাবে। এই হিসাবে এই সুসংবাদ মহান ইমামের উচ্চমর্যাদা প্রাপ্তির দলিল।[১]

১. সিকাতুস্ সুফুহ্

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর রচনাবলী

ইমাম রবী বিন সুলাইমান বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ) যে ভাষা এবং বাগ্মীতার সাথে বক্তৃতা করতেন এবং তাঁর কথার মধ্যে যেসব আরবী পরিভাষা ব্যবহার করতেন, তা বোঝার জন্যও যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। আরবী ভাষায় পণ্ডিত বিশেষজ্ঞদেরও সে বক্তৃতা শুনে মাথা ঘুরে যেতো। লেখা বা রচনার মধ্যেও যদি তিনি সেই পারিভাষিক অলঙ্কারপূর্ণ উচ্চাঙ্গের বাগ্মীতা প্রয়োগ করতেন, তাহলে তা সাধারণ পাঠকদের পড়ে কিছু বোঝার উপায় থাকতো না। কিন্তু তিনি তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এতো সহজ-সরল এবং সুন্দর বর্ণনা রীতি ব্যবহার করেছেন যা সাহিত্য মানে অতি উন্নত অথচ সহজে বোধগম্য, প্রাণবন্ত। এটাও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য এবং আর একটি কারিশমা। "ইত্তেহাফুন নুবলা"তে নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব মোল্লা আলী কারীর (রহ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর রচনার সংখ্যা একশ' তের। 'তাওয়ালা আত্তাসীস'-এ ইমাম বায়হাকী ও হাফেয বিন হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, মিশরে চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বইগুলো প্রকাশ পেয়েছিল।

রেসালায়ে কাদীম, রেসালায়ে জাদীদ, ইখতিলাফুল হাদীস, জামেউল ইল্ম, ইবতাল আল ইস্তিহ্সান, আহকামুল কুরআন, বায়ানুল ফরয সীফাতুল আমর ওয়ান নাহী, ইখতিলাফে মালিক ওয়া শাফেয়ী, ইখতিলাফে ইরাকীন, ইখতিলাফে মুহাম্মদ বিন আল হাসান। কিতাবে আলী ওয়া আবদুল্লাহ্, ফাযায়েলে কোরায়েশ এবং কিতাবুল উম্। যার মধ্যে তাহারাত, আস্সলাত বেশুমুল সালাতে জুম'আ, সালাতে খাওফ, সালাতে ঈদ, সালাতে কাসওফ, সালাতে ইসতেস্কা, নাওয়াফেল, নামায বর্জনকারীর প্রতি আদেশ, নামাযে জানাযা, যাকাত এবং দানসমূহের প্রকারভেদ, রোযা, এ'তেকাফ, হজ্জ্ব, কিতাবুল বুয়ূ, বাই সাল্ম, রহ্নে কবীর রহ্নে সাগীর, হাজার ও তাফলীস, সামগ্রীক লেন-দেন, পরামর্শ, ফারায়েয, জীবন-মৃত্যু, আমানত, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস, কিতাবুস নিকাহ্ এবং তার আনুসঙ্গিক বিষয়াদি, অপরাধ, কিতাব কিতাল আহলল বাগা, কিতাব আল জিহাদ, ছীরুল আওযায়ী, সীরুল ওয়াকেদী, কিতাবুল আত্আমা, কিতাবুল আশ্রাবাহ, কিতাবুল দিহায়া, কিতাবুছ ছইদ ওয়া আজ যবায়েহ, কাদা বিল ইয়ামীন ওয়া আশ শাহেদ, কিতাবুদ দো'আ ওয়ান্নুয়াত, কিতাবুল আকদিয়া, কিতাবুল ইমাম ওয়া আন্নুযুর, কিতাবুল আত্ক, কিতাবুশ শুরুত, কিতাবুল উম্ এই ধরনের প্রায় একশ' চল্লিশটি শিরোনাম রয়েছে। ইমাম হরমলাহ্ তাঁর একটি রচনাকে পুনর্বিন্যাস করেছেন। যার নাম কিতাবুস সুনান— অত্যন্ত বিস্তৃত। ইমাম বায়হাকী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ) হাদীস এবং সাহাবগণের ঐতিহ্য সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানার্জনের পরে নিজের পুরানো বক্তব্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে নতুন ফিকাহ্ রচনা করেছেন। ইমাম মুযনী তার একখানি কিতাব পুনর্বিন্যাস করেছেন যার নাম 'কিতাবে মবসুত'। মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞানে তাঁর সমসাময়িক ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম হামিদী, রবী বিন সুলাইমান, ইমাম বুউতী, ইমাম মুয্নী, ইমাম হরমলাহ্ প্রমুখের ছিল এবং এই মহাত্মনগণ তাঁদের সকল ছাত্রদের কাছে ইমাম শাফেয়ীর এই অসিয়ত পৌছে দিচ্ছিলেন যে, যদি কখনো তাঁর মতের বিপরীতে কোন শুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে তা-ই তার মতামত বলে ধরে নিতে হবে।

www.pathagar.com

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ) আল্লামা আবু তাহের মাদানীর (রহ) কাছে ইমাম শাফেয়ীর বিন্যাসকৃত হাদীস, ফিকাহ্ এবং কিতাবুল উম্ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছেন এবং মাসায়েল উদ্ভাবনে শাহ সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী সবসময় ইমাম শাফেয়ীকে অনুসরণ করেছে। শাহ সাহেব আনছাফ, আক্দুল জাইদ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা এবং মুছফী ও মুছাউয়াতে প্রেক্ষিত অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা করেছেন। কিতাবুল ইমামের পরিধি প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠা এবং রেসালায়ে ইমামের ৮৬ পৃষ্ঠা। এই পুস্তিকা আরবী ভাষা, অলঙ্কার শাস্ত্র এবং ভাষা তত্ত্বের এক দুরূহ সংকলন।

মিশরে কিতাবুল উম্ সাত খণ্ডে ১৩২১ হিজরীতে দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার (রহ) অধ্যায়গুলোর উন্নত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া মিশরের প্রকাশক ঐ কিতাবের ফুট নোটে এইসব কিতাবের কিছু কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছেন এবং আরও কিছু কিতাব— কিতাব ইখ্তেলাফুল ইয়াকীন, কিতাব ইখতেলাফ মা'আ মুহাম্মদ বিন আল হাসান, কিতাব মা আখতালাফা ফীহ্ আবু হানিফা ওয়া ইবনে আবী লায়লা, কিতাব ইখতেলাফে আলী ওয়া আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ, কিতাব ইখতেলাফে মালিক ওয়া আশ-শাফেয়ী, কিতাব ইব্তাল আল ইসতেহ্সান, সীরুল আওযায়ী, সীরুল ওয়াকেদী, মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী, কিতাব ইখতেলাফিল হাদীস এবং ইমাম মুয্নী (রহ)-এর কিতাবুল মুখতাসার।

ইমাম সাহেবের যাবতীয় রচনাবলী সবচাইতে প্রিয় পাঠ্য হবার মতো কিন্তু তার মধ্যে নীতি শাস্ত্রীয় তত্ত্বের এবং তথ্যের জন্য রেছালাহ্ আহ্কামুল কুরআন এবং ইখতেলাফুল হাদীস গ্রন্থদ্বয় গভীর গবেষণার উপাদানে ভরপুর।

'রেসালায়ে উসূলে' তিনি উসুলে ফিকাহ্ ও হাদীসকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং যুগের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে ফিকাহ্র মধ্যে যে অস্পষ্টতা এবং হাদীসসমূহের বর্ণনা রীতিতে যেসব ভ্রান্তি জমে গিয়েছিল সেসবকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে তিনি সফর করেছেন। স্থানীয় চর্চাকারীদের সাথে আলাপ করেছেন, মত বিনিময় করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন প্রচুর। তারপরে এমন এক নীতিমালা তৈরী করলেন যা আজ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত বুনিয়াদী রচনা হিসেবে গণ্য হয়। যেমন কিয়াসের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এরকম— তিনি বলেন, কিয়াস কুরআনের ওপরে ভিত্তি করে হোক কি শুদ্ধ সুন্নতের ওপরে হোক, তার বাস্তবতা হলো এই যে, কুরআন ও শুদ্ধ সুন্নতের মধ্যে যেসব বিধি-বিধান রয়েছে তা নির্দিষ্ট। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেসব অভিনব প্রেক্ষিত সামনে এসে দাঁড়ায় বা দাঁড়াবে তা নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত নয়। এজন্য যখন কোনো অভিনব অবস্থা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন কুরআন ও হাদীসের মধ্যে গভীর অনুসন্ধান চালাতে হবে। তারপরে সাহাবায়ে কিরামের কর্ম-ঐতিহ্য খুঁজে দেখতে হবে। এই তিন উৎসের মধ্যে এমন কোনো ঘটনা বা ইশারা-ইঙ্গিত যদি পাওয়া যায়, যা উপস্থিত ঘটনার সাথে কিছুটা হলেও সদৃশ্যপূর্ণ, তখন কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধান এবং উপস্থিত সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরী করার জন্য আমাদের এটা অধিকার রয়েছে যে, আমরা বিষয়টির ওপর গভীর গবেষণা চালাই এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করি যে, কুরআন বা হাদীসে ঐ বিধানটি নির্ধারণ করার কার্যকারণ কি ছিল ? তার ফলাফল যখন বেরিয়ে আসবে তখন আমরাও সেই কারণের ওপর ভিত্তি করে বিবেচনা করার অধিকারী হবো! কিয়াসের ওপরে এই সূক্ষ্ম নীতি নির্ধারণী বড় বড় মুহাদ্দিসীনগণ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এতো গেল রেসালাহ্র একটা ছোট্ট নমুনা। এভাবেই আহকামুল কুরআন ও কিতাবুল আমালে তাঁর তুলনাহীন সব সূক্ষ্ম অথচ অকাট্য যুক্তি রয়েছে।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের শায়খ ও উস্তাদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) 'তাওয়ালা আত্তাসী'সে লিখেছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর শায়খ এবং যাঁদের কাছ থেকে তিনি কিছু হলেও জ্ঞান পেয়েছেন তাঁদের মোট সংখ্যা ৮০। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজনের নাম উদ্ধৃত করা হলো ঃ মুসলিম বিন খালেদ যান্জী, হযরত ফজিল বিন আয়াজ যাহেদ, ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্, ইমাম মালিক বিন আনাস, ওয়াকী বিন জেরাহ, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ কাত্তান, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন আবী ফাদীক, ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান, আবদুল্লাহ বিন মুবারক মারুজী, ইব্রাহীম বিন সো'ওদ আনসারী (রহ) প্রমুখ।

মুসলিম বিন খালেদ যান্জী ফকীহ্ মক্কা ঃ তাহযীব আত্তাহযীব ও তায্কেরাতুল হুফ্ফাযে তাঁর সম্পর্কে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাতে তিনি তাঁর সময়ে 'শায়খুল হারাম' ছিলেন। মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরী, আমরুদ বিন দীনার, যায়দ বিন আসলাম এবং হিশাম বিন উরওয়াহ্র কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয বিন জারীহ্ ফকীহ্ হারাম-এর কাছে ফিকাহ্র তালিম নিয়েছেন। যাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৫০ হিজরীতে। তাঁর ইন্তেকালের পরে ৩০ বছর পর্যন্ত মুসলিম বিন খালেদ যান্জী শায়খুল হারাম ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) প্রথম জীবনে তাঁর কাছেই ফিকাহ্র তালিম পেয়েছেন। সকল মুহাদ্দিসীনগণ তাঁর ফিক্হী পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দেন, কিন্তু হাদীস বিষয়ের ওপরে তাদের পর্যবেক্ষণে একটা জিনিস ধরা পড়েছে যে, শেষ বয়সে তিনি বর্ণনাসমূহকে সঠিকভাবে সংরক্ষণে রাখতে পারেননি।

হযরত ফজিল বিন আইয়াজ বিন মাস্উদ (রহ) ঃ আউলিয়ায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে তিনি গণ্যমান্য ছিলেন। তিনি খোরাসানের অধিবাসী, কিন্তু মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাহযীব আত্তাহযীব ও সেফাতুস সুফুহ্তে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি আ'মাশ ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আনসারী, ইমাম জাফর সাদেক (রহ) ও হামীদ আল তাউয়ীল থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক, কুতাইবাহ্ বিন সাঈদ আসমায়ী এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ) প্রমুখ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। মক্কা মুকাররমায় ১৮৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসীনগণ নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তাঁর সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনগণ যেসব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তা হলো, তিনি আস্থাভাজন, মহৎ, জ্ঞানী, খোদাভীরু, একনিষ্ঠ আবেদ, অনেক হাদীসের হাফেয ইত্যাদি। তিনি পৃথিবী এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের ছেড়ে নির্জনে থাকতে পছন্দ করতেন। শাফেয়ী (রহ)-কে খুব ভালবাসতেন। তাঁর কাছ থেকেই ইমাম শাফেয়ী (র) তপশ্চর্যা এবং খোদাভীরুতার প্রকৃত রূপ শিখে নিয়েছিলেন। একটি ব্যাপার অত্যন্ত স্পষ্ট যে, হযরত ফজিলের শিক্ষার প্রভাব ইমাম শাফেয়ীর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নানানভাবে প্রকাশিত ছিল। আল্লামা ইবনে জাওযী তাঁর সম্পর্কে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

ফজল বিন রবী বর্ণনা করছেন যে, খলিফা হারুন আর-রশীদ যখন হজ্বে এসেছিলেন তখন আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আমি বললাম, আপনি এতো কষ্ট করে কেন আসতে গেলেন, আমাকে খবর দিলে আমিই চলে যেতাম। খলিফা বললেন, রাখুন এসব কথা, চলুন মক্কার জ্ঞানীদের সাথে একটু দেখা করে আসি। আমি বললাম, এখানে খুব কাছেই সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ থাকেন। বললেন, চলুন সেখানেই যাওয়া যাক। তার বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে সুফিয়ান বলে উঠলেন, কে ? আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন এসেছেন। তিনি হন্তদন্ত হয়ে বাইরে এসে খলিফাকে বললেন, আহ্হা! আপনি কেন কষ্ট করে এলেন! খলীফা বললেন ঃ আমাকেই ডেকে পাঠাতেন! আমি তো আসলে আপনাকে কিছু উপহার দেবো বলে এসেছি, বলেই নজরানা পেশ করা হলো। খলিফা প্রশ্ন করলেন, আপনার কোন ঋণ নেই তো ? সুফিয়ান বললেন, জ্বী হ্যাঁ আছে। খলিফা আদেশ করলেন— আবু আব্বাস, ওনার ঋণ পরিশোধ করে দাও।

খলিফা এবার বললেন, চলুন অন্য কোথাও যাওয়া যাক! আমি বললাম, এই কাছেই ইমাম আবদুর রাজ্জাক বিন হিতাম থাকেন। আমরা সেখানে পৌঁছে যথারীতি দরজায় করাঘাত করলাম। ভেতর থেকে প্রশ্ন এলো— কে ? বললাম, আমীরুল মুমিনীন। তিনিও প্রায় ছুটে বেরিয়ে এসে বিনীতভাবে খলিফাকে বললেন, আপনি কেন, খবর দিলে আমিই যেতাম। খলিফা তাকে কিছু নজরানা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, তিনি ঋণগ্রস্ত কি না ? বললেন, হ্যাঁ। খলিফা আবু আব্বাসকে আদেশ করলেন, তাঁর ঋণও যেন পরিশাধ করে দেয়া হয়।

সেখান থেকে ফিরে খলিফা আমাকে বললেন, এখানেও আমার আশা পূরণ হলো না। অন্য কারো কথা বলুন। বললাম, কাছেই ফজিল বিন আইয়াজ থাকেন, বললেন চলুন। সেখানে যখন পৌঁছালাম, শুনি ভেতর থেকে কুরআন পড়ার আওয়াজ আসছে। মনে হলো নামাযে দাঁড়িয়ে একখানি আয়াত বার বার তেলাওয়াত করছেন। একসময় নীবরতা দেখে খলিফা বললেন, এবার কড়া নাড়ুন, ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, কে ? আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন এসেছেন, ভেতর থেকে কঠিনকণ্ঠে জবাব এলো— আমীরুল মুমিনীনের সাথে আমার কোন কাজ নেই। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (স) সেই বাণী কি আপনার মনে নেই যে, “মুসলমানরা যেন তাদের নিজেদেরকে অপমানিত না করে”। এটা শুনে দরজা খুলে দিলেন এবং উপরে রাখা প্রদীপটি নিভিয়ে দিয়ে ঘরের কোণায় গিয়ে বসলেন বলে মনে হলো। আমরা দু'জনেই অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম। খলিফা অনুমান করেই তাকে খুঁজে বের করলেন এবং সেই অন্ধকারের মধ্যেই তার হাত ধরে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, আমি আপনার জন্য সামান্য কিছু নজরানা এনেছি, দয়া করে গ্রহণ করুন! তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন শুনুন! হযরত উমর বিন আবদুল আজীজ যখন খলিফা হয়েছিলেন তখন তিনি হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন উমর ও মুহাম্মদ বিন কা'আব আল কারযী এবং রেজা বিন হায়াত কুন্দীকে ডেকে বলেছিলেন হে রাসূল (স)-এর সঙ্গীরা! আমি এই মহাবিপদের (খেলাফত) মধ্যে পড়ে গিয়েছি, এখন আপনাদের পরামর্শ কি তাই বলুন! কারণ আমি আপনাদের মতো পুণ্যাত্মা মহাত্মনদের অবস্থিতিকে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ মনে করি। তখন হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) বলে উঠলেন, হে উমর! তোমার জীবন এই পৃথিবীতে যেন রোযাদারের মতো হয় এবং তোমার মৃত্যুই যেন হয় তোমার ইফতার। এবার মুহাম্মদ বিন কা'আব আল কারযী বললেন, হে উমর! যদি আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পেতে চাও তাহলে দ্বীনদার পূণ্যবানদের

www.pathagar.com

নিজের পিতা মনে করো এবং মধ্য স্তরের লোকদেরকে নিজের ভাই আর ছোটদেরকে নিজের সন্তান। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চললে বড়দের প্রতি যথাযথ সম্মান, ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল, সহমর্মিতা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা ধরে রাখতে পারবে। এরপরে হযরত রেজা বিন হায়াত কুন্দী বললেন, হে উমর! যদি কাল হাশরের দিনে আল্লাহ্র আযাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাও তাহলে তোমার নিজের জন্য যা কিছু পছন্দ হয় তা সাধারণ মুসলমানদের জন্য পছন্দ করো এবং নিজের জন্য যেটা অপছন্দ করো সাধারণ মুসলমানদের জন্যও তাকে অপছন্দ করো। এভাবে যদি চলতে পারো তাহলে, তারপর যখন খুশী মরে যেও।

এ কারণে আমি এখন আপনাকে বলছি, যেদিন বড় বড় পূণ্যবানদের পা কাঁপতে থাকবে সেদিনের কল্পনায় আমি অস্থির হয়ে যাচ্ছি যে, সেখানে সেদিন আপনার অবস্থা কি হবে? উমর বিন আবদুল আজীজের তো এই রকম মহান পরামর্শদাতা ছিল! আপনার আশপাশে সে রকম কে আছে? হারুন আর-রশীদ এসব শুনে কাঁদতে কাঁদতে চেতনা হারিয়ে ফেললেন। অনেকক্ষণ পরে তার চেতনা ফিরে এলে উঠে বসলেন। আমি তখন হযরত ফজিলকে বললাম, আপনি খলিফার সাথে একটু শান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলুন। তিনি বললেন, হে আমার মায়ের ছেলে রবী— তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা তো আমীরুল মুমিনীনকে জবাই করছো। আর আমাকে বলছো নরম কথা বলতে? ইতিমধ্যে হারুন আর-রশীদ অনেকটা সামলে উঠেছেন, বললেন, না না আপনি ওর কথা শুনবেন না। আপনি আমাকে আরও কঠিন কিছু বলুন। তখন তিনি হযরত উমর বিন আবদুল আজীজের সময়ের আর একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যাতে হারুন আর-রশীদ আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং মাথা নাড়িয়ে পাগলের মতো বলতে লাগলেন, আরো বলুন, আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন শোনো, রাসূলের চাচা হযরত আব্বাস রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে কোথাও কোনো আমীরের পদে নিয়োগ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমীরত্ব কেয়ামতের দিন অনুশোচনা এবং আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এবারে হারুন আর-রশীদ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ওপর অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আপনি আমাকে আরো কিছু বলুন! বললেন, হে সুন্দর সুপুরুষ কেয়ামতের দিন তোমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকুলের হাজারো প্রশ্ন দাঁড়াবে, এজন্য হুঁশিয়ার হয়ে যাও! তুমি যদি তোমার এই সুন্দর চেহারাটা আগুনের থাবা থেকে বাঁচাতে পারো তাহলে এখানেই তাকে রক্ষা করো এবং সাবধান! একটা কথা মনে রাখবে, সকাল হোক বা সন্ধ্যা, তোমার প্রতি তোমার প্রজা সাধারণের তরফ থেকে কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ যেন না থাকে। কেননা রাসূল (স) বলেছেন, যার প্রতি প্রজা সাধারণের দুঃখ-কষ্টের ক্ষোভ থাকবে, জান্নাতের হাওয়াও তাকে স্পর্শ করবে না।

হারুন আর-রশীদের কান্না আর থামেনি। কাঁদতে কাঁদতেই সে প্রশ্ন করলো, আপনার কোনো ঋণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমার অনেক ঋণ! কিন্তু তিনি তার হিসেব পরকালে নেবেন। তিনি আমাকে এই আদেশ করেছিলেন যে, আমি তোমাকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমিই তোমার রিযিক পৌছাবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমি জানি না আমি তার কি জবাব দেবো! হারুন আর-রশীদ বললেন, এই এক হাজার দীনার আমি আপনাকে নজরানা দিচ্ছি বাচ্চাদের জন্য খরচ করবেন। বললেন, সুবহানাল্লাহ্ আমি তোমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, আর তুমি আমাকে জাহান্নামের গর্তে ফেলার জন্য ধাক্কা দিচ্ছ? বলেই তিনি চুপ হয়ে গেলেন, আর একটি কথাও বললেন না।

www.pathagar.com

হারুন আর-রশীদ রবী'কে বললেন, শোনো, আমাকে তুমি এই ধরণের মানুষের কাছে নিয়ে যাবে। এই ব্যক্তি সাইয়েদুল মুসলিমীন। আল্লামা ইবনে জাওযী বলেন, তাঁর গুণাবলী অসংখ্য। আমি তাঁর গুণাবলী নিয়ে আলাদা একটি বই লিখেছি। বড় বড় তাবেয়ীনগণ তাঁর উস্তাদ, কিন্তু তবু তাঁরা তাদের এই ছাত্রকে সমীহ্ করতেন। ইমাম শাফেয়ীর সাথে তাঁর একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

হযরত সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ (রহ) ঃ তাজকেরাতুল হুফ্ফায, সিফাতুস সুফুহ, তাহ্যীব আত্তাহ্যীব ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে। তিনি হিজরী ১০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আমরুদ বিন দীনার, ইমাম যুহরী বিন আসলাম, আবদুল্লাহ্ বিন দীনার, মনসুর বিন মো'তামার (রহ) এবং অন্যান্য হাদীসের ইমামগণের কাছে হাদীস বিষয়ের ওপর শিক্ষা লাভ করেন এবং তার থেকে আ'মাশ, আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক, আবদুর রহমান বিন মাহ্দী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন, ইমাম ইসহাক বিন রাহোইয়া এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ) বর্ণনা করেছেন।

মুহাদ্দিসীনগণের সর্বসম্মত রায়, তিনি ইমাম, তিনি হুজ্জাতুল ইসলাম, হাফেযে হাদীস, যাহেদ, আবেদ এবং মক্কা মোকাররমায় তাঁর সময়ের অন্যতম ইমাম ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, যদি ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ না হতেন তাহলে হিজাজে ইল্মে হাদীসের অস্তিত্ব থাকতো না। তিনি বলেন, বিধান সম্পর্কিত হাদীসের সংগ্রহ ইমাম মালিকের কাছে মোটামুটি ৪৬৫ থেকে ৫০০ ছিল এবং ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্র কাছে ছিল ৪৯৫। আবদুর রহমান বিন মাহ্দী বলেন যে, ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ হিজাজী আলেমদের মধ্যে সবচাইতে বেশি হাদীস জানতেন। ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ হামাদ বিন যায়দের চাইতেও বেশি হাদীসের হাফেয ছিলেন। তিনি ১৯৭ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। সত্তুরবার হজ্ব করেন। তিনি নিজে বলছেন, আরাফাতের ময়দানে আমি যখন তওবা করতাম, তখন বিশেষভাবে এই প্রার্থনা করতাম, প্রভু! এই পবিত্রতম সম্মানিত স্থানে এটাই যেন আমার শেষ অবস্থান না হয়। এভাবে যখন সত্তুরবার হয়ে গেলো তখন এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবার চাইতে খুব লজ্জাবোধ করলাম। সে বছরই তিনি মারা গেলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) তাঁর সঙ্গ-সান্নিধ্যে থেকে অনেক কিছুই শিখেছেন।

ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্র (রহ) কাছে যদি কেউ কুরআনের তাফসীর, ফতোয়া, ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অথবা হাদীসের বৈপরীত্য নিয়ে প্রশ্ন করতো, তখন তিনি বলে দিতেন, আমাদের মজলিসে এই কোরায়েশী নওজোয়ান মুহাম্মদ বিন ইদরিস শাফেয়ী তো রয়েছে, তার কাছে জিজ্ঞেস করো। সে-ই সব কথার জবাব দেবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ) হাদীসের পারস্পরিক বৈষম্যগুলোকে কুরআনের তাফসীর এবং ভাষাগত ব্যাখ্যাগুলো এতো সুন্দরভাবে বলতেন, যা শুনে ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বললেন, এখন তুমি স্বাধীনভাবে নিজে ফতোয়া এবং শিক্ষা দেবার জন্য দরসগাহ্ খুলে বসো। তোমার প্রতিভা, তোমার জ্ঞান, তোমার যোগ্যতা এবং স্মরণশক্তির ওপরে আমার আর কোন সন্দেহ নেই, তুমি এখন তোমার নিজের ওপর ভরসা করতে পারো।

একবার এক লোক ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহর কাছে অনুযোগ করলো, কুফার আলেমদের মতামত হলো, তায়াম্মুমের জন্য মাটি শর্ত নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এবং

www.pathagar.com

তাঁর ছাত্রগণ ভূ-পৃষ্ঠে যে কোন পরিচ্ছন্ন স্থান এমনকি পরিষ্কার পাথরও যদি হয় বলে মতামত দিয়েছেন! এ ব্যাপারে আপনার কি মতামত ? তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর দিকে ইশারা করে বললেন, এ জবাব দেবে। শাফেয়ী (রহ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে দুই জায়গায় তায়াম্মুমের আদেশ দিয়েছেন। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ فتيمموا صعيدا طيبا তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো। অন্য জায়গায় ঃ فامسحوا ب جو هكم وايديكم অর্থাৎ কিছু মাটি হাতে নিয়ে তা দিয়ে হাত এবং মুখে ডলে দাও। একারণে ইরাকীদের জবাব এটাই যে, 'ছঈদ' শব্দটির সম্পর্ক ধুলোবালিওয়ালা মাটির সাথে। পাথরের ওপরে যদি ধুলো-বালি না থাকে তাহলে তায়াম্মুম অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দ্বিতীয় আয়াতে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, হাত এবং মুখে মাটি না লাগালে তায়াম্মুম সম্পূর্ণ হতে পারে না। ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ এই জবাব শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ) ঃ মালিক বিন আবী আমের এর তিন ছেলে ছিল। আনাস, রবী এবং আবু সোহেল নাফে'। ইমাম মালিকের চাচা আবু সোহেল নাফে' নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম মালিকও তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা নিয়েছেন।

তাহ্যীব আত্তাহ্যীব, তায্কেরাতুল হুফ্ফায এবং সেফাতুস্ সুফুহ ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে যে, তিনি জায়দ বিন আসলাম, নাফে মাওলা, আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রা) হামীদ আল তাওয়ীল, সাঈদ আল মাক্ববারী, আবু হাযেম, সালমা বিন দীনার, ইমাম যুহরী, হিশাম বিন উরওয়াহ্ ও ইমাম জাফর সাদেক (রহ) প্রমূখ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসীন ও তাবেয়ীনগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বর্ণনা নিয়েছেন হাজারো মুহাদ্দিসীন। ইসলামী পণ্ডিত এবং মুহাদ্দিসীনগণের সম্মিলিত রায় হলো, ইল্ম ও আমল, তাক্ওয়া ও যুহুদ ইত্যাদি শব্দগুলো যে অর্থ প্রকাশ করে ইমাম মালিকের বেলায় তা প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণতা পায়।

তিনি নিজে বলেন, 'আমি ফতোয়া দেবার যোগ্য' বিশেষজ্ঞগণের এই রায় যতোদিন পর্যন্ত সত্তুরের কোটায় গিয়ে পৌছায়নি, ততোদিন আমি 'ফতোয়া' দেইনি। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কিছু উক্তি ঃ

(১) ইল্মে হাদীস দ্বীনের উৎস। একটু দেখে নাও, কার কাছ থেকে তা অর্জন করছো! মাসজিদে নববীর এই স্তম্ভগুলোর কাছে বসে ক্বালা রাসূলুল্লাহ্ (স) ক্বালা রাসূলুল্লাহ্ (স) বলছেন এমন সত্তুরজনকে আমি দেখেছি, কিন্তু তাদের কারো কাছ থেকে আমি কোনো বর্ণনা নেইনি। অথচ তাঁরা সবাই অত্যন্ত উন্নত ঈমানের ধারক ছিলেন। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে বললেন, তারা যা বলতেন, তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন, একথা আমার মনে হতো না।

(২) জ্ঞানের মানদণ্ড কে কতোটা জানে তার ওপরে নয়। জ্ঞান একটি 'নূর' যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসে হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়।

(৩) তাঁর শায়খগণের একজনও ইরাকী নয়। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জবাব দিতেন— আমি তাদের কাছ থেকে কি বর্ণনা নেবো ? তারা এখানে এসে এমন সব লোকদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন এবং শেখেন, যাদের একজনও নির্ভরশীল নয়।

(৪) আল্লামা যুহ্রী ইসমাঈল বিন দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম মালিকের কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি ইমাম রবী'র কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, এই পবিত্র স্থানের প্রতিপালকের কসম পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী একজন ইরাকীকেও আমি পাইনি।

www.pathagar.com

(৫) মো'ওন বিন ঈসার বরাত দিয়ে ইমাম যুহরী বলেন, কাযী আবু ইউসুফকে নিয়ে হারুন আর-রশীদ হজ্বে যাচ্ছিলেন। মদীনায় পৌঁছে ইমাম মালিকের সাথে দেখা করে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কাযী আবু ইউসুফ ইমাম মালিকের কাছে একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। মালিক নিরুত্তর। আবার জিজ্ঞেস করলেন। এবারেও তিনি নিরুত্তর। এবার হারুন আর-রশীদ বললেন, হে, আবু উবায়দুল্লাহ্! ইনি আমাদের কাযী ইয়াকুব, যে আপনার কাছে একটা মাসআলা জানতে চায়। মালিক জবাব দিলেন, আপনি যদি আমাকে ফালতু লোকদের আসরে বসে থাকতে দেখতেন, তাহলে সেই মাজলিসে আমি এই মাসআলার জবাব দিতাম।

ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, হাদীস শাস্ত্রে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সনদ مـالك عن نافع عن ابن عمر رضى اللّٰهُ عنهما অর্থাৎ ইবনে উমর (রা) থেকে নাফে' এবং নাফে থেকে মালিক (রহ)।

ইমাম মালিক যতোটা উচ্চমানের মুহাদ্দিস ছিলেন! ফিকাহ্‌র ওপরেও তাঁর অধিকার ছিল একই মানের। হিজাযের জ্ঞান-সাধকদের কাছে তিনি এবং ইমাম সুফিয়ান আইনিয়াহ্ ছিলেন নির্ভরযোগ্যতার শ্রেষ্ঠ দুই প্রতীক। ৮৬ বছরের আয়ুস্কালে ৬২ বছর দরসে হাদীসে মশগুল ছিলেন।

হযরত সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ মক্কায় বসে মালিকের মৃত্যু সংবাদ শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। জ্ঞান ফেরার পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, পৃথিবীর বুকে তাঁর সমকক্ষ কাউকে রেখে যাননি।

মসজিদে নববীতে শোরগোল বা উচ্চকণ্ঠে কথা বলাকে ঘৃণা করতেন। বলতেন, এটা নবুয়তের আসনের সাথে বেআদবী। অনেকগুলো ঘোড়া পালতেন, কিন্তু তাতে চড়ে কখনো মদীনার পথে বের হননি। এমন ভাব-গম্ভীর পরিবেশে হাদীস পড়াতেন যেখানে জোরে কথা বলারও দুঃসাহস কেউ করতো না। রাসূল (স)-এর নাম প্রসঙ্গক্রমে মুখে আসলেই শরীর কেঁপে উঠতো এবং মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেতো।

ইমাম মালিকের ব্যাপারে শাফেয়ী (রহ)-এর রায় ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কাছে ইমাম মালিক সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ইমাম মালিক এবং সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ না হলে ইল্‌মে হাদীসের শুদ্ধ চর্চা বিলুপ্ত হয়ে যেতো। শাফেয়ী (রহ)-কে তিনি সন্তানের মতো ভালবাসতেন। একবার শাফেয়ী (রহ) ইমাম মালিকের আস্তাবলে রাখা খোরাসানী ঘোড়া এবং মিশরী খচ্চরের খুব তারিফ করছিলেন। ইমাম মালিক শুনে বললেন, তোমার পছন্দ হলে এগুলো সব নিয়ে যাও। শাফেয়ী (রহ) হতভম্ব হয়ে পড়লেন। মালিক (রহ) হেসে বললেন, অবাক হয়ে গেছো ? আমি তোমাকে ভালবাসি তাই উপহার হিসেবে দিলাম। এখন নেবার ব্যবস্থা করো, যাও। শাফেয়ী (রহ) বললেন, একটা অন্ততঃ আপনার জন্য থাক! বললেন, দেখো, যে শহরের মাটিতে রাসূল (স) শুয়ে আছেন, সেই মাটিতে কোনো পশুর পিঠে সওয়ার হতে আমার খুব লজ্জাবোধ হয়। আমার একটারও প্রয়োজন নেই, তুমি নিয়ে যাও।

ইমামের অন্যান্য শায়খগণের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলেও বইয়ের কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে, তাই তাঁদের শুধু নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে চাই। মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, ইরাক ও মিশরের এই শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের নাম যথাক্রমে ইবরাহীম বিন সো'ওদ বিন ইবরাহীম আয্ যুহ্‌রী, ইবরাহীম বিন আবদুল আজীজ বিন আবী মাহযুরাহ্, ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন

আবী ইয়াহ্ইয়া, ইবরহীম বিন হারম, উসামা বিন যায়দ বিন আসলাম, ইসহাক বিন ইউসুফ আল আযরাক, ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মাক্সাম, ইসমাঈল বিন জাফর বিন আবী কাসীর, ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ্ বিন কিস্তান্তাইন, আনাস বিন আইয়াজ, আবু যুমরাহ্ আল লাইছী, আইয়ুব বিন সাউইদ আর রমলী, জাফর বিন ইবরাহীম আততায়ী, হাতেম বিন ইসমাইল আল মাদানী; আল হারেস বিন আমীর আল বাছরী, আলহুর বিন ইবরাহীম, হুসাইন আল আলছা'আ, হাম্মাদ বিন আছছামাহ্, হাম্মাদ বিন জায়দ বছরী, হামাদ বিন জরীক, দাঊদ বিন আবদুর রহমান, আতা'আ সাঈদ বিন সালেম আল ক্বাদাহ্, সাঈদ বিন সালমা, সাঈদ বিন মুসলিমাহ্, সুফিয়ান বিন আইনাহ্, সুলাইমান বিন উমর ছামাক বিন ফজল, আল জুন্দী, দহাক বিন ওসমান, ইবাদ বিন আওয়াম, আবদুল্লাহ্ বিন ইদরিস আওদী, আবদুল্লাহ বিন হারেস মক্কী, আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ, আবু সাফ্ওয়ান, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক মারুজী, আব্দুল্লাহ বিন মূসা আবদুল্লাহ্ বিন নওমেল, আবদুল্লাহ্ বিন নাফে' আছে্ ছায়েগ, আবদুল্লাহ্ বিন অলীদ আদানী, আবদুর রহমান বিন আবী বকর আল মালিকী, আবদুর রহমান বিন হাসান, আবদুর রহমান বিন আবী জুনাদ, আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ্ আল আম্রী, আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ্, আবদুল আজীজ বিন মুহাম্মদ দরাদরদী, আবদুল মজীদ বিন আবদুল আজীজ, আবদুল কারীম বিন মুহাম্মদ খুরাসানী, আবদুল মালিক বিন অলীদ, আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আবদুল মজীদ ছাক্বাফী, আতাফ বিন খালেদ, উমর বিন আবদুর রহমান, আমরুদ বিন হাবীব, আমরুদ বিন আলী সালমা, আমরুদ বিন ইয়াহ্ইয়া, ফজিল বিন আইয়াজ, কাশেম বিন আবদুল্লাহ্, মালিক বিন আনাস, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন আবী ফাদিক্ব, মোহাম্মদ বিন হাসান শাব্বাবী, মুহাম্মদ বিন খালেদ জুন্দী, মুহাম্মদ বিন আব্বাস আশ্ শাফেয়ী, মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকেদী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আনছারী, মুহাম্মদ বিন ওসমান, মুহাম্মদ বিন আলী বিন শাফে', মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ওয়াসেতী, মারওয়ান বিন মুয়াইয়া আল ফাযারী, মুসলিম বিন খালেদ যনজী, মুতরাফ বিন মাজেন ছানআনী, মুয়ায বিন মূসা জাফরী, হিশাম বিন ইউসুফ, ওয়াকী বিন জিরাহ্, ইয়াহ্ইয়া বিন হাছান, ইয়াহ্য়িা বিন সাঈদ কেতান, ইয়াহ্ইয়া বিন সালিম মক্কী, ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক, ইয়াকুব বিন ফিসা, ইউসুফ বিন আসওয়াদ, ইউসুফ বিন খালেদ, ইউসুফ বিন আমরুদ, ইউসুফ বিন ইয়াকুব, ইবনে আবী আল কিনাত আল খাযাগী আল মক্কী (রহ) প্রমুখ।[১]

---

১. তাওয়ালা আত্তাসীস

কিছু অনুধাবন উপলব্ধি এবং দিক-দর্শন

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর ইজতিহাদ এবং সংস্কারসমূহের আলোচনায় যাবার আগে ফিকাহ্‌র পরিচয় এবং ইতিহাসের ওপর একটা উড়ন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া প্রয়োজন। মুকাদ্দামাহ্ ইবনে খালদুনের ৮৭ পৃষ্টায় ফিকাহ্‌র সামগ্রিক পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে।

ফিকাহ্‌র পরিচয়

'দায়িত্বপ্রাপ্ত' মানুষের কাজকর্ম এবং চলাফেরা অর্থাৎ সামগ্রিক জীবন যাপন পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিধান কি, তা জেনে নেয়াকে 'ফিকাহ্' বলে। এই জ্ঞান, মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাকে বাস্তবায়ন করতে যেসব রীতি-নীতি প্রকাশ পেয়েছে, সেই মূল উৎস থেকে নেয়া যে বিধানসমূহ কিতাব ও রাসূল (স)-এর কর্মপদ্ধতি থেকে উদ্ভাবন করা হয় তাকে 'ফিক্‌হী' বলা হয়।

বস্তুত ঃ ইল্‌মে ফিকাহ্‌র বিন্যাস ও সংকলনে সাহাবায়ে কিরামের শুভ কর্মপ্রয়াসসমূহের যে অংশ অন্তর্ভূক্ত, তার ইতিহাস এই শিরোনামগুলোর মাধ্যমে বর্ণনা করা যেতে পারে।

(১) সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছ থেকে ফিকাহ্‌র তালিম কিভাবে নিয়েছেন ?

(২) সাহাবাগণের কয়টি স্তর ছিল ?

(৩) সাহাবাগণ তাবেয়ীনদের কিভাবে ফিকাহ্‌র তালিম দিয়েছেন ?

(৪) তাঁরা উসূলে ফিকাহ্‌র কি ধরনের নিয়ম-নীতি জারী করেছিলেন ?

(৫) সাহাবায়ে কিরামের মতপার্থক্যমূলক মাসায়েলের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

নবুয়তকালীন সময়ে ইল্‌মে ফিকাহ্ বরং কোন ইল্‌মই সুনির্ধারিতভাবে লিখিত ছিল না। এজন্য সাহাবাগণ স্বপ্ন অথবা ব্যাখ্যা চাওয়ার মাধ্যমে রাসূল (স)-এর কাছে মাসআলা জানতে চাইতেন। অথবা সাহাবাগণ রাসূল (স)-এর যাবতীয় কাজকর্ম যেমন অজু, নামায, রোযা, হজ্জ্ব এবং যাকাতের বাস্তব পর্যবেক্ষণ করতেন। কখনো কুরআন থেকে এবং কখনো জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের শর্তসমূহ এবং অংশসমূহের ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাহ্ বা মনসুখ বলে বুঝে নিতেন। মহিলা সাহাবাগণের এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা লাভের সুযোগ খুব কমই হতো। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রয়োজনীয় মাসআলা সরাসরি জানতে চাইতেন। তার মধ্যে আনছারী মহিলাগণ সুতীব্র আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতেন। হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা) বলেনঃ

نعم النساء نساء الانصارلم يكن يمنعهن الحياء يتفقّهن فى الدين –

আনসার নারীগণ এমন ছিলেন যে, দ্বীন জেনে নেয়ার ক্ষেত্রে কোন লজ্জাই তাদের আটকে রাখতে পারতো না।

যে সাহাবাগণ মদীনার বাইরে থাকতেন তাদের পক্ষেও সার্বক্ষণিক রাসূলের (স) সঙ্গে

থেকে সবকিছু দেখে-শুনে শিখে নেয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য তাঁরা মাঝে মাঝে এসে কয়েকদিন রাসূল (স)-এর কাছে থেকে ফিক্হী তালিম নিয়ে নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে সেখানকার লোকদের শেখাতেন। সেখানে তিনিই শিক্ষক। কুরআন মজীদে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ -

তোমাদের প্রত্যেক দল থেকে এমন ব্যক্তিবর্গ কেন বেরিয়ে আসে না, যারা দ্বীনের নিয়ম-নীতি শিখে নেয় এবং যখন নিজেদের দলের মধ্যে ফিরে যাবে, তখন তাদেরকে ভয় দেখাবে, হয়তো তারা ভয় পাবে।

নবুয়ত আমলে ফিকাহ্র তালিম

এই রকম বেশ কিছু মধ্যস্থতাকারীর উল্লেখ হাদীসের কিতাবসমূহে রয়েছে। ওয়াফাদ আবদুল কায়স রাসূল (স)-এর কাছে এসে নিবেদন করলেন, আমি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছি। পথে পথে কাফিরদের বাধা। নির্ধারিত হারাম মাস ছাড়া আমাদের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব নয়। এখন আমাদের জন্য কি কি বিধি-বিধান রয়েছে তা শিখিয়ে দিন, আমরা ফিরে গিয়ে আমাদের জনগণকে শেখাবো। রাসূল (স) ঈমান, নামায, যাকাত, রোযা ও খুমুসের বিধান এবং তা পালনের নিয়ম-নীতি শিখিয়ে দিলেন। আর কিছু নিষিদ্ধ কাজ যেমন শরাবের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে বলে জানিয়ে দিলেন। বললেন, যা কিছু বলা হয়েছে তাকে খুব ভাল করে শিখে নাও, যেন ফিরে গিয়ে জনগণকে তা শেখাতে পারো।[১] বনী সো'ওদ গোত্রের তরফ থেকে হযরত যমাম বিন ছা'আলাবা এসেছেন এবং নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন রেখে বললেন, আমি আমার জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। এরকম বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে।

ফকীহ্ সাহাবাগণের তিন স্তর

এক ঃ যাঁদের থেকে বহু মাসায়েল বর্ণিত আছে। দুই ঃ যাঁদের থেকে মধ্যম পরিমাণের মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে। তিন ঃ যাদের থেকে খুব কম মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে এই সাতজন মহাত্মণ রয়েছে ঃ হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আয়শা (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) এবং যায়দ বিন সাবিত (রা) প্রমূখ।

দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে তেরজন বিশিষ্ট সাহাবা রয়েছে ঃ হযরত আবু বকর (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত আবু হোরায়াহ্ (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর ও বিন আল-আস, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা), হযরত আবু মূসা আশআরী (রা), হযরত সালমান ফরসী (রা), হযরত যাবের বিন আবদুল্লাহ, হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা), হযরত সো'ওদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন।[২]

১. বুখারী, কিতাবুল ইলম। ২. আ'লামুল মাওকিয়ীন।

www.pathagar.com

তৃতীয় শ্রেনীর মধ্যে অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম।

প্রথম স্তরের সাতজন মর্যাদাবান সাহাবার প্রত্যেকের মাসায়েল দিয়ে বড় বড় সংকলন তৈরী হতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরের সাহাবাগণের সম্মিলিত সংগ্রহ নিয়ে কয়েকখানি সংকলন তৈরী হতে পারে এবং তৃতীয় স্তরের সংগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে সীমিত পর্যায়ের।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাস্উদ দীর্ঘদিন কুফায় ছিলেন। হযরত ওসমানের খেলাফতকালে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। সেখানে তার ছাত্রদের মধ্যে হযরত আলকামা মাস্উদ ছিলেন। তারপরে তার ছাত্র ইবরাহীম নখ্য়ী ইমাম হলেন। ইবরাহীম নখ্য়ী ফিকাহ্কে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যার একটা সংক্ষিপ্ত সংকলনও তৈরী হয়েছিল। এ সংগ্রহের সবচাইতে বড় হাফেয ছিলেন 'হামাদ'। তাঁর কাছেই ইমাম আবু হানিফা (রহ) তালিম পেয়েছিলেন।

হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) ঃ হযরত যায়দ বিন সাবিত, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত আয়শা সিদ্দিকা এবং হযরত উমর (রা) স্থায়ীভাবে মদীনাতেই ছিলেন এবং এই মহাত্মনগণের সম্মিলিত বর্ণনাসমূহের বর্ণনাকারী ছিলেন হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, ইমাম নাফে, হযরত উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের এবং হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ ও বড় বড় তাবেয়ীনগণ। হযরত ইমাম মালিক (রহ) এই মহাত্মনগণের ধারাবাহিকতার উত্তরসূরী।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের ছাত্রগণ মক্কাকে জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন এবং যেহেতু অধিকাংশ সাহাবাগণের হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল তাই আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে অনেক অনেক কিছু জেনে নেয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। ইবনে জারীহ্, সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্, ইমাম মুজাহিদ, আকরামা এবং তাউস প্রমুখ এই ধারাবাহিকতার ধারক-বাহক।

মাসায়েলসমূহের নিবন্ধন

যেসব মাসায়েলের পেছনে সহীহ্ হাদীসের দলিল ছিল এবং যা নিয়ে পারস্পরিক কোনো দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না তার ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া খুবই সহজ ছিল এবং সাহাবায়ে কিরাম তাই করতেন। কিন্তু যেসব মাসায়েলের ব্যাপারে আদৌ কোনো হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না, সেসবের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি ছিল সাদৃশ্য অনুসন্ধান এবং ইজতিহাদ। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাস্উদ (রা) প্রমুখ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র) বলেনঃ

اما غير هولاء الاربعة فكانوا يريدون دلالة ولكن ماكانوايميزون الركن والشرط من الامه داب والسنن ولم يكن لهم قول عند تعارض الاخبار وتقابل الدلائل الاقليلا كابن عمر وعأشه وزيدبن ثابت -[১]

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্

www.pathagar.com

এই চারজন ছাড়া অন্যান্য সাহাবাগণ মানে-মতবল অবশ্যই বুঝতেন, কিন্তু সর্বাঙ্গ শর্তসমূহ এবং ব্যবহারিক রীতি-নীতির মধ্যে পার্থক্য করতেন না এবং যেসব বর্ণনাসমূহে পারস্পরিক বিরোধিতা সৃষ্টি হতো অথবা উল্টো দলিল দাঁড়িয়ে যেতো, তার মধ্যে তারা খুব কমই মাথা গলাতেন। যেমন হযরত ইবনে উমর (রা) হযরত আয়েশা (রা) এবং যায়দ বিন সাবিত (রা)।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল যেসব মাসায়েল সামনে এসে যেতো তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা শুরু হতো। তা চলতে থাকতো যতোক্ষণ না তার সমাধান বেরিয়ে আসে। অনেক মাসায়েল সাহাবাগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সমাধান দিয়ে দিতেন। হযরত আবু বকর (রা) এই প্রক্রিয়ার প্রথম উদ্ভাবক এবং হযরত উমর (রা) এই প্রক্রিয়ার সমাধানে বহু কাজ করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহ) বলেন ঃ

كان من سيرة عمرانه كان يشادرالصحابة دينا ظرهم حتى تنكشف الغمة دياتيه الثلج فصارغالب قضاياه فتاواه متبعة فى مشارق الارض ومغاربها -

হযরত উমর (রা)-এর পদ্ধতি ছিল সাহাবাগণের মধ্যে কোনো একটা ফিক্হী মাসআলা নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন, তারপর নিজে এক পক্ষ হয়ে বিতর্ক শুরু করে দিতেন। এই বিতর্ক চলতে থাকতো যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিকতা তৈরী হতো। একারণেই পৃথিবীতে তাঁর প্রণীত ফতোয়াসমূহের দ্বিধাহীন চর্চা হতে পেরেছে।

সাহাবাগণের মতপার্থক্য

হযরত উমরের খিলাফত আমলে অধিকাংশ সাহাবা নতুন নতুন বিজিত রাজ্যগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন আর এদিকে খলিফার সামনে নিত্যনতুন সমস্যা এসে জড়ো হচ্ছিল। একারণে যেসব মাসায়েল সম্পর্কিত হাদীস তাঁর স্মরণে থাকতো অথবা কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ভাবন করতে পারতেন, সে অনুযায়ী তিনি তাদের বিধান দিয়ে দিতেন। কিন্তু যেসব সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল না, সেসব সম্পর্কে তাঁর মতামত নিয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন ঃ

(১) একজন সাহাবী কোনো একটা মাসআলা সম্পর্কে রাসূল (স)-এর ফায়সালা শুনেছিলেন। কিন্তু অন্য সাহাবাগণের তা শোনার সুযোগ হয়নি। তাই তাঁরা অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের ইজতিহাদ অনুসন্ধানের ওপরে নির্ভর করে কাজ করেছেন। যে কারণে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রথমত ঃ এমন হয়েছে যে, সেই ইজতিহাদ ঠিক ঠিক হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেছে! যেমন ঃ একজন মহিলার স্বামী মোহ্রানা নির্ধারণ করার আগেই মারা গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের কাছে লোকেরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানতে চাইল। তিনি বলে দিলেন, এ ব্যাপারে রাসূল (স)-এর সমাধান আমার জানা নেই। কিন্তু লোকদের পিড়াপিড়ীতে পড়ে তিনি সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মোহরানা এবং উত্তরাধিকার দেবার ফতোয়া দিয়ে দিলেন এবং মহিলাকে ইদ্দত পালনের আদেশ দিলেন। এর পরে হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার একদিন বললেন, রাসূলে কারীম (স)ও এক মহিলার ঠিক এই একই

রকম সমস্যার সমাধানে এই ফতোয়াই দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) আনন্দের অতিশয্যে কেঁদে ফেলেছিলেন। তাঁর দেয়া ফতোয়া খোদ আল্লাহ্র রাসূলের (স) সাথে মিলে গেছে!

২. দ্বিতীয় অবস্থা এ রকম

দুইজন সাহাবার মধ্যে মতপার্থক্য হলো। একজন যখন সহীহ্ হাদীসের দলিল পেশ করলেন, তখন আর মতপার্থক্য থাকলো না। নিজের মত এবং দেয়া ফতোয়া থেকে শুদ্ধ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। যেমন ঃ আবু হোরায়রার (রা) মতে রমযানে সকাল পর্যন্ত কেউ অপবিত্র থাকলে তার রোযা শুদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু 'বিশ্বাসীদের মাতা' রাসূল (স)-এর স্ত্রীগণের মাধ্যমে যখন এর বিপরীত কথা শোনা গেল তখন তিনিও তার মতামতকে বদলে নিলেন। অথবা যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) গোসলের সময় মহিলাদের চুল খুলে নেবার আদেশ দিতেন, কিন্তু যখন হযরত আয়শা সিদ্দিকার কাছে এই কথা পৌছল তখন তিনি বললেন, ইবনে উমর মহিলাদের মাথা ন্যাড়া করে ফেলার আদেশ দিলেই পারতো! আমি নিজে খোদ রাসূল (স)-এর সাথে গোসল করেছি। তখন মাত্র তিনবার মাথায় পানি ঢেলে দিতাম।

৩. ধরন অনুধাবনে পার্থক্য

রাসূল (স) কোনো কাজ করেছেন, তা দেখে কোনো কোনো সাহাবা তাকে ইবাদত মনে করেছেন, আবার কেহ কেহ তাকে কিছুই মনে করেননি। যেমন ঃ হজ্বের যাত্রাপথে রাসূল (স) ইবতাহ্তে থামলেন। হযরত আবু হোরায়াহ্ ও হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) মনে করলেন, ইবতাহ্তে থেমে অবস্থান করা সুন্নতসম্মত এবং হজ্বের কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু হযরত আয়শা ও হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের মতে তা নিত্যন্তই একটি ঘটনা, হজ্বের কর্তব্যসমূহের সাথে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

৪. রাসূল (স)-এর কাজ দেখে বিভিন্ন ধারণা পোষণ

সাহাবাগণ রাসূল (স)-কে কোনো একটি কাজ করতে দেখেছেন। তা দেখে যার যেটা মনে হয়েছে, সে তাই ধরে নিয়েছেন। যেমন ঃ বিদায় হজ্বকে নিয়ে সাহাবাগণের মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে তিনি 'তামাত্তু'র ইহরাম বেঁধেছিলেন। কারো কারো মতে তিনি 'কারেন' ছিলেন। আবার কারো কারো মতে তিনি শুধুমাত্র হজ্বের ইহরাম বেঁধেছিলেন। অনুধাবনের এই বিভিন্নতা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) তার ব্যাখ্যা করেছেন।

৫. অন্য মনস্কতা বা ভুলে যাওয়ার কারণে ভুল বোঝা

অন্যমনস্কতা বা ভুলে যাওয়া প্রাকৃতিক স্বভাব। এ কারণেও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা)-এর মনে ছিল যে, রাসূল (স) রজব মাসে 'ওমরাহ্' করেছেন, কিন্তু হযরত আয়শা (রা) তাকে ভুলে যাওয়ার পরিণতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৬. আংশিক ভুলে যাওয়ার পরিণতি

কোনো কোনো মতবৈষম্য বর্ণনার সকল অংশ ঠিকমতো স্মৃতিতে সংরক্ষিত না রাখার কারণে হয়েছে। যেমন ঃ আবদুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণনা করেছেন যে, মৃতের জন্য তার আপনজনের

www.pathagar.com

কান্নার ফলে মৃতের আযাব হয়। হযরত আয়শা (রা) যখন এই বর্ণনা শুনেছেন, বলেছেন, হাদীসটি তিনি ঠিকমত মনে রাখেননি। ঘটনাটা এরকম, এক ইয়াহুদী মহিলা মারা গেলে তার আপনজন তাকে নিয়ে বিলাপ করছিল। রাসূল (স) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন, এরা তো তাকে নিয়ে কাঁদছে আর বিলাপ করছে, ওদিকে কবরে তার ওপর আযাব হচ্ছে। আবদুল্লাহ্ বিন উমর মৃতের জন্য কান্নাকে কবর আযাবের কারণ ধরে নিয়েছেন। অথচ তা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ব্যাপার। একটি অন্যটির কারণ নয়।

এভাবে হযরত আবু হোরায়রাহ্ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনটি জিনিসের মধ্যে অমঙ্গল রয়েছে ঃ বাড়ি, নারী এবং সওয়ারী (ঘোড়া)। হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা) এই বর্ণনা শুনে বললেন, বর্ণনার প্রথম অংশ তাঁর মনে নেই। রাসূল (স) তো এভাবে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন, কারণ ওরা বলে যে, বাড়ি, নারী এবং ঘোড়া এই তিন জিনিসে অমঙ্গল রয়েছে।

৭ . মতপার্থক্যের আরো একটি কারণ

সাহাবাগণের মধ্যে কোনো আদেশের কারণ অনুধাবন করতে পার্থক্য হয়েছে, যে কারণে পরিণতির দিক দিয়ে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঃ হাদীসসমূহে জানাযা দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়ার বর্ণনাসমূহ এসেছে। যার কারণ বিভিন্ন এবং এই কারণ সাহাবাগণের বুঝের বৈচিত্র্যের পরিণতি। কোনো কোনো সাহাবা মনে করেন এটা ফেরেশতাদের সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। এমতাবস্থায় মুসলিম অথবা কাফির উভয়ের ক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত। কেননা ফেরেশতা উভয়ের সঙ্গেই রয়েছে। কারো কারো মতে, পরকালের স্মরণ এবং ভয় এর কারণ। এ তাৎপর্যের ক্ষেত্রেও কাফির বা মুমিন উভয়ের জানাযা দেখেই দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এরকমও বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূল (স)-এর সামনে দিয়ে এক ইয়াহূদীর শবযাত্রা যাচ্ছিল। তিনি এমন জায়গায় বসেছিলেন যেখানে মিছিলটা তার গায়ের ওপর দিয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল— অথবা খুব কাছে দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা তাঁর কাছে ভাল লাগেনি বলে তিনি উঠে সেখান থেকে সরে দাঁড়ালেন।

৮. পরস্পর বিরোধী বিধানের ক্ষেত্রে মতবৈষম্য

এটা মতপার্থক্যের বড় একটি কারণ। একই ঘটনার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর পরস্পর বিরোধী বিধান দেয়া আছে। এর বিশেষ কারণ হলো যে, পর্যায়ক্রম এবং আরোহণের নীতির ওপর খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে এরকম বহু বিধান আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তার মধ্যে কোনো আন্তঃবিরোধিতা বাকি থাকে না।

আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী 'মু'তা' প্রচলিত ছিল, কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পরে রাসূল (স) তাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেন। অথবা মক্কায় থাকা অবস্থায় নামাযের আসনসমূহের যে প্রকৃতি ছিল মদীনায় এসে তা বদলে গেল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রুকুতে যাবার সময় দুই হাত মিলিয়ে দুই পায়ের মধ্যে দিয়েই রুকু করতেন। অথবা আগুনে জ্বাল দেয়া জিনিস দিয়ে অজু করার মাসআলা, বা উটের গোশত খেয়ে আবার অজু করা। এই ধরনের বেশ কিছু বিধান রয়েছে যা পর্যায় এবং প্রেক্ষিত অনুযায়ী করা হয়েছে।

বস্তুত রাসূল (স)-এর জামানায় অযুর জন্য কোন লিখিত কিতাব ছিল না। এবং এটাও সুস্পষ্ট যে, নতুন ঈমান আনা অধিকাংশ মুসলিম মহাত্মনগণের পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা

www.pathagar.com

সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। নানানভাবে বারে বারে তাদেরকে তা শেখানো হয়েছে। এর পরে তাঁরা যখন উচ্চতর পর্যায়ে এসে পৌছেছেন তখন সেই প্রাথমিক বিধান আর তার আগের অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকেনি।[১]

হযরত উমর (রা)-এর কর্ম পদ্ধতি

এ বাস্তবতা অনস্বীকার্য যে, হযরত উমর ফারুক (রা) স্মরণ ও ধারণ এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণে ইমামগণের ইমাম ছিলেন। তাঁর শাসনামলে মতবৈষম্যের বীজ বপিত হতে পারেনি। তিনি নিজে ৫৩৯ খানি হাদীসের বর্ণনাকারী। হাদীসের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। মতপার্থক্যের কোনো সুযোগই তিনি দিতেন না। এতোটুকু সন্দেহের উদ্রেক হলে সাথে সাথে সাহাবাগণের পরামর্শ সভা বসিয়ে দিতেন এবং সেখানেই তার সমাধান হয়ে যেত।

একবার চাবুকের আঘাতে কোনো এক মহিলার গর্ভপাত হয়ে গেল। হযরত উমর (রা) 'দিয়াত'-এর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মুগীরাহ্ বিন শো'বা (রা) বললেন, রাসূল (স) এই রকম অবস্থায় একটি গোলাম অথবা একটি দাসী ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করে দিতে বলেছিলেন। হযরত উমর (রা) বললেন, কোনো সাক্ষী আছে ? হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলিমাহ্ (রা) একথার সাক্ষী দিলেন।[২]

একবার হযরত আমরুদ বিন উমাইয়া আয্যামরী বাজারে চাদর ক্রয় করছিলেন। কেউ একজন প্রশ্ন করেছিলো, চাদর দিয়ে কি হবে ? বললেন, সাদ্কা করে দেব। হযরত উমর (রা) কথাটা শুনে পরে জিজ্ঞেস করলেন, বলতো, চাদরটা কাকে দান করেছ ? বললেন, আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছি। কেননা রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীকে যা কিছুই দিবে তা 'সাদকা' হবে। হযরত উমর (রা) বললেন, হে আমরুদ, রাসূল (স)-এর ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিও না। আমরুদ বিন উমাইয়া তখন হযরত উমর (রা) কে হযরত আয়শার কাছে নিয়ে এলেন এবং তার কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়ে দিলেন।[৩]

একবার আবু মূসা আশআরী হযরত উমর (রা)-এর কাছে এলেন। তিনবার অনুমতি চাইলেন, কোন উত্তর না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। হযরত উমর তখন ডেকে বললেন, ফিরে যাচ্ছ যে ? বললেন, রাসূল (স)-এর এরকমই আদেশ। হযরত উমর (রা) বললেন, একথার কোনো সাক্ষী দিতে পারো ? হযরত আবু সাঈদ খুদরী সাক্ষী দিলেন। এর পরে বললেন, শুনুন, আমি আপনাদেরকে কোনো দোষে দোষী করতে চাই না। আমার সব সময়ই একটা ভয় লেগে থাকে এ ব্যাপারে যে, লোকেরা ভুল কিছু বলার ব্যাপারে সাহসী না হয়ে উঠে।[৪]

তিনি বিচারকমণ্ডলীর একটি সভা গঠন করেছিলেন। যার সদস্যগণ ছিলেন হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা), হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা), হযরত আবী বিন কা'আব (রা), হযরত যায়দ বিন সাবেত (রা) প্রমুখ। মদীনা মুনাওয়ারায় এই মহাত্মনগণের বাইরে অন্য কারো জন্য ফতোয়া দেবার কোনো অনুমতি ছিল না এবং কেউ তা করার দুঃসাহসও করতেন না।

আল্লামা যুহরী দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) অধিক বর্ণনার জন্য শাস্তি ঃ মুঈন বিন ঈসা বর্ণনা করছেন যে, ইমাম মালিক (রহ) আবদুল্লাহ্ বিন ইদরিস থেকে, তিনি শো'বা থেকে, তিনি সাঈদ বিন ইবরাহীম থেকে, তিনি

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্। ২. আবু দাউদ, কিতাবুল আয়াত।
৩ . মুসনাদে আবু দাউদ। ৪. বুখারী ও আবু দাউদ।

www.pathagar.com

তার পিতার বরাত দিয়ে বলছেন যে, হযরত উমর (রা) ইবনে মাসউদ, আবু মাসউদ আনসারী এবং আবু দারদা'কে বন্দী করে বলেছিলেন, তোমরা রাসূল (স)-এর কথা অত্যন্ত বেশিমাত্রায় বর্ণনা করো।

(২) অত্যধিক বর্ণনায় বেত্রাঘাতের ভয় ঃ আবদুল আযীয বিন দরাদরদী মুহাম্মদ বিন আমরুদ থেকে, তিনি আবু সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু হোরায়রাহ্ (রা)-এর কাছে জানতে চাইলাম যে, আপনি কি হযরত উমর (রা)-এর সময়ও এইভাবে এতো বর্ণনা করতেন? তিনি বললেন, সে সময় এরকম করলে তো আমাকে বেত্রাঘাত খেতে হতো।[১]

এই সব ঐতিহাসিক খণ্ডচিত্র থেকে যে সত্যটি বেরিয়ে আসে তাহলো, হযরত উমর (রা) তাঁর সময়কালে অত্যন্ত সতর্কতা এবং কঠোর সাবধানতার সাথে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। যা করতে গিয়ে তাঁকে রাসূল (স)-এর ভালবাসায় পাগলপ্রায়, পূণ্যাত্মা মহাত্মনগণের ওপরেও সুকঠিন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হয়েছে। যেন ঐশী বিধানের মূল শৃংখলা, বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত হয়ে না যায় এবং এতোটুকু মতপার্থক্যের বীজ যেন কখনো অঙ্কুরিত হতে না পারে।

ইরাক বিজয়ের পরে হযরত উমরের ইজতিহাদ

ইরাক বিজয় নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মারাত্মক মতপার্থক্য দেখা দিলো। হযরত বেলাল (রা) হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) এবং অধিকাংশ সাহাবাগণের অভিমত ছিল এই যে, যাঁদের তলোয়ার দিয়ে এই দেশ দখলে এসেছে তাদের মধ্যেই সে দেশের সকল ভূমি বণ্টন করে দেয়া হোক। হযরত উমর এবং হযরত আলী (রা)-এর মতে বিজিত ভূখণ্ড রাষ্ট্রের মালিকানাধীন হলো এবং তাই থাকবে। যা দিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্ম উপকৃত হবে। বিতর্ক যখন কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না তখন তিনি মুহাজিরীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনার অধিকারী পাঁচজন এবং আনসারদের মধ্য থেকে সমমানের পাঁচজন ব্যক্তিত্ব নিয়ে একটি শালিস কমিটি গঠন করলেন এবং তাঁদের সামনে রাখলেন এই উদ্ভূত সমস্যা। কয়েকদিন ধরে চললো তুমুল আলোচনা-পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক। শেষ পর্যায়ে হযরত উমর (রা) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতির সমর্থনে কুরআনুল কারীমের এই আয়াত পেশ করলেন।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ تَوَالَّذِيْنَ جَاءُ وَامِنْ بَعْدِهِمْ -

সে সব নিঃস ব্যক্তিদের জন্য যারা নিজেদের বসত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ হারিয়েছে। আর যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে তাদের জন্য।

এই আয়াতের শেষ অংশ দিয়ে তিনি দলিল পেশ করলেন। সকল সাহাবাগণ শুনে দ্বিধাহীন চিত্তে একমত হয়ে গেলেন এবং সেই সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, যে দেশই জয় করা হবে তা সৈন্যবাহিনীর মালিকানায় নয়; বরং রাষ্ট্রের মালিকানায় আসবে। তাঁর শাসনামল তথা খোলাফায়ে রাশেদুনের খিলাফতের পরে তাবেয়ীনগণ নিজ নিজ শহরে নিজ নিজ উস্তাদবৃন্দ ও সাহাবায়ে কিরামের বর্ণনা এবং ফতোয়াসমূহের প্রচার ও প্রসারের কর্তব্যসমূহ অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করেছেন।

---

১. তায্‌কেরাতুল হুফ্‌ফায

www.pathagar.com

মদীনা মুনাওয়ারার ফকীহ্‌বৃন্দ

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব, হযরত উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের, হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন, হযরত উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ্, হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার, হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ, হযরত ইমাম বাকের, হযরত মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী, হযরত নাফে মাওলা, আবদুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত আবু আয্যিনাদ, হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আনসারী, হযরত রাবিয়াহ্ বিন ফরোখ (রহ) প্রমুখ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী মহাত্মনগণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ফতোয়া কেন্দ্র কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কুফা'র ফকীহ্‌গণ

কুফায় হযরত আলকামাহ্ বিন কায়স, হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ নখয়ী, কাজী শরীহ্, হযরত ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ নখয়ী, হযরত ইমাম শা'বী, হযরত সাঈদ বিন জাবীর (রহ) প্রমুখ আল্লাহ্‌র সন্তোষপ্রিয় মনীষীবৃন্দ দরস ও ফতোয়ার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে মসনদে আসীন ছিলেন।

বসরায় ইমাম হাসান বসরী, রফী বিন মেহরান, জাবের বিন যায়দ, মুহাম্মদ বিন ছিরীন কাতাদাহ্ (রহ) প্রমুখ বরেণ্য দ্বীনি পণ্ডিতগণ একনিষ্ঠ তাবেয়ী, মুহাদ্দিস এবং মুফতী ছিলেন।

শাম এবং দামেস্কের ফকীহ্‌গণ

শাম ও দামেস্কে হযরত রেজা'আ বিন হাইওয়াহ্ কুনদী, হযরত মাকহোল এবং হযরত উমর বিন আবদুল আজীজ (রহ)-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বগণ কর্মরত ছিলেন। মিশরে ইয়াযিদ বিন আবী আলজীব (রহ) বিশিষ্ট তাবেয়ী ও মুফতী ছিলেন। ইয়েমেনে হযরত তাউস বিন কীছান ও হযরত ওয়াহাব বিন মুত্তাবাহ্ (রহ) নির্ভরযোগ্য এবং আস্থাভাজন ছিলেন।

এই সব তাবেয়ীন নিজ নিজ শহরে অবস্থানকৃত সাহাবাগণের ছাত্র-শিষ্য ছিলেন। উস্তাদগণের রেখে যাওয়া রীতি-নীতি, কর্মপদ্ধতি এবং ভাবনা-চিন্তার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং দায়িত্বশীল উত্তরসূরী ছিলেন তাঁরা। মদীনাবাসীর এক বিরাট আত্মতৃপ্তি এই যে, তাঁদের শহর সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালকের প্রেরিত 'অহীর' অবতরণস্থল এবং দীর্ঘদিন খিলাফতের রাজধানী ছিল।

মক্কাবাসী তাদের শহরে পবিত্র কা'বা ঘরের অবস্থানের কারণে এমনিতেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, তার ওপরে গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিবাসী (যাদের মধ্যে মহান এবং মহত্তম ব্যক্তিত্বগণও রয়েছেন) তওয়াফ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাদের আগমন-নির্গমনের অব্যাহত ধারা সেখানে প্রতিনিয়ত চলছে। কল্যাণময় জ্ঞান চর্চা সেখানে আপনা থেকেই উৎসারিত।

তাবেয়ীনগণের সময়কালটা প্রচুর দাঙ্গা-ফ্যাসাদে বিক্ষুব্ধ ছিল। যদিও হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা থেকেই এর সূত্রপাত। এরপরে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহ্‌র শাহাদাত, আহলে বাইতের শাহাদাত, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়েরের শাহাদাত এবং হোররাহ'র ঘটনাকে কেন্দ্র করে মদীনা মুনাওয়ারায় লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণের মতো চরম অরাজকতার শিকারে পরিণত হয়েছেন অধিকাংশ তাবেয়ীনগণ। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হত্যার মতো কঠিন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। এজন্য অনেক মুহাদ্দিসীন ও তাবেয়ীন 'ইবতেলা ও মোহনের' মতো ভয়ঙ্কর মরু-জঙ্গল পার হয়ে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

www.pathagar.com

তাবেয়ীন ও তব্য়ে-তাবেয়ীনের যুগ

তাঁদের সময়কালে বনী উমাইয়ার জুলুম-নির্যাতন সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁদের প্রাথমিক যুগেও খলিফা 'নামাযের ইমামতের' অর্পিত দায়িত্ব পালন করতেন এবং নামাযের ইমামতকে সর্বোচ্চ সম্মানিত কাজ হিসেবে তখনো জ্ঞান করা হতো। কিন্তু কিছুদিন পরেই খলিফারা ইমামতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সে জায়গায় নিজের তরফ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করলো।

ইযালাতুল খাফা'আতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ) লিখেছেন ঃ

"খোলাফায়ে রাশেদুনের পরে কোন খলিফা স্ব-উদ্যোগে নিজ নেতৃত্বে হজ্জ্বব্রত পালন করেনি। তাদের রাজত্ব অগ্নিপূজক মজুসীদের আদলে চরম বিলাসী 'বাদশাহী' ছিল। ব্যাস, পার্থক্য শুধু এতোটুকু, তারা কথায় কথায় কলেমা পড়তো এবং নামায পড়তো। আমরা এই চরম বিকৃতির আঁচল তলে জন্ম নিয়েছি। জানি না সামনের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা কি দেখাতে চান!

শুধু ইমামতকে ছেড়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, নামাযের সময়কেও তারা পরিবর্তন করে দিয়েছিল। সুলতান ও আমীরদের প্রশংসামালা ও স্তুতি বাক্য এবং দরবারের কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতায় অনেক আলেমও প্রাণের ভয়ে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াযহু ও আহলে বাইতের পবিত্র বংশধরগণকে মসজিদের মেম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবায় অশ্রাব্য গালিগালাজ করা হতো। খেলাফতের নামে কুৎসিত আঁধারেভরা দিনগুলো কাটিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ঊষার দুয়ারে রাঙ্গা প্রভাতের মতো হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহ)-কে খলিফা বানালেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বীন-ধর্ম, রাজনীতি, স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্র হযরত উমর (রা)-এর আদলে নতুন করে ঢেলে সাজালেন। এই সংস্কার দুই থেকে আড়াই বছরের মধ্যে পূর্ণতায় পৌছাতে না পৌছাতেই আবার স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারের ভয়ঙ্কর থাবা তাকে গ্রাস করে নিলো। নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতায় বনী উমাইয়ার চাইতে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে বনী আব্বাস আত্মপ্রকাশ করলো।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে ওলামাদের সম্পর্কহীনতা

নব্য স্বৈরাচারদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের মুকাবিলায় দাঁড়াবার মতো কোন শক্তিই দানা বাঁধতে পারেনি। যে কোনো প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ খণ্ডিত তৃণের মতো ধারালো তরবারীর আঘাতে ধুলিস্মাত হয়ে যেতে হয়েছে। তওহীদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের রক্ত দিয়ে শুরু হলো ইসলামের পোষাক পরে আরব্য জাহিলী গোত্রবাদের পুনর্জাগরণের মহোৎসব। 'খোদাই খিলাফত' রাজতন্ত্রে বদল হয়ে গেল। ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসীন আমীর ও সুলতানদের থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে সকল ফেতনা থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে নিজ নিজ শহরে নিজ নিজ বাড়িতে জ্ঞান চর্চার আসন পেতে বসলেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ) ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ) কোনো মূল্যের বিনিময়েই তথাকথিত খিলাফতের জালে নিজেদেরকে জড়াননি। লেখাপড়া এবং তা সংরক্ষণের সরঞ্জাম আজকের মতো এতো সহজলভ্য ছিল না। যোগাযোগের সংকট, শাসকদের রক্তচক্ষু এবং নিত্য নতুন আইন-কানুন। এসবের বেড়াজালে পড়ে ইমামগণ নিজ নিজ শহরের পূর্বতন পূর্বসূরীদের বাণীসমূহ চর্চা এবং তাদের জীবন যাপন পদ্ধতির অনুকরণ-অনুশীলনকেই নিজেদের জীবন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একমাত্র

কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেন। সুতরাং কুফায় ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর সামনে তাঁর উস্তাদ ইমাম ইবরাহীম নখয়ীর (রহ) মাসায়েল, ফতোয়াসমূহ ও বর্ণনাসমূহের ভাণ্ডার ছিল। এরই ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর চিন্তা-দর্শনের সুউচ্চ ইমারত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তিনি কুফার মনীষীগণের বর্ণনা ও ফতোয়াসমূহের সীমাতিক্রম পছন্দ করতেন না।

ইমাম মালিক (রহ) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ) ঃ ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর ফিকাহয় সুস্পষ্ট পার্থক্য যা প্রতীয়মান হয় তাহলো ইমাম আবু হানিফার অভিব্যক্তি কুফার পূর্বসূরীগণের বর্ণনাসমূহ, তাঁদের ফতোয়া এবং বুদ্ধিভিত্তিক মাসায়েলসমূহের ওপরেই ভিত্তিশীল। একইভাবে ইমাম মালিক (রহ) শুধুমাত্র মদীনার পূর্বসূরী পণ্ডিতগণের বর্ণনাসমূহ এবং তাঁদের বিবেচিত বিধানসমূহকে অনুসরণ ও কার্যকরকরণ যোগ্য বলে মনে করেন। কিয়াস ও বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনার ক্ষেত্রে যেভাবে ইমাম আবু হানিফার কর্মপদ্ধতিতে 'উত্তম বিবেচনার' অগ্রাধিকার রয়েছে! তারই কাছাকাছি ইমাম মালিকের কর্মপদ্ধতিতেও 'হাদীস ভিত্তিক' চিন্তার প্রচলন রয়েছে। ইমাম মালিক এবং ইমাম আবু হানিফার মধ্যবর্তী সময়কালটা ছিল খলিফা মনসুরের যুগ। যার স্বৈরাচারী নির্যাতনে গোটা সাম্রাজ্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এসময়ে ফকীহ্ ও আলেমগণ নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে অর্জিত জ্ঞান, ইতিহাস এবং চিন্তা-দর্শনের চর্চা করতেন। মনসুর হজ্ব উপলক্ষে মদীনায় গেলে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দেখা করতে এলেন। সবার আগে ইমাম মালিক (রহ)-কে ডেকে বললো, হে, আবু আবদুল্লাহ্, আমি ফিক্হী বিতর্ক দেখে ভয় পেয়ে গেছি। ইরাকে কিছুই নেই, শামে শুধু জিহাদের জল্পনা-কল্পনা, যা কিছু আছে তা এই হিজাজেই আছে এবং মদীনায় মুহাদ্দিসীনদের আপনিই মধ্যমণি, সুতরাং আপনিই পারেন এমন একখানি কিতাব রচনা করতে যা ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও ইবনে মাসউদ, ইবনে উমরের উসূলে ফিকাহ্র মাঝামাঝি এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়। সারাদেশে আমি সেই অনুযায়ী কাজ করার আদেশ দিয়ে দেবো। তিনি জবাব দিলেন, সাহাবাগণ গোটা সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যিনি যে স্থানে অবস্থান নিয়েছেন, সেখানকার লোকজন তাঁর ফতোয়া, তাঁর দেয়া নিয়ম-বিধান এবং তাঁর বর্ণিত বর্ণনাসমূহ দিয়ে স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠেছেন আলেম, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস হয়ে। বর্তমানে সেখানকার সমাজে সেটাই গ্রহণযোগ্য। এমতাবস্থায় আমি যদি কোনো কিতাব লিখেও দেই তা পালন করতে গোটা সাম্রাজ্যকে বাধ্য করা সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি না। আমার এই চিন্তা ভুলও হতে পারে, একথা বলে তিনি চলে এলেন। এরপরে সুফিয়ান সাওরী এলেন। শাহী তাঁবুতে তলব করা হলো তাঁকে। তিনি ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, এই শাহী কার্পেট না তুললে আমি তো আসতে পারছি না! সাথে সাথে তুলে ফেলা হলো। তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন মাটিস্পর্শ করে ঃ

منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً اخرى -

আর এই মাটি থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি; এতে আমি তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং এর থেকেই আমি তোমাদের পূণর্বার বের করে আনব।

মনসুর এ আয়াত শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকলো। সুফয়ান সাওরী দীর্ঘক্ষণ অত্যন্ত কঠিন ভাষায় নানান ধরনের নসিহত করে উঠে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

দরবারী নায়েব আবু উবায়দা দুই ইমামের দুঃসাহস দেখে মনসুরের কাছে এসে বললো, আমীরুল মুমিনিন এই রকম বেআদব লোকদের মাথা কেটে ফেলার আদেশ কেন দিচ্ছেন না। খামোশ! মনসুর গর্জে উঠলো। বললো, ইমাম মালিক এবং সুফিয়ান সাওরী সম্মান করার মতো ব্যক্তিত্ব। এই মনসুরের আমলেই মদীনার প্রশাসক ইমাম মালিক (রহ)-কে বেত্রাঘাত করে খালি গায়ে উটের পিঠে চড়িয়ে মদীনার পথে পথে ঘুরিয়েছিল। অবশ্য মনসুর তা জানতে পেরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল।

এই সব ঘটনা সময়ের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে দেয় যে, সাধারনের 'পায়ে-হাঁটা' যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে ফকীহ্গণ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী নিজস্ব একটা রীতি-নীতি তৈরী করে নিয়েছিলেন। এভাবে মক্কার ফিকাহ্, মদীনার ফিকাহ্, ইরাকের ফিকাহ্, মিশর ও শামের ফিকাহ্ ইত্যাদির ফকীহ্ ও ফিক্হী উপাদান এবং তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সর্বজনমান্য একক কোনো নীতিমালা ছিল না যার ওপর ভিত্তি করে হাদীসের শুদ্ধতা বা দুর্বলতা যাচাই করা যায়। প্রতিটি শহরের ফিকাহ্ আলাদা, ফকীহ্ আলাদা। শুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে মুরসাল মুনকাতে এবং মওকুফ বর্ণনাসমূহের ওপরেও নির্ভরশীলতা বাড়লো। ইরাকের ফিকাহ্ দিন দিন ব্যাপকতা পাচ্ছিল। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ দার্শনিকদের (মুজ্তাহিদ) থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। ওদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীনের প্রতি চরম উপেক্ষা এবং রাজনৈতিক শক্তিমত্তা ও দাপটে সত্যবাণীর গুঞ্জরণ থেকে আরব ও আজমকে সম্পূর্ণ শূন্য করে দেয়া হয়েছিল।

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর নীতি-দর্শনের ওপর এক নজর

ঠিক এই সময় শাসকের শক্তিমত্তা, জুলুম-নির্যাতন, মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ্বৃন্দের বিশাল বিশাল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে ভয় না করে দ্বীন বিকৃতিকারীদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর আক্রমণাত্মকভাবে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইমাম শাফেয়ী (রহ)। গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য সফর করে আরব আজমের স্থবির হয়ে থাকা সকল সত্য সন্ধানী সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে তৌহিদী বিধানের এই নীতিমালা পেশ করলেন।

(১) দ্বীনের মূল উৎস কুরআন এবং হাদীস। উদ্ভূত সমস্যার সমাধান যদি সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে না পাওয়া যায় তাহলে 'কিয়াস'। কিন্তু তা সেই কুরআন-হাদীসের আলোকে হতে হবে।

(২) উপযুক্ত দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হাদীসে রাসূল শুদ্ধ প্রমাণিত হলে তাকে কার্যকর করা অবশ্য কর্তব্য।

(৩) হাদীসের বাহ্যিক তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য। যখন তার মধ্যে কয়েকটি তাৎপর্যের সম্ভাবনা দেখা দেবে তখন যে তাৎপর্য বাহ্যিক তাৎপর্যের কাছাকাছি হবে তাকে গ্রহণ করতে হবে।

(৪) সাহাবায়ে কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত খবরে ওয়াহেদ থেকে অনেক ওপরে। তা না পাওয়া গেলে তখন খবরে ওয়াহেদ বিবেচ্য। হাদীস, তা সে যে স্তরেরই হোক কুরআনকে অকার্যকর করতে পারে না।

(৫) একই বিষয়ের কয়েকখানি হাদীস যখন পরস্পর বিরোধী পাওয়া যাবে তখন খুব ভাল

www.pathagar.com

করে দেখতে হবে কোনটার বর্ণনাকারী কি রকম। তারপর দেখতে হবে তার মধ্যে যে বিধান দেয়া আছে তা বিন্যাসের ধরন কোনটার কি রকম! তারপর দেখতে হবে বর্ণনাকারী সাহাবা ঈমান আনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের ছিলেন, না শেষ পর্যায়ের।

(৬) 'হাদীসে মুরসাল' সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব ছাড়া অন্য কারোটা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৭) মওকুফ মুনকাতে হাদীস, মুত্তাসাল সহীহ্ হাদীসের বিপরীতে কোনো পর্যায়ের নয়।

(৮) তাঁর সময়কালে সাহাবাগণের বক্তব্যসমূহ প্রায় সবই সংগৃহীত হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু শুদ্ধ হাদীসের বিপরীত পাওয়া গেছে। একারণে ইমাম শাফেয়ীর (রহ) সিদ্ধান্ত হলো সহীহ্ হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবার বক্তব্য কোনো মূল্য রাখে না। এ প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, 'তারাও মানুষ ছিলেন এবং আমরাও মানুষ'।

(৯) প্রতিটি 'সাধারণ' নির্দেশের মধ্যে ব্যতিক্রমও হয় এবং সাধারণ সন্দেহাতীত হয় না।

(১০) 'উপকারিতা অর্জনের চাইতে অনিষ্টতা দূর করা' অধিকতর উপযোগী বা শ্রেয়তর।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর চিন্তা-দর্শনের মূল্যায়ন

তিনি তাঁর এই নীতিমালাকে অকাট্য দলিল-প্রমাণসহ সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপরে তার প্রচার এবং প্রসারের জন্য সারা দেশ সফর করেছেন। বাগদাদ এবং ইরাক যেহেতু দার্শনিকদের কেন্দ্র ছিল সেহেতু সেখানে পৌছে তিনি বড় বড় ফকীহ্ ও দার্শনিকদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং বহস-বিতর্কের মাধ্যমে তাঁদের স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন এবং মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, শাম, দামেস্ক, মিশরসহ প্রতিটি জায়গায় পৌছে তিনি তাঁর প্রণীত নীতিমালাকে সেখানকার নীতি নির্ধারকদের দ্বারা সত্যায়িত করে নিয়েছেন।

এই নীতিমালা প্রসারের পরে বড় বড় মুহাদ্দিসীন যেসব মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—

ইমাম হুসাইন কারামিসী (রহ) ঃ তিনি বলেন, আমরা এবং আমাদের পূর্বসূরীগণ এটা জানাতম না যে, কুরআন এবং হাদীস কিভাবে বুঝতে হবে। এমনকি আমি তার পদ্ধতি এখন ইমাম শাফেয়ীর কাছ থেকে শুনলাম।

আবু মুসা দরীর ঃ তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইমাম শাফেয়ীর রচনাবলী মানুষের কাছে কি কারণে এতো গ্রহণযোগ্যতা পেলো ? বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা এই-ই ছিল যে, তাঁর জ্ঞান প্রকাশিত হোক। একারণে আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে এই উচ্চ মর্যাদায় তুলে দিয়েছেন।

ইমাম ইসহাক বিন রাহোহুরু ঃ ইমাম ইসহাক বিন রাহোহুয়ার কাছে একজন জিজ্ঞেস করল ঃ এতকম বয়সে ইমাম শাফেয়ী (রহ) অসাধারণ সব গ্রন্থাবলি কেমন করে রচনা করলেন ? বললেন, এই কম বয়সের কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিপূর্ণ বুঝ দান করেছেন।

হেলাল বিন আলা (রহ) ঃ তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা চারজন প্রভাবশালী সামর্থবান ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করে পৃথিবীর ওপরে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন ইমাম শাফেয়ী (রহ)।

জাহেয ঃ বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ীর রচনাবলী দেখেছি, তা লেখা নয়, যেন মুক্তো ছড়ানো।[১]

১. তাহযীব আত্তাহযীব, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী।

www.pathagar.com

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ) ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করেন যিনি বিকৃতির কবলে পড়া আল্লাহ্র দ্বীনকে রাসূল (স) প্রদর্শিত পন্থায় সংস্কার সাধনের শিক্ষা দেন এবং সকল ভ্রান্তিকে সমূলে উৎপাটিত করেন। গত শতাব্দীতে উমর বিন আবদুল আজীজ ছিলেন এবং এই শতাব্দীতে ইমাম শাফেয়ী (রহ)। গত তিরিশ বছর যাবত আমি একটানা প্রতি নামাযের পরে ইমাম শাফেয়ীর জন্য মাগফিরাতের দো'আ করে আস্ছি।

ইমাম আলী বিন মাদিনী (রহ) ঃ তিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ। নিজের ছেলেকে বলছেন, ইমাম শাফেয়ীর রচিত কিতাবসমূহের একটি অক্ষরকেও তুচ্ছজ্ঞান করবে না। আমি তাঁর সকল কিতাব সংগ্রহ করে রেখেছি। তাঁর রচনাবলীতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রেরণা রয়েছে।

ইমাম নাসাঈ ঃ তিনি বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ) আমাদের নির্ভরযোগ্য বিশিষ্ট আলেমদের মধ্যে অন্যতম।

ইমাম মুসলিম ঃ তাঁর কিতাব 'আল ইনতিফা'আ বেজুলুদিল বা'আ' এবং 'আর রদ্দে আলী মুহাম্মদ বিন নছর'-এ হৃদয় উজাড় করে ইমাম শাফেয়ীর প্রশংসা এবং তাঁর গুণগান বর্ণনা করেছেন।

কুরআন, কুরআনের বুঝ, কুরআনের তাফসীর এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ)

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কিতাব আহকামুল কুরআনের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ এই যে, কুরআন মজীদে যেসব বিধানের বাধ্যবাধকতা মুসলমানদের ওপরে আরোপ করা হয়েছে, তা চার প্রকারের।

(১) আকায়েদ (বিশ্বাস সংক্রান্ত) ঃ যার মধ্যে তওহীদ, রেসালাত, পূর্বের কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ, কিয়ামত ও পুনরুত্থান এবং কুরআনের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা ফরয।

(২) ইবাদাত ঃ ইবাদত হিসেবে যা কিছু নির্ধারিত, তা সব যথাযথ আদায় করা ফরয। যেমন নামায, রোযা, সম্পদের যাকাত এবং সামাজিক ইবাদত। হজ্ব ব্যক্তিগত এবং সামাজিক এই চারটি ইবাদত ঈমানের পরে ইসলামের বুনিয়াদ এবং ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) পারস্পরিক লেনদেনের বিধি-বিধান ঃ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা দেয়া, ভাড়া দেয়া ইত্যাদি।

(৪) দণ্ডবিধি ঃ অর্থাৎ প্রতিশোধমূলক শাস্তি-দণ্ড (কিসাস)

কুরআন মজীদের বিধানসমূহকে কিভাবে অনুধাবন করা উচিত সে ব্যাপারে তিনি সব সময় একথাটি বলতেন যে, সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হই যে, মূল আরবী ভাষা এবং আরবের আদি যুগ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কুরআন মজীদের তাফসীর করার দুঃসাহস করে। কোনো লোক কুরআন মজীদ থেকে কোনো কল্যাণ অর্জন করতে পারে না যতোক্ষণ না তার অন্তর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুরআনী ওয়াদাসমূহের ওপর নিশ্চিত আস্থাশীল হয়ে যায়। কুরআনী ভীতি প্রদর্শনে কেঁপে উঠে। আল্লাহ্‌র এককত্ব এবং রিসালাতের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে পরিচিতি অর্জন করে যে পর্যন্ত তার মূল তাৎপর্যকে বুঝে নেবার যোগ্যতা তৈরী করে না নেয় এবং তার বর্ণনা রীতি থেকে সরাসরি স্বাদ আস্বাদন করতে না পারে। তার সাথে রাসূল (স) -এর জীবনের সামগ্রিক অবস্থা এবং সেই সব প্রেক্ষিতসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিতি যেসবের ওপরে কুরআন নাযিল হয়েছে!

অর্থাৎ আরবী ভাষা ও আরবের বোল-চাল এবং ওপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ অতিক্রমণের পর যা বাকি থাকে তাহলো স্বয়ং এই কিতাবের প্রণেতা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ যার অপর নাম 'অন্তর্দৃষ্টির আলো'।

তিনি বলছেন, কুরআনুল কারীমের এই আয়াতকে কিভাবে অনুধাবন করবে?

الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون –

সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে গুলিয়ে ফেলেনি

তাদের জন্যই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা রয়েছে এবং তারাই আমার নির্দেশিত পথে ঠিকভাবে চলছে।

এখানে, যদি জুলুমের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে ইল্লা মা'শাআল্লাহ্ কেহই রক্ষা পাবে না।

সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (স) কাছে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (স) ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজ সত্তার ওপর জুলুম করেনি ? তিনি বললেন, "এখানে জুলুমের অর্থ শির্ক"। এই হাদীস ভাষার মধ্যে একটা নতুন সংযোজন এনেছে যে, 'জুলুমের' আর একটি তাৎপর্য হলো কোন জিনিসের ব্যবহার ভুল জায়গায় করা। তাহলে মূল বক্তব্য হলো এই যে, 'ঈমান' নিজেই এক 'মহাশক্তি' যার মধ্যে 'তওহীদ' ছাড়া অন্য কিছু যেন না থাকে। এখানে শিরকের সংমিশ্রণ! সেই কোনো জিনিসের ব্যবহার ভুল জায়গায় করার তাৎপর্যটাই সত্যায়িত হলো।

কুরআনের তাফসীরে ইমাম শাফেয়ীর অবস্থা

ইমাম ইউনুস বিন আবদুল আ'লা (রহ) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ) এমনভাবে কুরআনের তাফসীর করতেন যে, এসব আয়াত নাযিলের সময় তিনি যেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

হযরত জুনাইদ (রহ) বলতেন, এমন কেউ নেই যে, কুরআন মজীদকে ইমাম শাফেয়ীর চাইতে বেশি বোঝেন! ইমাম শাফেয়ী (রহ) নিজেই বলতেন, কুরআনুল কারীমে এমন কোনো কথা নেই যার তাৎপর্য আরবীয় কথোপকথন অনুযায়ী আমি বুঝতে পারি না।[১]

কুরআনের বর্ণনা রীতির মধ্যে সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য, যথাযথ সাদৃশ্যপূর্ণ, সাধারণ, বিশিষ্ট, রহিতকারী, রদকৃত, বিবেচনা, উদাহরণ, কাহিনী বিধানসমূহ, নাযিলের কারণসমূহ এবং আরবীয় বাক পদ্ধতি এসব কিছুর ওপরে তাঁর গভীর দৃষ্টি থাকতো। আমরা এখানে শুধুমাত্র কিতাবুল উম ও আহকামুল কুরআনের কিছু কিছু অংশ তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

শরীয়তী লৌকিকতার বুনিয়াদ

সকল শরীয়তী কর্ম প্রচেষ্টার বুনিয়াদ দুটি শব্দের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, 'করো' এবং 'করোনা' যার নাম 'আমর' ও 'নাহী'। কুরআন এবং হাদীস উভয়ের মধ্যেই আদেশ এবং নিষেধসমূহ রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এতোদুভয় অর্থাৎ আমর এবং নাহীর বিধানসমূহ যেসব কাজ করা বা না-করার পরামর্শ দিচ্ছে তা করা বা না-করা কি অপরিহার্য হবে ? অথবা যদি কুরআন এবং হাদীসের আমর ও নাহী অবশ্য কর্তব্য হয় তাহলে যদি পালনকারী ইবাদতে অন্য আদেশের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সেখানে কি বিধান হবে ?

যার কিছু উদাহরণ এখানে তুলে দেয়া হলো, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ

يايها الذين امنوا ليستئنا ذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات -

১. তাওয়ালা আত্তাসীস

www.pathagar.com

হে, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের দাস-দাসী এবং তোমাদের মধ্যে তারা যারা এখনো বালেগ হয়নি। তোমাদের কাছ থেকে তিনবার অনুমতি চেয়ে নেবে কিন্তু অনুমতি চাইবার এই আদেশ অন্য কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত নয়।

يـايـهـاالـذيـن امـنـوا اذا قـمـتـم الى الـصـلـواة فـاغـسـلـو وجـوهـكـم –

হে, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নেবে।

অযুর এই যে আদেশ তা অন্য একটি ইবাদত অর্থাৎ নামাযের সাথে সম্পৃক্ত। অথবা আল্লাহ্ বলেন ঃ

يـايـهـاالـذيـن امـوا اذا اتـدايـنـتـم بـديـن الى اجـل مـسـمـى فـاكـتـبـوه –

হে, যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমার একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন করো তখন তা লিখে নিও।

লেখার এই আদেশও অন্য একটি উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ঋণের দলিল সংরক্ষণের জন্য।

অথবা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يـاايـهـاالـذيـن امـنـوا اذا طلقتم الـنـسـاء فـطـلـقـو هـن بـعـدتـهـن –

হে বিশ্বাসীগণ ! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদের ইদ্দতের মধ্যে তালাক দিও।

এই আদেশেও তালাকের জন্য প্রথম ইদ্দত পালনের যে সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে, তা অন্য একটি উদ্দেশ্য অর্থাৎ তালাকের জন্য। যেন সেই তালাক প্রাপ্তার ক্ষতির কোন কারণ না দাঁড়ায়।

তাহলে কি এটা বলা যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে জিনিসের আদেশ দিয়েছেন তা অবশ্য কর্তব্য ? তা যখন অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হবে সে অবস্থায়ও তা অবশ্য পালনীয় ? যদি তা ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তা যার সাথে সম্পৃক্ত ছিল একারণে কি তা প্রভাবিত হবে ? অর্থাৎ অযু ছাড়া নামায। লিখিত দলিল ছাড়া ঋণ এবং স্ত্রীলোকদের ঋতুকালীন সময়ে তালাক ইত্যাদি কি বাতিল হয়ে যাবে ?

এই সব কথাকে বিবেচনায় রেখে তিনি বলছেন, কুরআন-হাদীস এবং সাধারণ লোকদের কথাবার্তায় আদেশ-নির্দেশের কয়েকটি মানে হতে পারে।

প্রথমত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে একটা জিনিসকে হারাম করেছেন তারপরে মুবাহ্ করে দিয়েছেন। এ কারণে কোনো কোনো অবস্থায় একটি আদেশের মানে একটি হারাম জিনিসকে হালাল করে দেয়া। যেমন واذا حللتم فاصطادوا অর্থাৎ যখন তুমি হজ্বের ইহরাম খুলে ফেললে, তখন শিকার করতে পারো। এবং فاذا قضيت الصلوان فانتشروافى الارض وابتغوا من فضل الله —যখন জুম'আর নামায আদায় করা হয়ে যাবে তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ সন্ধান করো।

www.pathagar.com

অথবা واتو النساء صدقاتهن ذحله অর্থাৎ স্ত্রীদের তাদের মোহরানা আদায় করে দাও। যদি সে সন্তুষ্টচিত্তে ছেড়ে দেয় তাহলে তা আনন্দ সহকারে খাও। অথবা যখন কুরবানীর পশু জবাই হয়ে যাবে তখন তা থেকে খাও ঃ فاذا وجبت جنوبها فكلوامنها এবং এ রকম আরও অনেক বিধান রয়েছে। কিন্তু ইহরাম খোলার পরে শিকার করা। জুমা'র নামাযের পরে উপার্জনের জন্য ছড়িয়ে পড়া। যদি কোন স্ত্রী আনন্দে তার মোহরানার কোনো অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তা ভোগ করা এবং জবাই হয়ে যাবার পর কুরবানীর গোশত খাওয়া ইত্যাদি কাজগুলো ফরয বা ওয়াজিব নয়। অথবা- وانكحو الايامى منكم والصالحين من عادكم —তোমাদের বিধবাদের এবং ভাল লোকদের বিবাহ করিয়ে দাও। এই আদেশকে ফরয বা ওয়াজিব কিভাবে বলা যেতে পারে ?

কুরআনুল কারীমের বর্ণনা রীতি ঃ কুরআনুল কারীম জিজ্ঞাসা এবং বেছে নেয়ার ব্যাপারে এক ধরনের বর্ণনার প্রয়োজন মনে করেনি বরং অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জানা যায় যে, সে বিভিন্নভাবে কর্মপ্রকাশের আহ্বান করে।

(১) কখনো প্রকাশ্য নির্দেশের শব্দ ব্যবহার করে, যেমন ঃ

اِنْ اللّٰهَ يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى -

আল্লাহ্ তা'আলার ইনসাফ ও বদান্যতার সাথে তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমাদের ঘনিষ্ঠজনদের তোমরা দাও। অথবা

اِنْ اللّٰهَ يأمركم ان تودوالامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل -

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, আমানতকারীদের আমানত তাদের দিয়ে দাও এবং যখন তোমাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করো তখন তা ইনসাফের সাথে করো।

(২) কখনো জানিয়ে দিচ্ছে যে, এই কাজ যারা করবে তাদের জন্য ফরয করা হয়েছে।

كتب عليكم القصاص بالقتلى -

নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস ফরয করা হয়েছে।

كتب عليكم الصيام -

তোমাদের জন্য রোযাকে ফরয করা হয়েছে।

ان الصلوة كانت على المؤ منين كتابا موقوتا -

নামায মুমিনদের জন্য এক নির্দিষ্ট ফরয।

(৩) কখনো এভাবে বলছে যে, এই কাজের দায়-দায়িত্ব সকল মানুষের ওপর অথবা কোনো বিশেষ দলের ওপর।

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا -

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র জন্য মানুষের ওপরে হজ্ব করা ফরয। বিশেষ করে তাদের ওপর যারা সফরের ব্যয় সংকুলান করার সামর্থ রাখে।

وَعلى المولود له رزقهن وكسو تهن بالمعرون –

এবং যে ব্যক্তির সন্তান জন্ম হলো তার ওপরে তার গর্ভধারিণীর ভরণ-পোষণ দেয়া ফরয।

وَللمطلقات متاع بالمعرون حقا على المتقين –

যাদের তালাক দেয়া হলো তাদের সাথে বিধান অনুযায়ী আচরণ করা উচিত। কেননা তা আল্লাহ্‌মুখী লোকদের ওপরে এক ধরনের কর্তব্য বিশেষ।

(৪) কখনো সে ইঙ্গিত কাজের দায়-দায়িত্ব সেই লোকদের ওপর অর্পণ করে, যাদের সাথে সেই কাজের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন ঃ

وَالمطلقات يتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء والذين يتوفون منكم ويذرون

اوزاجًابتربصن بانفسهن اربعة اشهر وَعشرا –

তালাকপ্রাপ্ত মহিলাগণ যেন তিন ঋতু অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত নিজদেরকে সংবরণ করে রাখে এবং তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং স্ত্রীদের ছেড়ে যায় সেই স্ত্রীলোকেরা নিজদেরকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সংবরণ করে রাখবে।

কখনো এমন সব কথা ব্যবহার করা হয় যার দ্বারা প্রাপ্ত কাজের তাগিদ হয় এবং এটাও প্রমাণ হয় যে, কাজটা ফরয নয়। যেমন ঃ

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن ارادان يتم الرضاعه –

এবং যে নিজের সন্তানকে পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত দুধ পান করাতে চায়, তাহলে সেই মায়েরা নিজেদের সন্তানদের পুরো দুই বৎসর দুধ পান করাক।

(৫) কখনো সে নিদের্শমূলক শব্দরূপ বর্তমান ও ভবিষ্যত কালবাচক (ক্রিয়া) নাম সংযোজিত শব্দ দ্বারা কর্ম সম্পাদনের দাবি করে। যেমন ঃ

ثُمَّ ليقضو انفسهم وليوفوا نذ ورهم وليطوفوا بالبيت العتيق –

অতঃপর প্রয়োজন এই যে, তারা তাদের অপরিচ্ছন্নতাগুলোকে দূর করে নিজেদের মানতগুলো পূর্ণ করুক এবং আদি ঘরের তওয়াফ করুক।

(৬) কখনো সে তার ব্যাখ্যা ফরয হিসেবে প্রকাশ করে। যেমন ঃ

قد علمنا مافرضنا عليهم فى اوزاجهم وماملكت ايمانهم –

আমরা যা কিছু তার স্ত্রী এবং দাসীদের ব্যাপারে ফরয করেছি, তা সব আমরা জেনে নিয়েছি।

(৭) কখনো সে কর্তব্য কাজের উল্লেখ কোন শর্তের পুরস্কার হিসেবে করে, কিন্তু তা সাধারণভাবে নয়। যেমন ঃ

www.pathagar.com

فان أحصرتم فما استيسر من الهدى -

হজ্ব করার পথে তোমাদেরকে যদি বাধা দেয়া হয় তাহলে কুরবানীর জন্য যা সঙ্গে এনেছো তাকে পাঠিয়ে দিও।

فمن كان منكم مريضًا اوبه اذى من راسه ففدية من صيام اوصدقة اونسك وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسره -

এবং তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ এবং তাদের মাথায় কোন সমস্যা রয়েছে তাহলে চুল কাটার বদলে রোযা, সাদকা ও খয়রাত বা কুরবানী করে দাও। যদি ঋণগ্রস্ত এবং অভাবী হয় তাহলে সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া উচিত।

(৮) কখনো সে ইপ্সিত কাজের উল্লেখ কল্যাণের সাথে মিলিয়ে করে। যেমন ঃ

ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير -

এবং যারা তোমার কাছে ইয়াতিমদের ব্যাপারে প্রশ্ন করে তাদেরকে বলে দাও সার্বিকভাবে তাদের কল্যাণ করাই তোমাদের উচিত।

(৯) কখনো সে কোনো কাজের উল্লেখ করে কোনো ওয়াদার সাথে। যেমন ঃ

من ذالذى يقرض الله قرضًا حسنا يضاعفه له اضعافًا كثيرة -

এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেবে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার কয়েকগুণ বেশি করে ফিরিয়ে দেবেন।

(১০) কখনো সে ইপ্সিত কাজটির ব্যাপারে বলছে যে, তা নিজেই কল্যাণ অথবা তা কল্যাণের দিকে পৌছে দেবে। যেমন ঃ

لن تنالوالبر حتى تنفقوامما تحبون -

তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিসের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে।

ولكن البر من اتّقى -

কিন্তু কল্যাণ শুধু তারই অধিকার যে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলার সিদ্ধান্ত নিল।

বিধান সম্পর্কিত যেসব আয়াত উদাহরণ হিসেবে এতোক্ষণ বলা হলো একইভাবে বিভিন্ন কর্মসমূহকে নিষেধকরণের বেলায়ও কুরআনী বর্ণনার বিচিত্র ধরন দেখানো যেতে যারে। যেমন; সুস্পষ্ট নিষেধ।

وَينهى عن الفحشاء والمنكر -

আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীল ও মন্দ কাজকর্ম করতে নিষেধ করেন।

انما ينهاكم الله عن الَّذِيْنَ قَاتلوكم فى الدين واخرجو كم من دياركم وظاهروا على اخرا جكم ان تولوهم -

www.pathagar.com

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে তোমাদের শত্রুদের সাহায্য করেছে। তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেন।

নিষিদ্ধ কাজের হারাম ঘোষণা করা। যেমন ঃ

انَّمَا حرم ربى الفواحش ما ظهر منها ومابطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوابالله مالم ينزّل به سلطانا وان تقولواعلى الله مالا تعلمون -

আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য অথবা গোপন সব রকমের কাজকে হারাম করে দিয়েছেন এবং ঔদ্ধত্বপূর্ণ অপরাধ ও সব রকম বাড়াবাড়িকে এবং আল্লাহ্র সঙ্গে তোমরা যাদেরকে শরীক করো, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোনো সনদ নাযিল করেননি তাকে এবং না জেনেশুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমরা যেসব কাল্পনিক কথা রচনা করো তাকে।

(৩) নিষিদ্ধ কাজকে 'হালাল নয়' বলে বলা হচ্ছে। যেমন ঃ

ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمو هن شيئا الا ان يخا فالايقيما حدود الله

তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, যা কিছু তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নাও। সেই অবস্থা ছাড়া যে তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই এই ভয় হয় যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখা যাবে না।

ولايحل لهن ان يكتمن ماخلق الله فى ارحامهن -

এবং স্ত্রী লোকদের জন্য তা হালাল নয়, যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাকে গোপন করা।

(৪) নেতিবাচক শব্দ দিয়ে (অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যতকালবাচক ক্রিয়াকে যার পূর্বে আনা হয়নি)।

অথবা এমন আদেশমূলক 'ক্রিয়া' দিয়ে যার লক্ষ্য নিষেধ করা। যেমন ঃ دع অথবা ذر -এর ব্যবহার করা। যেমন ঃ

ولاتقربوامال اليتيم الابالتى هى احسن -

কল্যাণমূলক কোন উদ্দেশ্য ছাড়া ইয়াতিমের সম্পদের কাছেও যেও না।

وذروظاهر الاثم وباطنه وداع اذاهم -

গোপন এবং প্রকাশ্য গুনাহগুলোকে ত্যাগ করো এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট দেয়াও ছেড়ে দাও।

(৫) নাসূচক ক্রিয়া দিয়ে পূণ্যের ধারণাকে খণ্ডন করা ঃ

ليس البران تولواوجوهكم قبل المشرق والمغرب -

তোমরা তোমাদের মুখ পূর্বদিকে করলে কি পশ্চিম দিকে তা কোনো পূণ্যের কাজ নয়!

www.pathagar.com

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج

তাহলে যে ব্যক্তি ঐ মাসগুলোতে হজ্বের ইচ্ছা পোষণ করে, তো হজ্বে না কোনো অশ্লীলতার ব্যাপার আছে, না কোনো পাপ, না যুদ্ধ।

لاتضار والدة بولدها ولامولودله بولده -

মাকে সেই বাচ্চার কারণে যেন কোনো ক্ষতি করা না হয় এবং না তাকে, যার বাচ্চা আছে তার বাচ্চার কারণে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

(৭) গুনাহের উপযোগিতার সাথে মিলিয়ে নিষিদ্ধ ক্রিয়ার উল্লেখ করা। যেমন ঃ

فمن بدله بعد ماسمعه فانما اتمه على الذّين يبد لونه -

যে অসীয়ত শুনে তা বদলে ফেলে, তাহলে তাদের গুনাহ তাদের ওপরেই যারা অসীয়তকে বদলে দেয়।

(৮) নিষিদ্ধ ক্রিয়াকে শাস্তির হুমকির সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা। যেমন ঃ

وَالذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقون فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

এবং যারা সোনা ও রূপাকে জমা করে এবং তাকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তির সুসংবাদ দাও।

(৯) নিষিদ্ধ ক্রিয়ার বিশেষণে شر শব্দের ব্যবহার। যেমন ঃ

ولاتحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هوخير الهم بل هو شرلَهُمْ -

যারা আল্লাহ্‌র দেয়া অনুগ্রহ নিয়ে কৃপণতা করে তারা এটা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে; বরং তা তাদের জন্য জঘণ্য পরিণতি ডেকে আনবে।

কুরআন মজীদে এমনও কিছু নির্দেশনা রয়েছে যা করা না-করা দায়িত্ব প্রাপ্তের ইচ্ছাধীন। সেই সব নির্দেশনার প্রকাশও বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। যেমন ঃ

ايوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوالكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم -

(১) আজকের দিনে তোমাদের খাবারের জন্য পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল করে দেয়া হলো এবং তাদের জবাই করা জিনিস যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে। তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের জবাই করা জিনিস তাদের জন্য হালাল।

يسألونك ماذا احلّ لهم قداحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين -

www.pathagar.com

লোকেরা তোমার কাছে প্রশ্ন করে, ওদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে ? ওদেরকে বলে দাও যে, যা কিছু পবিত্র খাবার তা তোমাদের জন্য হালাল এবং যেসব শিকারী জন্তু তোমরা শিকারের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করেছ তাদের শিকারও হালাল।

(২) فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه

যে অসহিষ্ণু অধৈর্য হয়ে যায়, কিন্তু সীমা লংঘন করে না তার ওপরে কোনো গুনাহ্ নেই।

فمن تعجل فی یو مین فلا اثم علیه ومن تاخر فلااثم علیه -

অতঃপর যে তাড়াতাড়ি করে এবং দু'দিনে উঠে দাঁড়ায় তার ওপরেও কোনো গুনাহ নেই। তারপরে যে একটু বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করে তার ওপরেও কোনো গুনাহ নেই।

(৩) যে কাজটি গুনাহের নয় احناح শব্দ দিয়ে তার ভাব প্রকাশ ঃ

انْ الصفا والمروة من شعأر الله فمن حج البيت اواعتمر فلاجناح عليه ان يطوف بهما -

সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। এখন যে ব্যক্তি কা'বাঘরের হজ্ব করবে বা ওমরা করবে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানো তার জন্য কোনো গুনাহের কাজ নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) আরও বেশ কিছু আদেশ এবং নিষেধের ধরন বর্ণনা করে অতঃপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার এই সব বিধানের সঠিক ব্যাখ্যা রাসূল (স) ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। শুদ্ধ হাদীসের সাথে কুরআনের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে এই আয়াত উল্লেখ করে বলেন ঃ

هوالذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته وَيُزكِيْهِمْ وَيعلمهم الكتٰب والحكمة وان كانوامن قبل لفى ضلال مبين -

আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষরজ্ঞানহীন সেই লোকদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল উত্থিত করেছেন যে তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত পড়ে শোনায় এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করে এবং 'লিখিত বিধান' ও তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল শিখিয়ে দেন। এর আগে ঐ লোকেরা ছিল সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত।

এই আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানসমূহ বা আয়াত লোকদের পড়ে শোনান।

(২) সেই শ্রোতাদেরকে তিনি শিরক এবং অন্যান্য অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে তোলেন।

(৩) এবং তাদেরকে তিনি লিখিত বিধানসমূহের বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং কলা-কৌশলের শিক্ষা দেন।

তাহলে রাসূলের দায়-দায়িত্ব যদি এটাই হতো যে, তিনি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ

www.pathagar.com

মানুষকে পড়ে শোনাবেন এবং শুধুমাত্র এটা করলেই তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে যায় তাহলে শেষোক্ত আদেশ দু'টির (অর্থাৎ কিতারে শিক্ষা এবং কর্মকৌশল) তাৎপর্য কি ?

একারণে এর ব্যাখ্যা এই হবে যে, রাসূলগণ যে জ্ঞান ধারণ করেন তা দুই প্রকারের। একটিঃ নিঃখাদ 'অহী' অর্থাৎ সেই জ্ঞান যা স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি তাঁদের কাছে প্রেরণ করেছেন। যার সামগ্রিক সংকলনকে কিতাবুল্লাহ্, সহীফাহ্ রব্বানী বা কুরআন মজীদ বলা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় ঃ সেই জ্ঞান যা রাসূল (স)-এর জন্য সম্পূরক, নবুয়তের আলো অথবা সেই আলো আত্মস্থকরণ, যা ঐশী জ্ঞান অনুধাবনের ফলে ভেতরে জন্ম নেয়।

প্রথমোক্ত জ্ঞান মূল বা মৌলিক এবং দ্বিতীয়টা অন্তর্নিহিত। প্রথম জ্ঞান অপরিবর্তনীয় শরীয়ত এবং চিরন্তন বিধান সমগ্র ও তার গুরুত্বের বিস্তারিত প্রকাশকারী এবং দ্বিতীয় জ্ঞান প্রথম জ্ঞানের মৌল নীতির আলোকে তার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা ও তার আনুষাঙ্গিক বিষয়াদির বিস্তারিত বর্ণনা করে এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনশীল নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কে অন্তর্বর্তী সময়গুলোতে সংস্কারমূলক নিয়ম-নীতিও বাস্তবায়ন করে এই মূল নীতি অনুযায়ী ।

রাসূল (স) বক্তব্যের তিনটি পর্যায়

(১) কুরআন মজীদে যা দেয়া আছে অবিকল সেইভাবে।

(২) কুরআন মজীদের সংক্ষিপ্ত বিধানসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

(৩) যার উল্লেখ কুরআন মজীদে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত কোনভাবেই নেই।

তারপর বলছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (স)-এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যকে ফরয করেছেন।

রাসূল (স) এমন কোনো আদেশ করেননি যার কিছু না কিছু ইঙ্গিত কুরআনে পাওয়া যাবে না। এসব সম্পর্কিত যাবতীয় বক্তব্য রাসূল (স)-এর উন্মুক্ত অন্তরে গুছিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং এটাই 'হিকমত'। যখন কোনো নতুন প্রেক্ষিত রাসূল (স)-এর সামনে উপস্থিত হতো এবং সে উপলক্ষে কোনো অহী নাযিল হতো না! তখন রাসূল (স) নিজেই ইজতিহাদ করে নির্দেশনা জারি করে দিতেন। যা তাঁর অনুসারীদের জন্য বিনা প্রশ্নে পালনযোগ্য এবং তা যে কোনো ধরনের সন্দেহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। এই জন্য রিসালাতের আদেশসমূহ এবং দ্বীনের বিধান বর্ণনায় তার বক্তব্য কখনো ভুল হতে পারে না। তারপর বলছেন আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গিত হোক— নবীসুলভ ইজতিহাদ এবং দার্শনীক জ্ঞানে তিনি ছিলেন অফুরন্ত ফল্গুধারা, যার ধারাসমূহ অন্তরের গভীর তলদেশ থেকে প্রবাহিত হয়। এই অনুপ্রেরণা, আল্লাহ্-ভীতি রিসালাতের আলোকে আলোকিত চেতনা এবং নবুয়তের প্রতিভা-যোগ্যতা যা ঐশী প্রজ্ঞা থেকে উৎসারিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এজন্য হযরত উমর ফারুক (রা) বলেন ঃ

يـاايُّهَـا النَّـاسُ اِنَّمَـا الـرائ كـان مـن رسـول الـلّـه مصـيـبـتـا لان كـان يـريـه وانـمـا هـومـنـا الـظـن والـتـكـلـف -

হে মানুষ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অভিমত যে কোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত-পবিত্র। কেননা তা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং আমাদের মতামত আমাদের ধারণা-অনুমান ও চিন্তা-ভাবনা প্রসূত কথা।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা) এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদ থেকে উদ্ঘাটন করেছেন যে ঃ

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين النّاس بما اراك اللّه -

আমরা তোমার ওপর সত্যতার ভিত্তিতে কিতাব নাযিল করেছি যেন তুমি মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করো যেভাবে আল্লাহ্ তোমাকে বুঝিয়েছেন।

এবং রাসূল (স) নিজে বলেছেন ঃ

انا اقضى بينكم برای فيما لم ينزل على -

যেসব বিষয়ে অহী নাযিল হয় না, তোমাদের মধ্যে সেইসব বিষয়গুলোর ফয়সালা আমি নিজের বুঝ অনুযায়ী করি।

রাসূল (স) পৃথিবীতে যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তা সর্বশেষ এবং চিরন্তন। এই রকম শেষ এবং চিরস্থায়ী শরীয়তের জন্য এটাই প্রয়োজন ছিল যে তা শরীয়তের মৌলিক বিধানসমূহের ওপর বেশি গুরুত্ব দেবে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ কিতাব কুরআন মজীদকে সামগ্রিক বিধি-বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং অনুসঙ্গ এবং খুঁটিনাটির জন্য তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে এমন সব ইশারা-ইঙ্গিত রেখেছেন, যাদের সাহায্যে সেইসব অন্তর যা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আলোকিত এবং বিধাতার অনুগ্রহে যাদের চেতনাগুলো সমস্ত সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে ভাবতে পারবে, তারা যুগ বা কালের প্রেক্ষিত অনুযায়ী সেইসব অনুসঙ্গের ব্যাখ্যা দেবে।

আমাদের জন্য সর্বপ্রথম অনুসরণীয়, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষণে বিকশিত জীবন, মানবতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম— তাঁর মতামত, তাঁর বক্তব্যসমূহ, তাঁর কর্ম প্রক্রিয়া— যে কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত সংরক্ষিত। যেহেতু তা চির অনুস্মরণীয় একারণে ঐ অবস্থানের যে কোন পর্যায়েই সব রকম দোষ থেকে মুক্ত। অতঃপর তাঁর মহাপ্রয়ানের পরে ঐ মর্যাদা খোলাফায়ে রাশেদুন এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং যুগ পরম্পরার আল্লাহ্ নিবেদিত প্রাণ— জ্ঞানী, মনীষী এবং আলেমগণ পেয়ে এসেছেন এবং পেতে থাকবেন। এরই সংশোধিত নাম 'ইজতিহাদ'।

কিন্তু সবার ওপরে এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সর্বপ্রথম ফরয হলো, রাসূল (স)-এর শুদ্ধ বাণীসমূহ এবং তাঁর কর্ম প্রকাশের বাস্তব চিত্র আমাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করে উদ্ঘাটন করতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের চেতনায় ধরে রাখতে হবে।

ومن يطع الرسول فقد اطاع اللّه -

যে রাসূলের অনুসরণ করলো সে আল্লাহ্রই অনুসরণ করলো।

হযরত শাফেয়ী (রহ)-এর সুনির্দিষ্ট দশটি নীতির হাদীস ও কুরআনী ব্যাখ্যা তাঁরই রচনাবলী থেকে নেয়া হয়েছে। ('কিতাবুল উম' ৭ম খণ্ড)।

শুদ্ধ হাদীস চেনার নীতি নির্ধারণের আগে তিনি যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যেমন, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব ছাড়া মুরসাল বর্ণনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় এবং মওকুফ মুতাআল্লাক মুনকাতে বর্ণনাসমূহ শুদ্ধ মুত্তাসাল হাদীসের বিপরীতে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব রাখে না। বিষয়টির অল্প বিস্তর ব্যাখ্যা এখানে প্রয়োজন, কারণ এ ব্যাপারটা পাঠকের কাছে পরিষ্কার হলে শুদ্ধ হাদীসের সাথে পরিচিতি লাভের পথে বড় কোনো বাধা আর থাকবে না।

www.pathagar.com

হাদীসের আলোচনা, অনুসন্ধান, পরিভাষা ও পর্যায়

'মুরসাল' তাকে বলে, বর্ণনাকারী রাসূল (স)-এর 'কথা বা কাজ' বর্ণনা করে বর্ণনা পরম্পরাকে 'তাবেয়ী' পর্যন্ত নিয়ে শেষ করে দিয়েছেন। সাহাবাগণের কারো নাম নেয়া হয়নি।

'মুরসালে খফী' তাকে বলা হয় যা এমন এক সাহাবী বর্ণনা করছেন যিনি রাসূল (স)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন কিন্তু তাঁর কোনো বর্ণনা শুনেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং তিনি অন্য কোনো সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণনা করছেন অথচ তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।

المرسل هوما سقط عن اخره من النابعى وصورته ان يقول التّابعى سواء كان كبيرا اوصغيراً قَال رَسُولَ اللّه صلى اللّه عليه وصلم كَذَا اوفعل كذا اوفعل بحضرته اونحوذلك وانما ذكر فى القسم المردودوللجهل بحال المحذوف لانه يحتمل ان يكون تابعيا وعلى الثانى يحتمل ان يكون ثقة ويحتمل ان يكون حمل عن صحابى ويحتمل ان ركون حمل عن تابعى اخر -

অর্থাৎ মুরসালের পরিচয় এই যে, তাবেয়ীর ওপরে বর্ণনাকারীর উল্লেখ নেই। ব্যাপারটা এ রকম যে, 'তাবেয়ী', তা সে যতো বড়ই হোক (যেমন কায়েস বিন আবী হাযেম এবং হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব) অথবা ছোট (যেমন ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আনসারী) এটা বলে দিলো যে, রাসূল (স) এরকম বলেছেন, এ রকম করেছেন অথবা তাঁর উপস্থিতিতে এরকম হয়েছে অথবা এ ধরনের কোনো কথা বলেছেন। মুরসালের আলোচনা 'খণ্ডনকৃত অথবা সনদ বর্জিত' প্রসঙ্গে এজন্য করা হচ্ছে যে, যে সর্বশেষ বর্ণনাকারীর নাম বাদ দেয়া হয়েছে তার অবস্থা অস্পষ্ট। এর ফলে কয়েকটি সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে। যেমন ঃ তিনি হয়তো সাহাবী হতে পারেন অথবা তাবেয়ী হতে পারেন। যদি তাবেয়ী হন তাহলে নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য এ প্রশ্ন উদয় হবে। নির্ভরযোগ্য হলেও এ প্রশ্ন থেকে যায়, সম্ভবত তিনি কোনো সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন অথবা সমসাময়িক কোনো তাবেয়ীর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

ইমাম হাকেম বলছেন ঃ

النوع الثامن من هذا العلم معرفة المراسيل المختلف فى الا حتجاج بهاوهذا نوع من علم الحديث صعب قل ما يهتدى اليه الا المتبحر فى

১. নুখবাতুল ফিক্‌র, হাজার আসকালানি।

www.pathagar.com

هذا العلم فان مشائخ الحديث لم يختلفو فى ان الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدّث باسانيد متصلة الى التابعى فيقول التابعى قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم واكثر ماتروى المراسيل من اهل المدينة عن سعيد بن المسيب ومن اهل مكة عن عطاء بن ابى رباح ومن مصر عن سعيد بن ابى هلال ومن اهل الشام عن مكحول الدمشقى ومن اهل البصرة عن الحسن بن ابى الحسن ومن اهل الكوفة عن ابراهيم بن يزيد النخعى واصحهامرا سيل سعيد بن المسيب والدليل عليه ان سعيدا من اولا دالصحابة واباه المسيب بن حذن من اصحاب الشجرة وبيعة الرضوان وقد ادرك سعيد عمر وعثمان عليا وطلحة وابلزبير الى اخرا العشرة المبشرة وليس فى جماعة التابعين من ادركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن ابى حازم ثم مع هذا انسانه فقيه اهل الحجازومفتيهم واول من فقهاء السبعة الذيْن يعد مالك بن انس اجما عهم كافة الناس سمعت ابا العباس محمدبن يعقوب يقول سمعت العباس الددرى - يقول سمعت يحيى بن معين يقول اصح امرا سيل سعيد بن المسيب واليضًا فقد تامل الائمه المتقد مون مراسيله فوجدوها صحيحة وهذه الشرائط لم توجد فى مرا سيل غيره فهذه صفة المرسيل عند اهل الحد يث وقال الحاكم بسند الى يزيد بن هارون يقول قلت لحماد بن ذيديا اباسمعيل هل ذكراللّه اصحاب الحديث فى القران فقال بلى الم تسمع الى قول اللّه ليتفقهوا فى الدين ولينذرواقومهم اذارجعوا اليهم لعلهم يخذرون فهذ فى من رجل فى طلب العلم ثم رجعب الى من را ءه ليعلمهم اياه قال الحاكم ففى هذا النص دليل على ان العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل هذا امن كتاب اللّه واما من السنة فحدثنا ابو جعفر محمد بن

علی بن وحیم الشیبا فی ثنا احمدبن حازم بن بی غرزة ثناضراربن صروثنا ابوبکر بن عیاش عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الاسدی عن سعید بن جبیر عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم -

এই শাস্ত্রের অষ্টম প্রকার 'মুরসাল'কে জানতে হবে। যার মাধ্যমে যুক্তি প্রদানে বিতর্ক রয়েছে। এই ধরনটি হাদীস শাস্ত্রের এমন একটা জটিল বিষয় যার অবস্থান নির্ণয় অথবা তার আসল পরিচয় বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমদের পক্ষেই জানা সম্ভব। মাশায়েখে হাদীসগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, মুরসাল বর্ণনা তাকে বলে যাকে মুহাদ্দিস সনদসহ ধারাবাহিকভাবে তাবেয়ী পর্যন্ত বর্ণনা করবে এবং তাবেয়ী বলবে যে, রাসূল (স) এই রকম বলেছেন। অধিকাংশ মুরসাল বর্ণনাসমূহ মদীনার পণ্ডিতদের মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, মক্কার আতা বিন আবী রাবাহ্, মিশরের সাইদ বিন আবী হালাল, শামের মাকহোল দামেস্কী, বসরার হাসান ইবনে আবী আল হাসান এবং কুফার ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ নখয়ী (রহ) বর্ণনা করেন। এইসব মুরসাল বর্ণনাসমূহের মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের বর্ণনাগুলো বেশি শুদ্ধ হয়ে থাকে। তার কারণ, হযরত সাঈদ একজন সাহাবীর সন্তান। তাঁর পিতা মুসাইয়্যিব বিন হাযান "বাইয়াতে রেদওয়ানের" সদস্য ছিলেন এবং তিনি হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরসহ আশআরায়ে মুবাশ্বারার সম্মানিত সাহাবাগণের সঙ্গ-সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষা পেয়েছেন। তাবেয়ীগণের মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব ও কায়েস বিন আবী হাযেম (রহ) ছাড়া আর এমন কেউ নেই যে সরাসরি প্রথম স্তরের সাহাবাগণের কাছে এইভাবে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি হিজাযের ফকীহ ও মুফতি ছিলেন এবং মদীনার সর্বোচ্চ স্তরের সাতজন আলেম নিয়ে যে 'ফুকাহায়ে সাব'আ' ফকীহ্ সপ্তক গঠিত হয়েছিল তিনি তাদের নেতা ছিলেন। ইমাম মালিক বলেন, মদীনার ফকীহ্ সপ্তকের সম্মিলনটা এমন ছিল যেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখপাত্র। অর্থাৎ যে কোনো ব্যাপারেই একমত। আমি আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াকুবের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি আব্বাস দাদ্রী এবং তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈনকে বলতে শুনেছেন যে, সকল মুরসাল বর্ণনার মধ্যে শুদ্ধতম বর্ণনাগুলো হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের।

এর আরও একটি কারণ হলো, পূর্বসূরী ইমামগণ তাঁর মুরসাল বর্ণনাগুলোকে নিয়ে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন। তারা তাঁর সনদসমূহ সংহত এবং সাযুয্যপূর্ণ পেয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো মুরসাল বর্ণনায় পাওয়া যায় না। হাদীস বিজ্ঞানীদের কাছে মুরসালের এটাই পরিচয়।

ইমাম হাকেম আরও বলেন, ইয়াযিদ বিন হারুন হামাদ বিন যায়দের কাছে প্রশ্ন করলেন, হে আবু ইসমাঈল! হাদীস বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে কিছু বলা আছে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে তো! কেন, তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার সেই ইরশাদ শোননি ? "যেন তাঁর দ্বীনকে উত্তমরূপে অনুধাবন করে, ফিরে গিয়ে নিজের জাতিকে বুঝায় যেন তারা ভয়

পায়"। তা হলে এই ফরমান এমন ব্যক্তিবর্গের জন্যই কার্যকর যে জ্ঞান সন্ধানে সফর করে এবং জেনে নিয়ে তা আবার তার অঞ্চলের জনগণকে জানায় এবং শেখায়।

হাকেম আরও বলেন, কুরআনের এই উদ্ধৃতি দিয়ে এই দলিল প্রতিষ্ঠিত হলো যে, জ্ঞান তা-ই গ্রহণযোগ্য যা শুনে হুবহু বর্ণনা করালো। সেটা নয় তাকে মুরসাল হলো। এতো গেল কুরআনী দলিল। এবার হাদীসের বর্ণনা সাঈদ বিন জাবীরের মাধ্যমে এই যে, তার কাছে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে যেভাবে শুনেছ ঠিক সেভাবেই অন্যেরা তোমাদের থেকে শুনবে। এরপর তাদের থেকে তারা শুনবে যারা তোমাদের থেকে শুনে থাকবে! এজন্য সনদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মওকুফ, মুনকাতে' ও মুতাআল্লাক হাদীস

যে হাদীসের মূল পাঠ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং সাহাবীর বেলায় এটা প্রমাণিত নয় যে, তিনি তা রাসূল (স) থেকে শুনেছেন কি না! তাকে 'মওকুফ' বলা হয়।[১]

যদি বর্ণনা পরম্পরায় দুই অথবা তার বেশি মাধ্যম ছুটে যায় তাকে 'মো'দেল' বলা হয়। অভিধানে 'মো'দেল' অর্থ বিভ্রান্তিকর। যা বিবেচনার অযোগ্য। তবে যদি বর্ণনাকারীর বর্ণনা বিক্ষিপ্তভাবে ছোটে, অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে না ছোটে তাহলে তাকে 'মুনকাতে' বলে।

ইমাম হাকেম-মা'রেফাতু উলুমে হাদীসের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

النوع التاسع من هذا العلم معرفة المنقطع من الحديث وهوغير المرسل وقلّ مايو جد فى الحفاظيميز بينهما والمنقطع على ثلا ثة افسام فمنها ماحد ثناه ابو عمر وعثمان بن احمد بيغداد ثناايوب بن سليمان السعدى ثنا عبد العزيز بن موسى ثناهلال بن حق عن الجريرى عن ابى العلاء وهوا بن الشخير عن رجلين من بنى حنظلة عن شدّادبن اوس قال كان رسول الله صلعم يعلم احدنا ان يقول فى صلاته -

এই শাস্ত্রের নবম প্রকার 'হাদীসে মুনকাতে'কে চিনতে হবে এবং এগুলো মুরসাল হাদীস ছাড়া অন্যান্য। হাদীসের হাফেযদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব খুব কমই রয়েছেন যারা মুরসাল ও মুনকাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন। মুনকাতে'র আবার তিনটি ধরন রয়েছে। তার একটা উদাহরণ এভাবে দেয়া যায় যে, আবু উমর এবং আবু উসমান বিন আহমাদ বাগদাদে বসে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আইয়ুব বিন সুলাইমান সো'দী, তার থেকে আবদুল আযিয বিন মূসা, তার থেকে হালাল বিন হাক্ক, সে হারিরী থেকে, সে আবুল আলা' ইবনে শাখীতার থেকে, সে বনী হানজালাহ্র দুই ব্যক্তি থেকে, সেই দু'জন শাদ্দাদ বিন আওস থেকে, যে রাসূল (স) আমাকে এই দো'আ শিখিয়েছেন যেন নামাযে আমি এটা পড়ি।

১. নুখবাতুল ফিক্র।

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ التَّثَبُّتَ فِىْ الاُمُوْرِ وَعَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَاَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنُ عِبَادَتِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَعْلَمُ وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَعْلَمُ -

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সকল কাজে-কর্মে নির্ভরতা কামনা করছি, হেদায়েতের দৃঢ়তায় ওপর। আর আমি তোমার কাছে নিরাপদ অন্তর, সত্যবাদী জিহ্বার প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার কাছে আরও চাচ্ছি তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা, তোমার ইবাদতের সাবলিলতার প্রতি। আর আমি ক্ষমা প্রার্থনা করেছি সেই সব বিষয়ের যা তুমি জান। আর আশ্রয় চাচ্ছি সেসকল খারাপ বিষয় থেকে যা তুমি জান আর আমি তোমার কাছে সে কল্যাণ কামনা করছি যে সম্বন্ধে জান।

قالَ الحاكم هذ الاسنادمثل لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين ابى العلاء بن الشخير واشداد بن اوس وشواهده فى الحديث كثيرةٌ -

হাকেম বলছেন এই সনদে ইন্‌কেতা (বিচ্ছিন্নতা) এভাবে আছে যে, দু'জন লোক যারা ইবনে শাখীর এবং হযরত শাদ্দাদ বিন আওসের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী তাদের অবস্থা অজ্ঞাত এবং এ ধরনের উদাহরণ হাদীস সমগ্রের মধ্যে বহু দেখা যায়।

মুনকাতের দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন ঃ

حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنى يحيى بن ابى طالب ثنا على بن عاصه عن داؤد بن ابى هند قال نزلت جزيرة قيس فسمعت شيخا- اعمى يقاله ابو غمر يقول سمعت اباهريرة رض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور فمن ادرك ذالك الزمان فليتخير العجز على الفجور قال الحاكم فهل النوع من المنقطع الذى لايقف عليه الاالحافظ الفهم المتبحر فى الصنعة وله شواهد كثيرة جعلت هذا الواحد مشاهدالها -

আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর থেকে ইয়াহ্ইয়া বিন আবী তালিব, তাঁর থেকে আলী বিন আসেম, তিনি দাঊদ বিন আবী হিন্দ থেকে, তিনি বলছেন আমি যখন 'জাজিরায়ে কায়েস' এ নেমে দাঁড়ালাম তখন সেখানে একজন অন্ধ বুড়ো মানুষ যাকে লোকেরা আবু উমর বলে সম্বোধন করছিল, তাকে এটা বলতে শুনেছি যে, তিনি আবু হোরায়রাহ (রা) থেকে শুনেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের সামনে একটা সময় এমন আসবে যে তাকে দুর্বল নির্জীব হয়ে থাকতে হবে নতুবা আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্রোহাত্মক পথ অবলম্বন করতে হবে। এই জন্য, যে ব্যক্তি এই রকম

www.pathagar.com

সময়ের মুখোমুখী হবে সে যেন নাফরমানীর পথ অবলম্বন না করে দুর্বল হয়ে থাকাটাই গ্রহণ করে। এই বর্ণনায় অন্ধ বৃদ্ধ শায়খকে আবু উমরের একটা উড়ো নাম দেয়া হয়েছে এছাড়া তার আর কোন পরিচয় নেই। ইমাম হাকেম বলছেন, এটাই মুনকাতের (তথ্য বিচ্ছিন্ন), এমন উদাহরণ যাকে অনেক বড় হাদীস বিজ্ঞানী এবং বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশেষজ্ঞের পক্ষেই চেনা সম্ভব। এ রকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যার মধ্য থেকে এখানে মাত্র একটাকে উপস্থাপন করা হলো।

তৃতীয় উদাহরণ ঃ

حدثنا ابوالنصر محمد بن محمد ن يوسف الفقيه حدثنا محمد بن يسليمان الحضرمى حدثنا محمد بن سهل ثنا عبد الرزاق قال ذكر الثورى عن ابى اسحق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وليتمو هاابابكر فقوى امين لاتاخذه فى الله لومة لائم وان وليتموها عليا فهاد مهدى يقيمكم على طريق مستقيم - قال الحاكم هذا لاسناد لايتامله احد الاعلم اتصاله وسنده فان الحضرمى محمدبن سهيل ثقتان وسما وعبد الرزاق من سفيان التورى واشتهاره به معروف وكذ لك سماع الغوفى من ابى اسخق واشتهارهبه معروف وفيه انقطاع فى مرضعين فان عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى والثورى لم يسمعه من ابى اسحق -

আমার কাছে আবু নসর মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ফকীহ্ বর্ণনা করেছেন যে, তার কাছে মুহাম্মদ বিন হায্‌রামী, তাঁর কাছে মুহাম্মদ বিন সহল এবং তাঁর কাছে আবদুর রাজ্জাক বলেছেন যে, ছাওরী আলোচনা করছিলেন যে, আবু ইসহাক থেকে তিনি যায়দ বিন ইয়াছী থেকে, তিনি হুযাইফাহ থেকে যে, রাসূল (স) খিলাফতের ব্যাপারে বলেছেন, যদি তোমরা আবু বকরকে খলিফা নিযুক্ত করো তাহলে সে শক্তিশালী এবং নিরাপদ ও বিশ্বস্ত হবে। আল্লাহ্‌র বিধান পূর্ণ করার ব্যাপারে কোনো সমালোচকের পরোয়া করবে না। এবং তোমরা যদি আলীকে খলিফা নিযুক্ত করো তাহলে সে যেমন হেদায়েত প্রাপ্ত তেমনি হেদায়েতকারীও বটে। তোমাদেরকে সে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

হাকেম বলছেন, যখন এই বর্ণনাটির উপরে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি আরোপ করা হবে তখন বাহ্যিকভাবে একে ধারাবাহিক সনদ সম্বলিত দেখা যাবে। এ কারণে যে, মুহাম্মদ বিন সহল এবং হাযরামী দু'জনেই অত্যন্ত আস্থাভাজন এবং সুফিয়ান সাওরী থেকে আবদুর রাজ্জাকের 'শ্রবণ' ব্যাপারটা বিখ্যাত এবং সর্বজনবিদিত। এভাবেই সুফিয়ান সাওরীর আবদুর রাজ্জাককে বর্ণনার ব্যাপারটাও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই বর্ণনাটিতে দু'টি জায়গায় বিচ্ছিন্নতা

www.pathagar.com

রয়েছে। এই বর্ণনাটি আবদুর রাজ্জাক এভাবেই বর্ণনা করতেন না যে, তিনি সুফিয়ান সাওরীর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন অথবা তার থেকে তিনি নিজে শুনেছেন। না সুফিয়ান সাওরী এটা বলছেন যে, তিনি আবু ইসহাকের কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করছেন। এটা এমন 'ফিকহী' দুর্বলতা যার ওপরে মুহাদ্দিসদের দৃষ্টি দেয়া উচিত!

'মুআল্লাক' বর্ণনার ব্যাখ্যা হাফেয ইবনে হাজার (রহ) তাঁর 'নাখবাতাল ফিকরে' এভাবে দিয়েছেন।

ومن صودة المعلق ان يحذن جميع السند ويقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمنها ان يحذن الالصحابى اوالا التابعى والصحابى معاء ومنها ان يحذن من حديثه ويضيفه الى من فوقه قان كان من فو قه شيخا الذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى لتغليقاء اولاداالصحيح فى هذا التفصيل ان عرف بالنص والاستقراء ان فاعل ذلك مدلس قضى به والافتعليق -

মুআল্লাকের ধরনটা এরকম যে, প্রথম বর্ণনাকারী সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীদের উহ্য রেখে নিজেই বলে দিচ্ছে যে, রাসূল (স) এই কথা বলেছেন। আর একটা অবস্থা এরকম যে, সনদের মধ্যে শুধুমাত্র সাহাবীর নাম নেয়া হবে এবং বাদবাকী উহ্য থাকবে। অথবা তাবেয়ী এবং সাহাবীকে রেখে দেয়া হবে, অন্যান্যরা উহ্য থাকবে।

একটা রূপ এমনো হয় যে, 'মুআল্লাক'কারী তার শায়খকে উহ্য রাখে এবং শায়খের শায়খকে নামসহ প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় দেখা যাবে যে, তাঁর বর্ণনাকারীর সাথে কখনো হয়তো দেখা হয়েছে। এরকম অবস্থায় ঐ বর্ণনাটিকে মুআল্লাক (ঝুলন্ত) বলা উচিত, না উচিত না।

বস্তুতঃ মূল কথা এই যে, যদি হাদীসের ইমামগণের মধ্যে কারো বিবৃতি পাওয়া যায় অথবা পরিপূর্ণ অনুসন্ধানে এটা খুঁজে পাওয়া যায় যে, এই রকম কর্ম সম্পাদনকারী প্রতারক তাহলে তার ওপর প্রতারণার দোষ আরোপ করতে হবে। না হলে এরকম বর্ণনা মুআল্লাকই থেকে যাবে।

প্রতারণা ও প্রতারকের ব্যাখ্যা

সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে এতোটা সতর্কতা ছিল যে, তাদের .থম শ্রেণীর মুহাদ্দিসগণ যতোদূর সম্ভব নবী (স) উচ্চারিত শব্দসমূহের অবিকল পুনরাবৃত্তি জরুরী মনে করতেন। তবে যদি ভাব সম্বলিত বর্ণনাও করতেন তাহলে রাসূল (স) ঠিক যা যতোটুকু বোঝাতে চেয়েছেন তার সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশের এতোটুকু ক্ষুণ্ন হতে দিতেন না। তাঁরা কতোগুলো মূলনীতি মেনে চলতেন।

كفى بالمرء كذبان يحدث بكل ماسمع -

www.pathagar.com

মানুষের মিথ্যাবাদী হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যে-কোনো শোনা কথাকে বিচার-বিশ্লেষণ না করেই বলে দেয়া।

من كذب على معتمداً فليتبوأ مقعده فى النار –

যে জেনেশুনে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থায়ী বাসস্থান তৈরী করে নিলো।

একারণে যা নয় তা বলার মতো দুঃসাহসিক ভাবনাও তাদের মনে স্থান পেতো না।

এর পরেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন। স্বৈরাচার, স্বৈরাচারীর একগুঁয়ে ব্যক্তিত্বের প্রভাব, জবরদস্তি অর্থাৎ এমন সব অবস্থার উদ্ভব হতে লাগলো যাতে মিথ্যাকে বিভিন্নরূপে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার নিতান্ত সাধারণ একটা রূপ 'তাদলিস'। অর্থাৎ কোন দুর্বল মিথুক সন্দেহপূর্ণ ব্যক্তির নামকে আড়াল করে এবং মূল বর্ণনার কিছু কথা কমিয়ে কিছু কথা বাড়িয়ে অথবা নিজেদের মতলবের প্রতিকূলে কিছু কথাকে বেমালুম চেপে গিয়ে বর্ণনা করে দেয়াই 'তাদলিস' বা প্রতারণা।

সলফে সালেহীন যখন দরস দিতেন তখন সনদসহ প্রতিটি বর্ণনা আলোচনা করতেন। কিন্তু তাঁরা যখন সাধারণ ইলমী আলোচনা বা জনসমাবেশে বক্তৃতা-ভাষণ দিতেন, তখন সাধারণত সনদ উহ্যই থাকতো। এই পদ্ধতি বা প্রচলনটা ততোটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল না। তবুও মুহাদ্দিসীন সুনিপুন দক্ষতার সাথে সেই মর্যাদাবান তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনগণের নামসমূহ খুঁজে বের করে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই চমৎকার রীতিটি দেখে দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী অসাবধান অধার্মিক কিছু লোক তাকে অনুসরণ করে অনধিকার চর্চা করেছে। ফলে মুহাদ্দিসীন বাধ্য হয়েছেন এর গোমর ফাঁস করে দিতে।

وهو ان اهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالى ليس التدليس من مذهبهم وكذلك اهل خراسان والجبال واصبهان وبلاد فارس وخوذستان وما دراء النهر لايعلم من ائمتهم من ولسو اواكثر المحدثين تدليسا اهلا الكوفة ونفر يسير من اهل البصرة –

অর্থাৎ হিজায, হারামাইন (মক্কা-মদীনা), মিশরে ও আশপাশের অঞ্চলসমূহের দ্বীন চর্চাকারীদের মধ্যে এই প্রতারণামূলক নিয়মের প্রচলন ছিল না। একইভাবে খুরাসান, আল জিবল, ইসফাহান, পারস্য দেশগুলো, খোজেস্তান এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের ছোট-বড় মুহাদ্দিসীনদের সম্পর্কেও এই ধরনের প্রতারণামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বেশিরভাগ কুফা'র মুহাদ্দিসীন এবং বসরার কিছু মহাদ্দিসীনের মধ্যে এই ধরনের চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১]

ইমাম হাকেম তাঁর 'উলূমে হাদীসের' ১০৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

---

১. তাওজীহুস্ নাযার ইলা উসূলিল আছার

www.pathagar.com

اخبرنا ابو عبد الله محمدبن احمد قال حدثنا محمدبن عبد الله قال حدثنا سليمان بن داؤ دالمنقرى قال سمعت عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابنه قال التدليس ذل - قال سليمان التدليس والغش والغروروالخدع والكذب يحشر يوم تبلى السرائر فى نفاذواحد -

আমার কাছে আবু আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ, তাঁর কাছে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্, তাঁর কাছে সুলাইমান বিন দাউদ মুনকারী, তিনি বলছিলেন যে, আমি আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারেস থেকে শুনেছি এবং তিনি তার পিতা আবদুল ওয়ারেসের বলা কথা পুনরুল্লেখ করে বলতেন, প্রতারণা অত্যন্ত হীন কাজ। ধোঁকা, অহংকার, মিথ্যা ষড়যন্ত্র কিয়ামতের দিন সব আড়াল মুক্ত হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তখন সব একই পরিণতির সম্মুখীন হবে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) 'তবকাত আল মুদাল্লেসীন' নামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একখানি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যা মিশরে এখনও সহজলভ্য। সেই পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন— প্রতারকদের পাঁচটি শ্রেণী। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিত্বগণ অত্যন্ত উঁচুমানের আস্থাভাজন এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাদের রীতি ছিল দরসের মজলিস ছাড়া অন্যত্র সনদ ছাড়াই বর্ণনা করতেন। (একথাও ওপরে আমরা বিস্তারিত বলে এসেছি।)

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিত্বগণ, যাদের দ্বারা ব্যাপারটা বেশি চর্চিত হয়েছে। হাদীসের ইমামগণ ততোক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের শোনা কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করতেন। তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের বর্ণনা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমনো আছে যাদের বর্ণনাসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করলে পরে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে যেমন— আবী যুবায়ের মক্কী।

চতুর্থ শ্রেণী এমন যাদের সম্পর্কে মুহাদ্দিসীন সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যে, যেহেতু তারা দুর্বল ও অজ্ঞাত লোকদের নাম দিয়ে প্রতারণা করে, এজন্য তারা যতোক্ষণ পর্যন্ত শ্রুত হাদীসের ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করতে না পারবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোনো বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

পঞ্চম শ্রেণীতে যারা পড়েছেন তারা এই প্রতারণার দোষ ছাড়াও অন্যান্য দুর্বলতার দোষেও দুষ্ট। এরকম লোকেরা সঠিক সনদসহ বিস্তারিত বর্ণনা করলেও তাদের বর্ণনা 'বাতিল' বলে গণ্য হবে। তবে যার মধ্যে দুর্বলতার কারণগুলো খুব সামান্য পরিমাণ হবে যেমন ঃ 'ইবনে লাহিয়া'। তাকে এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ধরা যেতে পারে এইজন্য যে, তার অন্যান্য কারণগুলো সমর্থনযোগ্য।

এরপরে হাফেয সাহেব বলেন, প্রতারণা কখনো সনদের ক্ষেত্রে হয়েছে কখনো হয়েছে শায়খগণের ক্ষেত্রে। এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটি অভিজ্ঞ হাদীস বিশেষজ্ঞের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। কেননা তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীগণের জন্ম সন মৃত্যু সন অথবা যে শতাব্দীতে তারা বিরাজিত ছিলেন এবং তাদের সমসায়িকদের সার্বিক অবস্থা খুব ভাল করেই জানতেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ শ্রেণীর বারজন বিখ্যাত প্রতারক

১. বকীয়াহ্ বিন অলীদ ঃ আবু মুহাম্মদ তাঁর ডাক নাম! হামিরী কালাঈ তাইমী আনছী, এসব তার সম্বন্ধ বিশেষণ। আবু ইসহাক জাওযুজানি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা 'বাকীয়ার' ওপরে রহম করুন, সে যখন বর্ণনার কল্পকাহিনী বলে তখন তার বিবেচনায় এটা থাকে না যে, সে কি এবং কার সূত্রে বর্ণনা করছে। যখন নির্ভরযোগ্য সত্রে বর্ণনা করে তখন সে বর্ণনা সঠিক হয়।

হাদীসের ইমামগণের ফনয়সালা যে, সে যখন আখবারনা, হাদ্দসনা, আম্বাআনা বলে শুরু করেন তখন সেই বর্ণনাসমূহ শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখনই সে 'আন' বললো তখন আর তার সনদ শুদ্ধ নয় বলে ধরে নিতে হবে। কেননা সে অজ্ঞাতনামা এবং ভুল ব্যক্তিত্বদের নামে প্রতারণা করে। সহীহ্ মুসলিমে তার থেকে একটি মাত্র বর্ণনা নেয়া হয়েছে যা শুদ্ধ বলে প্রমাণিত। মুদার বিন মুহাম্মদ বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈনের কাছে বাকীয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু তার বর্ণনার ব্যাপারে এই শর্ত অবশ্যই আরোপ করতে হবে যে, সে যেন প্রখ্যাত এবং সর্বজনবিদিত মাশায়েখগণের থেকে বর্ণনা করে, তাহলে তা ঠিক হবে। তা না হলে তার বর্ণনায় এমন কিছু শায়েখের উল্লেখ থাকে যাদের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় না। ১৯৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. হাজ্জায বিন আরতাত ঃ বিখ্যাত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। মুহাদ্দিসীন বলেন, তার মধ্যে মারাত্মক অহংকার ছিল। মসজিদে আসতো না। বলতো, কুলি-মজুর মুদিওয়ালাদের ভিড়ে আমি কি করতে আসবো ? ইমাম আহমাদ ও ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন তার বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে এও বলতেন যে, তার মধ্যে ত্রুটি গোপন করার দোষ ছিল এবং প্রায় ৬০০ বর্ণনা সেই ত্রুটিপূর্ণভাবেই তার কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আছমায়ী বলেন, বসরার কাজীদের মধ্যে শুধু সেই-ই ঘুষ নিয়েছে। আবদুল্লাহ্ বিন ইদরিস বলেন, হাজ্জায বিন আরতাত নিজেই নিজের কাপড় ধুয়ে নিতো, কিন্তু যখন মেহদীর দরবার থেকে ফিরে এল তখন আসার পথে চল্লিশটি উটের পিঠে বোঝাই করা ছিল তার মালপত্র।[১]

৩. হামিদ বিন রবী বিন হামিদ বিন মালিক বিন শাহীম আবুল হাসান নাখমী কুফী ঃ ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন বলেন, আমাদের আমলে চার মিথ্যুক ছিল। হুসাইন বিন আবদুল আউয়াল, আবু হিশাম রিফায়ী, হামিদ বিন রবী, কাসেম বিন আবী শাইবা। ইবনে আদি বলেন, এরা হাদীস চুরি করতো। মওকুফ বর্ণনাকে 'মরফু' করে দিতো। এরা বিখ্যাত প্রতারক ছিল।[২]

৪. সাওঈদ বিন সাঈদ আল হাদসানী ঃ শেষ জীবনে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্মরণশক্তিও কমে গিয়েছিল। এই বয়সের যে কোনো বর্ণনা বিবেচনা করার মতো নয়। যৌবনে ঠিক ছিল। বার্ধক্যে এসে প্রতারণা করতো।

১. মীযানুল ইতেদাল, যুহ্বী
২. মীযান

www.pathagar.com

৫. এবাদ বিন মনসুর নাজী বসরী ঃ বসরার কাজী ছিল। শ্রদ্ধা করার মতো ঈমান রাখতো, কিন্তু ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারী পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, সে দুর্বল বর্ণনাকারীদের নাম গোপন করায় অভ্যস্ত ছিল।[১]

৬. আতিয়া বিন সাঈদ কুফী ঃ বিখ্যাত তাবেয়ী, কিন্তু প্রতারণার ক্ষেত্রেও বিখ্যাত ছিল।[২]

৭. মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার মুতাল্লেবী মাদানী বীর যোদ্ধা ছিলেন ইমাম ইবনে শিহাব যুহরীর শিষ্য। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী বিন মাদিনীঃ বলেন, মানুষটা অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের। তার বর্ণনাও শুদ্ধ, কিন্তু মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত হন। আল্লামা যুহরী মিজানে লিখেছেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক। ব্যক্তিগতভাবে নিষ্ঠাবান ধার্মিক এবং সত্যবাদী। কিন্তু যেসব বর্ণনাসমূহ তিনি স্বতন্ত্রভাবে নিজে করেন সেসবের মধ্যে স্মৃতিভ্রমের কারণে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েই যায়। হাফেয ইবনে হাজার ইমাম আহমাদের বরাত দিয়ে বলেন, তিনি দুর্বল এবং অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীদের ব্যবহার করতেন।

* মুহাদ্দিসীনদের ফয়সালা এই যে, সে প্রতারক ছিল।[৩]

৮. মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন কাসেম ছামীই দামেস্কী ঃ এরকম প্রতারণা সেও করতো।

৯. ইয়াকুব বিন আতা বিন আবী রাবাহ ঃ তাকে ইমাম আহমাদ, ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন এবং আবু হাতেম প্রমুখ দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং সেও প্রতারণা করতো বলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

১০. উমর বিন আলী আল মাকদানী ঃ বিখ্যাত তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। মুহাদ্দিসীন তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে 'হাদ্দাসনা', 'আখবারনা', ও আম্বাআনা না বলে ততোক্ষণ তার কোনো বর্ণনা বিবেচনায় আনা যাবে না।

১১. অলীদ বিন মুসলিম দামেস্কী ঃ অনেক বড় ইমাম, আবেদ, যাহেদ বটে কিন্তু প্রতারণার বেলায়ও তিনি বিখ্যাত মশহুর।

১২. ঈসা বিন মূসা আল বুখারী ঃ ব্যক্তিগতভাবে তার সত্যবাদিতায় কারো কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রায় একশজন অজ্ঞাত পরিচয় লোকদের বর্ণনা চর্চা করেন। হাফেয বিন হাজার (রহ) বলেন, এই শ্রেণীর বারজন ত্রুটি গোপনকারী রয়েছেন। তাদের বর্ণনাসমূহ তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তাদের বর্ণনায় সুস্পষ্ট শুদ্ধ সনদ পাওয়া যাবে।

এবার পঞ্চম শ্রেণীর ২৪ জন বিখ্যাত ত্রুটি গোপনকারীর বিবরণ ঃ

১. ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ আবী ইয়াহ্ইয়া আসলামী ঃ বরেণ্য মুহাদ্দিসীন সম্মিলিতভাবে তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম শাফেয়ীর (রহ) ও ইমাম আহমাদ তাকে ত্রুটি গোপনকারী প্রতারক বলেছেন।

২. ইসমাঈল বিন আবী খলিফা আবু ইসরাঈল আল মালায়ী ঃ তিরমিযী তাকে প্রতারক বলেছেন।

৩. বশীর বিন যাযান ঃ দারেকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন এবং হাদীস বর্ণনায় প্রতারক হিসেবে বিখ্যাত।

৪. তালিদ বিন সুলাইমান মুহারাবী কুফী ঃ ইমাম আহমাদ, আজ্লী ও দারে কুতনী প্রমুখ তাকে প্রতারক বলেছেন।

---

১. মীযান। ২. মীযান। ৩. লিসানুল মীযান।

www.pathagar.com

৫. হেসান বিন ইয়াযিদ জা'ফী কুফী ঃ ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও আজলী তাকে প্রতারক বলেছেন।

৬. হাসান বিন আমারাহ্ কুফী ঃ আবু মুহাম্মদ ফকীহ্ এবং জামহুর তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার ব্যাপারে সমস্যা হলো তিনি প্রতারণাও করেন।

৭. হুসাইন আতা বিন ইয়াসার ঃ আবু হাতেম তাকে হাদীস অস্বীকারকারী, ইবনে জারুদ তাকে মিথ্যুক বলেছেন এবং প্রতারক হিসেবেও বিখ্যাত।

৮. খারেজাহ্ বিন মুসআব খুরাসানী ঃ জমহুর বলেছেন, দুর্বল, ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন বলেছেন, এই মিথ্যুক বর্ণনাকারীদের নাম গোপন করে।

৯. সাঈদ বিন মারযবান বাকাল ঃ ইমাম আহমাদ তাকে প্রতারক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

১০. সালেহ বিন আবী আল আখদার ঃ প্রতারক হিসেবে বিখ্যাত।

১১. মিশরের কাযী আবদুল্লাহ্ বিন লাহিয়া হাযরামী ঃ শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিল। তার বর্ণনাসমূহে ভুল কথাবার্তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ইবনে হাব্বান বলেন, মানুষ হিসেবে খুবই ভাল, কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নিতেন।

১২. আবদুল্লাহ্ বিন যিয়াদ বিন সামআন মাদানী ঃ ইবনে হাব্বান তাকে প্রতারক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

১৩. আবদুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া বিন আসেম বিন মুন্‌যের বিন যুবায়ের বিন আওয়ামঃ ইবনে হাব্বান তাকে প্রতারক বলেছেন।

১৪. আবদুল্লাহ বিন ওয়াকেদ আবু কাতাদাহ ঃ আল হারবানী, ইমাম আহমাদ তাকে প্রতারক বলেছেন।

১৫. আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনআম ঃ ইবনে হাব্বান তাকে প্রতারক বলেছেন

১৬. আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব কালায়ী ঃ ইবনে হাব্বান তাকে প্রতারক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১৭. আবদুল ওয়াহাব বিন মুজাহিদ বিন জাবির ঃ ইমাম হাকেম তাকে প্রতারক হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

১৮. উসমান বিন আবদুর রহমান আত্‌তারায়েফী ঃ ইবনে হাব্বান তাকে প্রতারক প্রমাণ করেছেন।

১৯. আলী বিন গালেব মিছরী ঃ ইমাম মুহাম্মদ এবং ইবনে হাব্বান তাকে প্রতারক বলে প্রমাণ করেছেন।

২০. উমর বিন হাকাম ঃ ইমাম হাকেম তাকে প্রতারক বলেছেন।

২১. হেরাতের কাজী মালিক বিন সুলাইমান। ইমাম নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান তাকে প্রতারক বলেছেন।

২২. মুহাম্মদ বিন কাছীর ছানআনী ঃ 'আকীলি' তাকে দুর্বল ও প্রতারক বলেছেন।

২৩. হাছিম বিন আদী আত্‌তায়ী ঃ ইমাম বুখারী বলেছেন, এ মিথ্যা রোগে আক্রান্ত, ইমাম মুহাম্মদ তাকে তথ্য বিকৃতিকারী প্রতারক বলেছেন।

২৪. ইয়াহ্ইয়া বিন আবী হাইতাহ্ আল কালবী ঃ মুহাদ্দিসগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এই যে, সে একজন প্রতারক।

www.pathagar.com

হাদীস পরস্পর বিরোধী পাওয়া গেলে কি করতে হবে ?

যখন কিছু হাদীস পরস্পর বিরোধী পাওয়া যাবে তখন তাদের মধ্যে গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে হবে। প্রথমত ঃ কোনটার বর্ণনাকারী কি রকম। দ্বিতীয়ত ঃ তার মধ্যে বর্ণিত বিধানসমূহের বিন্যাস। তৃতীয়ত ঃ বর্ণনাকারী সাহাবা ঈমান গ্রহণে প্রাথমিক পর্যায়ের না শেষ পর্যায়ের। চতুর্থত ঃ সাহাবীর সাথে তাবেয়ীর ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা লক্ষণীয়। তার সাথে নাসেখ-মনসুখ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

হাফেয আবু বকর মুহাম্মদ বিন মূসা বিন উসমান বিন হাযেম (রহ) এই মূল নীতির অতুলনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন এবং এটাই মুহাদ্দিসীনের অনুসৃত পন্থা। এই মূলনীতির আলোকে ১৭টি পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়েছে।[১]

১. দেখতে হবে যে, বর্ণনা দু'টির মধ্য কতোটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব! যদি একেবারেই অসম্ভব হয়, তাহলে খ্যাতি এবং প্রচলিত পদ্ধতির উন্নত সনদ সমৃদ্ধ বর্ণনাটি গৃহীত হবে।

২. দুটো বর্ণনার বর্ণনাকারীদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে। দেখতে হবে তার মধ্যে কার স্মরণশক্তি সংরক্ষিত বলে প্রমাণিত ও মর্যাদার দিক থেকে উন্নত এবং কোন বর্ণনার মধ্যে তিনি রয়েছেন। যেমন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরীর মদীনায় দু'জন শিষ্য রয়েছে। ইমাম মালিক (রহ) এবং শোয়াইব বিন আবী হামযা। এমতাবস্থায় ইমাম মালিকের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. দুটো বর্ণনার বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন বর্ণনার বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে খ্যাতি রয়েছে বা মুহাদ্দিসীনের ঐকমত্য রয়েছে এবং কোন বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে বিতর্ক আছে। যেটার ব্যাপারে ঐকমত্য থাকবে সেটা গ্রহণযোগ্য।

৪. কোন বর্ণনার বর্ণনাকারী তার শায়খের কাছ থেকে পরিপক্ক বয়সে বর্ণনা গ্রহণ করেছে এবং কে অল্প বয়সে। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির বর্ণনা কমবয়সীর বর্ণনার ওপরে প্রাধান্য পাবে। যেমন ইমাম যুহরীর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক ও ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ। সুফিয়ান (রহ) অল্প বয়সে এবং মালিক (র) পরিপক্ক বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

৫. দুটো বর্ণনার বর্ণনাকারীদের কোনটির বর্ণনাকারী তার শায়খের সামনে বসে কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি শুনেছেন এবং কোনটি কোনো মাধ্যম বা লিখিত আকারে তার কাছে পৌছেছে যা শাগরেদ এখন বলছে। এ পর্যালোচনার পরে মুখোমুখি শোনা বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

৬. দু'জন বর্ণকারী। একজন ঘটনা বর্ণনা করছে আর একজন সেই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে যিনি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত তাঁর বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য। যেমন ঃ হযরত মাইমুনার (রা)

১. কিতাবুল ই'তেবার, হাযেমী

www.pathagar.com

বিবাহের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। একটি এ রকম যে, রাসূল (স) সে সময় ইহরাম পরা অবস্থায় বিবাহ করেছেন। বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)। দ্বিতীয় বর্ণনাটিতে ইহরাম পরা ছিলেন না। এর বর্ণনাকারী হযরত আবু রাফে (রা)। এখন আবু রাফের বর্ণনাটি একারণে গ্রহণযোগ্য যে, তিনিই ছিলেন এই বিবাহের ঘটক। এর ওপর ভিত্তি করে হযরত আয়শা সিদ্দিকার (রা) কাছে কেউ একজন প্রশ্ন করলো সাজ-সজ্জার ওপরে 'মোছেহ' কিভাবে এবং কতোক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে? তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, হযরত আলীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। কারণ সফরে বেশিরভাগই তিনি রাসূল (স)-এর সঙ্গে থাকতেন।

৭. দুটি বর্ণনার বর্ণনাকারীদের এ ব্যাপারটাও লক্ষণীয় যে, যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হচ্ছে তা বাস্তব ক্ষেত্রে কার দ্বারা প্রমাণিত। যেমন কোনো কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, যৌনাঙ্গ থেকে কিছু বেরুলেই গোসল ফরয। কিন্তু হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা) এই কথাটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, শুধুমাত্র যৌনাঙ্গের মধ্যে যৌনাঙ্গ প্রবেশই গোসলের কারণ হতে পারে।

৮. দু'জন বর্ণনাকারীর একজন হিজাজী আর একজন ইরাকী। সে ক্ষেত্রে হিজাজীর বর্ণনা অগ্রাধিকার পাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, এমনিতে তো যে কোনো শহরের শুদ্ধ সনদসহ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু হিজাজের বর্ণনাকারীদের অগ্রাধিকার এজন্য যে, অধিকাংশ সাহাবা মদীনায় বসবাস করতেন এবং প্রতিটি আদেশ-নির্দেশের কিছু না কিছু মূল তাদের কানে অবশ্যই আসতো বা তারা জানতে পারতো।

৯. দুটি বর্ণনা। একটি বর্ণনার বর্ণনাকারীরা এমন যে, তারা একটু-আধটু ত্রুটি গোপনকে দোষণীয় মনে করেন না। যেমন কুফার অধিকাংশ আলেমগণ এবং বসরারও কিছু আলেম এবং অন্য বর্ণনাটির বর্ণনাকারীগণ এমন, যে বর্ণনার ক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটি গোপনকেও তারা দোষণীয় মনে করেন। এক্ষেত্রে শেষোক্তদের বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য।

১০. দুটি বর্ণনা। একটি বর্ণনার বর্ণনাকারীগণ সেই শ্রেণীর যারা অর্থ বা ভাবগত বর্ণনার পক্ষপাতি এবং দ্বিতীয়টির বর্ণনাকারীগণ হুবহু বর্ণনার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় দলের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

১১. এমন দু'টি বর্ণনা। যার একটি হযরত আবু বকর ও উমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন ছাড়া কার্যকর ছিল এবং দ্বিতীয়টি এমন নয়। তাহলে প্রথমটি গ্রহণযোগ্য।

১২. দু'জন এমন বর্ণনাকারী যারা একই শায়খের শিষ্য। এই দু'জনার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় গড়মিল দেখা দিয়েছে। তাহলে এর মধ্যে যে উস্তাদের সঙ্গ-সান্নিধ্যে বেশি থেকেছে তার কথা গ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম যুহরীর ছাত্রদের মধ্যে নো'মান বিন রাশেদ এবং ইউনুস বিন ইয়াযিদ। ইউনুস বিন ইয়াযিদ ইমামের সফরসঙ্গী হতেন এবং বাড়িতেও বেশি থাকতেন। এখানে নো'মানের চাইতে ইউনুসের বর্ণনা অগ্রাধিকার পাবে।

১৩. দু'টি বর্ণনা এমন যার একটি সুস্পষ্টভাবে কুরআনের অনুকূলে এবং দ্বিতীয়টি এমন নয় তাহলে প্রথমটি গ্রহণযোগ্য।

১৪. একটি অবস্থা এমনও আছে যে, একজন বর্ণনাকারী মাশায়েখদের বরাতে বর্ণনা করেন এবং অন্যজন সেই শহরেরই একটু কম মানের লোকদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। এখানে প্রথমজনের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com

১৫. একটি বর্ণনায় বড় বড় মুহাদ্দিসগণ রয়েছে এবং আর একটিতে নির্ভরযোগ্য ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিস রয়েছেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি গ্রহণযোগ্য।

১৬. এমন দুটি বর্ণনা, যার একটির মধ্যে রাসূলে কারীম (স)-এর কথা এবং কাজেরও প্রমাণ রয়েছে। আর দ্বিতীয়টিতে শুধু বাণী, কাজের উল্লেখ নেই সে ক্ষেত্রে প্রথমটি গ্রহণযোগ্য।

১৭. এমন দুটি বর্ণনা, যার একটির বর্ণনাকারী নিজের স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করে বর্ণনা করেন এবং দ্বিতীয় বর্ণনাটির বর্ণনাকারী নিজের স্মরণশক্তি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও বর্ণনাসমূহ লিখে রাখতেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়জনের বর্ণনা অগ্রাধিকার পাবে।

উপরোক্ত নীতিমালা হাদীসের বর্ণনাসমূহ বিশ্লেষণের রীতি-পদ্ধতি। বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় প্রসঙ্গে নাসেখ মনসুখের আলোচনা প্রয়োজন।

হযরত আলী (রা) কোথাও যাচ্ছিলেন। একজন ওয়ায়েয ওয়ায করছিল, তিনি তাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, নাসেখ-মনসুখ সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে কি ? সে বললো জ্বী না। বললেন, তুমি নিজেও ধ্বংস হয়ে যাবে আর অন্যকেও বরবাদ করে দেবে। 'কিতাবুল 'ইতেবার' পাতা নম্বর চার-এ হুবহু এরকমই বর্ণনা রয়েছে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে। ইমাম মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরী বলেন ঃ

لم يدون فى هذا العلم احد قبل تدوينى -

আমার আগে জ্ঞানের এই বিষয়টি কেউই লিপিবদ্ধ করেনি।

সাধারণভাবে মনসুখ হাদীসসমূহের সংখ্যা একশ'র কাছাকাছি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু হাদীস গবেষকগণ তার সংখ্যা নির্ণয় করেছেন মাত্র ২৭টি। নওয়াব ছিদ্দিক হাসান খান মরহুম "আত্তালেব" গ্রন্থের ৮০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

কিন্তু কাযী আবু বকরের গবেষণায় অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন সংখ্যা ২৭-এর ওপরেই ঐকমত্য। ইমাম শাফেয়ী (রহ) নাসেখ-মনসুখের বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করার কঠিন তাগিদ দিয়েছেন এবং এজন্য কিছু নীতিমালাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

১. রাসূল (স) খোদ নিজে একথা বলেছেন যে, এ ব্যাপারে প্রথমে আমি এই আদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন এই আদেশ দিচ্ছি ঃ

২. শুদ্ধ সনদের ভিত্তিতে অধিকাংশ সাহাবা থেকে এই বর্ণনা থাকতে হবে যে প্রথমে আমাদেরকে এই রকম আদেশ দেয়া হয়েছিল! তারপরে অন্য আদেশ দেয়া হয়েছে।

৩. প্রথম আদেশের সন-তারিখ এবং দ্বিতীয় আদেশের সন-তারিখ জানা থাকতে হবে।

৪. অনুসারীদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য থাকতে হবে। যেমন ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাস্‌উদ বলছেন, আমরা হাবশায় হিযরতের পূর্বে নামাযরত অবস্থায়ও রাসূল (স)-কে সালাম করতাম। তিনি তার জবাব দিতেন। হাবশা থেকে ফিরে আসার পরে আগের মতো নামযের মধ্যে সালাম দিয়েছি, কিন্তু তিনি তার জবাব দেননি; বরং নামায শেষ করে আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা নামাযের মধ্যে কথা বলাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।"

www.pathagar.com

জাহিলিয়াতে মু'তা বিবাহের প্রচলন ছিল। মদীনাতেও তা কার্যকর ছিল। কিন্তু খায়বর বিজয়ের পরে রাসূল (স) গৃহপালিত গাধা খাওয়া এবং মু'তা বিবাহ হারাম ঘোষণা করেছিলেন। খায়বরে যেহেতু সবাই উপস্থিত ছিলেন না তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মক্কা বিজয়ের পরে সম্মিলিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এই ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন যে, আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মু'তা কে হারাম ঘোষণা করা হলো।

আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রহ) 'যাদুল মা'আদ' প্রথম খণ্ডের ৪০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর এই ধারণা বর্ণিত আছে যে, মু'তা একেবারে হারাম ছিল না। আশংকাজনক অবস্থায় অনুমোদন ছিল। কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনা শোনার পরে তিনি তার পূর্বের ধারণা ত্যাগ করলেন।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন আগুনে পাকানো জিনিস দিয়ে অজু করো। এই বর্ণনা মনসুখ হয়ে গেছে। খোলাফায়ে রাশেদুন, তাবেয়ীন এবং মুহাদ্দিসীন সম্মিলিতভাবে এ ব্যাপারে একমত। আল্লামা ইবনে যাওজী এই প্রসঙ্গে একটি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন ঃ

وقدروى عكراش انه اكل مع رسول الله صلى الله على وسلم قصعة من ثريد ثم اتى بماء فغسل يده وفمه ومسح وجهه وقال ياعكراش هذا الوضؤ مما مست النار -

অর্থাৎ হযরত আক্‌রাশ রাসূল (স)- এর সাথে এক বাটিতে সুরুয়া খেলেন। খাওয়ার পরে পানি আনা হলো। রাসূল (স) নিজের হাত এবং মুখ ধুলেন তারপর পুরো মুখমণ্ডল মুছে বললেন, আকরাশ, আগুনে পাকানো জিনিসের এই অজু অর্থাৎ হাত ধোয়া, কুলি করা এবং কোন কাপড় দিয়ে মুখ মুছে নেয়াই যথেষ্ট।

সুলাইমান বিন বুরাইদাহ্ পিতা হযরত বুরাইদাহ থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাকে কবরসমূহ জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন বলছি জিয়ারত করো।

আবু বকর হায্‌মী বলছেন, এই বর্ণনায় শুধুমাত্র পুরুষদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। নারীদের জন্য হযরত আবু হোরায়রাহ (রা)-এর বর্ণনা মওজুদ রয়েছে যে, কবরসমূহ জিয়ারতকারিণী মহিলাদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্কের ওপরে জুমআর গোসল ওয়াজিব। এই আদেশটি মনসুখ। নাসেখ এই যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের (রা) কাছে একজন প্রশ্ন করলো, জুম'আর গোসল কি ওয়াজিব ? বললেন না। জুম'আর গোসলের প্রয়োজনীয়তা ছিল এই জন্য যে, প্রথমদিকে সাহাবাগণের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। কম্বল জড়িয়ে থাকতেন। দিনমজুরী করতেন। মসজিদ ছিল ছোট্ট-সংকীর্ণ। একদিন গ্রীষ্মকালে রাসূল (স) জুম'আর নামাযের জন্য মসজিদে এসেছেন। উপস্থিত মুসল্লীগণ ঘেমে লেপ্টে যাচ্ছিলেন। আর সেই এতোগুলো মানুষের ঘামের গন্ধে গোটা পরিবেশ শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠেছিল। সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূল (স) উপস্থিত

www.pathagar.com

অনুসারীগণকে নির্দেশ দিলেন জুম'আর দিন গোসল করে সুগন্ধী মাখিয়ে আসবে। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কৃপায় অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন না লোকেরা সেই মোটা মোটা কাপড় জড়িয়ে থাকে আর না সবাই দিন মজুরী করে। মসজিদও মা'শাআল্লাহ্ অনেক বিস্তৃত। এজন্য এখন না সেই ঘামে ভিজে লুটোপুটি খেতে হয়! আর না তার গন্ধে পরিবেশ অস্থির হয়ে উঠে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর আলোচনার তাৎপর্য এই যে, আদেশের অনস্তিত্ব 'কারণের' অস্তিত্ব অনস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। হযরত শাফেয়ী (রহ) 'কিতাবুল উম' প্রথম খণ্ড ১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

فخب للرجل ان يتنظف يوم الجمعة بغسل واخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح من جميع جسده وسواك وكل مانظفه وان يمس طيبًا مع هذا ان قدر عليه ويستحسن من ثيابه ما قدر عليه ويطيبها ابتاعالليسنة ولايوذى احداً قاربه بحال وكذالك احب له فى كل عيد وامره به واحبه فى كل صلوه جماعته وامره به واحبه فى كل امر جامع للناس -

আমার কাছে এটা অত্যন্ত পছন্দনীয় ব্যাপার যে, মানুষ জুম'আর দিন গোসল করবে, বাড়তি চুল কাটবে, নখ কাটবে এবং নিজের দেহ থেকে সব ধরনের অপরিচ্ছন্নতা দূর করবে। মেছওয়াক করবে, খুশবু লাগবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ভাল কাপড় পরিধান করবে এবং কাপড়েও সুগন্ধী লাগাবে। এইসব কাজগুলো রাসূল (স)-এর অনুসরণীয় কাজ হিসেবে করবে। নিজের অপরিচ্ছন্নতার কারণে পাশে উপবিষ্ট জনকে কষ্ট দেবে না। এভাবেই দুই ঈদ, প্রতিটি নামাযের জামা'আত এবং যে কোন সম্মিলনের জন্য এই রকম প্রস্তুতি আমার খুব পছন্দনীয় এবং আমি সবাইকে এর জন্য জোর তাগিদ জানাচ্ছি।

হযরত আয়শা (রা) বলেন, প্রথম প্রথম আশুরার দিনে রাসূল (স) রোযা রাখতেন এবং অনুসারীদেরও রোযা রাখতে বলতেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয হয়ে গেলো তখন আশুরার রোযা সেভাবে আর রাখতে বলতেন না। যার ভাল লাগতো সে রাখতো আর যে পারতো না সে রাখতো না।

www.pathagar.com

হাদীসের বাহ্যিক অর্থকে উপেক্ষা করা যায় না

সহীহ্ হাদীস ঃ

ينزل ربنا عزوجل الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعونى فاستجيب له من يسئنا لنى فاعطيه من يستغفر نى فاستغفرله –

রাতের শেষে যখন এক-তৃতীয়াংশ রাত বাকী থেকে যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছে যে আমার কাছে কিছু চাইবে, আর আমি তাকে তা দিয়ে দেবো! কে আছে, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে আমার ক্ষমার দানে ধন্য করে দেবো।

এই বর্ণনায় 'অবতরণ' শব্দটি থেকে আল্লাহ্ তা'আলার একটা অবয়বের ধারণা জন্ম নেয়। কারণ, আরোহণ-অবতরণ ধরনের তৎপরতা কোনো দেহ ছাড়া কি করে সম্ভব! অথচ আল্লাহ্ তা'আলা নিরাকার! হাদীস অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার কোনো না কোনো অবয়ব আছে বলেই মেনে নিতে হয়!

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের খুঁজে দেখতে হবে আরববাসী 'নুযুল' শব্দ থেকে কি কি অর্থ গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় পাঁচটি অর্থে 'নুযুল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

১. স্থানান্তর ও চলাচল। যেমন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وانزلنا من السماء ماء –

আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি।

২. জানিয়ে দেয়া, যেমন ঃ

نزل به الروح الامين

রুহুল আমিন তাকে জানিয়ে দিয়েছে।

৩. বলা। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

سانزل مثل ماانزل الله –

আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে বলেছেন আমিও সেভাবে বলবো।

৪. কোন দিকে ঝুঁকে পড়া। এই প্রবচনটি আরবী কথাবার্তায় প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় ঃ

نزل فلان من مكارم الاخلاق الى دينها –

www.pathagar.com

অমুক ব্যক্তি ভাল স্বভাব থেকে মন্দ স্বভাবের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অথবা অমুক তার অবস্থান থেকে পড়ে গেছে বা নীচে নেমে গেছে।

৫. শক্তি ও ক্ষমতা। আরবরা বলে ঃ

كُنَّا فِيْ خِيْر وعدل حتى نزل بنابنو فلان –

অমুক লোক 'নাযিল' হবার আগে পর্যন্ত আমরা খুব সুখে-শান্তিতে ছিলাম।

অর্থাৎ তার স্বৈরাচারী শাসন জারি হবার আগে পর্যন্ত।

অন্য একটি বর্ণনায় শব্দ ينزل এর পরিবর্তে تنزل রয়েছে। যাতে অর্থটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। এ কারণে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষীহীন মহান সৃষ্টিকর্তা বিধাতা আল্লাহ্ তা'আলার মান ও মর্যাদার অবস্থান তো এই যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো সৃষ্টির দিকে তিনি কেন ফিরে তাকাবেন ? কিন্তু তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি দৃষ্টিদান করেন। পৃথিবীর আকাশে আল্লাহ্ তা'আলার অবতরণের ব্যাপারটাও এরকম। আরবী কথোপকথন অনুযায়ী 'দুনিয়ার আকাশ' কথাটির তাৎপর্য, সেই অবস্থা যা আমাদের কাছাকাছি। এবং 'দুনিয়া' শব্দটির মানে 'নিজেই একটি ধোকা' বা নিকৃষ্টতর প্রতারণা।

এরকমই এই হাদীসটির অর্থের তাৎপর্য এই যে ঃ

ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نقبل ماذال نائما حتى اصبغ ماقام الى الصلوة فقال بال الشيطان فى اذنه –

রাসূল (স)-এর সামনে একজন লোক সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল যে, সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল এবং নামাযের জন্যও উঠেনি। তিনি বললেন, শয়তান ওর কানে পেশাব করে দিয়েছে।

بال শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

معناه افسد والعرب يقولون للفساد بالبول ويقولون بال سهيل فى الفصيح نقذ –

পেশাব করার মানে নষ্ট করে দেয়া। আরবরা নষ্ট করা বা খারাপ করার রূপক হিসেবে بال 'পেশাব করে দেয়া' কথাটি ব্যবহার করে। যেমন প্রবচন রয়েছে যে, 'সোহেল উটনীর দুধে পেশাব করে দিয়েছে।' অর্থাৎ দুধগুলো নষ্ট করে দিয়েছে বা ফেলেছে।

www.pathagar.com

সুফল অর্জন এবং ক্ষতি অপসারণ

সুফল অর্জনের চাইতে ক্ষতির অপসারণ শ্রেয়। অর্থাৎ কোনো কাজে ল্যভও আছে আবার ক্ষতিও আছে। সেক্ষেত্রে ক্ষতির অপসারণটাই প্রথম করণীয়। যেমন ঃ হযরত তল্ক বিন আলী থেকে বর্ণনা রয়েছে যে, একজন লোক প্রশ্ন করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ (স), কেউ যদি তার লজ্জাস্থানে হাত লাগায় তাহলে কি তাকে অজু করতে হবে ? তিনি বললেন, না! ওটাতো তোমার দেহেরই একটা অংশ! এই বর্ণনাটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইমাম আহ্মাদ, দারে কুতনী (রহ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম সুফিয়ান সাওরী, হযরত হাসান বসরী প্রমুখের এ ব্যাপারে একই মত। ইবনে হাব্বান, তিবরানী, ইবনে আরাবী এবং হাযেমী সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, এ বর্ণনা মনসুখ হয়ে গেছে। প্রথম কারণ হলো, তল্ক বিন আলী নিজেই তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন যে, 'লজ্জাস্থানে হাত লাগালে অজু ভেঙ্গে যায়'। এই বর্ণনাটি তিবরানী শুদ্ধ সনদসহ প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় হযরত বসরা বিন সাফওয়ান থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে তার লজ্জাস্থানে হাত লাগলো তার উচিত অজু করে নেয়া। বর্ণনাটি ইমাম মালিক (রহ) মু'আত্তায়, ইমাম শাফেয়ী (রহ) কিতাবুল উম-এ, ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইবনে হাযিমাহ, ইবনে হাব্বান এবং ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন যে, ইমাম বুখারী বলেছেন যে, এ প্রসঙ্গে এই বর্ণনা শুদ্ধতম।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, একই বর্ণনা হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্, হযরত আবু হোরায়রাহ, হযরত আনাস বিন আবী কা'আব, মুয়াবিয়া বিন হাইদাহ, কাবীসাহ, আরওয়া বিনতে আনিস, আবদুল্লাহ্ বিন উমর, যায়দ বিন খালেদ, সাঈদ বিন আবী ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ বিন উমর, আলী বিন তল্ক, নো'মান বিন বশীর, হযরত আয়শা ছিদ্দিকা, হযরত উম্মে সালমা, হযরত উম্মে হাবিবাহ (রা) প্রমুখ থেকেও বর্ণিত।

কাযী শাওকানী নাইনুল আওতার প্রথম খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা), হযরত আবু হোরায়রাহ (রা), হযরত আয়শা (রা), হযরত সাঈদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা), ইমাম আতা'আ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, ইমাম মুজাহিদ, আব্বাস বিন উসমান, সুলাইমান বিন ইয়াসার, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইসহাক বিন রাহোইয়া (রহ) প্রমুখের এই একই মতামত যে, লজ্জাস্থানে হাত লাগালে অজু নষ্ট হয়।

মাসআলাটির প্রকৃতির ওপরে লক্ষ্য আরোপ করলে দেখা যায় যে, রাসূল (স)-এর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিজের হাত কোনো পাত্রে ঢুকিয়ে দিও না। কেননা ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার হাত কোথায় কোথায় গিয়েছিল এটা তুমি জানো না। এজন্য প্রথমেই হাত ধুয়ে নাও।

www.pathagar.com

এই হাদীসে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, হতে পারে ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের হাত তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে! এজন্য পরিচ্ছন্নতার খাতিরে হাত ধোয়া ছাড়া কোনো পাত্রে ঢুকাতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন বিতর্ক থেকে যায় যে, তাহলে লজ্জাস্থানে হাত লাগালেই অজু নষ্ট হবে কেন ? হযরত আয়শা এবং উম্মে হাবিবাহ (রা) এরকম বর্ণনা করেছেন যে, মহিলারা তাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে যেন তারা আবার অজু করে নেয়। সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ মতামত এবং বিশেষ করে হযরত উমর (রা)-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বও অজু করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মদীনার বিশিষ্ট তাবেয়ীন এর সপক্ষে মত দিয়েছেন এবং হাদীসের ইমামগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবেই এর ওপর রায় দিয়েছেন। এইজন্য কিছু মুহাদ্দিসীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শেষোক্ত বর্ণনাটি 'নাসেখ' এবং প্রথমটি 'মনসুখ'। হানাফী ফকীহবৃন্দ দাবি করেছেন, শেষেরটি 'মনসুখ' আর প্রথমটি 'নাসেখ'। মওলানা আবদুল হাই ফেরেঙ্গী মহল্লী সাহেব মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তা'আলীক আল মুমাজ্জাদ"-এর ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

والانصاف فی هذا لبحث ان يقال لاسبيل الى الجزم بالنسخ فی هذا البحث فی طرف من الطرفين لكن الذی يقرب انه ان كان هناك نسخ لحديث طلق لابالعكس

এই বিতর্কের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা এই যে, দু'টি বর্ণনার কোনটি মনসুখ তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু নীতিগত বিবেচনায় নিকটতম সম্ভাবনা এই দাঁড়ায় যে, 'তল্‌কে'র হাদীসটি মনসুখ হয়ে গেছে।

বস্তুত হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর নির্ধারিত নীতির আলোকে বিচার করলে মাসআলাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ কল্যাণ অর্জনের চাইতে অকল্যাণ দূর করা শ্রেয়। শুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে অজু ছাড়া নামায হয় না। অথচ তল্‌ক বিন আলীর বর্ণনায় অজু না করার ধারণা প্রকাশ পায়। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ণনায় অজু নষ্ট হওয়ার শুদ্ধ সনদ বর্তমান এবং অধিকাংশ সাহাবা, নবী (স)-এর পবিত্রা স্ত্রীগণ, তাবেয়ীন ও আয়েম্মায়ে মুহাদ্দিসীনের সম্মিলিত মতামত এর অনুকূলে। তাই নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে, 'মন্দ দূরীকরণই প্রথম কাম্য' তা হলো অজু করা জরুরী।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ) কিতাবুল উম প্রথম খণ্ড ১৬ পৃষ্ঠায় অজুর অধ্যায়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ প্রসঙ্গে এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

قال واذا افضى الرجل ببطن كفه الى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء قال وسواء كان عامد اوغير عامد -

যদি কোনো লোক তার হাতের তালুর দিক দিয়ে নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে এবং দুটোর মাঝখানে কোন কাপড়ের আড়াল না থাকে তাহলে তা সচেতনভাবে হোক কি অসচেতন, অজু অবশ্যই করতে হবে।

www.pathagar.com

এর পরে লিখেছেন ঃ

وكذلك لومس ويره اومس قبل امراته اودبرها اومس ذلك من صبي اوجب عليه الوضؤ فان مس انثيه اوليتيه اوركبتيه - ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء وان مس ذكره بظهر كفه اوذراعه اوشي غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء فان قال قائل فما فرق بين ماوصفت قبل الافضأ باليد انما هو ببطنها - كما تقول افضى بيده مبا يعاو افضى بيده الارض ساجداً -

যদি কোন ব্যক্তি তার পায়খানার রাস্তা বা তার স্ত্রীর লজ্জাস্থান বা পায়খানার রাস্তা অথবা কোনো ছেলের লজ্জাস্থানে হাত লাগায় তাহলে তার অজু করা উচিত। (কেননা পায়ুপথে হাত লাগলে অজু করার ব্যাপারে শুদ্ধ সনদের ভিত্তিতে হাদীস রয়েছে)। কিন্তু লজ্জাস্থান ছাড়া শরীরে অন্য যে কোন অংশে হাত লাগালে অজুর প্রশ্ন নেই। অথবা লজ্জাস্থানে হাতের তালু ছাড়া শরীরের অন্য যে কোন অংশ দিয়ে স্পর্শ করলো, যেমন কনুই লাগলো বা হাতের পিঠ লাগলো! তাহলে অজুর প্রয়োজন নেই। যদি কেউ বলে হাতের তালুতে আর পিঠে বা কনুইতে কি পার্থক্য ? তাহলে তার জবার এইযে, হাত লাগানোর অর্থ হাতের তালু দিয়ে তাকে ধরা। যেমন কথিত আছে যে, সে বাইয়াতের জন্য হাত বাড়িয়েছে এবং সে সেজদার জন্য হাত বিছিয়ে দিয়েছে। সে যাই হোক, এই মাসআলার ব্যাখ্যা সেই মূলনীতির আলোকেই করা হলো।

www.pathagar.com

বিপরীতমুখী হাদীসসমূহের তদন্ত এবং তদবির

কুরবানীর মাস'আলা ঃ 'ইবনে মাযাহ মাতবুআহ্ আছহ্হাল মুতাবে'-এর ২৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে ঃ

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ثنازيد بن الحباب ثنا عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن الاعرج عن ابى هريرة رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعته ولم يضح فلا يقربن مصلانا -

হযরত আবু হোরায়রহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করবে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে অথবা নামায পড়ার জায়গায় না আসে।

এই বর্ণনার ভিত্তিতে হানাফীপন্থীরা বলেন কুরবানী ওয়াজিব।

الاضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر فى يوم الاضحى عن نفسه وعن ولده الصغار امالو اجب تقول ابى حنيفة ومحمد ورفر والحسن واحدى الروايتين عن ابى يوسف وعنه انها سنة ذكره فى الجوامع وهو قول الشافعى -

কুরবানীর দিন প্রত্যেক স্বাধীন সামর্থ্যবান স্থায়ী বসবাসকারী মুসলিমের জন্য কুরবানী দেয়া ওয়াজিব। সে তা নিজের এবং নিজের ছোট ছোট সন্তানদের পক্ষ থেকে করবে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ, জাফর ও হাসানের বক্তব্য অনুযায়ী তা 'ওয়াজিব'। ইমাম আবু ইউসুফ এবং তার সমমনাদের মতে তা 'সুন্নত'। ইমাম শাফেয়ীর মতেও তাই।

এই বর্ণনাসমূহের প্রেক্ষিতে ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন ঃ

ولوزعمنا ان الضحايا واجبة ماجزاء اهل البيت ان يضحوا الاعن كل انسان بشاة -

যদি আমরা মনে করতাম যে, কুরবানী ওয়াজিব তাহলে একটি বাড়ির লোকজনের পক্ষ থেকে একটি মাত্র 'বকরী' হতো না; বরং প্রতিজন একটি করে ছাগল কুরবানী করতো।

তারপর বলেন ঃ

ولايلزم الرجل ان يضحى من امرأة ولاولد ولا من نفسه وقد بلغنا ان بابكر

www.pathagar.com

وعمر رضى الله عنهما كان لايضحيان كراهته ان يقتدى بهما يظن من راهما انها واجبته وعن ابن عباس انه جلس مع اصحابه ثم ارسل بد رهمين فقال اشترويهما الحمائم فقا للهذاه اضبحية ابن عباس وقد كان قلما يمريه يوم الانحر فيه اوذ بح ممكنه وانما ارادبذ لك مثل الذى روى عن ابى بكر وعمر رضى الله عنهما قال الشافعى الضحاياسنة لاحب تركها -

অর্থাৎ এটা শর্ত নয় যে, লোকেরা নিজের বা নিজের সন্তান ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে কুরবানী করতে হবে! এই জন্য যে, আমাদের কাছে এ বর্ণনাও পৌছেছে যে, হযরত আবু বকর ও উমর (রা) এই আশংকায় কুরবানী করতেন না যে, লোকেরা তাকে ওয়াজিব ভেবে তাদের অনুকরণ না শুরু করে দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস তাঁর সঙ্গী-সাথী নিয়ে এসেছিলেন। কোন একজন সঙ্গীকে দুই দিরহাম দিয়ে বাজারে পাঠালেন গোশত কিনে আনতে। বললেন, ইবনে আব্বাসের এটাই কুরবানী। অথচ তিনি মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা, যেখানে মক্কায় এবং মিনাতে রীতিমত কুরবানী করা হতো! আসলে তাঁর উদ্দেশ্য হুবহু তাই ছিল যা হযরত উমর (রা) এবং আবু বকর (রা)-এর ছিল। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, এই জন্য কুরবানী সুন্নত এবং তাকে ছেড়ে দেয়া আমি পছন্দ করি না।

হেদায়াহ্'র রচয়িতা হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা)-এর কুরবানী না করা নিয়ে একটা সন্দেহের সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা হয়তো সফররত অবস্থায় এমনটা করেছিলেন। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহ) তার জবাব দিয়েছেন।[১]

لم اجد بل صح غنها انهما كانا لايضحيان مطلقا احيانا خشيته ان يظن وجوبهما

সফররত অবস্থায় তাঁরা এরকম করেছিলেন এরকম কোনো বর্ণনা আমি পাইনি। বরং শুদ্ধ সনদের ভিত্তিতে ঐ দুই মহাত্মনের ব্যাপারে এটাই প্রমাণিত যে, তাঁরা এই আশংকায় কুরবানী করতেন না যে, লোকেরা তাকে ওয়াজিব না ভেবে বসে।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন ঃ

وعن البى مسعود البدرى قال انى لادع الاضحية وانا من ايسركم كر اهته ان يعتقد الناس انها حته واجب اخرجه سعيد بن منصور -

হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বলেন যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি এই জন্য কুরবানী করছি না যে, লোকেরা নিশ্চিতভাবে তাকে ওয়াজিব না মনে করে বসে।

১. নাসাব আর্‌রায়াহ্ ফী তাখরীজ আহাদীসে হেদায়াহ্।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম তিরমিযী ও মুসতাদরাক হাকেম (রহ) শুদ্ধ সনদসহ এই বর্ণনা করেন, "আতা বিন ইয়াসার বলেছেন, তার কাছে আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেছেন, আমি নবীজী (স)-এর সময়কালে আমার এবং আমার ঘরের লোকদের পক্ষ থেকে একটি মাত্র 'বকরী' কুরবানী করতাম। কিন্তু এখন তো লোকেরা এটাকে একটা গৌরবের বিষয় মনে করে প্রত্যেকের তরফ থেকে একটা করে ছাগল কুরবানী করা শুরু করে দিয়েছে।

কাযী শাওকানী (রহ) বলেন ঃ

من قال ان الاضحية غير واجبة بل سنة وهم الجمهور قال النودى قال بهذا ابو بكر وعمر بلال وابو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمه والا اسود وعطاء ومالك واحمد وابويوسف واسحق وابو ثوروالمزنى وابن المنذ روداورد غيرهم انتهى وحكاه فى البحر ايضاعن العترة والشافعى وابو يوسف ومحمد وقال ربعة دالادزاعى وابوحنيفة وبعض المالكية انها واجبة على الموسر قال ابن حزم لايصح عن احد من الصحابة انها واجبة وصح انها غير واجبة عن الجمهور -[১]

যেসব সাহেবানদের মতামত এই যে, কুরবানী ওয়াজিব নয়, তার মধ্যে অধিকাংশ ওলামা শামিল রয়েছেন। ইমাম নূদী বলেছেন, সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত বেলাল (রা) ও হযরত আবু মাসউদ বদরী। তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, আল্ কামাহ, আসওয়াদ ও আতা (রহ)। ইমামদের মধ্যে ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম ইসহাক, আবু ছাউর, মুযনী, ইবনে মুনযের ও ইমাম দাউদ (রহ) প্রমুখ রয়েছেন। সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আহলে বাইতের ইমামগণ, ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদও রয়েছেন। শুধুমাত্র রবিয়া, ইমাম আওযায়ী (রহ), ইমাম আবু হানিফাহ এবং মালিকী মাযহাবের কিছু অংশ শুধু সচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করেছেন। ইমাম বিন হাযম আন্দালুসী বলেন, সাহাবাগণের কারো দ্বারাই এটা প্রমাণিত নয় যে, কুরবানী ওয়াজিব বরং অধিকাংশ সাহাবাগণ একে 'সুন্নত' মনে করেন।

আবু হোরায়রাহ (রা)-এর বর্ণনা ঃ ওয়াজিবের ব্যাপারটি শুধুমাত্র হযরত আবু হোরায়রাহ (রা)-এর একটি বর্ণনার ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে। যে বর্ণনাটির ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন বলেন, বর্ণনাটি 'মওকুফ'। অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রাহ'র বক্তব্য বটে, কিন্তু রাসূল (স)-এর ইরশাদ নয়। এর বিপরীতে সেইসব বর্ণনাসমূহ রয়েছে যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনায় হযরত আবু হোরায়রাহ'র বর্ণনাটি মওকুফ বলেই মনে হয়। কেননা রাসূল (স)-এর

১. নাইলুল আওতার, ৪র্থ খণ্ড

www.pathagar.com

এই ধরনের কথা যে, যদি কারো সামর্থ্য থাকার পরেও কুরবানী না দেয় তাহলে সে যেন আমাদের 'নামাযের স্থানের' কাছেও না আসে! নামাযের স্থান মানে যদি ঈদগাহ বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে কুরবানীতো নামাযের পরে হয়, নামাযের আগেই এই প্রসঙ্গে কোনো কথা অসম্ভব। আর যদি 'নামাযের স্থান' বলতে মসজিদে নববীতে নামাযের উপস্থিতি বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে রাসূলে কারীম (স) নিজে এই রকম একটি কাজ না করার জন্য কাউকে ফরয নামাযে হাজির হতে নিষেধ করেছেন! এটাই বা কেমন করে সম্ভব! আসলে কুরবানীর ব্যাপারটাই 'ইবরাহিমী সুন্নত' যার পুনর্জীবিতকরণের ব্যাপারটাই যতোদূর সম্ভব প্রমাণিত হবে।

হজ্ব প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর দলিল

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কিতাবুল উম-এ কুরআন মজীদ থেকে হজ্ব প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্ট দলিল পেশ করেছেন।

হজ্বের বিধানে মুসলমানদের জন্য বেশ কয়েকটি প্রত্যক্ষ কল্যাণ দৃশ্যমান ঃ

১. মক্কা যেহেতু একটি কৃষিহীন উষর ভূমির শহর, যে জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা হজ্ব ও উমরাকারীদের দ্বারা খোদ মক্কাবাসী অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে। এছাড়া কুরবানীর কারণে প্রচুর গোশতের আয়োজন হয় অর্থাৎ প্রচুর খাদ্যের যোগান। যা দেখলে খুব সহজেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সাল্লামের দো'আ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُو الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَرَزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

হে প্রতিপালক, পরোওয়ারদিগার, আমি আমার কোনো এক সন্তানের স্থায়ী নিবাস স্থাপন করলাম কৃষি ফসলহীন মরুভূমিতে তোমার বাইতুল হারামের পাশে। হে প্রভু! যেন সে নামায প্রতিষ্ঠিত করে। এখন, মানুষের অন্তরগুলোকে তুমি তাদের প্রতি ঝুঁকিয়ে দাও এবং বিভিন্ন ফলের রিযিক তুমি তাদেরকে পৌছে দাও যেন তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

২. হজ্বের মৌসুমে হজ্বের পাশাপাশি ব্যবসায়ী পণ্য নিয়েও অনেক হাজী মক্কায় আসেন, যার বাণিজ্য হয় এবং প্রতিটি মানুষ 'হারাম শহরে' জান-মালের নিরাপত্তাসহকারে থাকতে পারে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পণ্য বিনিময়ের এই মহা সুযোগ লাভ করে মানুষ। বিশেষ করে মক্কার মানুষ। কুরআনে এইদিকে ইঙ্গিত لِيَشْهَدُ وامنافع لَهُمْ যেন তারা নিজেরা লাভবান হতে পারে।

৩. বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন ঃ পারস্পরিক পরিচিতি লাভের সম্মেলন, ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি জানার বিশ্বসম্মেলন, বিশ্ব মুসলিম ভাষা সম্মেলন এবং বিশেষ করে কেবলা যিয়ারতের কল্যাণ প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে পেয়ে থাকে। প্রত্যেকে যেন তার জ্ঞানগত, ধর্মীয় এবং পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করে নেয়, তারপর যিলহজ্বের দশ তারিখ ঈদ এবং কুরবানীর জন্য একারণে

www.pathagar.com

নির্বাচন করা হয়েছে যে, ঈদুল ফিত্‌রের নির্ধারিত সময়ের পরে নবম যিলহজ্বের, যেদিন রাসূল (স)-এর ওপর কুরআন নাযিলের সমাপ্তি হয়েছে দিনটি এবং সুন্নতে ইবরাহিমীর চিরকালীন স্মরণে ঈদ উৎসব হতে পারে। সুতরাং এই রকম একটি দিশাধন্য সুন্নতের কার্যকর চর্চার জন্য সব রকম সহজতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন অহংকার ও জাঁকজমকের প্রদর্শনীমূলক প্রথা চালু না হয়ে যায়। যেভাবে হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য আনসার সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুশীলনে প্রকাশ পেয়েছে।

এই সেই জবরদস্ত মাসআলার প্রকৃত স্বরূপ যাকে ওয়াজিব ধরে নিয়ে কি তুমুল আয়োজন শুরু হয়ে যায়। কতো আন্তরিকতার সাথে অথচ বিনা প্রয়োজনে এক একজন লোক কয়েকটি করে পশু নিছক ওয়াজিব মনে করে জবাই করে ফেলে! যেখানে খোদ কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে ঃ

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ -

তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও তাহলে যার পক্ষে যেটা সহজ হয় তা কুরবানী করে দাও। অথবা

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

আল্লাহ্‌র কাছে তার গোশত এবং রক্ত কোনোটাই পৌঁছায় না বরং পৌঁছায় তোমাদের আন্তরিক নিবেদনটুকু।

একারণে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ) সেই শুদ্ধ হাদীসের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন এবং বর্ণনার সঠিক তাৎপর্য অনুযায়ী এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, একটি ছাগল, একটি ছাগী বা একটি ভেড়া একটি ঘরের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

www.pathagar.com

হাদীস কুরআনের রহিতকারী (নাসেখ) হতে পারে না

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার আদেশসমূহ কার্যকর করার এবং করাবার অধিকারী ছিলেন এবং কথা ও কাজে তার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা-অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। কাজেই তাঁর কোনো কথা, কাজ বা নির্দেশ কুরআনের বিপরীত হতে পারে না। এই জন্য যদি কেউ এই দাবি করে যে, হাদীস দিয়ে কুরআনকে রহিত করা যায়, তাহলে সে দাবি সর্বৈভ ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেন, আমার কাছে ইবনে কারীমাহ্ বলেছেন যে, তিনি আবু জাফরের কাছ থেকে শুনেছেন যে, তিনি খোদ রাসূলে কারীম (স) থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এক ইয়াহূদীকে ডেকেছিলেন যেন সে তাদের ধর্মীয় বর্ণনাসমূহ রাসূল (স)-কে শোনায়। সে তার কথার মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সাল্লামের ব্যাপারে মিথ্যা কিছু কথা বর্ণনা করে গেল। এরপরে যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ (স) খোত্‌বা দিতে মেম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, শোন! খুব শীঘ্রই আমার বরাত দিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা করা হবে এবং তা নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হবে। এই জন্য মনে রেখো! আমার যে কথা, কুরআনের অনুকূলে হবে তা আমারই কথা বলে মনে করবে, আর যা কুরআনের বিপরীতে দাঁড়াবে তা কোনোভাবেই আমার কথা নয় জানবে!

মাসআর বিন কেদাম ও হাছান বিন এমারাহ আমরুদ বিন মুররাহ্‌র কাছ থেকে তিনি বুখ্‌তারীর কাছ থেকে তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহুর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে হাদীসে রাসূল (স) পৌছাবে তখন তার মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবে যে, অত্যন্ত দিক-নির্দেশনামূলক, সুস্পষ্ট এবং মন-অন্তরকে উজ্জীবিত করে রাখার মতো অনেক বেশি প্রেরণাদায়ক কি না। যদি এইসব গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো তার মধ্যে পাও তাহলে জানবে যে, তা খোদ রাসূল (স)-এর কথা। এশআত বিন সাওয়ার ও ইসমাঈল বিন খালেদ ইমাম শা'বী থেকে এবং তিনি কারযাহ্ বিন কা'আব আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের আনসারদের একটি দল যখন কুফায় রওয়ানা করতে যাবে তখন হযরত উমর (রা) পায়ে হেঁটে আমাদের এগিয়ে দিচ্ছিলেন। মূল বসতি থেকে আমরা যখন অনেক দূরে চলে এসেছি! তখন হযরত উমর (রা) বললেন, হে আনসারের দল! তোমরা কি বুঝতে পেরেছ কেন আমি পায়ে হেঁটে তোমাদের সাথে এতোদূর এসেছি? বিদায়ী আনসারগণ বললেন, জ্বী, আপনি আমাদের অধিকারকে সম্মান জানাতে এসেছেন। বললেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের এটা অধিকার যে, আমি তোমাদের এভাবেই এগিয়ে দিতে আসি! কিন্তু তোমরা এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছো যেখানে মৌমাছির গুঞ্জরণের মতো কুরআন পড়া হয়। এই জন্য সেখানে তোমরা আলাদা করে রাসূল (স)-এর কথা খুব কম বলবে। কারযাহ বিন কা'আব (রা) বলে উঠলে, আমি রাসূল (স)-এর কোনো হাদীসই সেখানে বলবো না।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলছেন, মনে রেখো! বর্ণনা অনেক হয়ে গেছে, এর মধ্যে অধিকাংশেরই সঠিক সন্ধান পাওয়া যাবে না। এই জন্য সেই হাদীসই গ্রহণ করবে যার ওপরে একটা বড় দলের সমর্থন আছে এবং তা কুরআনুল কারীমের অনুকূলে হতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমার কাছে বেশ নির্ভরযোগ্য লোকেরা বলেছেন যে, রাসূল (স) তাঁর মৃত্যুশয্যায় কুরআন ও মশহুর বর্ণনাসমূহের ওপর আমল করার স্থায়ী আদেশ দিয়ে গিয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলছেন, যদি মুহাদ্দিস ও ফকীহবৃন্দ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করে এবং তারা রাসূল (স)-এর রিসালাতের শুরু থেকে তাঁর ওফাত পর্যন্ত কোরায়েশদের সার্বিক অবস্থা এবং সত্য ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে এবং তার ওপরে কুরআন নাযিলের কারণসমূহকে ভাল করে জেনে নেয় তাহলে তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নূর এসে অন্তর্দৃষ্টির আলো সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

সব সামগ্রিকতায় ব্যতিক্রম অনিবার্য

আল্লাহ্ তা'আলার সুনির্ধারিত বিধানেও যেমন ব্যতিক্রম রয়েছে! ঠিক সে রকম ব্যতিক্রম নবীর আহকামেও আছে। যেমন ঃ নামায ফরয। কিন্তু নাবালেগ ঋতুবতী নারী, বাচ্চার মা, দুধপান করাবার মহিলা, অপারগ, মানসিক রোগী, পথিক, অসীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ—এরা ব্যতিক্রম। ইবাদত ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও ব্যতিক্রম রয়েছে। যেসব ব্যাপারে ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসবৃন্দের সম্যক জ্ঞান খুবই জরুরী। যেমন সূরায়ে মায়েদাতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لاِثْمٍ -

যে লোক ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির তবু আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার কোনো ইচ্ছা তার মনে নেই, এরকম বাধ্যবাধকতা ও জীবন বিধ্বংসী প্রেক্ষাপটে নিষিদ্ধ জিনিস খাওয়াও জায়েয।

قُلْ لاَاَجِدُ فِىْ مَاأُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسْفُوْحًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ اَوْفِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَعَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ -

হে মুহাম্মদ! বলে দাও আমার কাছে যে আদেশ পৌঁছেছে তার মধ্যে খাবার জন্য এমন কোনো জিনিস হারাম করা হয়নি। শুধুমাত্র মরা পশুর মাংস, প্রবাহিত রক্ত এবং শুকরের মাংস ছাড়া। কেননা এগুলো অপবিত্র এবং সেইসব জিনিস যার ওপরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে। কিন্তু যার তাছাড়া কোনো উপায় নেই এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করারও কোনো মানসিকতা নেই এমতাবস্থায় কিছু গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন।

'মুসতাদরাক হাকেম'-এ হযরত আম্মার বিন ইয়াসার-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মুশরিকরা তাঁকে এমনভাবে পানির মধ্যে চুবিয়েছে যে, তিনি প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। এরকম সময় পাপিষ্ঠরা তার মুখ দিয়ে যা খুশী তাই বলাতে বাধ্য করেছে। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়েছে। অপমানের যন্ত্রণা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। সেভাবেই পৌঁছালেন নবীর (স) দরবারে। অশ্রুধারা কোনো বাধা মানছিল না। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আম্মার, কি হয়েছে! বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, খুব বেশি খারাপ কিছু হয়ে গেছে। আজ আমার মুখ দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে অনেক বাজে কথা বলতে হয়েছে আর ওদের মাবুদদের গুণগান গাইতে হয়েছে এবং তারপরেই আমি ছাড়া পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার অন্তর থেকে কি সাড়া পাও? আম্মার বললেন, আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ এবং তাতেই সন্তুষ্ট। রাসূল (স)

www.pathagar.com

কাছে এসে স্ব-স্নেহে চোখ মুছিয়ে দিয়ে মমতা মাখা কণ্ঠে বললেন, আম্মার! কিছুই হয়নি। ওরা যদি আবারও এরকম কিছু করে তুমিও তাই করবে আজ যেভাবে করেছ। এরপরে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

مِنْ كُفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ الاٰمَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌ بِالاِيْمَانِ –

যে ব্যক্তি ঈমান আন্যর পরে আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এমতাবস্থায় যে তাকে বাধ্য করা হয়েছে! অথর্চ তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ। (তাহলে তার কোন দোষ নেই)।

www.pathagar.com

শুদ্ধ হাদীস এবং সাহাবাগণের উক্তি

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর সময়কালে সাহাবাগণের উক্তিসমূহ সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল এবং কিছু কিছু বক্তব্য শুদ্ধ হাদীসের বিপরীতেও পাওয়া গেল। এই জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহ) এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে কোনো সাহাবার কোনো উক্তিই দাঁড়াতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আরো বললেন, তাঁরাও মানুষ ছিলেন এবং আমরাও মানুষ।

কথাটির তাৎপর্য অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কোনো সাহাবার উক্তির বিপরীতে যখন শুদ্ধ হাদীস পাওয়া গেল, তখন হাদীসই গ্রহণযোগ্য। কেননা সকল সাহাবায়ে কেরাম সব সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে থাকতেন না। এমনও বহু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যখন অনেক বড় বড় সাহাবাগণ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে উপস্থিত নেই। সুতরাং হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর কর্মপদ্ধতি যা তাঁদের যার যার খেলাফত আমলে কার্যকর ছিল তা থেকে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যখন কোনো সমস্যা উপস্থিত এবং সে ব্যাপারে রাসূল (স)-এর বক্তব্য কি তা তাদের জানা নেই তখন সম্ভাব্য সকল সাহাবার সভা ডেকে তাদের সামনে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা হতো। উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে আগত সভাষদ সাহাবাগণ যার যার জানামতো হাদীস বর্ণনা করতেন। সাবধানতার জন্য সেইসব হাদীসকেও সত্যায়িত করে নেয়া হতো।

www.pathagar.com

হাদীসের ওপর আমল করা জরুরী

মুহাদ্দিস ইমামগণ সব সময় চেষ্টা করেছেন যেন তাদের সনদসমূহ 'সনদে আলী' হয়। অর্থাৎ রাসূল (স) পর্যন্ত বর্ণনা মাধ্যম যতো কম হয় ততোই তা উন্নত এবং তাদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী স্মরণশক্তিসম্পন্ন, দ্বীনদার, ন্যায়পরায়ণ এবং একনিষ্ঠ রাসূল (স)-এর অনুসারী হোক। তাকেই বলে 'সনদে আলী' অর্থাৎ উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন। রাসূল (স) পর্যন্ত পৌঁছাতে বর্ণনা মাধ্যম যতো বেশি হবে সনদের মান ততো কমে যাবে। তাকে বলা হয় 'সনদে নাযেল'। অর্থাৎ নিম্নগামী। যেমন ঃ ইমাম বুখারী (রহ) ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ) ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী ইমাম শাফেয়ীর চাইতে ৪৪ বছরের ছোট ছিলেন। ইমাম বুখারীর (রহ) ইন্তেকাল হয়েছে ২৫২ হিজরীর ঈদুল ফিতরের রাতে এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইন্তেকাল করেছেন ২০৪ হিজরীতে। ইমাম শাফেয়ীর (রহ) ইন্তেকালের সময় ইমাম বুখারীর বয়স ছিল দশ। কাজেই 'সনদে আলী' এবং 'সনদে নাযেল' কোনটা তা খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়! হাদীস জগতের শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ হযরত ইমাম মালিক (রহ) এবং সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ (রহ) ছিলেন ইমাম শাফেয়ীর শিক্ষক। যেমন ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ

حدثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر (رض) ياحدثنا مالك، عن ابن شهاب .
عن سعيد بن المسيب، عن ابى هريرة –

ইমাম মালিক আমাকে বলেছেন নাফে থেকে এবং তিনি ইবনে উমর থেকে। অথবা মালিক আমাকে বলেছেন ইবনে শিহাব থেকে, তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব থেকে এবং তিনি হযরত আবু হোরায়রাহ (রা) থেকে। এটাই সনদে আলী।

মুহাদ্দিসগণ বর্ণনার এই পরম্পরাকে 'সিলসিলাতুয্ যাহাব' অর্থাৎ 'সোনার শিকল' বলেছেন। এ পর্যায়েরই আরো আছে যেমন ঃ আহমাদ বিন্ হাম্বাল ইমাম শাফেয়ী (রহ) থেকে, তিনি ইমাম মালিক (রহ) থেকে, তিনি নাফে থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে। ব্যক্তিত্বগণের মর্যাদা অনুযায়ী এই পরম্পরা অত্যন্ত উন্নত, কিন্তু তারপরেও ইমাম আহমাদের জন্য তা 'নাযেল' পর্যায়ে পড়ে গেছে। অর্থাৎ সাহাবা পর্যন্ত পৌঁছাতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের চার স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। যদি ইমাম আহমাদ এমন কোন বয়স্ক, আস্থাভাজন বিশ্বস্ত শায়খ পেয়ে যান যাঁরা ইমাম মালিকের সমসায়িক। যেমন ঃ হযরত সুফিয়ান বিন আইনিয়া (রহ) অথবা লাইস বিন সো'ওদ যাঁরা ইবনে শিহাব যুহরীর শিষ্য। তাহলে ইমাম আহমাদের এই সূত্রের বর্ণনাকে 'সনদে আলী' বলা যাবে।

উপরোক্ত নীতি নির্ধারণের পরে একটা সামগ্রিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। হাদীস সমগ্র, মাগাযী এবং তাফসীর ইত্যাদি বিষয়সমূহে ইমাম আহমাদ বিন শিহাব যুহরী (রহ)-কে ইমামুল আয়েম্মা অর্থাৎ ইমামগণের ইমাম বলা হয়ে থাকে। বাস্তবতার নিরীখেও তিনি তা-ই।

www.pathagar.com

সকল হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁর সনদ সর্বোচ্চ সম্মানিত। ইমাম সুফিয়ান বিন আইনিয়া একদিন তাঁকে বলেছিলেন, আপনার ওপরে সকল মুহাদ্দিসীনের আস্থা এবং বিশ্বাস অটল-অবিচল। আপনি এখন কোনো সনদ ছাড়া হাদীস বর্ণনা করলেও কোনো সমস্যা নেই। তিনি হেসে বললেন, "সিঁড়ি ছাড়াই ছাদে উঠতে চাও"?

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক বলেন ঃ

الاسنادمن الدين لولا الاسناد لقال من شاء وماشاء -

সনদ এখন দ্বীনের অবলম্বন। এ যদি না থাকে তাহলে যার যা খুশী তাই বলে দেবে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ) বলেন, الاسناد سلاح المومنين। 'সনদ মুমিনদের হাতিয়ার'।

হাদীস গ্রহণে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর শর্তাবলী

একসময় এটা প্রচলন হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো সাহাবী (রা) অথবা কোনো তাবেয়ীর কোনো 'কওল'কে বর্ণনা করে সে অনুযায়ী কাজকর্ম করা হতো। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, এটা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। বরং যা হওয়া উচিত তাহলো, সর্ব প্রথম কুরআন মজীদকে দেখতে হবে, তারপরে রাসূল (স)-এর প্রমাণিত শুদ্ধ বর্ণনাসমূহ এবং তারপরে অধিকাংশ সাহাবাগণের (রা) ঐকমত্য প্রসূত কর্মপদ্ধতি। কোনো মওকুফ, মুনকাতে বর্ণনা বা সাহাবাগণের বক্তব্য সহীহ হাদীসের মুকালায় গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর কুফার হাদীস ও বর্ণনাসমূহের ওপর ভরসা ছিল। একসময় তিনি কুফার অত্যন্ত দুর্বল একটি বর্ণনাকেও অন্য শহরের শুদ্ধ বর্ণনার ওপরে প্রাধান্য দিতেন। ইমাম মালিক (রহ) মদীনা এবং হিজাজের বর্ণনাসমূহের ওপরে আস্থাশীল ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, শুদ্ধ এবং অবিরাম ধারাবাহিক বর্ণনাসমূহ তা কুফা, বসরা, মিশর, শাম এবং হিজাজ যেখানকারই হোক, গ্রহণযোগ্য। তিনি এটাও বলেছেন যে, যদি একটি বর্ণনায় কিছু কথা কম এবং অন্য একটিতে বেশি এমন হাদীস পাওয়া গেলে, বেশি বর্ণনাকারী কম বর্ণনাকারীর তুলনায় সবদিক থেকে আস্থাভাজন না হলে শুধু বেশি কথার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি আরও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যদি একই বিষয়ের দুটো করে হাদীস পরস্পর বিরোধী পাওয়া যায়, তাহলে সঠিক দলিল-প্রমাণ ছাড়া কোনোটিকে বাতিল করা উচিত নয়। যতোদূর সম্ভব ওর মধ্যে বর্ণিত বিধানের তাৎপর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করতে হবে। কেমন করে তা করতে হবে সে ব্যাপারেও তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'ইখতিলাফুল হাদীস' নামের এই বইখানি কিতাবুল উম-এর ব্যাখ্যা পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ফিকাহ্, উসূলে ফিকাহ্, ফিকহী মতামত

ইলমে ফিকাহ্‌র মর্যাদা সম্পর্কে কয়েকখানি আয়াত প্রণিধানযোগ্য ঃ

مَنْ يُرِدِاللّٰهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهَه فِىْ الدِّيْنِ -

আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ করবেন বলে স্থির করেন তাকে দ্বীনের ফিকাহ্ (বুঝ) দান করেন।

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىْ خَيْراً اكَثِيْراً -

যাকে হিকমত (দ্বীনের বুঝ) দেয়া হলো তাকে অনেক বেশি কল্যাণের অংশীদার করা হলো।

انْ رَسُوْلَ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم مر ابمجلس فىْ مسجده فقال كلا هما على خير واحدهما افضل من صاحبه اماهولأوفيه عون اللّٰه ويرغبون اليه فان شاء اعطاهم وان شأ منعهم واما هولأ فتيعلمون الفقه اوالعلم ويعلمون الجاهل فيهم افضل وانما بعثت معلما ثم جلس فيهم -

একবার রাসূলে কারীম (স) মসজিদে নববীতে এসে দেখলেন, সাহাবায়ে কেরাম দুই দলে বিভক্ত হয়ে রসে আছে। একদল আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ-প্রার্থনায় মশগুল, অন্য দল দ্বীনের তালিম দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, উভয় দলই ভাল কাজ করছে, একদল আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী হয়ে বসে আছে। তিনি চাইলে তাদের প্রয়োজন তিনি পূরণ করে দেবেন! না চাইলে দেবেন না। আর এই দ্বিতীয় দল সবচাইতে উত্তম কর্মে ব্যস্ত কেননা তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে নিজেরা বোঝার চেষ্টা করছে এবং যারা জানে না তাদেরকেও শোনাচ্ছে। একথা বলে তিনি তাদের মধ্যে বসে গেলেন এবং বললেন, এই দ্বীনের শিক্ষা দেয়াই আমার কাজ এবং দায়িত্ব।—

রাসূল (স) আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের জন্য দো'আ করেছিলেন ঃ اللهم فقيه فى الدين —হে আল্লাহ্ তাঁকে তোমার দ্বীনের ফকীহ্ বানাও। এই ধরনের বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে যাতে ইলমে ফিকাহ্‌র মর্যাদা অনুভব করা যায়।

ফিকাহ্‌র পরিচয়

ফিকাহ্‌র সংস্কারমূলক সংজ্ঞা এই যে, معرفة النفس مالها وما عليها عملا وقيل العلم بالاحكام الشرعية العملية التفصيلة من ادلتها – মানুষের দায়িত্বে যেসব কর্মসমূহ নির্ধারিত, তাকে জানার

www.pathagar.com

নাম ইলমে ফিকাহ্। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, শরীয়তের বিধানসমূহ সঙ্গত দলিল-প্রমাণ অনুযায়ী কার্যকর করার বিস্তারিতরূপ জানার নাম ইলমে ফিকাহ।

সকল ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণের সম্মিলিত অভিব্যক্তি এই যে, মূলনীতির উৎস শুধু দুটি— কুরআন এবং হাদীস। এই দুইয়ে মিলেই জীবন বিধান। তারপরে ফিকহী নীতিমালার অবস্থান। কিয়াস ও ইজমা এদেরই অনুগত-অনুযায়ী। কিয়াসের জন্য যখন পর্যন্ত বিবেচ্য বিষয় এবং অন্যান্য শর্তাবলী সুপ্রতিষ্ঠিত না হবে, তা হবে না। 'ইজমা'র জন্যও কোনো না কোনো সনদ অবশ্যই থাকতে হবে।"

الجمهورعلى انه لايجوز الاجماع الاعن سند من دليل اوامارة لان عدم السند لستلزم الخطاء اذ الحكم فى الدين بلا دليل خطاء -

অধিকাংশ ওলামা এবং বিশেষজ্ঞগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, দলিল ছাড়া 'ইজমা' অনুমোদিত (জায়েয) নয়। কেননা দলিল ছাড়া ইজমায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা বেশি এবং দ্বীনে দলিল প্রমাণ ছাড়া কোনো আদেশ বৈধ নয়।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ) বলেন ঃ

اتفقواعلى القول بالاجماع الذى مستنده الكتاب والسنة اولاستنباط من احدهما ولم يجوز والقول بالاجماع الذى ليس مستنداً الى اخد هما -

আলেমগণ সেই 'ইজমা'র প্রবক্তা হতে পারেন যার দলিল কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত অথবা সেখান থেকে গবেষণা করে বের করা হয়েছে। যে ইজমা এইভাবে করা হয়নি তা যেমন যুক্তিসঙ্গত নয়, তেমনি গ্রহণযোগ্যও নয়।

আল্লামা শাওকানী (রহ) বলেন ঃ

قَالَ جماعة لابدله من مستند فوجب ان يكون عن مستند ولأنه لوا نعقد عن غير مستند لاقتضى اثبات نوع، بعد النبى عليه السلام وهو باطل -

আলেমদের একটি দল বলেন যে, ইজমা'র জন্য দলিলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এজন্য এটা অবশ্যই জরুরী যে, ইজমা'র জন্য দলিল থাকতে হবে। দলিল ছাড়া ইজমা হলে তা রাসূল (স)-এর পরে নতুন কোনো শরয়ী বিধান নির্ধারণ করারই নামান্তর, তা ভুল।

বিস্তারিত এই আলোচনার পরে আর একটি ব্যাপার বিবেচনায় আসতে পারে, সলফে সালেহীনের কর্মপদ্ধতি কি ছিল ? হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ) হাদীস ভিত্তিক ফকীহ্ এবং দার্শনিক ফকীহ্গণের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন ঃ এই বৈষম্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর অনুধাবন উপলব্ধি এবং ইজতিহাদের রকম প্রক্রিয়া আলোচনার আগে দুই দলের মতপার্থক্যের মূল কারণ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ) যা বলেনঃ

www.pathagar.com

দার্শনীক ফকীহ্গণের ইজতিহাদের ধরন এবং শাস্ত্রজ্ঞান

وذالك انه لم يكن عندهم من الاحاديث والاثار مايقدرون به على استن باط الفقه على الاصول اللتى اختارهااهل الحديث ولم تنشرح صدورهم للنظر فى اقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنهما واتهوا انفسهم فى ذلك وكانوا يعتقدون فى ائمتهم فى درجة العليا من التحقيق وكان قلوبهم اميل شى الى اصحابهم كما قال علقمه هل احد منهم اثبت من عبد الله وقال ابوحنيفة ابراهيم افقه من سالم وولولافضل الصحبته لقلت علقمة افقه من ابن عمر -

তাদের কাছে হাদীসে রাসূল (স) এবং সাহাবায়ে কিরামের কর্ম-ঐতিহ্যের সেই রকম সংগ্রহ ছিল না, যা দিয়ে তারা মুহাদ্দিসীনদের মতো প্রয়োজনীয় মাসায়েল খুঁজে বের করবে। আর না তাদের অন্তরে এ ধরণের কোনো উপলব্ধির উদয় হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবেয়ীনগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং তাদের বক্তব্যসমূহ সংগ্রহ করে তার ওপর গবেষণা করি। এ ব্যাপারে তারা তাদের নিজেদেরকেই দায়ী করেছে এবং তারা তাদের ইমামদের ব্যাপারে এমন আস্থা ও বিশ্বাস তৈরী করে নিয়েছিল যে, তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই সবার ওপরে এবং তাদের সকল মনোযোগ শুধুমাত্র নিজেদের উস্তাদগণের ওপরেই নিবদ্ধ ছিল। যেমন অলকামাহ্ বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের চাইতে মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা আর কে আছেন ? ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেই দিয়েছেন যে, 'ইবরাহীম নখয়ী কুফী, ফিকাহ্ শাস্ত্র-জ্ঞানে হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন উমরের চাইতেও বড় এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) যদি সাহাবা না হতেন তাহলে আমি বলেই দিতাম যে, আল কামাহ্ তাঁর চাইতে অনেক বড় ফকীহ্।

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস ফকীহগণের চিন্তা-দর্শন

وكان عند هم انه اذافى المسئلة قرأن ناطق فلايحوز التحول منه الى غيره واذا كان القران محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه فاذا لم يجد وافى كتاب الله اخذو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كا ن..... مستفيضًا دايرابين الفقهاء اويكون مصتخاباهل بلدأن واهل بيت اوبطر يقته خاصة سواء عمل به الصحابة والفقها اولم يعلموا به ومتى كان فى المسئلة حديث فلا يتبع فيها خلان اثر من الاثارولا اجتهاداحد من المجتهدين واذا فرغواجهدهم فى تتبع الاحاديث ولم يجدوافى المسئلة حديثا اخذواباقولجماعة من الصحابه والتابعين ولا يتقيدون بقوم دون قوم ولا بلددون بلدكما يفعل من قبلهم فان اتفق جمهورالخلفاء والفقهاء على شى فهو المقنع وان اختلفوا اخذوابحديث اعلمهم علماء وادرعهم ورعاء واكثر هم ضبطًا اوما اشتهر عنهم فان وجد وشيئا يستوى فيه قولان فهى مسئلة ذات قولين فان عجز وعن ذلك ايضا تاملوا فى عمومات الكتاب والسنة وايماء اتمها واقتضاء اتمهل وحملوانظير المسئلة عليها فى الجواب اذا كانتَا متقاربين بادى الوائى الايعتمدون فى ذلك على قواعد من الاصول ولكن على مايخلص الى الفهم ويثلج به الصدركما انه يس ميزان التواترعددالرواة ولاحالهم ولكن اليقين الذى يعقبه فى قلوب الناس كما ينهنا عن ذلك فى بيان حال الصحابة وكا نت هذه الاصول مستخر جة عن ضيع الاوئل وتصريحاتهم -

মুহাদ্দিস-ফকীহ্গণ (ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ)-এর ইজ্‌তিহাদের ধরণ ছিল এই, যদি কোনো মাসআলায় সুস্পষ্ট কুরআনী ফায়সালা পাওয়া যেতো তাহলে তারা শুধু তাকেই মেনে নিতেন। কুরআনী আয়াতে যদি স্পষ্ট না হতো তখন হাদীসের সন্ধান করতেন এবং সেখান থেকেই ফয়সালা করতেন। তাই সে হাদীস মশহুর হোক অথবা অন্য যে কোনো শহর

www.pathagar.com

থেকেই সে বর্ণনা সংগৃহীত হোক। তা যদি শুদ্ধ সনদের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় তাহলে সাহাবা এবং ফকীহ্‌গণ তার ওপরে আমল করুক বা না করুক, তারা করতেন। এরকম সহীহ্ বর্ণনা পাওয়া গেলে তারা সাহাবা বা তাবেয়ীর ইজতিহাদকে গণ্য করতেন না। কিন্তু যখন তারা হাদীস খুঁজে পেতে সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টার পরেও ব্যর্থ হতেন তখন বাধ্য হয়ে সাহাবা এবং তাবেয়ীনগণের সম্মিলিত মতামত গ্রহণ করতেন। তা তারা যে শহরেরই হোক না কেন! মূলতঃ সাহাবা এবং তাবেয়ীনগণেরও এই পদ্ধতি ছিল। এরকম অবস্থায় যদি অধিকাংশ ফকীহ্ এবং খোলাফায়ে রাশেদুনের ফয়সালা বা সম্মিলিত মতামত পাওয়া যেতো তাহলে তাতে সন্তুষ্ট হতেন। তার মধ্যেও যদি কোনটিতে বৈষম্য দেখতেন, তখন তাদের মধ্যে কুরআন-হাদীসের পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা যাদের রয়েছে, যারা শক্তিশালী স্মরণশক্তির অধিকারী বলে পরিচিত তাদের বক্তব্য গ্রহণ করতেন। যদি কোনো মাসআলা এমন পাওয়া যেতো যার ওপরে দুটি বক্তব্য সাহাবাগণের এবং দুটি তাবেয়ীনের অর্থাৎ সমান সমান। তাহলে তাকে "দুই-বক্তব্য"ওয়ালা মাসআলা বলা হতো। এতো অনুসন্ধান এবং চেষ্টা-যত্নের পরেও যদি সে মাসআলা না পাওয়া যেতো তাহলে তারা আবার নতুন করে কুরআন এবং হাদীসের মধ্যে গভীর অনুসন্ধান চালাতেন এবং তার ওপরে কিয়াস করতেন। কিন্তু এভাবে কিয়াসের বেলায় তারা কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতেন না। বরং তাদের পদ্ধতি ছিল সেখানে বিবেক-বুদ্ধি এবং হৃদয়-মনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী সমাধান অর্জন। ধারাবাহিকতার জন্য যেমন বর্ণনাকারীর সংখ্যা ও অবস্থা শর্ত নয় বরং বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনই শর্ত যা নীরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার ফলেই অর্জিত হয়। ইজতিহাদের এই প্রক্রিয়া ছিল সাহাবাগণের এবং এই মহাত্মনগণ তাঁদের থেকেই তা অর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

হানাফী মাযহাব

এই চিন্তাধারা ও মতামতের উদ্যোক্তা ইমাম আবু হানিফা (রহ) । তিনি হিজরী ৮০ সনে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। প্রায় সত্তুর বছর তিনি জীবনের আয়ুস্কাল পেয়েছিলেন। হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা কাযী আবু ইউসুফ যার আসল নাম ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আনসারী তাঁর ছাত্র। জন্ম ১১৩ হিজরী, ওফাত ১৮৬ হিজরী সাল। আল্লামা ইবনে খালকান বলেন ঃ

ماكان فى اصحاب ابى حنيفة مثل ابى يوسف لولاابويوسف ماذكر ابوحنيفة -

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর ছাত্রদের মধ্যে কাযী আবু ইউসুফ (রহ)-এর কোনো তুলনা ছিল না। তিনি না হলে ইমাম আবু হানিফা বিস্মৃত হয়ে যেতেন। আর এক সুযোগ্য ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান ফারকাদ আশ্ শাইবানী। ১৩২ হিজরীতে তার জন্ম। ইন্তেকাল ১৮৯ হিজরীতে। তৃতীয় শাগরেদ জাফর বিন হাযিল কুফী। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ১১০ হিজরীতে এবং ইন্তেকাল ১৫৭ হিজরী সালে। চতুর্থ শাগরেদ হাসান বিন যিয়াদ লো'লোই (রহ) যিনি আনসারের গোলাম ছিলেন এবং উপরোক্ত তিনজন ইমামেরই ছাত্র। তাঁর ইন্তেকাল ২০৪ হিজরীতে। কুফা ও ইরাকে এই চারজনার কারণেই এই মাযহাব বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ওলামায়ে মুহাদ্দিসীন বলেন, কাযী আবু ইউসুফ (রহ) এঁদের মধ্যে সবচাইতে বেশি হাদীসের অনুগামী ছিলেন।

ফিকাহ্র মূল নীতি

اصول الفقه اربعة كتاب الله وسنت وسوله واجماع الامة والقياس ولابد من البحث من كل واحد من هذه الاقسام ليعلم طريق تخريج الاحكم -

ফিকাহ্র উৎস মূল চারটি। কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে উম্মত ও কিয়াস। এদের বিষয়গুলো নিয়ে এই জন্য আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয় যেন বিধান উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া জানা যায়।

ইজতিহাদের শর্তসমূহ

شرط لاجتهاد ان يجوى علم الكتاب بمعانيه اللغويته والشرعية ووجوهه التى قلنا من الخاص والعام والامر اولنهى وسائرالاقسام السابقته ولكن لايشترط عليهم جميع مافى الكتاب بل قدرما يتعلق به الاحكام ويستنبط هى منه وذلك قدرخمس مائة ايات التى الفتها وجمعتها فى

www.pathagar.com

التفسير الاحمدية وعلم السنة بطرقهاالمذ كورة فى اقسل مهامع اقسام الكتاب وذلك قدرمايتعلق به الاحكام اغنى ثلاث الاف دون سائرهاوان يعرف وجوه القياس بطرقها وشرائامزكورة انفا -

ইজতিহাদের শর্ত হলো কুরআনের ভাষা ও নীতিশাস্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য জানা থাকতে হবে এবং যেসব মূল কারণ অর্থাৎ বিশেষ ও সাধারণ আদেশ ও নিষেধসমূহ এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ণ কিতাবের অভিজ্ঞতা জরুরী নয়। প্রয়োজন ততোটুকু যাতে সংশ্লিষ্ট বিধান উদ্ভাবন সম্ভব হয়। তাফসির আহমদীতে প্রায় পাঁচশত আয়াত আমি চিহ্নিত করে রেখেছি। কুরআনের সাথে হাদীসের বিভাগ ও কিতাবসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সেখানে হাদীসের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে মাত্র তিন হাজার। এমন নয় যে, হাদীস বলতে যা কিছু বোঝায় তার সব। সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ সমেত কিয়াসের নিয়ম জানা থাকতে হবে।

ইজমা ও কিয়াস

الاجماع اتفاق المجتهدين من هذه الامة فى عصر على امرشرعى وقال بعض النظاميه والشيعة انه محال ولوسلم فاالعلم به محال ولوسلم فنقله الينا محال -

কোনো একটি সময়ের জাতীয় বরণ্যে মুজতাহিদগণের কোনো শরয়ী বিধানের ব্যাপারে একমত হওয়াকে ইজমা বলা হয়। কতিপয় নেজামিয়া ও শিয়া এর বাস্তবতা অসম্ভব মনে করেন। এর বাস্তবতা মেনে নিলেও তা থেকে কোনো 'তথ্য' অসম্ভব। আর যদি কোনো তথ্য বেরিয়েও আসে তাহলে তা আমাদের পর্যন্ত পৌছা অসম্ভব।[১]

ইজমা দুই রকমের ঃ ইজমা দুই ধরনের হতে পারে। একটি ঃ যার উৎস আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলের হাদীস। দ্বিতীয়টি ঃ ফকীহ্‌ ও ওলামাগণের সম্মিলিত রায়। তা যে কোনো প্রয়োজনের ভিত্তিতেই হোক না কেন। প্রথম ইজমা অবশ্য পালনীয়। আর দ্বিতীয়টি ইচ্ছাধীন।[২]

الجمهو رعلى انه لايجوز الاجماع الاعن سند من دليل اومادة لان عدم السند ليلتزم الخطاء اذا الحكم فى الدين بلا دليل خطاء -

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, দলিল ছাড়া ইজমা জায়েয নয়। কেননা দলিলের ভিত্তি ছাড়া ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী এবং দ্বীনে দলিল ছাড়া কোনো আদেশ বৈধ নয়।

১. তালবীহ্‌
২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্‌

www.pathagar.com

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ বলেন ঃ

اتفقوا على القول بالاجماع الذى مستنده الكتاب والسنة اولاستنباط من احدهما ولم يجوز والقول بالاجماع الذى ليس مستندا الى احدهما -

ইজমার ব্যাপারে আলেমদের ক্ষেত্রে এই নীতির দাবি রাখে যে, তার দলিল সুস্পষ্টভাবে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহর (স) মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। অথবা তা থেকে উৎসারিত। যে ইজমার সনদ কুরআন অথবা হাদীস থেকে নয় আলেমগণ তার প্রবক্তা হতে পারেন না।

কিয়াসের সংজ্ঞা

هو تقدير الفرع بالاصل فى الحكم والعلة -

বিষয়কে (যাকে মুকাইয়েস বলা হয়, অর্থাৎ যার ওপর জরিপ চালানো হয়েছে) মূল (যার ওপর ভিত্তি করে জরিপ করা হয়েছে) এর সাথে আদেশ এবং তার কারণকে সমান সমান করা।

এবং

مساوات المسكوت بالنصوص فى علة الحكم -

যে কাজের আদেশ শরীয়তে আসেনি তাকে চুলচেরা বিশ্লেষণের সাথে যে আদেশ এসেছে তার কারণের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

এছাড়া

والفقهاء اذا اخذواحكم الفرع من الاصل سمواذلك قياسا النقدرهم الظرع بالاصل فى الحكم والعلة -

ফকীহ্গণ যখন মূল থেকে শাখা-প্রশাখা বের করে নিয়ে আসেন তখন তাকে 'কিয়াস' বলা হয়। কেননা তারা অংশকে মূলের সাথে আদেশ ও কারণে ভারসাম্য স্থাপন করেন।

অর্থাৎ নিজের ধারণাপ্রসূত বিষয়কে নিষিদ্ধতা ও তার কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা। যেমন ক্ষতি এবং কল্যাণকে কোনো আদেশের কারণ হিসেবে তুলে ধরা। এটাই উত্তম বিবেচনা। এছাড়া আরও কিছু মূলনীতি রয়েছে। এর মধ্যে আল্লামা আবু হাফ্ছ, উমর বিন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন ইসমাঈল নস্ফী (ওফাত ৫৩৭ হিঃ) আল্লামা কুরখীর (ওফাত ৩০০ হিঃ) মূলনীতি পেশ করেছেন। যার ওপরে হানাফী মতাবলম্বীদের বিশ্লেষিত মাসায়েলের ভিত্তি স্থাপিত। তার মধ্যে এই দুই মূলনীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. নুরুল আনওয়ার
২. মুসাল্লাম আছ্ছুবুত
৩. জামী

www.pathagar.com

الاصل ان كل اية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ اوعلى الترجيح والاولى ان تحمل على التاويل من جهة التوفيق -

الاصل ان كل خبر يجي بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ اوعلى انه معارض بمثله -

অর্থাৎ সেই প্রতিটি আয়াত যা আমাদের ফকীহ্‌দের বক্তব্যের বিপরীত হবে তা প্রথম বাতিলের মধ্যে গণ্য করা হবে। অথবা অগ্রাধিকার প্রদানের বিবেচনা করা হবে। এবং তারপর উত্তম এই যে, তাকে তাৎপর্যের গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ দেয়া হোক এবং এভাবেই সেই প্রতিটি হাদীস যা আমাদের হাদীস বিজ্ঞানের অধিকারীদের বিপরীত হবে প্রথমত সে হাদীস বাতিল বলে গণ্য হবে! অথবা এই যে, অবশ্যই সেই হাদীস অন্য কোনো হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক।

এটাও একটা নীতি যে, হাদীস দিয়ে কুরআনের ওপর পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা জায়েয আছে এবং এমনকি হাদীস দিয়ে কুরআনের আয়াতও বাতিল হয়ে যেতে পারে! (?)

www.pathagar.com

মালিকী ফিকাহ্

হযরত ইমাম মালিক (রহ) ছিলেন শায়খুল মুহাদ্দিসীন। সকল মুহাদ্দিসীনের নিঃসঙ্ক স্বীকারোক্তি। তাঁর বর্ণনা উন্নত এবং শ্রেষ্ঠতর। তাঁর মুয়াত্তায় নিম্নে বর্ণিত ধারানুক্রমে হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। সুবিন্যস্ত সংকলন রচনার উদ্দেশ্যে তিনি দশ হাজার হাদীসের এক বিশাল সংগ্রহ নিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু শুদ্ধতা নির্ণয়ে তাঁর খোদায়ী নূরে আলোকিত অন্তরচক্ষু পাকা জহুরীর মতো আসল হিরা খুঁজে পেতে মাত্র ১৭২০ খানি বর্ণনাকে হাদীস হিসেবে নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১. মসনাদ ও মরফু ৬০০

২. মুরসাল ২৩৫

৩. মওকুফ ৬১৩

৪. তাবেয়ীনের বক্তব্য ও ফতোয়া ২৮৫

৫. বালাগাতে ইমাম মালিক[১]

মুয়াত্তার বিষয় শুধু নীতি শাস্ত্রীয় বিধানসমূহ (ফিকাহ্)। একারণে বুখারী মুসলিমের মতো অসংখ্য অধ্যায় তাতে নেই। এজন্য মুহাদ্দিসীনের রীতি অনুযায়ী তাকে কিতাবুস সুনান বলা উচিত। 'মুয়াত্তা' শব্দটি তাওতীয়াহ্'র কর্মপদ। যার মানে পিষ্ট করা বা পদদলিত করা অথবা কোনো কিছুর ওপর দিয়ে চলা। মুয়াত্তার আভিধানিক অর্থ পদদলিত করা হয়েছে এমন, বা যার ওপর দিয়ে পদচারণা করা হয়েছে। ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ) বলেন, রূপক অর্থ এই যে, 'যার ওপর দিয়ে সকল ওলামা, ইমাম এবং মনীষীবৃন্দ চলাচল করেছেন। তাহলে বলা যায় তা 'সর্বসম্মত' অথবা এই যে, সেই মাসায়েল নিয়ে গঠিত যার ওপর ভিত্তি করে সাহাবাগণের কার্যক্রম পরিচালিত হতো এবং পূর্বসূরীগণ যার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে গিয়েছেন।

ইমাম মালিকের চিন্তাধারা

ইমাম মালিক (রহ) তাঁর ফতোয়াসমূহ কুরআন ও হাদীসের ওপর ভিত্তি করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি হিজাজের শ্রেষ্ঠতম আলেম ও মুহাদ্দিসীনের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ যে নীতির ওপর মদীনাবাসী চলতেন। বিশেষ করে হযরত উমর (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) কে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কেননা নাফে মাওলার মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ বিন উমরের জ্ঞানগত অনেক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি তিনি লাভ করেছিলেন। অন্যান্য শহরের বর্ণনাসমূহকে তিনি এ কারণে অগ্রাহ্য করতেন যে, মদীনার পূর্বসূরীগণ সেভাবে চলতেন না। কিন্তু তার অনুসরণীয়

১. মুকাদ্দাস মাছওয়া, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্

পূর্বসূরীদের থেকে কোনো মাসআলার সমাধান না পেলে নিজেই 'কিয়াসের' ওপর নির্ভর করতেন। যেমন আবু হানিফার সর্বশেষ অবলম্বন 'ইসতেহসান' (উত্তম বিবেচনা)। তেমনি তাঁর রয়েছে 'মুসলেহাতে মুরসালাহ্' অর্থাৎ হাদীসের কল্যাণ।

'মুসলেহাতে মুরসালাহ্' তাকে বলা হয় যার বাতিল হওয়া এবং গ্রহণ করার সাক্ষ্য কোনো সুনির্দিষ্ট নির্ধারণকারী নির্ধারণ করে দেননি।

যেমন ঃ চুরির স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অভিযুক্তকে মারা বা প্রহার করা ইমাম মালিক (রহ) জায়েয মনে করেন। যা অন্যান্য ফকীহগণ জায়েয মনে করেন না। ইমাম মালিক (রহ) মদীনার পণ্ডিতগণের 'ইজমাকে' একমাত্র নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ীর (রহ) নীতি-দর্শন ও ইজতিহাদের রীতি-নীতি

তিনি মনে করেন যে, কোনো মুজতাহিদের পাঁচটি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে। সর্বপ্রথম কুরআন, তারপর হাদীস এবং এতদুভয়ের বিভাগসমূহ, খাস, আম, মুজমাল, মুবাইয়েন, নাসেখ ও মনসুখ সম্পর্কে সম্যক ধারণা। হাদীসসমূহের বর্ণিত পাতাগুলোর সকল বিষয়ের ওপরে গভীর পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টি। তৃতীয় আরবী ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক সামগ্রিক জ্ঞান। চতুর্থ ঃ সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহের ওপর পর্যায়ক্রমিক ধারণা এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনের পদমর্যাদা ও শ্রেণী বিন্যাস করতে পারা। তদুপরি তাদের মতপার্থক্যসমূহের প্রেক্ষিত ও কারণসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান। সর্বোপরি কিয়াসের ধরনগুলোর ওপর অভিজ্ঞতা।

ইজতিহাদের তিনটি পর্যায় ঃ উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী মুহাদ্দিসীন, মুজতাহিদের দু'টি স্তর নির্ণয় করেছেন। স্বাধীন, স্বতন্ত্র মুজতাহিদ এবং স্বতন্ত্র মুজতাহিদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত মুজতাহিদ।

স্বতন্ত্র মুজতাহিদ তাকে বলা হয়, যে পূর্বতন মুজতাহিদগণ থেকে তিনটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবেন।

১. পূর্বগামী কারো নীতি-পদ্ধতির প্রভাব ছাড়া নিজেই উদঘাটন করতে পারেন।

২. হাদীসসমূহ এবং সাহাবাগণের কর্ম প্রক্রিয়া সংগ্রহ করেন এবং তার মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। যা গুরুত্বপূর্ণ তার গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারেন। যা সামঞ্জস্যপূর্ণ তার সমন্বয় সাধন করতে পারেন এবং যা সম্ভাবনাময় তার সম্ভাব্যতাকে যাচাই-বাছাই করে প্রকাশ করতে পারেন।

৩. বর্তমান ও অতীতের মাসআলাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তিনি এমন নীতি উদ্ভাবন করবেন যা যতোদূর সম্ভব ভবিষ্যতের জন্যও কার্যকর থাকবে।

ইমাম শাফেয়ীর দৃষ্টিতে ইজমা ও কিয়াস

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কাছে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের সেই রকম উপযোগিতা নেই যা অন্যান্য মাযহাবে রয়েছে। তিনি যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. কোনো আদেশের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য অথবা শর্তের কারণে ঝুলে থাকা, সেই শর্ত এবং বর্ণিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া না গেলে আদেশের নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে।

২. নীরব ইজমা যুক্তিসঙ্গত নয়। হতে পারে, কিছু সাহাবা এটা বলেছেন এবং কিছু সাহাবা কাজটি দেখে নীরব থেকেছেন। সুতরাং তাদের নীরবতা সমর্থনের দলিল নয়।

৩. এক মূলকে অন্য মূল দিয়ে কিয়াস করা সঙ্গত নয় এবং মূলের ব্যাপারে এটা বলা সমীচীন নয় যে, এটা কি কারণে এবং কেমন করে আছে। বরং অংশ বা শাখা-প্রশাখার মধ্যে বলা যেতে পারে যে, এটা কেন?

www.pathagar.com

৪. নাযিলের বিশেষ কারণ মূল আদেশের বহিভূর্ত নয়। অর্থাৎ কুরআনের আদেশ যে ব্যাপারে নাযিল হয়েছে সেই ঘটনা এবং প্রেক্ষাপট অবশ্যই এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যদিও সাধারণ বাণী অনুযায়ী কারণ ছাড়া নাযিলসমূহও মূল আদেশের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। কিন্তু নাযিলের কারণ কিছুতেই মূল আদেশের বহির্ভূত হতে পারে না।

ইজমায়ী মাসায়েল। সবার আগে ইজমা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, দীর্ঘ দীর্ঘ দিনের প্রাণপাত অনুসন্ধানের পরে কুরআন মজীদের এই আয়াতকে আমি হেদায়েতের আলোর মশাল হিসেবে পেয়েছি।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّه مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا -

যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা পেয়ে যাবার পরেও রাসূল-এর বিরোধিতা করলো এবং মুসলমানদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে চলতে শুরু করলো। তাকে আমি জাহান্নামে ফেলে দেবো এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) কোনো এক বিতর্কানুষ্ঠানে বলেছেন যে, ফরযসমূহ যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব এবং অন্যান্য হারাম করা জিনিস— এগুলো এমন মাসায়েল যার মধ্যে কোনো সন্দেহ সংশয়েরও অবকাশ নেই। এই রকম বিষয়গুলোকে আমরা সার্বজনীন মাসায়েল বলতে পারি।

কিয়াসের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর রায়

কিয়াসের ব্যাপারে তিনি তিনটি ধরণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (১) মূল আদেশকে বিবেচনায় রেখে যে কোনো যৌগিকের সমাধান করা হবে। যেমন ঃ কুরআন মজীদে 'দাসীদের' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'জ্বিনায় লিপ্ত হয়েছিল বলে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীন মহিলাদের অর্ধেক। কুরআন মজীদে 'দাসদের' ব্যাপারে যেহেতু কোনো আদেশ নেই! এইজন্য এই আয়াতকে মূল ধরে গোলামদের ব্যাপারে কিয়াস করা হবে। কিন্তু অংশ যদি মূল আদেশের প্রথম প্রতিক্রিয়ার আওতায় না আসে সেক্ষেত্রে দু'টি বিবেচনা সামনে রাখতে হবে। এক ঃ মূল থেকে আদেশের কারণ উদঘাটন করতে হবে। সেই কারণ অনুযায়ী অংশের ওপরেও মূলের আদেশ কার্যকর হয়ে যাবে। যেমন কুরআন মজীদে 'মদ' নিষিদ্ধতার উল্লেখ রয়েছে এবং 'নেশা' তার কারণ! এখন যে বস্তুর মধ্যে মদ ছাড়া নেশা পাওয়া যাবে তার ওপরেও নিষিদ্ধতার আদেশ জারী করা হবে। এই ধরনের কিয়াসের নাম ইমাম শাফেয়ী (রহ) কেয়ামুল মা'নী অর্থাৎ 'তাৎপর্যগত' কিয়াস রেখেছেন।

(২) দু'টি ভিন্ন আদেশের প্রেক্ষিতের মধ্যে একটা তৃতীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। যার প্রকৃতি পরিষ্কারভাবে জানা নেই। এমতাবস্থায় ঐ তৃতীয় ঘটনাটি প্রথম দু'টি ঘটনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিবেচনা করতে হবে। এখন যার প্রকৃতির সাথে তার বেশি মিল পাওয়া যাবে, তার ওপরে আরোপিত আদেশ তার বেলায়ও কার্যকর হবে। এ ধরনের কিয়াসের নাম ইমাম শাফেয়ী 'কিয়াসুস শোবাহ" অর্থাৎ সন্দেহজনক কিয়াস রেখেছেন। যেমন ইমাম শাফেয়ীর নিজস্ব একটি কিয়াস এরকম যে, 'জ্বিনার' ফলে নিষিদ্ধতার (হারাম) প্রেক্ষিত সৃষ্টি হয় না।

www.pathagar.com

অর্থাৎ পিতা কোনো মহিলার সাথে জ্বিনা করলে সেই মহিলার মেয়ের সাথে পুত্রের বিবাহে কোনো বাধা নেই। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এ ব্যাপারে রায় দিয়েছেন যে, 'জ্বিনা'র ফলে বৈবাহিক নিষিদ্ধতার (হারাম) কারণ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মহিলাদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে বিবাহের কারণে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় জ্বিনা সংঘটিত হলেও তাই হবে। যেমন ঃ যদি কোনো লোক কোনো মহিলার সাথে জ্বিনা করে তাহলে যেভাবে সে তার নিজের স্ত্রীর মা বা কন্যার সাথে বিবাহ করতে পারে না, ঠিক সেভাবেই এই জ্বিনার সঙ্গী মহিলার মা অথবা মেয়েকে সে বিবাহ করতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর দলিল হলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে সেই মহিলাদের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যাদের সাথে বিবাহ করা জায়েয নেই। তারপরে বলেছেন أُحِلَّ لَكُمْ مَا وراء ذلكم অর্থাৎ যাদের হারাম হওয়ার কথা তোমাদের বলা হলো তাদের ছাড়া বাকী সব নারীই তোমাদের জন্য হালাল এবং যেসব মহিলাদের হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে জ্বিনার সঙ্গী মহিলার মা ও মেয়ের কথা বলা হয়নি। যে আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা জারী করেছেন তা বিবাহ হয়ে যাবার পর মানুষ নিজের স্ত্রীর মা এবং মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না। এমনো তো হতে পারে যে, জাহিলিয়াতের যুগে অনেকেই অনেক মেয়ে লোকের সাথে জ্বিনা করেছে এবং সেইসব মহিলাদের সন্তানদের সাথে ইসলাম কবুল করার পরে বিবাহ করেছে (?)

কিয়াসে ইসতেহ্সানের বিরোধিতা

ইমাম শাফেয়ী (রহ) এই উত্তম বিবেচনার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন। আমরা তার **'কিতাবুল উম' সপ্তম খণ্ডের** একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

"যে ব্যক্তি এটা বললো যে, আমি এই 'উত্তম বিবেচনা' না আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী করছি না তাঁর রাসূলের (স) আদেশ অনুযায়ী। তাহলে সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের (স) কথাকে গ্রহণ করেননি বা মেনে নেয়নি এবং যা কিছু সে বলেছে তার তথ্যানুসন্ধান সে আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের (স) আদেশ থেকে করেনি। তাছাড়া এই রকম কথা যে ব্যক্তি বললো, তার কথার মধ্যে ভ্রান্তি তো সুস্পষ্ট! কেননা সে যা বলেছে তাহলো এই যে, আমি যা কিছু বলছি এবং করছি। না আমাকে তার আদেশ দেয়া হয়েছে না সে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে! আমাকে যে জিনিসের আদেশ করা হয়েছে এবং নিষেধ করা হয়েছে, আমার কথা ও কাজ ঠিক সেই পন্থার ওপরে দাঁড়ানো নয়। অথচ অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ লোকের কথার উল্টোটা ফয়সালা করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের বাইরে যাবার অধিকার তিনি কাউকে দেননি।"

এই ব্যাখ্যার পরে ইমাম শাফেয়ী (রহ) কিয়াসের ব্যাপারে দু'টো উদাহরণ দিয়েছেন এবং ইমাম মুহাম্মদের সাথে তার একটি আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথম উদাহরণ এই যে, হযরত আবু হোরায়রাহ (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন, "নিজের ভাইয়ের বাগদত্তার সাথে তুমি বাগদান করো না।" এর পরে দ্বিতীয় বর্ণনা, যা হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত ঃ তিনি রাসূল (স)-এর কাছে নিবেদন করলেন, মুয়াবিয়া বিন আবী সুফিয়ান ও আবু জাহান তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব

দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূল (স) বলেছিলেন, আবু জাহান সবসময় সফরে থাকে আর মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান তো এক হতোদরিদ্র লোক। এদের চাইতে ওসামা বিন যায়দকে বিয়ে করা তোমার জন্য ভাল। এই হাদীস থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণ হয়। একটি এই যে, তিনি বুঝে নিয়েছিলেন ওরা একজনার পরে আর একজন তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এবং তিনি ঐ দু'জনার বিবাহের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও ফাতেমাকে ওসামা বিন যায়দের সাথে বিবাহ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এইজন্য আমরা দু'টো বর্ণনাকে সামনে রেখে এই সমন্বয় সাধন করছি যে, ফাতেমা বিনতে কায়েস একজনকেও তার সম্মতির কথা তখনো বলেননি অথচ সে অধিকার তার ছিল। রাসূল (স)-এর প্রথম ইরশাদের উদ্দেশ্য এই যে, যদি কারো বিবাহের প্রস্তাব মেনে নিয়ে কোন স্ত্রীলোক তাকে বিবাহের অনুমতি দিয়ে দেয়, সে রকম অবস্থায় অন্য কোনো পুরুষের তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়াও নিষেধ।

দ্বিতীয় উদাহরণে ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলছেন, এক লোক একটি বাড়ি কিনলো তারপর সেখানে সে নতুন করে একটা দালান তৈরী করলো। এই সময় অগ্রক্রয়ের অধিকার নিয়ে একজন এসে সে বাড়ি দাবি করে বসলো। এখন রায় কি হবে? এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ এবং তাদের সমর্থক বিশেষজ্ঞগণ রায় দিয়েছেন যে, অগ্রক্রয়ের অধিকারী সে বাড়ি নিয়ে নেবে এবং ইমরাত তৈরীকারী তার ইমারত ভেঙ্গে নিয়ে যাবে। কাযী বিন আবি লায়লা রায় দিয়েছেন বাড়ি ও ইমারত দুটোই নব্য দাবিদার পেয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, এ ব্যাপারে আমার মতামত এঁদের সবার চাইতে ভিন্ন। আমার মতে, যখন এক ব্যক্তি একটা বাড়ি কিনে তাতে নতুন করে একটা ইমারত তৈরী করলো বা আংশিক তৈরী করলো এখন কোনো বৈধ দাবিদার এসে তা দাবি করলে সেই দাবিদারকে বলতে হবে এই বাড়িটাই তোমার যদি পেতে হয় তাহলে ক্রয়কারী এবং তাতে ইমারত রচনাকারীর সমুদয় অর্থ বাজার দর অনুযায়ী আদায় করে দাও, তারপর বাড়ি দাবি করো। তা না হলে বাড়ির দাবিটাই ছেড়ে দাও। এছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। কেননা খরিদদার তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইমারত তৈরী করেছে একারণে তার ওপরে সেই ইমারতের উচ্ছেদ ফরয নয়।

আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রা) ও শাফেয়ী (রহ)-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর যোগ্যতম ছাত্রদের একজন এবং ইসলামের জগতে তিনি অত্যন্ত উঁচুদরের ইমাম এবং সর্বজন শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি তাঁর উস্তাদ ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর প্রণীত নীতিমালার প্রায় সবটাই কার্যকরভাবে মেনে নিয়েছেন। শুধু এই কয়েকটি ব্যাপারে সংস্কার অথবা সংযোজন করেছেন।

১- আমাদের কিয়াসের চাইতে সাহাবাগণের বক্তব্যসমূহ উত্তম।

২- খবরে ওয়াহেদ কার্যকরভাবে গ্রহণযোগ্য।

এই সামস্য সংযোজনের কারণে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ)-এর ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মাযহাবের সাথে মতপার্থক্য খুব কমই দেখা যায়।

ইমাম মালিক (রহ)-এর মাযহাবের সাথে ইমাম শাফেয়ী (রহ) প্রায় শতকরা (২০%) বিশ ভাগ মাসআলায় ইখতিলাফ রয়েছে। এই ইখতিলাফ ইবাদত পর্যায়ে কম এবং মোয়ামেলাত পর্যায়ে বেশি। হানাফী মাযহাবের সাথে ইমাম শাফেয়ীর প্রায় (৭০%) সত্তুর

www.pathagar.com

ভাগ মাসআলায় ইখতিলাফ রয়েছে। এই ইখতিলাফ ইবাদত, মুয়ামেলাত তথা নীতিশাস্ত্রের প্রতিটি বিভাগে অত্যন্ত প্রকটভাবে দৃশ্যমান। ইবাদত ইত্যাদি বিষয়ের পার্থক্য চিহ্নিত করে একটা নকশা তৈরী করা হলো এবং সাথে সাথে ফিকাহ্ ও হাদীসের অল্প অল্প দলিলও দেয়া হলো যাতে করে পাঠক খুব সহজেই ব্যাপারটা যুক্তিসঙ্গতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

মাসায়েলে হানাফিয়া

১. ধারাবাহিকতা ও নিয়ত ছাড়া অজু জায়েয।

২. পানি না পাওয়া গেলে খেজুর রস দিয়ে অজু করা যাবে।

৩. অজু এবং গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয।

৪. নামাযরত অবস্থায় অট্টহাসি হাসলে নামায-অজু দুটোই যাবে।

৫. রোযা অবস্থায় অজুর সময় কুলি করতে গিয়ে গলার মধ্যে পানি চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

৬. কাফির গোলামের পক্ষ থেকে মুসলিম মালিক সদকা-ফেতরা আদায় করবে।

৭. নফল রোযার কাযাও ফরয রোযার মতো আদায়যোগ্য।

৮. ঘরের আঙ্গিনায় ১ সের পরিমাণ তরকারী উৎপাদিত হলেও তার রাজস্ব দিতে হবে।

৯. জুম'আ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নগর এবং রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতি শর্ত।

১০. সাধারণ ব্যবহারিক অলংকারের যাকাত দিতে হবে।

১১. জবরদস্তিমূলকভাবে স্বামীর কাছ থেকে তালাক লিখিয়ে নিলে তা জায়েয এবং তালাক হয়ে যাবে।

১২. মুসলিম গোলামের কাফিরকে নিরাপত্তা দেয়া জায়েয হবে না।

১৩. অসুস্থ ও সফররত অবস্থায় জুমা বাইনাস সালাত তিন জায়েয নয়।

১৪. ঘোড়ার গোশত নাজায়েয।

১৫. ইমামের পেছনে সরব অথবা নীরব নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া উচিত নয়।

১৬. নাবালেগের সম্পদের ওপরে যাকাত নেই।

১৭। কুরবানী ওয়াজিব এবং প্রত্যেক সামর্থবানের জন্য একটি ছাগল।

১৮। স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারে।

মাসায়েলে শাফেয়ীয়া

১. নিয়ত ও ধারাবাহিকতা ছাড়া অজু শুদ্ধ হবে না।

২. পানি ছাড়া অজু শুদ্ধ হবে না।

৩. এই দুটো কাজ ফরয নয়।

৪. নামায ছুটে যাবে কিন্তু অজু নষ্ট হবে না।

৫. ভুল করে অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুলি করার সময় পেটে পানি গেলেও রোযা ভাঙ্গবে না।

www.pathagar.com

৬. কাফির গোলামের ওপরে সদকা-ফেতরা ধার্য করা হয় না।

৭. নফল রোযার কাযা আদায় করা বাধ্যতামূলক নয়।

৮. বিশ মণের (২০ মণ) কম শস্য উৎপাদনকারীর ওপরে রাজস্ব ধার্য করা যাবে না।

৯. যে কোন অবস্থায় জুমা শুদ্ধ শুধু ৪০ জনের একটা জামায়াত হওয়া প্রয়োজন।

১০. সাধারণ ব্যবহারিক অলংকারের যাকাত নেই।

১১. এরকম তালাক অর্থহীন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

১২. মুসলিম গোলামও কাফিরদের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম।

১৩. অসুস্থ এবং সফরে জুমা বাইনাস সালাত জায়েয আছে।

১৪. ঘোড়ার গোশত জায়েয।

১৫. প্রতিটি নামাযে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়া উচিত। নইলে নামায হবে না।

১৬. যাকাত আদায় করা অবশ্য কর্তব্য।

১৭. কুরবানী সুন্নত। প্রতিটি ঘরের মালিক ঘরের সমস্ত লোকের তরফ থেকে একটা ছাগল বা ভেড়া কুরবানী করতে পারে।

১৮. অভিভাবক ছাড়া কোনো মেয়ে বিয়ে করতে পারে না।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য ও বাণীসমূহ

'নাযুরাতুল হক' ২৬ পৃষ্ঠায় আল্লামা মুরজানি হানাফী (রহ) বলেন ঃ

قَالَ الشافعى رَحْمَةُ اللّٰه عَلَيْهِ اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنت رسول اللّٰه صلّى اللّٰهُ عليه وسلم لم يحل له ان يدعهابقول احد -

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, সকল মুসলমানদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, রাসূলে কারীম (স)-এর হাদীস কারো কথার কারণে কোনো অবস্থায় পরিত্যাগ করা যাবে না।
মীজানে কুবরা,ইমাম শা'রানী, পৃষ্ঠা ৫০

وكَانَ يَقُوْلُ رَضِىْ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا ثبت عَنْ النَّبِىّ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بابى وامى شى لم يحل لناتركه -

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলতেন, আমার পিতা-মাতা রাসূল (স)-এর ওপরে উৎসর্গিত হোক, যখন রাসূল (স)-এর কোনো বর্ণনা সুস্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যায় তখন তাকে উপেক্ষা করা জায়েয নয়।

বায়হাকী বলছেন, আমার কিতাবে রাসূল (স)-এর সুন্নতের খেলাফ এতোটুক কিছু পেলেও তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাসূলের (স) সুন্নতকে কার্যকর করবে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহ) তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাতে বলেছেন ঃ

قَالَ الشافعى لاحمل بن حنبل انتم اعلم بالاخبار الصحيحة منا فاذاكان خبر صحيح فاعلمونى حتى اذهب عليه -

ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ)-কে বলেছেন, শুদ্ধ বর্ণনাসমূহ তুমি আমার চাইতে বেশি জানো। তাই কোনো শুদ্ধ বর্ণনা তোমার চোখে পড়লে আমাকে বলে দিও যেন আমি তার ওপর আমল করতে পারি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর এই কথা শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং তিনি কার্যত তা প্রমাণ করে দুনিয়ার সামনে এক চিরন্তনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কোনো বিষয়ে প্রথমে তাঁর একটা বক্তব্য ছিল, কিন্তু যখনই সে ব্যাপারে কোনো সহীহ্ হাদীস পাওয়া গেলে সাথে সাথে তাঁর পুরানো কথাকে প্রত্যাহার করে প্রকাশ্যে প্রমাণিত হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে দিলেন। তাঁর পুরানো বক্তব্য এবং নতুন বক্তব্যের রহস্য এখানেই। তাঁর বলা কথার মধ্যে ভুল বক্তব্য ছিল! তা সত্ত্বেও সকল মুহাদ্দিসীন এবং ফকীহ্ মুহাদ্দিসীন তার সাহায্য-সহযোগিতা

www.pathagar.com

করেছেন এবং তার নীতি-পদ্ধতিকে আন্তরিক সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছেন। লক্ষ লক্ষ মুহাদ্দিসীন, মুফাস্সেরীন, ফকীহ্ মুহাদ্দিসীন, ধর্মীয় নেতা, বক্তা এবং বড় বড় সুফী সাধক তাঁর নীতি-পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। উত্তরসূরীদের মধ্যে হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহ) ও ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী'র নাম ইসলামের ইতিহাসে মধ্যগগণে সূর্যের মতো দেদ্বীপ্যমান। এই মহাত্মনগণ ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর নীতি-পদ্ধতির প্রশংসনীয় গুণাবলী ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন, তিনি ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ) বলেন ঃ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, হাদীস সমগ্রের মধ্যে গভীর অনুসন্ধান চালানো হোক এবং ফিকাহ্ ও উদ্‌ঘাটিত শুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী নিজেদের কর্মপদ্ধতিকে সংস্কার করে নতুন করে ঢেলে সাজানো হোক। আল্লাহ্র বিধানের কাছে কিয়াসসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র তা-ই গ্রহণযোগ্য যা সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হয়। অথবা সেই সূক্ষ্ম কিয়াস যার ভিত্তি সাধারণ যুক্তিসিদ্ধতার ওপরে স্থাপিত। যারা দর্শন অনুসরণ করতে গিয়ে আরও গভীর চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন হয় তারা কোনোভাবেই সুন্নতের অনুসারী নয়।

মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে মূল সুন্নতের সবচাইতে কাছে ইমাম শাফেয়ীর (রহ) মাযহাব। তাই তার ওপরে আরও গভীর গবেষণা এবং প্রত্যক্ষ যাচাই-পরখ পরিচালনার দাবি রাখে। মহামান্য ইমামের স্বর্ণ-ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কারণসমূহের মূল অস্তিত্বে মুহূর্তে পৌছে যেতো।[১]

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের চরম উৎকর্ষ পদ্য ও গদ্য রচনা

ইমাম শাফেয়ী (রহ) পদ্য ও গদ্য রচনায়ও অদ্বিতীয় ছিলেন। অনুধাবনের জন্য সামান্য একটু নমুনা নীচে উদ্ধৃত করা হলো।

سياسة الناس اشد من سياسة الدواب الان الانسان الجاهل يعتقد فى نفسه انه عالم فلا يقبل قول الانسان للمشقق ان للعقل حدا ينتهى اليه كماان للبصر حدينتهى اليه للمروه اربعة اركان حسن الخلق والسخاء والتّواضع والشكر لايكميل الرجل فى الدنيا الاباربع الديانة والامانة والصيانة والرزانة الانبساط الى الناس مجلبة القرناء السّؤ والانقباض عنهم مكسبته للعداوة فكن بين المنقبض والمنبسط مااكرمت احداً فوق مقداره الااتضع من قدرى عنده بمقدارمااكرمة مانظر الناس الى هم دونه الالسبطوا السنتهم فيه من حضر مجلس العلم بغير مجدة دورق كان كمن اتى الظل حون بغير قمح من احسن ظنه بلئيم كان ادنى عقوبته الحرمان، صحبة من لايخان العاريوم القيامة لظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لايكرمه درغب فى مودة من لاينفعه ومدح من لايعرفه، طبع ابن ادم على النوم فمن شانه ممن يتقرب ممن يتبا عد ممن يقرب منه خيرالد نيا والاخرة فى خمس خصال غنى النفس وكف الاذى وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة باللّه على كال حالِ الشفاعات ذكات المروات مثل الذى يطلب العلم بلاحجة كمثل حاطب ليل مريحملة خطب وفيه افعى تلدغه وهو لايدرى زينته العلماء التقوى وحليتهم حسن الخلق وجمالهم كرم النفس من لايحب العلم الاخير فيه ولايكن بينك وبينه معرفة ولاصداقة من اظهر شكرك بما لمتات اليه فاحذران نيكر نعمتك فيما اتيت اليه من علامة الصديق ان يكون لصديق صديقه صديقا انك لاتقدر ان ترضى

www.pathagar.com

الناس كلهم فاصلح مابينك وبين الله ثم لايتال بالناس من استغضب فلم يغضب فهو حما . من استرضى فلم يرض فهو شيطان، التلطف فى الحيلة اجدى من الوسيلة لاتشاورمن ليس فى بيته دقيق، ماضحك من خطارجل الاثبت صوابه فى قلبه نزك العبادة ذنب مستحدث ليس من المروة ان يخبر الرجل لينه من تعلم القران عظمت قيمة ومن نظر فى الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث قويت حجة ومن نظر فى اللغة رق قلبه ومن نظر فى الحساب جزلرائه من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه من نم لك نم بك ومن نقل اليك نقل عنك من اذا اراضيته قال فيك ماليس فكل لك اذا غضبته قال فيك ماليس فيك -ليس العاقل الذى يد فع بين الخير ·الشر فيختارالخير ولكن العاقل من يختاراخير هما ماوردت الحق والحجة سلى الحد فقبلها منى الاهبته وا عتقدت مودته ولاكابرنى على الحق احد ودافع الحجة الاسقط من عينى اشد الاعمال ثلثة - الجود من قلة والودع فى خلوة وكلمة حق عند من يرجى ويخاف - العلم حر وطالبه عبد فان خدم العبد قبلة العلم وان بتختر عليه فالعلم اولى بان تيخجتر عليه - الكلام يقظه العقل والسكوت نومه فانظر كيف مراعاتك له فى يقظة ونومه العاقل مه عقله عقله عن كل مدموم لو علمت ان نشرب الماء البادرينقص من مرؤتى شيئاً ماشربته العجلة توجبا الحر مان والرفق وسيلة الى الوجدان عاشر كرام الناس تعش كريما ولاتعا شرلئام الناس فتنسب الى اللوم من صدق فى اخوة انسان قبل علله وسد خلله وغفرذلله من اعتذ رعن دنب لم يذ نبه فقد اوجب على نفسه ذنبًا السفلة من تكون اكراهه لمخالفيه اكثر من اكر اهه لاهل مذهبه لانه بر يد ان يجعل العدووليا بنفاقه وذلك لايكون ان الله خلقك حرافكن كما خلقك من - سمع بافه نه صارحاكيا ومن اصغى بقلبه صارراعيا ومن وعظ بفعله صارها ديا من وعظ اخاه سر افقد نصحه وزانه ومن نصحه علا نية فقد نصحه وشانه -

www.pathagar.com

التواضع من اخلاق الكرام والتّكبر من شئم اللئام الوديعة لايقبها الاخائن اواحمق اذا كثرت عليك الحوا ائج فابدأ باهمها من احب الدنيا كان عبد الاهلها فقرالعلماء فقر اختيار وفقر الجهال فقراضطرار من رضى بالقنوع زال عنه الخضوع من احب ان يفتح اللّه على قلبه نور الحكمة فعليه بالخلوة وقلة الا كل وترك مخالطة السفهاء ولبغض العلماء الذين ليس معهم دين ولاداب لاسكلم فيما لايعينك فانك اذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها العلم جهل عند اهل الجهل كما ان الجهل جهل عند اهل العلم - كفى للعلم فضيلة انه يد عيهه من ليس فيه وكفى للجهل سوءًا بان تيبرا منه من هو فيه ويغضب اذا نسب اليه الكرم يغطى عيوب الدنيا ولاخره - ان الا فئدة مزارع الالسن فازرع الكلمة الكريمة فانه ان لم ينبت كلها نبت بعضها - ان المنطلق ماهو اشد من الصخروانقذ من الابروامر من الصبر وادور من الرحى واحد من سنة من طلب الرياسة فى غير حينها لم يزل فى ذل ما بقى من طلب الرياسة فرت منه يحتاج طالب العلم الى ثلث خصال طول العمر دسة ذات اليد الذكاء العلم علمان علم الاديان الفقه وعلم الابد ان الطب طلب العلم افضل من صلوة النافلة -

চতুষ্পদ জন্তুকে শিষ্টাচার শেখানোর চাইতে মানুষের কূটনীতি ভয়ঙ্কর, যেহেতু এ মূর্খ বিশ্বাস করে যে— সে জ্ঞানী, তাই কোনো উপদেশদাতার উপদেশ সে মানে না। বোধশক্তির একটা সীমা আছে, যেখানে গিয়ে সে থেমে যায়। যেমন দূরদৃষ্টিরও আছে একটা শেষ সীমা।

মানুষের জন্য চারটি স্তম্ভ— উত্তম চরিত্র, উদারতা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতা। আর এই চারটির ওপরে পৃথিবীতে মানুষের পরিপূর্ণতা-দ্বীনদারী, চক্ষুলজ্জা সংরক্ষণ ও বিশ্বস্ততা।

সমাজ জীবনে সম্পূর্ণ মিশে যাওয়া মন্দ সঙ্গী উৎপাদন করে। আবার সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে থাকলে তা সমাজের বৈরিতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এর মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকাটাই উত্তম।

কারো মর্যাদার চাইতে যতোটা বেশি সম্মান তাকে আমি দেব আমার সম্মান তার কাছে ততোটাই নীচে নেমে যাবে। ইতর শ্রেণীর মানুষ তার চাইতে বড় কাউকে সহ্য করে না, দেখতে পারে না। সে সবসময়ই বড়কে হেয় করে, তার সমকক্ষ করার চেষ্টা করতে থাকবে।

জ্ঞানীদের মজলিসে কাগজ-কলম ছাড়া যাওয়া গম ভাঙ্গার কলের কাছে গম ছাড়া যাওয়ার মতোই।

কোন নীচ কৃপণের কাছে যদি কেউ ভাল কিছুর আশা করে তাহলে তার নিম্নতম শাস্তি বঞ্চনা ও ব্যর্থতা।

নির্লজ্জের সঙ্গ কেয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই ব্যক্তি নিজের ওপর সবচাইতে বেশি নির্যাতন করে, যে এমন লোককে সম্মান করে, যে তাকে সম্মান করে না এবং এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে, যে তার সাধারণ উপকারটুকু করে না এবং এমন লোকের তারিফ করে যে তাকে চেনে না।

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি তিরস্কারযোগ্য। যে তার কাছ থেকে দূরে যেতে চায়, সে তারই আরও কাছে যেতে চায় এবং যে কাছে থাকে, তার কাছ থেকে সে দূরে যেতে চায়।

পৃথিবী ও পরকালের কল্যাণ এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল— সব রকম অভাবমুক্ত অন্তর, কারো দুঃখ-কষ্টের কারণ না হওয়া, হালাল উপার্জন, সমস্ত মন্দ থেকে বেঁচে থাকার সদা সতর্ক চেষ্টা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ওপর নির্ভরতা।

অত্যধিক তোষামোদ আত্মমর্যাদাকে শেষ করে দেয়। যে লোক না বুঝেই কিছু জ্ঞান অর্জন করে ফেললো তার তুলনা সেই লোকের মতো যে রাতের বেলা জ্বালানি কাঠের বোঝা বাঁধছে আর এর মধ্যে কোনো সাঁপ এসে তাকে দংশন করলো।

সংযমশীলতা আলেমদের ভূষণ। উত্তম চরিত্র তাদের অলংকার। পরিচ্ছন্ন মানসিকতা তাদের সৌন্দর্য।

যার মধ্যে জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা নেই। ভাল বলতে তার মধ্যে আর কিছুই নেই। এমন লোকের সাথে সম্পর্ক তো বহুদূরের ব্যাপার, পরিচিতিও রাখা উচিত নয়।

যে লোক তোমার এমন কোনো উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যা আসলে তুমি তার জন্য করোনি। তার থেকে সাবধান থাকবে। এমন না হয় যে, সে তোমার সত্যিকারের কোনো উপকারকে অস্বীকার করে বসে।

বন্ধুর পরিচয় এই যে, তার বন্ধুও তোমার বন্ধু হবে !

সবাইকে খুশী রাখা সম্ভব নয়। এইজন্য মানুষের উচিত আল্লাহ্র সাথে নিজের সম্পর্ক ঠিক রেখে অন্য কারো তোয়াক্কা না করা।

যাকে রাগালে রাগে না সে গাধা এবং যাকে খুশী করতে চাইলে খুশী হয় না সে শয়তান।

আত্মনির্ভরশীল কর্মপ্রচেষ্টা কারো প্রতি নির্ভরতার চাইতে উত্তম।

যার ঘরে খাবার নেই তার কাছে কোনো পরামর্শও নেই।

ভুল করলে যার হাসি পায়! তার অন্তরে সংশোধনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে।

ইবাদত না করা একদিকে যেমন পাপ, তেমনি দ্বীনের ক্ষেত্রে তা এক নতুন উদ্ভাবনও বটে। অর্থাৎ বেদআত।

কারো কাছে তার বয়স জানতে চাওয়া পুরুষত্বের অপমান।

www.pathagar.com

কুরআনের শিক্ষায় মানুষের মর্যাদা, নীতিশাস্ত্রে (ফিকাহ্) সম্মান, হাদীসে যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা। ভাষা জ্ঞানে আন্তরিক তৃপ্তি এবং হিসেব জানা থাকলে অভিব্যক্তির দৃঢ়তা লাভ করা যায়।

জ্ঞান শিখে যে মন্দ থেকে বাঁচতে না পারলো, জ্ঞান তাকে কি দিলো? তোমার সামনে যে অন্যের বদনাম চর্চা করে সে অন্যের সামনে তোমারও বদনাম করে।

যে লোক তোমার সাথে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় অন্যের সামনে তোমার এমন কিছু গুণের চর্চা করে যা তোমার মধ্যে নেই। সে লোকের সাথে সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে অন্যের সাথে তোমার এমন কিছু দোষের চর্চা করবে যা তোমার মধ্যে ছিল না।

ভাল ও মন্দ যে কোনো অবস্থায় যে উত্তম পন্থায় চলে সেই জ্ঞানী। আমি যখন কোনো সত্যকে দলিল-প্রমাণসহ কারো সামনে পেশ করি এবং সে তা গ্রহণ করে, তার জন্য আমার মনে একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তার প্রতি একটা ভালবাসা জন্মে। আর যে সত্য নিয়ে আমার সাথে অর্থহীন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয় সে আমার চোখ থেকে পড়ে যায়।

তিনটি কাজ অত্যন্ত কঠিন। অভাবের সময় বদান্যতা, একাকিত্তে মিতাচার, যেখানে কোনো প্রত্যাশা আছে অথবা আছে ভয়, সেখানে নিরেট সত্য কথা বলা।

জ্ঞান মুক্ত স্বাধীন। জ্ঞান সন্ধানী তার গোলাম। গোলাম সেবা-যত্ন করলে মালিক তাকে গ্রহণ করবে এবং যদি সে যত্নশীল হয় তাহলে যত্নবানের জন্য জ্ঞানের দরজা অবারিত। তা বাড়তেই থাকবে। আলাপ-আলোচনা, চেতনাকে সজাগ করে এবং নীরবতা তার স্বপ্ন। এখন শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বাবস্থায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

আমি যদি জানতে পারি যে, ঠাণ্ডা পানি পান করলে বীরত্বের ঘাটতি হবে তাহলে তা আমি কোনোদিনই পান করবো না।

কোন কাজে তাড়াহুড়া করা ব্যর্থতার কারণ (হতে পারে) এবং ধীরস্থিরভাবে কাজ করা সাফল্যের সোপান।

সৎসঙ্গ মানুষকে উন্নত করে। অসৎ সঙ্গ মানুষকে সর্বনাশ করে দেয়।

যে কার্যত মানবতার সকল দাবি পূরণ করলো। ব্যর্থতার সকল সম্ভাবনা তার থেকে দূর হয়ে গেল এবং সকল গুনাহ মাফ হয়ে গেল।

না করা অপরাধের স্বীকারোক্তি নিজে নিজেই অপরাধী হওয়ার মতো।

আহাম্মক লোকেরা নিজ ধর্মের লোকদের ছেড়ে অন্য ধর্মের লোকদের বেশি সম্মান করে। সে তোষামদ করে তাদের মনে জায়গা করে নিতে চায়, অথচ তা কোনো দিনই সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে 'স্বাধীন' সৃষ্টি করেছেন অতএব তুমি মুক্ত। যে কানে শোনে সে বর্ণনাকারী, যে মন দিয়ে শোনে সে রক্ষক এবং যে তা কার্যে পরিণত করে সে পথ প্রদর্শক।

একান্ত আপনজনকে একাকী বোঝানো এবং উপদেশ দেয়া শিষ্টাচার এবং তার সংশোধনের মূল মন্ত্র। এবং সবার সামনে তাকে উপদেশ দেয়া লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ।

বিনয় আভিজাত্যের পরিচায়ক এবং অহংকার নিকৃষ্ট ব্যক্তিত্বের। আমানত রাখতে আগ্রহী ব্যক্তি হয় চোর নয় আহাম্মক।

www.pathagar.com

কাজের যখন খুব চাপ থাকে তখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণটা আগে শুরু করো।

দুনিয়ায় যে প্রতিষ্ঠা চায় সে দুনিয়াবাসীর গোলামে পরিণত হয়।

আলেমদের দারিদ্রতা ঐচ্ছিক এবং জাহিলদের দারিদ্রতা বাধ্যতামূলক।

যে অল্পতে সন্তুষ্ট সে মানুষের সামনে সচ্ছল সম্মানিত।

যদি কেউ আশা করে যে, আল্লাহ্র 'নূর' জ্ঞানের আলো তার অন্তরে প্রস্ফুটিত হোক, তাহলে তাকে খোদাই জ্ঞানহীন আহাম্মক লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। কম খেতে হবে এবং নির্জনবাস গ্রহণ করতে হবে। সেই সব আলেমদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যাদের না আছে শিষ্টাচার-সভ্যতা না আছে পরিপূর্ণ দ্বীন।

অর্থহীন কথা মুখ থেকে বেরুতে দিও না। কথা যখন মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তখন তা তোমার ওপরে কর্তৃত্ব করে। অর্থাৎ কথাই তোমার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

জ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞতা নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা। একইভাবে মূর্খদের কাছে জ্ঞান নির্বুদ্ধিতা।

জ্ঞানের মর্যাদা, এটাই বা কম কিসে যে, যার তা নেই সে আশা করে এবং অজ্ঞতার হীনতা এর চাইতে আর কি কম হতে পারে যে, মূর্খ তার অজ্ঞতাকে অস্বীকার করে! মূর্খকে মূর্খ বললে সে রেগে যায়।

উদারতা পৃথিবী ও পরকালের দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে দেবার মতো জিনিস। মন-অন্তর মুখের জন্য কৃষিক্ষেত্র, তাতে সুন্দর সুন্দর কথার বীজ বপন করো। সব বীজ অঙ্কুরিত না হলেও কিছু না কিছু তো অবশ্যই হবে।

মুখ থেকে যে কথা বেরিয়ে যায় তা পাথরের চাইতে কঠিন, সূঁচের চাইতে তীক্ষ্ণ, তূঁতের চাইতে তীক্ত, চাকার চাইতে বেশি ঘূর্ণায়মান, তীরের চাইতেও তীব্র গতির হয়ে থাকে! তাই কথা বলতে সাবধান!

উপযুক্ত সময় ছাড়া রাজত্ব বা ক্ষমতা যে চেয়েছে চিরদিন লাঞ্ছনা ও অপমানই সে পেয়েছে। কেননা তা যে চায় তার কাছ থেকে তা পালিয়ে বেড়ায়।

শিক্ষার্থীর জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন— দীর্ঘ জীবন, খোলা মন এবং মেধা-প্রতিভা।

জ্ঞান মূলত দু'টি ঃ চেতনার জ্ঞান ও জৈবিক জ্ঞান। চেতনার জ্ঞান ইল্‌মে দ্বীন এবং জৈবিক জ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান।

জ্ঞানার্জন করা নফল নামায পড়ার চাইতে উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর বিভিন্ন রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। এবার আমরা তাঁর পদ্য রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করবো। যদিও তিনি নিজে তাঁর কবিতাগুলোকে কবিতা বলতে দ্বিধা করতেন। কিন্তু যেহেতু কাব্য চর্চা আরবের জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি বা আরবদের এটা একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও বলা যেতে পারে, যা তাদের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) একজন আরব হয়ে কেমন করে এর বাইরে যাবেন। অহরহ তিনি স্বভাসুলভ কবিতা আবৃত্তি করতেন। ভাষা এবং বাণীতে কোনো গোঁজামিল বা অস্পষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই। যে অনলবর্ষী যাদুকরী বর্ণনা ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন তার সুস্পষ্ট নিদর্শন তাঁর বাণীতে দৃশ্যমান।

www.pathagar.com

ولولاالشعر بالعلماء يدرى لكنت اليوم اشعر من لبيد -

যদি আলেমদের কাছে কবিতা চর্চা শোভণ হতো—
তাহলে আজ আমিও 'লবীদের' চাইতে বেশি কবিতা বলে দিতাম।

বিখ্যাত কবি আব্বাস আশরাফ ইমাম শাফেয়ীর কাছে এসে বললো ঃ আবু আবদুল্লাহ্, আমি কবিতার কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করবো। তুমি যদি সে রকম কবিতা আবৃত্তি করতে পারো তাহলে আমি কবিতা চর্চা ছেড়ে দেবো।

باهمتى الامقامر عة العدا خلق الزمان دهمتى لم تخلق والناس اعينهم الى سلب الغنى لايسالون عن الحجى والادلق لوكان بالحيل الغنى لوجد تنى بنجوم اقطار السماء تعلق -

দুশমনদের সাথে লড়াই করা ছাড়া আর কোন শক্তি আমাতে বাকী নেই।

পৃথিবী অনেক পুরানো হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বীরত্ব পুরানো হয়নি।

মানুষের চোখ ধনী হওয়ার পেছনে লেগে আছে— তারা বুদ্ধিমত্তা এবং আহাম্মকির পার্থক্য করে না।

যদি ধনী হওয়ার উপায় প্রতারণার ওপর হতো তাহলে সে আমাকে আকাশের প্রান্তসমূহে পৌছে দিতো।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) তার জবাবে তাৎক্ষণিকভাবে এই চরণগুলো আবৃত্তি করলেন।

انَّ الذِّی رزق اليسار ولم يصب حمداً ولاشكراً بغير موفق الجد يدنى كل امر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق فاذا سمعت بان مجدودا حوى عوداً فاثمر فى يديه فصدق وماذاسمعت بان مجدودما اتى ماءً ليشر به فغاص فحقق ومن الدليل على القضاء وكونه يوس اللبيب وطيب عيش الاحمق لوكا بالحيل الكبير لوجد تنى باجل اسباب السماء تعلق لكن من رزق الحجى عدم الغنى ضدان مفتر قان اى تفر ق ولربما عرضت نفسى فكرة فلودمنها اننى لم اخلق واحق خلق الله بالهم امرء دوحمة بالعلى بعيش ضيق -

যে লোককে আল্লাহ্ তা'আলা ভাল অবস্থার বানিয়েছে
তাতেও সে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি
না তার প্রশংসা করেছে! সে তো দুর্ভাগা—
ভাগ্যই সকল বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়

www.pathagar.com

এবং ভাগ্যই সকল দূর-পরাহতকে কাছে এনে দেয়।
তাই তুমি যদি শোন কোনো ভাগ্যবান একটা শুকনো ডাল তুলেছে
এবং তা তার হাতে আসতেই তাজা ফলবান হয়ে গেছে-
তাহলে তা বিশ্বাস করে নিও।

আর যখন এটা শুনবে যে কোন দুর্ভাগা পানি পান করতে গেছে
এবং সেখানে সে ডুবে মরেছে তাহলে তাও বিশ্বাস করে নিও।

আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর হওয়ার সবচাইতে বড় প্রমাণ এই যে—
বুদ্ধিমান কঠিন সমস্যায় জর্জরিত আর আহাম্মক আরামের জীবন যাপন করছে।

ছলচাতুরী করে যদি বড় হওয়া যেতো, তাহলে
আমার সম্পর্ক বড় বড় আসমানী মাধ্যমের সাথে হতো।

কিন্তু যাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে সে সম্পদ থেকে বঞ্চিত
এ দু'টো বৈপরীত্য এমন যা একত্র হওয়া খুবই কঠিন।

বারংবার আমার মনে একটা কথাই জাগে—
আমাকে যদি সৃষ্টি করাই না হতো!

আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে সেই লোকটি সবচাইতে বেশি সহানুভূতির যোগ্য
চরম দারিদ্র্যতার মধ্যেও যে সাহসের সাথে জীবন যাপন করে।

আব্বাস আরজাক মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। শেষ হলে পরে চিৎকার করে বললো! সুবহানাল্লাহ! কবিতার পংক্তি না দর্শনের ভাণ্ডার! শেষ পর্যন্ত মাথানত করে চলে গেল। ইমাম শাফেয়ী (রহ) যখন মিশরে গেলেন দেখলেন, ইমাম মালিকের অনুসারী অনেক বেশি এবং তারা ইমাম শাফেয়ীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালো। পরে যখন কিছু কিছু মাসায়েলে তাঁর সাথে ইমামের ইখতিলাফ আছে জানতে পারলো, তখন তারা সেসব সম্পর্কে নানান ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করলো।

জবাবে ইমাম শাফেয়ী বললেন ঃ

اتنر درابين سارحته النعم النظم منشوراً لراعية الغنم ان فرج الله اللطيف بلطفه وصادفت اهلا للعلوم وللحكم ثبثت مفيداً واستعدت دواره الا فسمكنون لذى ومكث لم نمن منح الجهلال علما اضاعه من منع المستوجبين فقد ظلم -

আমি কি আমার গল্পের মোতি চতুষ্পদ জন্তুর রাখালদের সামনে উপস্থান করবো! নাকি ছাগল চড়ানো রাখালদের জন্য ছড়ানো মোতির মালা গাঁথবো ? যদি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে কোনো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তির সাথে দেখা হয়, তখন তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া ঠিক হবে না। তাকে তখন আমি বন্ধু বানাবো, না হলে সেই মোতি লুকানো থাকবে।

www.pathagar.com

যে মূর্খদের কিছু শেখালো সে জ্ঞানের অপচয় করলো এবং যে যোগ্য লোকদের পেয়েও শেখালো না সে 'জুলুম' করলো।

রাসূল (স)-এর আহলে বাইতের প্রশংসায় বলেন ঃ

اهل بيت رسول الله حبكم رض من الله فى القران انزله كفاكم من عظيم القدر انكم من لم لصل عليكم لاصلواة له -

হে রাসূলুল্লাহর (স) ঘরের সদস্যগণ! কুরআনের জন্য তোমাদেরক ভালবাসা ফরয। তোমাদের মহোত্তম মর্যাদার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তোমাদের ওপরে যারা দরূদ পড়লো না তাদের নামায কবুল হয়নি।

ياراكبًا قف بالمصب من منى واهتف بسا كنها خيفها والناهض سحداً اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كما النظم الفرات الفائض ان كان رفضاحب ال محمد فليشهد الثقلان انى رافضى اذا نحن فضلنا عليا فاننا روافض بالتفضيل عند دوى الجهل وفضل البى بكر اذا ماذكرته رميت بنصب عندذكرى للفضل فلا زلت ذالنصب ورفض كليهما بحبيهما حتى اوسد فى الرمل -

হে উষ্ট্রারোহী 'মিনা'র কোনো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে যাও। সকালবেলা হজ্ব যাত্রীরা যখন ফোরাত নদীর স্রোতের মতো মিনার দিকে আসতে থাকবে তখন খীফ ও নাহেয-এর অধিবাসীদের চিৎকার করে ডেকে একথা বলে দিও ঃ যদি মুহাম্মদের (স) বংশধরদেরকে ভালবাসলেই মানুষ 'রাফেযী' হয়ে যায় তাহলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমি সবচাইতে বড় 'রাফেযী'।

আমি যখন হযরত আলীর (রা) মর্যাদার কথা বর্ণনা করলাম তখন নিঃসন্দেহে মূর্খদের কাছে আমি 'রাফেযী' (বিদ্রোহী) হয়ে গেছি। আবার যখন হযরত আবু বকর (রা)-এর মর্যাদার কথা বর্ণনা করি তখন সেই মহত্ব প্রকাশের কারণে এই লোকেরাই আমাকে 'নাসেবী' (প্রতিষ্ঠাকারী) বলে প্রশংসা করে। সুতরাং এই ভালবাসা ও মহত্বের কারণে আমি 'রাফেযী' ও 'নাসেবী' দু'টোই হয়ে আছি এবং এভাবেই একদিন কবরে চলে যাবো।

المرء ان كان عاقلا درعا يشغله عن عيو بهم ورعه كما العليل السقيم يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه وذى حسد يفتا بنى حيث لايرى مكانى يثنى صالحاحيث اسمع اذا لم تصن عرضا نفسا ولم تخش خالقًا وتستحى مخلوقا فما شئت فاضع -

যে লোক বুদ্ধিমান এবং আল্লাহ্‌মুখী হয়, তার পুণ্য সাধনা মানুষের দোষ-ক্রটি খুঁজে বেড়ানোর প্রবণতা থেকে তাকে মুক্তি দেয়। যেভাবে কঠিন রোগীকে তার রোগ যন্ত্রণা অন্য সব রোগীদের রোগ যন্ত্রণার কথা ভাবতে দেয় না।

হিংসুক তো আমার পেছনে আমার বদনাম করে বেড়ায়! কিন্তু সে যখন আমার সামনে আসে তখন অনেক প্রশংসা করে। তোমার যখন নিজের আত্মসম্মানবোধ নেই আর না আছে আল্লাহ্‌র ভয়, না সৃষ্টি জগতের সামনে কোনো লজ্জাবোধ, তখন যা খুশী তা-ই করতে পারো!

اذا اصحبت عندى قوت يوم افخذ الهم عنى ياسعيد ولايخطر ههوم غد ببالى فان غداله رزق جد يد اسلم ان ارادالله امرا .... وترك ماارىد لما ير يد .

হে মঙ্গলাকাংখী! আমার কাছে যখন একদিনের খাদ্য সামগ্রী রয়েছে তখন আমার আহারের ভাবনা আর ভেবো না। আগামীকাল আমি কি খাবো এ ভাবনা কখনো আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। কেননা আগামীকালের জন্য রয়েছে নতুন 'জীবিকা'। আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার জন্য যতোটুকু নির্ধারণ করবেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমার চাওয়া-পাওয়া আমি তার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি।

عواقب مكروه الامورخيار وايام شر لاتدوم نضار وليس بباق يو سهاد ونعيمها اذا كر ليل ثم كرنهار -

কঠিন দুর্যোগের পরিণতি ভাল হয় আর দুঃসময়ের পরিধি খুব ছোট এবং তা স্থায়ী হয় না। পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখের দিন একই মাত্রায় থাকে না। কালো রাতের পরে সোনালী দিনেরই অবস্থান।

ياحكم جلدك مثل ظفرك فتول انت جميع امرك واذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك

শরীরে যদি চুলকানি উঠে, তা চুলকাবার জন্য তোমার নখগুলো তো আছেই! কাজেই নিজের কাজগুলো মন দিয়ে করতে থাকো! যদি কঠিন কোনো প্রয়োজন এসেই পড়ে তখন এমন লোকের কাছেই সাহায্য প্রার্থী হও যে তোমার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

احب من الاخوان كل مواتى وكل غفيض الطرف عن عشرا تى يصاجلن فى كل امراحبه ويحفظن حيا ويعد وفاقى تصفحت اخوانى فكان اقلهم على كثرة الاخوان اهل ثقات فمن له بهذا الامر ليت انى اصبة فقا سمته مالى مع الحسنات -

আমি আমার প্রত্যেকটি সমমনা ভাইয়ের কাছে এই নিবেদন রাখছি, এবং এমন সব ব্যক্তিবর্গের সামনে! যারা আমার ভুল-ক্রটিকে জেনেশুনে উপেক্ষা করে এবং আমার

www.pathagar.com

পছন্দনীয় কাজে আমার সহযোগী হয়। আমার জীবনে হয় সাহায্যকারী পরম বন্ধু এবং আমার মৃত্যুর পরেও আমাকে মনে রাখে— আমি আমার জন্য আমার ভাইদেরকে সন্ধান করেছি, অনেক পেয়েছি, কিন্তু নির্ভর করার মতো খুব কমই পেয়েছি। আমার এই সমস্যার সমাধান কে করে দেবে ? হায়! এমন যদি কাউকে আমি পেতাম তাহলে আমার যা কিছু আছে তা তাকেই বিলিয়ে দিতাম।

يامن تعذر بالدنيا وزينتها والدهر ياتى على المبنى والبانى ومن يك عدزة الدنيا وزينتها فعزة عن قليل زائل فان واعلم ان كنوز الارض من ذهب فاجعل كنوزك من بر وايمان –

হে পৃথিবী এবং পৃথিবীর চাকচিক্যে মুগ্ধ বিভ্রান্ত মানুষ! মনে রেখো! সময় এই বিলাসী ঘরবাড়ি এবং তার নির্মাণকারী দু'টোকেই ধ্বংস করে দেবে! দুনিয়ার সম্মান ও বিলাসী উপায় উপকরণ যার ভাল লাগে তার জেনে নেয়া উচিত, খুব শীঘ্রই এই ধন-মান-সম্মান তোমার জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মনে রেখো! দুনিয়ার ভাণ্ডারতো সোনা দিয়ে ভরা হয়, কিন্তু তোমার নিজের ভাণ্ডার পুণ্য কর্ম এবং ঈমান ছাড়া ভরা যাবে না।

اذارا فقت فى الاسفار قوم فكن لهم كذى الرحم الشقيق بعيب النفس بصر وعلم واعمى العين عن عيب الرفيق ولاتاخذ بعثرة كل قوم ولكن قل هلم الى الطريق فان تاخذ بعثر تهم يقلوا وتبقى فى الزمان بلاصديق –

একদল লোকের সাথে তুমি যদি সফরে বের হও তাহলে সফরসঙ্গীদের সাথে আপন ভাইয়ের মতো আচরণ করো। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী নিজের দোষক্রটির প্রতি লক্ষ্য রাখে আর সঙ্গী-সাথীদের ভুল-ক্রটি দেখেও দেখে না। অন্য সবার দোষ-ক্রটি নিয়ে সমালোচনা করা তোমার জন্য শোভনীয় নয়, বরং তাদের সঠিক পথে চলার উৎসাহ যোগানো তোমার কাজ। সেই চেষ্টাই তুমি করতে থাকবে। অন্যের দোষ-ক্রটি নিয়ে সমালোচনা করলে তোমার আপনজন কমতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে আপন বলতে তোমার আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

تركت مطامعى وارحتى نفسى فا النفس ماطمعت تهون واحييت القنوع كان ميتًا وفى احيائه عرضى مصون اذا طعام بنفس الم عبد علته مذمة وعلاه هون

আমি লালসাকে ত্যাগ করে নিজেকে মুক্তি দিয়েছি। মনের মধ্যে অভ্যাসানুযায়ী লালসা জেগে উঠার সাথে সাথেই সে অপমানিত হয়। মনের সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি যা মরে গিয়েছিল তাকে আমি জাগিয়েছি। অল্পে তুষ্টির জীবন আমার সম্মানকে সংরক্ষণ করেছে। মানুষের মনে যখন লালসার বাসনা স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে তখন প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হওয়া ছাড়া তার জন্য আর কিছুই বাকী থাকে না।

www.pathagar.com

اذا ماخلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب ولاتحسبن الله يغفل ساعة ولاان مايخفى عليه يغيب غفلنا العمر الله حتى تداركت علينا ذنوب بعد هنّ ذلوب فياليت أن الله يغفر ما مضى ويازن فى تو باتنا فنتوب -

একাকিত্বে তুমি এটা ভেবো না যে, আমি একা। আমার. ওপরে সদা দৃষ্টিমান একজন সংরক্ষক রয়েছেন। এক মুহূর্তের জন্যও এটা ভেবো না যে, আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে উদাসীন। এমন কোনো লুকানো বস্তু নেই যা তিনি দেখতে পান না। আল্লাহ্র কসম! আমরা কি এক মোহের মধ্যে পড়ে আছি আর পাপের ঘুণ পোকা আমাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। হায়! আল্লাহ্ যদি আমাদের অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের তওবা কবুল করতেন তাহলে আমরা কিছু কল্যাণ পেতে পারতাম।

اذا هبت دياحكم فاغتنهما فعقبى كل خافقة سكون ولاتغفل عن الاحسان فيهما فلا تدرى السكون متى يكون -

সময়ের গতি যখন তোমার অনুকূলে থাকে তখন তাকে মূল্যায়ন করো। কেননা প্রত্যেকটি গতিরই একটা বিরাম আছে! এ সময়ে কারো উপকার করতে কৃপণতা করো না। কে জানে তোমার সময় কখন থেমে যাবে?

بعمرك بالرز ية هدم دار دلا شاة تموت ولابعير ولكن الرزية موت حر يموت بموته خلق كثير -

তোমার জীবনের কসম! ঘর পড়ে যাওয়া কোনো বড় বিপর্যয় নয়, না কোনো উঁট বা ছাগলের পাল মরে যাওয়া। বরং সবচাইতে বড় বিপর্যয়টা ঘটে তখন যখন কোনো মহত ব্যক্তি মারা যায়। কেননা তার মৃত্যুতে মরে যায় একটা গোটা পরিবেশ।

اذا كنت لاتذرى ولاانت بالذى تسايل من يدرى فكيف اذن ندرى ولو كنت تدرى اوتدريت لم تكن تخالف من يدرى على علم من يدى -

তুমি নিজে জানো না, জানতে চাও এমন লোকের কাছে! সেও জানে না, তাহলে তুমি জানবেই বা কেমন করে, আর বুঝবেই বা কি? যদি তুমি জানতে বা জানার চেষ্টা করতে তাহলে জেনে-বুঝে তাদেরকে ভয় করতে না! যারা জানে।

المرآ يخطى ثم يعلوا ذكره حتى يزين بالذى لم يفعل وترى الشقى اذا تكا ملعليه يشقى ويخل كل مالم يعمل -

ভাগ্যবানদের বড় বড় প্রশংসা করা হয়ে থাকে। এমনকি তার ব্যাপারে এমন সব কথাও জুড়ে দেয়া হয়, যা সে কখনো করেনি এবং দুর্ভাগার যখন কোনো বড় দোষ প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন এমন বহু মন্দকাজ যা সে করেনি তাও তার নামে জড়িয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

গদ্য, পদ্য, দর্শন ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের কিছু অমূল্য মনিমুক্তা উপস্থাপন করা হলো। তাঁর জ্ঞান সাগরের পরিধি আমাদের অনুমানে আসে না। তবে মেশকাতের রচয়িতা যা বলেছেন, তা মোটামুটি প্রণিধানযোগ্য।

وفضائله اكثر من ان تحطى كان امام الدنيا دعالم الناس شرقا وغر باجمع الله له من العلوم والمفاخر مالم يجمع لاما قبله ولابعده وانتشرله من الذكر مالم ينتشر لاحد ماسواه -

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর চরম উৎকর্ষ প্রতিভার কথা বর্ণনা শক্তির বাইরে। তিনি জ্ঞান জগতের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম এবং পূর্ব-পশ্চিমের পথ প্রদর্শক ইমাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মধ্যে এমন মেধা-যোগ্যতা, জ্ঞান ও বাকশক্তি ভরে দিয়েছিলেন যা তাঁর পূর্বে এবং পরে অন্য কোনো ইমামের মধ্যে এমন অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় না। গোটা পৃথিবীতে তাকে নিয়ে যতো আলোচনা হয়েছে অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের বেলায় তা হয়নি।

www.pathagar.com

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ)-এর চোখে ইমাম শাফেয়ী (রহ)

ونَشـاء الشـا فـعى فى اوائـل ظـهور الـمذهبـيـن وترتـيـب اصوالـهـماوفـردعـهـما فنظرصنيـع الاوائل فوجد فيه امـوراً كبحت عنـانـه عـن الجريـان فى طريـقـهم وقد ذكر هـانى اوائل كتـاب الام منـهـا انـه وجد هـم يـاخذ ون بـالـمو سـل والمنـقـطـع فيدخـل فيـهـمـا الـخلـل فـانـه اذا جمـع طرق الـحديث يـظـهـر انـه كـم من مـرسـل لااصـل لـه وكـم مـرسـل يـخالـف مـسـنداً فقر وان لايـلـخذ بـالـمرسـل الاعـنـد وجود شـروطـه وهى مـذ كـورة فـى كـتـاب الاصـول ومـنـهـا انـه لـم تـكـن قـواعـد الـجـمع بـيـن الـمـخـتـلـفـات مـضـبـوطـة عـنـد هـم فـكـان يـتـطـرق بـذلـك خـلـل فـى مـجـتـهـداتـهـم افـوضـع لـهـا اصـولا ودونـهـالـى كـتـاب وهـذا اول مـاكـان فـى اصـول الـفـقـة مـثـاله مـابـلـغـنـا انـه دخـل عـلـى مـحـمـد بـن الـحـسن وهـويـطـعـن عـلـى اهـل الـمـديـنـة فـى قـضـائـهـم الـشـاهـدا الـواحـدمـع الـيـمـيـن ويـقـول هـذازيـادة عـلـى كـتـاب الـلّـه فـقـال الـشـافـعى انبت عندك انه لايجـوز الز يادة على كـتـاب لله بخبرالواحد قال نعم قال فلم فلت ان الوصيـة لـوارث لاتـجوزلقولـه عـلـيـه الـسلام الا لاوصـيـة لـوارث وقـد قـال تعـا لى كـتـب عـلـيـكـم اذا حـضـر احد كـم الـمـوت الايـة واورد عـلـيـه اشـيـاء مـن هذا الـقـبـيـل كلام مـحـمـد بـن الـحـسـن ومـنـهـا ان بـعـض الاحـاديـث الـصـحـيـحـة لـم يـبـلـغ عـلـمـا ء الـتـا بـعـيـن مـمـن وصـد الـيـهـم الـفـتـوى فـاجـتـهـد وابـارائـهـم واتـبـعـوالـعـمـومـات وا قـتـدو ابـمـن مـضـى مـن الـصـحـابـة فـافـتـوا حـسـب ذلـك ثـم ظـهـرت بـعـد ذلـك فـى الـطـبـقـه الـثـالـثـه فـلـم يـعـلـمـوا بـهـا ظـنًـا مـنـهـم انـهـا تـخـالـف عـمـل اهـل مـديـنـتـهـم وسـنـتـهـم الـتـى لااخـتـلاف لـهـم فـيـهـا وذلـك قـادح فـى الـحـديث وعـلـة مـسـقـطـة لـه اولـم تـظـهـر فـى الـثـالـثـه وانـمـا ظـهـرت بـعـد ذلـك عـنـد مـامـعـن اهـل الـحـديـث فـى جـمـيـع طـرق الـحـديـث ورحـلـو اقـطـارالارض وبـحـثـواعـن حـمـلـة الـعـلـم فـكـثـر مـن

الاحـاديـث مـالايـرويـه مـن الـصـحـابـه الارجـل اورجـلان ولايـرويـه عـنـه اوعـنـهـمـا الارجـل اورجـلان وهـلـم جـرافـخـفى على اهـل الـفـقـه وظـهـر فـى عـصـر الـحـفـاظ الـجـاكـعـيـن بـطـرق الاحـاديـث كـثـيـر من الاحـاديـث رواه هـل الـبـصـرة مـثـلا وسـا ئرالاقـطـارنـى فـى غـفـلـة مـنـه فـبـيـن الـشـافـعـى رحـمـة الـلّـه عـلـيـه ان الـعـلـمـا مـن الـصـحـابـتـه والـتـابـعـيـن لـم يـزل شـانـهـم انـهـم يـطـلـبـون الـحـديـث فـى الـمـسـئـلـة فـاذا لـم يـجـدواتـمـسـكـوا بـنـوع اخـر مـن الاسـتـد لالـثـم اذاظـهـر عـلـيـهـم الـحـديـث بـعـد رجـعـوامـن اجـتـهـادهـم الى الـحـديـث فـاذا كـان الامـركـذلـك لايـكـون عـدم تـمـسـكـهـم قـدحـافـيـه الـلـهـم الااذا بـيـنـوالـعـلـة الـقـادحـة مـثـالـه حـديـث الـقـلـتـيـن فـانـه حـديـث صـحـيـح روى بـطـرق كـثـيـره مـعـظـمـهـا تـرجـع الـى ابـى الـولـيـدبـن كـثـير عـن مـحـمـدبـن جـعـفـربـن الـزبـيـر عـن عـبـد الـلّـه اومـحـمـد بـن عـبـادبـن جـعـفـر بـن عـبـيـد الـلّـه بـن عـبـد الـلّـه كـلا هـمـا عـن ابـن عـمـر (رض) ثـم تـشـعـبـت الـتـرق بـعـد ذلـك وهـذ ان وان كـانـا مـن الـثـقـات لـكـنـهـمـا لـيـسـا مـمـن وسـد الـيـهـم الـفـتـوى ذعـول الـنـاس عـلـيـهـم فـلـم يـظـهـر الـحـديـث فـى عـصـر سـعـيـد بـن الـمـسـيـب ولا فـى عـصـر الـزهـرى ولـم يـمـش عـلـيـه الـمـالـكـيـتـه ولا الـحـنـفـيـتـه فـلـم يـعـلـمـوا بـه وعـمـل بـه الـشـافـعـى رحـمـة الله وكـحـديـث خـيـارالـمـجـلـس فـانّـه حـديـث صـحـيـح روى بـطـريـق كـثـيـرة وعـمـل بـه ابـن عـمـر وابـو هـزايـرة مـن الـصـحـابـتـه ولـم يـظـهـر عـلـى الـفـقـاهـاء الـسـبـعـة ومـعـاصـريـهـم فـلـم يـكـرنـوا يـقـولـون بـه فـراى مـالـك وابـو حـنـيـفـة هـذه عـلـة قـادحـة فـى الـحـديـث وعـمـل بـه الـسـا فـعى رحـمـة لله ومـنـهـا ان اقـوال الـصـحـابـة جـمـعـت فـى عـصـر الـشـافـعـى رحـمـة الله عـلـيـه فـتـكـثـرت واخـتـلـفـت وتـشـعـبـت وراى - كـثـيـراً مـنـهـا يـخـالـف الـحـديـث حـيـث لـم يـبـلـغـهـم داى الـسـلـف لـم يـزالـو يـرجـعـون فـى مـثـل ذلـك الى الـحـديـث فـتـرك الـتـمـسـمـك بـاقـوالـهـم مـالـم يـتـفـقـو اوقـال هـم رجـال ونـحـن رجـال ومـنـهـا انـه راى قـومـامـن الـفـقـهـاء يـخـلـطـون الـراى الـذى يـسـوغـه الـشـرع بـالـقـيـاس الـذى اثـبـتـه فـلا يـمـيـزون واخـذا مـنـهـا مـن الاخـر ديـسـمـونـه

www.pathagar.com

تارتًابالا حسان واعنى بالراى ان ينصب مظنلته حرج اومصلحة علة الحكم وانما القياس ان تخرج العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم فابطل هذا لنوع اتم ابطال وقال من استحشن فانه ارادان يكون شارعًا حكاه ابن الحاجب فى مختصر الاصول مثاله رشد اليتيم امر خفى فاقاموامظنته الرشد وهو بلوغ خمس وعشرين سنة مقامه وقالوا اذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم اليه ماله قالواهذا استحسان والقياس ان لايسلم اليه وبالجملة لماراى الشافعى فى ضيع الاوائل مثل هذاه الامور اخذ الفقه من الراس فلس الاصول وفرع الفروع وصنف الكتب فاجا دوادافا دواواجتمع عليه الفقهاء وتصر فواختصاراً وشرحًا وستد لا لاوتخريجا ثم تفرقوافى البلدان فكان هذا هذا هبا للشا فعى رحمة اللّه عليه والله اعلم -

যখন হানাফী মালিকী ব্যাপক প্রসার ঘটে গেছে এবং তাঁদের রীতি-নীতি বিভিন্ন বিভাগে বিন্যস্ত হয়ে সংকলিত হয়ে গেছে! ঠিক সেই সময় ইমাম শাফেয়ী (রহ) আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরীগণের রচনাবলী গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে, তার মধ্যে বেশ কিছু গড়মিল রয়েছে। ফলে নিঃসঙ্ক অনুসরণ তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) তাঁর কিতাবুল উম-এর শুরুতেই এসব কথা বর্ণনা করেছেন। বিষয়টা মোটামুটি এরকম যে, পূর্বসূরীগণ মুরসাল ও মুনকাতে বর্ণনাসমূহকেও কার্যকর মনে করতেন। অথচ এসব বর্ণনা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। হাদীসের সকল রীতি-পদ্ধতিকে যখন জমা করা হতো তখন ব্যাপারটা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়তো যে, অধিকাংশ মুরসাল হাদীস নিছক কাল্পনিক, অমূলক অসত্য। তদুপরি তা মুসনাদ বর্ণনাসমূহের খেলাফও বটে। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী (রহ) এই নীতি স্থির করলেন যে, মুরসাল বর্ণনার কার্যকারিতা তখনই বিবেচনায় আনা যেতে পারে যখন তার সকল শর্তসমূহ উপস্থিত থাকবে। নীতি নির্ধারণী কিতাবসমূহে সেইসব শর্ত বিস্তারিতভাবে দেয়া আছে।

দ্বিতীয় বিষয় ছিল, পূর্বসূরীদের যুগে এমন কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি ছিল না যা দিয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে হাদীস সংগ্রহ করে তার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। যে কারণে তাদের ইজতিহাদী মাসায়েলের অধিকাংশের মধ্যেই ভুল-ত্রুটি থেকে যেতো। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে ঐ ধরনের হাদীসের জন্য একটা নীতিমালা তৈরী করলেন এবং এ বিষয় সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থও রচনা করলেন।

'উসূলে ফিকাহ্' বিষয়ের সর্বপ্রথম গ্রন্থ এই কিতাব। এ ব্যাপারে একটা ঘটনা কথিত আছে যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইমাম মুহাম্মদ (রহ)-এর কাছে গেলেন। ইমাম মুহাম্মদ সে সময়

www.pathagar.com

মদীনার আলেমদের একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সমালোচনা করছিলেন, তারা একজন সাক্ষী এবং তার কসম দিয়ে ফয়সালা করে দেন। তিনি বলছিলেন, তাতে কুরআন মজীদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, তোমার কাছে কি এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, খবরে ওয়াহেদ দিয়ে কিতাবুল্লাহ্র উপরে কথা বলা জায়েয নেই। ইমাম মুহাম্মদ বললেন, হ্যাঁ। শাফেয়ী (রহ) বললেন, তাহলে তোমরা কেমন করে বলো যে, উত্তরাধিকারের জন্য অসিয়ত জায়েয নেই এবং তোমাদের কথার দলিল হিসেবে এই হাদীস উপস্থাপন করো যে, সাবধান উত্তরাধিকারের জন্য অসিয়ত করা ঠিক নয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, মৃত্যুশয্যায় পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য তোমাদের সম্পদ থেকে অসিয়ত করে যাওয়া উচিত। কুরআন থেকে এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ তিনি তুলে ধরলেন যার কোনো জবাব ইমাম মুহাম্মদ দিতে পারেননি।

আর একটি বিষয় ছিল, সেইসব ওলামায়ে তাবেয়ীন যাদের ওপরে ফতোয়ার দায়-দায়িত্ব ছিল। তাঁদের কাছে কিছু কিছু শুদ্ধ বর্ণনা পৌছেছিল। এই জন্য তাঁদেরকে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইজতিহাদ করতে হয়েছে। সাধারণ কথার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁরা সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় স্তরে (তাবেয়ীন পরবর্তী যুগে) সেই সব হাদীসমূহ আরও চর্চিত হয়েছে এবং তারা দেখেছেন যে, এই হাদীসসমূহ তাদের সমকালীন আলেম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত কর্মপদ্ধতির খেলাফ তাই তারা গ্রহণ করেননি। ফলে সেইসব হাদীসের পরিণতি এই হয়েছে যে, তা সন্দেহপূর্ণ বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অথবা তৃতীয় স্তরে সেইসব হাদীসের আদৌ চর্চা হয়নি। কিন্তু মুহাদ্দিসীন সকল হাদীসের উস্তাদগণকে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন এবং গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য সফর করে ওলামায়ে হাদীসের সাথে মত বিনিময় এবং পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে, তার মধ্যে অধিকাংশ হাদীস এমন বেরিয়েছে যা সাহাবাগণের মধ্যে মাত্র একজন বা দু'জন তা বর্ণনা করেছেন। এবং তাদের থেকে আবার এক অথবা দু'জন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন এবং এভাবেই তা চলে এসেছে। এই জন্য বেশিরভাগ ফকীহ্র দৃষ্টির আড়ালেই তা থেকে গেছে। সেই সব হাদীসের হাফেজদের যুগে তা আবার চর্চায় এসেছে যারা যে কোনো সূত্রের হাদীস মাত্রই সংগ্রহ করে আসছিলেন। অসংখ্য হাদীস এমন ছিল, যেমন বসরার আলেমগণ তা বর্ণনা করতেন এবং গোটা সাম্রাজ্যের বাদবাকী সকল অঞ্চলে তা ছিল অজ্ঞাত। ঠিক এই সময় ইমাম শাফেয়ী (রহ) সমুদয় বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হন। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, ওলামায়ে সাহাবা ও তাবেয়ীন প্রতিটি মাসআলায় হাদীস তালাশ করতেন। যখন কোনো একটি বিষয়ে কোনো বর্ণনা পাওয়া না যেতো তখন যুক্তি প্রদর্শন করতেন। কিন্তু যখনই আবার তাদের যুক্তির খেলাফ কোনো হাদীস সেই বিষয় সংক্রান্ত পাওয়া যেতো, তখন সাথে সাথে তাঁরা তাদের নিজেদের যৌক্তিকতা ছেড়ে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন। তাদেরই যখন রীতি-পদ্ধতি এরকম ছিল তখন হাদীসের ওপর আমল না করা হাদীসের জন্য কোনো অপবাদের কারণ হতে পারেন না। হাদীসের ব্যাপারে তখনই আপত্তি উঠতে পারে, যখন তার বর্ণনায় দোষ-ত্রুটি সবিস্তারে বিবৃত হবে। যেমন হাদীসে 'কিল্লাতাইন' সম্পূর্ণ শুদ্ধ হাদীস। বিভিন্ন পরম্পরা সূত্রে তা প্রমাণিত। এর মধ্যে সব চাইতে বড় যে পরম্পরা তা হলো, যার সনদ আবুল অলীদ ইবনে কাছীর পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। তিনি তাকে মুহাম্মদ জাফর বিন জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে জাফর আবদুল্লাহ্ অথবা মুহাম্মদ বিন ইবাদ বিন জাফর থেকে ওবায়দুল্লাহ্ বিন আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এরপরে বেশ কয়েকটি বর্ণনা দাঁড়িয়ে গেছে। এই দু'জন বর্ণনাকারী যদিও

www.pathagar.com

নির্ভরযোগ্য কিন্তু তাঁদের ওপরে ফতোয়ার দায়িত্ব ছিল না। এই জন্য এই বর্ণনা সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব এবং ইমাম যুহরীর সময়ে বিখ্যাত হতে পারেনি। এবং একারণেই মালিকী ও হানাফীগণ এর ওপর আমল করেননি। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ) তাকে কার্যকর করেছেন। এভাবে উত্তম ব্যক্তিত্বগণের বর্ণনা পরম্পরার হাদীস শুদ্ধ যা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবু হোরায়রাহ (রা) ও ইবনে উমর (রা) তার ওপর আমল করেছেন, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ) তার ওপর আমল করেননি। আরও একটি কারণ এই ছিল যে, সাহাবায়ে কেরামের যাবতীয় বাণীসমূহ ইমাম শাফেয়ীর সময়কালে সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের বাণীসমূহের আধিক্য এবং তাঁদের পারস্পরিক মতপার্থক্যের ওপর যখন ইমাম গভীর অভিনিবেষ সহকারে পর্যবেক্ষণ চালালেন, তখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে, সাহাবাগণের যেসব বাণী শুদ্ধ হাদীসের খেলাফ পাওয়া যায়, তা শুধুমাত্র একারণে যে, তাঁর পর্যন্ত এই বর্ণনা পৌছায়নি। একারণে হাদীসের ওপরেই আমল করা হোক এবং যেসব মাসায়েলে সাহাবাগণ ঐকমত্য ছিলেন না সেসবের ব্যাপারে ইমামের সিদ্ধান্ত হলো, তারাও মানুষ ছিলেন আর আমরাও মানুষ।

আর একটি কারণ এই ছিল যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) দেখলেনে যে, ফকীহ্দের একটি দল শরীয়ত অনুমোদিত কিয়াসে এমন সব বর্ণনা মিলিয়ে দেন, যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা শরীয়তে নেই। তারা সেই কিয়াস ও বিবেক-বুদ্ধির রায় এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না এবং এই ধরনের দার্শনিক মতামতের নাম রেখেছে 'ইসতেহ্সান'— ধারণা প্রসূত রায়। অর্থাৎ কোনো একটি প্রেক্ষিতের ক্ষতি অথবা কল্যাণকে আদেশের কারণ বলে বিবেচনা করা। আর কিয়াসের মানে হলো মূল আদেশের কোনো একটি কারণ উদ্ধার করে সে অনুযায়ী উদ্ভূত পরিস্থিতির আদেশ দেয়া। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী (রহ) ঐ ধারণাপ্রসূত রায়কে অত্যন্ত যৌক্তিক বিজ্ঞতার সাথে বাতিল করেছেন এবং বলেছেন যে, যিনি ইসতেহ্সানকে (উত্তম বিবেচনা) বৈধতা দেন তিনি শরীয়ত রচয়িতা হতে চান।

ইবনে হাজেব "মুখতাসার আল উসূলে" এটা উল্লেখ করেছেন। একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে, ইয়াতিমের বয়োপ্রাপ্ত হওয়া একটা অস্পষ্ট বিষয়। এই জন্য ফকীহ্গণ ২৫ বছর বয়সকে বয়োপ্রাপ্তির মাত্রা নির্ধারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, ইয়াতিম যখন ২৫ বছর বয়সে পৌছাবে তখন তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটাকেই তারা ইসতেহ্সান বলেছেন অথচ তা কিয়াসের দাবি পূরণ করে না।

মোদ্দা কথা হলো ইমাম শাফেয়ী (রহ) পূর্বসূরীদের সার্বিক অবস্থা দেখে নিজেই নতুন করে ফিকাহ্ রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তার মূলনীতি ও বিভাগসমূহ বিন্যাস করলেন। প্রাত্যেকটি রচনায় তার জ্ঞান প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কালোত্তীর্ণ যোগ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ প্রস্ফুটিত। সমসাময়িক সকল ফকীহ্গণ মধুমক্ষীকার মতো তাঁর চারপাশে এসে ভীড় জমালেন। তাঁর রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হলো। তার ওপরে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হলো। আনুষঙ্গিক দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো। নতুন পদ্ধতিতে মাসায়েল বের করা হলো। অতঃপর তা সকল শহর-নগরে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর এই নতুন নীতি পদ্ধতিকেই ইসলামী শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'শাফেয়ী মাযহাব' বলা হয়।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দু'জন স্বনামধন্য ছাত্র

উপসংহারে ঃ হযরত ইমাম বায়হাকী (রহ) এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ)-এর পরিচিতি পেশ করা হলো ঃ সাধারণভাবে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মত ও পথকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন অনুসরণ করেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু'জন মহাত্মন এমন যারা হযরত ইমামের ফিকাহ্ ও চিন্তাধারা সারা দুনিয়ায় পরিচিত করিয়েছেন। একজন ইমাম বায়হাকী (রহ) এবং দ্বিতীয় হাফেয ইবনে আসকালানী (রহ)। প্রাসাঙ্গিকভাবেই এই দু'জনার জীবনী আলোচনা অনস্বীকার্য।

ইমাম বায়হাকী (রহ)

আহমাদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবদুল্লাহ্ বিন মূসা আল হাফেয আবু বকর আলী বায়হাকী আল নিশাপুরী আল খসরুজারদী। ৩৮৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম হাকেমের বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে একজন। জগদ্বিখ্যাত কিছু কিতাবের রচয়িতা তিনি। সুনানে কুবরা— দশ খণ্ডে প্রকাশিত। হাদীস ও সাহাবাগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত অসাধারণ সৃষ্টি। "আসমা'আ ওয়া সিফাতে বারি তা'আলা", "আল ইতিকাদ" "দালায়েলুন্ নবুউয়াহ", "শা'আব আল ঈমান", "মানাকিব ইমাম আহমাদ, আহকামুল কুরআন ইমাম শাফেয়ী দাওয়াতে ছাগীর", "আল বা'আস ওয়ান্নুশুর, "আয্‌যুহদ আল কবীর" ইত্যাদি।

হাফেয যুহরী (রহ) বলেন, ইমাম বায়হাকী তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম এবং হাফেযে হাদীস। ইমামুল হারামাইন বলেন, পৃথিবীতে এমন কোনো শাফেয়ী অনুসারী নেই যার কাঁধের ওপর ইমাম শাফেয়ীর অনুগ্রহের বোঝা চাপানো নেই একমাত্র বায়হাকী ছাড়া। বায়হাকীর অবদানের বোঝা বরং ইমাম শাফেয়ীর ওপরে চেপে আছে। কেননা তিনিই তাঁর মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সমস্ত হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের ইতিহাসকে একত্রিত করে নিয়েছিলেন। ইমাম বায়হাকী বলেন, ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ীকে স্বপ্নে দেখেছেন যে, তিনি একটি সভায় প্রধান আসনে বসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, আজ আমি বায়হাকীর কিতাব পড়ে অনেক কিছু জেনেছি। আবু বকর বিন মুহাম্মদ মারুযী বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি আলোকিত 'সিন্দুক' আকাশে উড়ে যাচ্ছে। আমি প্রশ্ন করলাম এগুলো কি ? কে যেন আমায় বলে দিলো এর মধ্যে বায়হাকীর রচনাবলী রয়েছে। যা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ইমাম বায়হাকী ইমাম শাফেয়ীর নিষিদ্ধ করা দিনগুলো ছাড়া একটানা তিরিশ বছর রোযা রেখেছেন। ৪৫৮ হিজরী সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হাফেয ইবনে আসকালানী (রহ)

আহমাদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ হাজার কেনানী আল-আসকালানী। হাফেয সুয়ূতী বলেন, তাঁর পিতার ঘরে যে শিশুই জন্ম নিতো! মরে যেতো। সেকালের বিখ্যাত অলী শায়খ জা'ফিরীর কাছে তাঁর পিতা ছেলের সন্তান প্রাপ্তির জন্য দো'আ চাইলেন। তিনি বললেন,

www.pathagar.com

এবার তার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিবে এবং সেই ছেলে এমন এক আলেম হবে যার জ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীর লোকেরা কেয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। ২৩ শা'বান ৭৭৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে পা রেখেই তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল সফর করেন এবং হাফেযে হাদীস ইমাম জয়নুদ্দিন ইরাকীর সান্নিধ্যে পূর্ণ দশ বছর থেকে হাদীস, উসূলে হাদীসের যাবতীয় বিষয়সমূহের ওপরে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা ১৫০-এর অধিক। তাঁর রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যেতো। যে কোন মত ও পন্থার লোক তাঁর রচনার মুখাপেক্ষী। মিশর ও ভারতবর্ষে তাঁর রচিত পঞ্চাশখানা কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এই রকম।

১. বুলুগ আল্ মারাম।
২. নাখ্বাতুল ফিক্‌র।
৩. তাওয়ালা আত্ তাসীস
৪. ফাতহুল বারী— ১৪ খণ্ডে বুখারীর ব্যাখ্যা।
৫. তাহ্যীব আত্ তাহ্যীব— ১২ খণ্ড।
৬. লিসানুল মীযান— ৬ খণ্ড
৭. আসাবাহ্ ফী মা'রেফাতুস্ সাহাবা।
৮. দিরারুল কামিনাহ্।
৯. তাখ্লীসুল জাবীর।
১০. নাসাবুর রা'হ্য়াহ্ ফী তাখরীজ।
১১. আহাদীসুল হিদায়াহ।
১২. কাওলে মাসদাদ।
১৩- তবকাতুল মুদলিছীন. ইত্যাদি ইত্যাদি।

২৭ যিলহাজ্জ ৮৫২ হিজরী সালে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল। মিশরের বাদশাহ তাঁর মরদেহের খাট অন্যান্যের সাথে কাঁধে করে ঘর থেকে কবরস্থান পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। আমীর-উমরাও, গরীব-দুঃখী, আলেম-ওলামা অশ্রু বন্যায় ভেসে ভেসে যোগদান করেছিল। বিধাতার সৃষ্ট গোটা প্রকৃতিও বোধহয় সেদিন কাঁদছিল। তাই বর্ষা নয় তবু সেদিন আকাশ ছিল মেঘে ছাওয়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টির ফোঁটা লক্ষ জনতার অশ্রু ধারার সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেন প্রমাণ করে দিচ্ছিল সৃষ্টির সেরা মানুষ, সেই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন মানুষেকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে প্রকৃতিও তার অশ্রু ধরে রাখতে পারে না।

জাযুলীর মাযারের পাশে সূর্যাস্তের একটু আগে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট মাটির ঘরে চিরনিদ্রার শয়ানে শায়িত করে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

মহাপ্রয়াণ

ইমাম শাফেয়ী (রহ) অর্শ্বরোগে আক্রান্ত ছিলেন। হাফেয ইবনে অসকালানী বলেন ঃ

كَانَ عَـلـيـلا شـديـد الـعـلـة وربـمـاحرج الدم وهـو راكـب حتـى يـتـمـسلى سرا ويـلـه وخفـه بـغـى مـن الـبـوا سير -

তিনি মারাত্মকভাবে অর্শ্ব রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কোনো সাওয়ারীতে আরোহণ করলেই রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যেতো। রক্তপাতের ধরণ ছিল এই রকম যে, তা পাজামা অতিক্রম করে মোযা পর্যন্ত ভিজে যেতো।

বিভিন্ন বর্ণনা

এই রোগ ছাড়াও অন্যান্য যেসব ঘটনা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে তা হলো , ফাইতান বিন আবী আলমাসাহ্ মালিকী মিছরীর (রহ) সাথে এক বহসের সময় ফাইতান অভদ্রজনচিত বাক্যালাপ শুরু করে দিল এবং এক পর্যায়ে তা প্রচণ্ড ঝগড়া এবং শেষ পর্যন্ত মুকদ্দমা পর্যন্ত গিয়ে পৌছাল। মিশরের আমীর এই বিবাদের ফয়সালা করে ফাইতানকে শাস্তি দিল। অপমানিত ফাইতান প্রতিশোধ নিতে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো। একদিন রাতের অন্ধকারে একা পেয়ে সে সুযোগ সে হাতছাড়া করেনি। কঠিন কিছু একটা দিয়ে ইমামের মাথায় আঘাত করলো। মাথা ফেটে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। একদিকে অর্শ্ব রোগের রক্তক্ষরণ তাকে রক্তশূন্যতার পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল। শারীরিকভাবে ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। তার ওপরে এই মরণ আঘাত। সোজাসুজি তাকে শয্যাশায়ী করে ফেললো। অন্যদিকে মালিকী মাযহাবের ফকীহ আশহাব বিন আবদুল আজিজের বিরামহীন হিংসাত্মক বদদো'আ। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল হাকাম বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ীর (রহ) কাছে নিবেদন করলাম যে, আমি নিজ চোখে দেখেছি, আশহাব সেজদায় পড়ে আল্লাহ্র কাছে কাকুতি মিনতি করছে, হে আল্লাহ্ শাফেয়ীকে তুমি তুলে নাও। নইলে মালিকী ফিকাহ্ বিলুপ্ত হয়ে যাবে! তখন ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন ঃ

تـمـنـا رجـال ان امـوات وان امـت فـتـلـك سـبـيـل لـسـت فـيـهـا بـاوحـد وقـد عـلـمـوا لـو يـنـفـع الـعـلـم عـنـدهـم لـئـى مـت مـاالـداعـى عـلـى بـمـخـلـد -

অনেকেই আমার মৃত্যু কামনা করছে। আমি যদি মরেই যাই তো মৃত্যুর হাত থেকে আর কে রক্ষা পেতে পারে ? যদি জ্ঞান দিয়ে তার বুঝ অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে সে খুব ভাল করেই বুঝতে পারে যে, আমি যদি মরেও যাই তো আমার জন্য যারা বদ-দো'আ করে তারা কি চিরদিন বেঁচে থাকবে ?

সুতরাং এটাও কথিত আছে যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর ওফাতের মাত্র আঠারো দিন পরেই আশহাবও পরপারের খেয়ায় আরোহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

মরণ ব্যাধি

২০৪ হিজরীর ৩০ রজব বুধবার দিন আসরের সময় তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে দাঁড়ালো। ইমাম মুয্‌নী (রহ) তখন তাঁর পাশে বসে আছেন। তিনি নিবেদন করলেন ঃ

كيف امست ياستاذ الاست ذين -

হে উস্তাদগণের উস্তাদ কেমন বোধ করছেন?

বললেন ঃ

اصبحت من الدنيا راحلا وللا خوان مفارقا وبسوء افعالى ملاقيا وعلى الله واردا ولكاس الميته شاربًا ولا والله لاادرى ان روحى يصير الى الجنة فاهنيتها اوالى النار فاعزيها -

আজ আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি এবং আমার ভাইদের থেকে আলাদা হতে চলেছি। নিজের সমস্ত মন্দ কাজের শাস্তি পেতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাজির হতে চলেছি! আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না, আমার রূহ জান্নাতে যাবে আর সেখানে তাকে আমি স্বাগতম জানাবো, না জাহান্নামে যাবে যেখানে তার জন্য আমাকে বিলাপ করতে হবে!

অন্তিম সময়

অনেক কষ্টে তিনি মাগরিবের নামায আদায় করলেন। নামাযান্তে বিছানায় শুয়ে পড়ার সাথে সাথে মৃত্যু যাতনা শুরু হয়ে গেল। তিনি বললেন, শোন! মিশরের মশহুর আবেদ ইদরিসকে গিয়ে আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করতে বলবে! একথা বলেই তিনি অত্যন্ত করুণ কান্নাজড়িত কণ্ঠে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন ঃ

اليك اله الخلق ارفع رغبتى وان كنت ياذالمن والجود مجرما ولما قسى قلبى وضاقت مذاهبى جعلت الرجا منى بعفوك سلما وما زلت رذاعفو عن الذنب لم تزل لتخودوتعفو منة وتكرمًا ولولاك مايقوى بابليس عابد فكيف وقد اغوى صفيك ادما فان تعف عنى تعف عن متحر وظلوم عشوم لايزائل ماشما وان تنقم منى فلست بائس ولو دخلت نفسى بجرمى جهنما فجرمى عظيم من قديم وحادت وعفرك ياذالعفوا على داجسماتعا ظمنى ذنبى فلما قرنته بعفوك ربى كان عفوك اعظما -

হে দয়াময়, দয়ার সাগর! আমি তো গুনাহ্‌গার, তবু তোমার দরবারে ভিক্ষা চাইতে হাজির হয়েছি। আমার হৃদয় যখন কঠিন হয়ে গেল! বন্ধ হয়ে গেল আমার সব পথ, তখন আমি আমার 'আশা'কে তোমার দয়ার দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছাবার সোপান বানিয়েছি। ভুল-ত্রুটি আর

www.pathagar.com

গুনাহগুলোকে তুমি চিরদিনই ক্ষমা করে এসেছো! চিরদিনই তোমার গোপন অনুগ্রহের দানে ক্ষমা করেই যাবে। তোমার দয়া যদি সহায় না হতো তাহলে কোনো আবেদ কোনো মুত্তাকী শয়তানের মুকাবিলায় দাঁড়াতেও পারতো না। আর দাঁড়াবেই বা কেমন করে যেখানে তোমার অনুগ্রহ ধন্য আদম আলাইহিস্ সাল্লাম পর্যন্ত তাঁর ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল! বিধাতা! তুমি যদি আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও তাহলে তুমি অনেক বড় এক বিদ্রোহী জালিম পাপীকে ক্ষমা করে দিলে। দিনরাত গুনাহে লিপ্ত রয়েছি। তুমি যদি এসবের প্রতিশোধ নাও তাহলেও আমি তোমার কাছ থেকে নিরাশ হতে পারি না। আমার কর্মফল যদি আমায় জাহান্নামেও পৌছে দেয়, তবুও না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পাপের বোঝা অনেক বড়। কিন্তু হে দয়ার আঁধার তোমার দয়া আর অনুগ্রহের সাগর তো সীমাহীন। আমি আমার পাপের বোঝাকে অনেক বড় ভেবে রেখেছিলাম, কিন্তু যখন তোমার দয়ার সাগর-তীরে তাকে দাঁড় করলাম তখন দেখি হে প্রভু! তোমার দয়ার সাগর তো অন্তহীন।

এরপরে এশার নামায আদায় করলেন। নামায শেষে আবার আগের মতো করুণ আকুতিভরা কণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। দো'আ শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়ার সাথে সাথে পবিত্র 'রূহ' মাটির দেহ ছেড়ে অসীমের পথে পাড়ি জমালো। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন

ইমাম মুযূনী (রহ) মরদেহের গোসল করালেন। জুম'আর রাতেই জানাযার জন্য চিরবিদায়ের পোশাক পরিয়ে প্রস্তুত করা হলো। কিন্তু এতো বড় মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যু যেহেতু সাধারণ কোন ঘটনা ছিল না তাই সর্বসম্মতভাবে জুম'আর নামাযের পরেই জানাযা নামাযের সময় নির্ধারণ করা হলো। হযরত সাইয়েদাহ্ নাফীসাহ বিন্তে হাসান বিন যায়েদ বিন হাসান বিন আলী কারামাল্লাহু ওয়াজ্হু[১] জানাযা নামায পড়ালেন। আসরের আগেই নামায আদায় করে কায়রো নগরীর উপকণ্ঠে মাক্তাম পাহাড়ের পাদদেশে কারাফাতা-আছছুগরা কবরস্তানে চিরশয়ানে শায়িত করা হলো। কোটি কোটি মানুষের পথের দিশারী, বিধাতার নূরে আলোকিত মহান এই মানুষটি যে স্থানে শুয়ে আছেন মুসলিম মাত্রই অন্তরে সেই স্থানটি

১. তিনি হযরত আবু মুহাম্মদ হাসান বিন যায়দ হাসান বিন আলী কাররামাল্লাহর কন্যা। হযরত যাফর সাদেক (রহ)-এর ছেলে ইসহাকের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। শিক্ষা জীবন শেষ করে ইমাম শাফেয়ী যখন মিশরে এলেন তখন তাঁর আশ্রয়ে উঠেছিলেন এবং হাদীস সম্পর্কিত আরও কিছু জ্ঞান এখানে অর্জন করেছিলেন। শাফেয়ী (রা)-কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ২০৮ হিজরী রমযান মাসে সৈয়দা নাফীসাহ্ ইনতিকাল করেন। স্বামী হযরত ইসহাক বিন যাফর সাদেক (রহ)-এর ইচ্ছা ছিল স্ত্রীর মরদেহ তিনি মদীনায় নিয়ে যাবেন এবং এখানে দাফন করবেন। কিন্তু মিশরবাসী এই পুণ্যবর্তীর মরদেহ মিশরের মাটি ছেড়ে যেতে দেয়নি। রাতে ইসহাক্ স্বপ্নে দেখলেন খোদ রাসূল (স)ও তাঁকে মিশরেরই দাফন করতে বলছেন। নাফীসাহ্ মিশর বাসির জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমত স্বরূপ (মাশরেদুল আমওয়ার) হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানী (রহ) সাইয়েদাহ্ নাফীসাহ্র প্রায় একশ পঞ্চাশটি অলৌকিক ঘটনার কথা লিখেছেন এবং আল্লামা ইবনে খালকান তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

وقبرها معروف باجابته الدعوان عنده وهومجرن رضى الله عنهما .

অর্থাৎ 'তাঁর কবরের পাশে বসে যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো প্রার্থনা করা হয় তাহলে তা কবুল হয়।' এরকম একটা জনোশ্রুতী আছে এবং তা নানান ভাবে পরিক্ষাও করা হয়েছে।

www.pathagar.com

জিয়ারত করার বাসনা অনুভব করে। মহাকাল কোনো দিনই তাকে পুরানো করে দিতে পারেনি এবং এ পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁর মাযারে ফাতেহা পাঠের চর্চা চলতেই থাকবে।

কিছু সুসংবাদ

১. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ) বলেন, আমি স্বপ্নে ইমামকে দেখে প্রশ্ন করলাম, বলুন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কিভাবে নিয়েছেন ? বললেন, তিনি তাঁর আপন অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন আর আমাকে বিবাহ করিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, শাফেয়ী, জীবনকালে তুই কখনো অহংকার করিসনি আর যা কিছু সম্পদ আমি তোকে দিয়েছিলাম জাঁকজমক করে তাকে প্রকাশ করিসনি বলে আমি তোকে ক্ষমা করে দিলাম। —ইবনে আসাকার।

২. রবী বিন সুলাইমান বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি! আমি জিজ্ঞেস করছি, ইমাম আপনি কেমন আছেন ? তিনি বলছেন, রবী, আল্লাহ্ আমায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। সোনার সিংহাসনে বসিয়ে ফেরেশতাদের দিয়ে আমাকে সংবর্ধনা দিয়েছেন— ইবনে আসাকার।

৩. মুহাম্মদ বিন মুসলিম বলেন, যখন ইমাম আবু যার'আ (রহ)-এর ইন্তেকাল হলো! আমি এক রাতে তাকে স্বপ্নে দেখলাম! জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন ? বললেন, আমার বেলায় আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আবু আবদুল্লাহ্, আবু আবদুল্লাহ্ এবং আবু আবদুল্লাহ্র সাথে রাখো, আমি প্রশ্ন করলাম এঁরা কে ? বলা হলো প্রথম আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম মালিক দ্বিতীয় আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম শাফেয়ী তৃতীয় আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ)! (তাওয়ালা আত্ তাসীস)

৪. ইমাম বায়হাকী (রহ) উসমান (রহ)-এর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম কেয়ামত হয়ে গেছে এবং আমরা সবাই হাশরে উপস্থিত। আরশের নীচ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে— আবু আবুল্লাহ্, আবু আবদুল্লাহ্ এবং আবু আবদুল্লাহ্ ও আবু আবদুল্লাহ্কে জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক। আমার পাশে দাঁড়ানো একজন ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলাম এঁরা কারা ? সে বললো, ইমাম মালিক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ)।

ইমামের ইন্তেকালে কমপক্ষে সত্তরজন মর্সিয়া রচনা করেছেন। বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে দারীদের মর্সিয়া এর মধ্যে প্রণিধানযোগ্য। তার কিছু শে'র

الم تراثار ابن ادرليس بعده رلائلها فى المشكلات لوامع –
معالم يفنى الدهر دهى خوالد وتنخفض الاعلام وهى روافع –
مناهج فيها للهدى تصرف موارد فيها للرشادشوارع –
ظواهر بلحكم ومستنبطاتها لماحكم التفريق منه جوامع –

তুমি কি মুহাম্মদ বিন ইদরিসের ওফাতের পরে
তাঁর নিদর্শনগুলো দেখনি ?

www.pathagar.com

কঠিন থেকে কঠিনতর মাসআলাগুলোর সমাধানে
তার দলিলগুলো কেমন চমকাচ্ছে!
এগুলো তাঁর এমনই স্মৃতি চিহ্ন
পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত তা সুস্পষ্ট থাকবে!
ঝাণ্ডা অবনত হবে কিন্তু
ওগুলো অমনি দাঁড়িয়ে থাকবে।
এটা এমনই মসৃণ রাজপথ
যার ওপরে হেদায়েতের নির্দেশনা রয়েছে
এবং তা এমনই গিরিপথ যার ওপর দিয়ে
সত্য সঠিক পথের পথিকগণ চলে গেছেন
তাঁদের বিধানসমূহ সুস্পষ্ট
এবং তাঁদের উদ্ভাবনসমূহ সমন্বয়কারী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বাল (রহ)

জন্ম ১৬৪ হিজরী, ওফাত ২৪১ হিজরী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ▼ ফকীহ্, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ
- ▼ জাহেদ, সাধক, নবী (স)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী।
- ▼ 'খাল্‌কে কুরআন' (কুরআনের প্রকৃতি) নিয়ে যখন ফেতনা শুরু হলো তখন আব্বাসী বংশের সবচাইতে স্বেচ্ছাচারী স্বৈরাচার খলিফা মু'তাসিমের মুখোমুখী দাঁড়ালেন। ভরা দরবারে বেত্রাঘাত খেলেন। কারা নির্যাতন ভোগ করলেন। আরও অনেক অপমান লাঞ্ছনা সত্ত্বেও একবিন্দু আপোষ করেননি।
- ▼ "মুসনাদে ইবনে হাম্বাল" হাদীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিতাব।
- ▼ আরবের কিছু কিছু অঞ্চলে হাম্বালী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত। সৌদী রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মাযহাব 'হাম্বালী'।

www.pathagar.com

জন্ম, লালন-পালন, পরিবার ও বংশাবলী

শায়খুল ইসলাম ইমামুল মুসলিমিন কাদওয়াতুল মুত্তাকীন আবু আবদুল্লাহ্ আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বাল বিন বেলাল বিন আসাদ বিন ইদরিস বিন আবদুল্লাহ্ হাইমান বিন আবদুল্লাহ্ বিন আনাস বিন আসাদ বিন আওফ বিন কাসেত বিন মাযন বিন বযীল বিন শাইবান বিন যোহল বিন ছা'লাবা বিন আকাবাহ বিন মুসআব বিন আলী বাকার বিন ওয়ায়েল বিন কাসেত বিন হানসাব বিন কাসী বিন ওয়ামী বিন হাযীলাহ বিন আসাদ বিন রবীআহ বিন্ নিযা বিন মু'আদ বিন আদনান বিন আওদ বিন হামী'ই বিন ছাবেত বিন কাইদার বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম খালিলুল্লাহ্ সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈন আশ্শাইবানী আলমাযুরী ছুম্মা আল বাগদাদী।

ইমাম আবু বকর বায়হাকী তাঁর উস্তাদ আবু আবদুল্লাহ হাকেমের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের জীবনী লিখেছেন। এর মধ্যে তিনি তাঁর বংশ পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন। ইমাম আহমাদের পুত্র 'সালেহ' থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার বাবা আমার একটা নোট বইতে আমাদের এই বংশ পরিচয় লিখেছি দেখে তিনি শুধু এতোটুকু বলেছেন যে, 'এসব কি লিখেছ'? কিন্তু তার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।[১]

ইবনে খালকানের বিশ্লেষণ ঃ ইবনে খালকান তাঁর বংশধারা এভাবে বর্ণনা করেন। আল ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বাল বিন আসাদ বিন ইদরিস বিন আবদুল্লাহ্ বিন হাইয়ান বিন আবদুল্লাহ্ বিন আনাস বিন আওফ বিন কাসেত বিন হানসাব বিন আফ্দী বিন ওয়ামী বিন হাদীলাহ্ বিন আসাদ বিন রবীয়াহ্ বিন্ নাযার বিন সো'ওদ বিন আদনান তারপর বলেন ঃ

ورايت فى نسبه اختلافًا وهذا اصحالطرق التى وحدتها -

অর্থাৎ ইমামের বংশধারা সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি তা শুদ্ধ বলে বিবেচিত।[২]

"তাহযীবুল আসমাআ ওয়াল লুগাত"— ইমাম নুদী। "তব্কাতুশ্ শাফেয়ীয়াহ"— তকীউদ্দীন সাবকী এবং অন্যান্য কিতাবের বর্ণনাসমূহকে পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইবনে খাল্কানের বর্ণনাটি শুদ্ধতম। হযরত ইমামের পিতা সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন এবং আব্বাসী বংশের এক ঘোরতর সমর্থক। যৌবনেই তিনি মারা যান।[৩] ইমামের জন্মস্থান নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি পেটে থাকতে তাঁর বাবা তার মাকে নিয়ে বাগদাদে চলে আসেন এবং বাগদাদেই ১৬৪ হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কতিপয় বলছেন, পিতা তাঁর মাকে নিয়ে বাগদাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে আবার বাগদাদে ফিরে যান। সে যাই হোক দুই বছর বয়সে তিনি পিতা হারিয়েছেন এবং তারপর থেকে মায়ের কোলে-পিঠেই মানুষ হয়েছে।[৪] প্রাথমিক শিক্ষা বাগদাদে সম্পন্ন হয়েছে।

১. মুয়াজ্জাম আল মুসান্নেফীন। ২. ইবনে খালকান ৩. তায্কেরাতুল হুফ্ফায ৪. ইবনে খালকান।

www.pathagar.com

শিক্ষা জীবন

আহমাদ ইবনে হাম্বাল ১৫ অথবা ১৬ বছর[১] বয়সে ১৭৯ হিজরীতে হাদীস বিষয়ের ওপর শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন ইমাম আবু ইউসুফের দরসদাহে। তারপর অন্যান্য শায়খ ও উস্তাদগণের কাছেও শিখেছেন। ১৮৭ হিজরীতে প্রথম হজ্জব্রত পালন করেন। দ্বিতীয়বার ১৯১ হিজরীতে। সে বছর অলীদ বিন মুসলিমও হজ্বে এসেছিল। এরপরে ১৯৬ হিজরীতে হজ্বে গিয়ে পূর্ণ একটি বছর সেখানেই থেকে যান। এরপরে ১৯৮ হিজরীতে আর একবার হজ্ব করে ১৯৯ হিজরীতে ইয়েমেনে চলে যান। সেখানে মুহাদ্দিস আবদুর রাজ্জাক সাহেবে 'মুসান্নেফ' থেকে হাদীস শোনেন। এই দরসে তার সাথে হাদীস বিশ্লেষণ ও সংশোধনের পথিকৃত ইয়াহ্ইয়াহ বিন মুঈন ও ইমাম আহলুল মাশরেক ইসহাক বিন রাহোইয়া প্রমূখ ছিলেন।

ইমাম আহমাদ (রহ) বলেন, আমি পাঁচবার হজ্ব করেছি যার মধ্যে তিনবারই পায়ে হেঁটে।[২] প্রতিবার খরচ করেছি মাত্র বিশ দিরহাম।[৩] এর মধ্যে একবার আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। হাদীসের সেই বিখ্যাত অংশ يـاعـبـاد الله دلونا على الطر لق পড়া শুরু করে দিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আমি পথ পেয়ে গেলাম।

এরপরে কুফায় চলে গেলেন। সেখানে একটা ঘরে তিনি বসবাস শুরু করেন। বিছানা-বালিশ কেনার পয়সা না থাকায় মাথার তলায় ইট দিয়ে ঘুমাতেন। তিনি বলেন, এসবে আমার কোন কষ্ট ছিল না। আমার স্বপ্ন ছিল আমার কাছে কিছু দেরহাম হলে আমি 'রে' চলে যেতাম এবং সেখানে জারীর বিন আবদুল হামিদের ওখানে থেকে লেখাপড়া শিখতাম। আমার সঙ্গী-সাথীরা সব চলে যাচ্ছিল, কিন্তু টাকার অভাবে আমি যেতে পারছিলাম না।

ইমাম আহমাদ (রহ)-এর সেই দারিদ্রাবস্থা ইবনে আবী হাতেম তাঁর পিতা হারমালাহ্'র কাছে বর্ণনা করছিলেন এভাবে যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, আহমাদ বিন হাম্বাল (মিশরে) আমার কাছে আসার ওয়াদা করেছিল, কি জানি কেন এলো না! ইবনে আবী হাতেম বলেন, তার কারণ অভাব, দারিদ্র্যতা। তবু এর মধ্যেই তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন এবং সমকালীন গণ্যমান্য মাশায়েখগণের কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেছেন। জ্ঞানের প্রতি তাঁর তীব্র আকাংখা এবং তা ধরে রাখতে পারার অসাধারণ ক্ষমতা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যে কোনো উস্তাদের প্রিয়পাত্রে পরিণত হতেন।

ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফেয়ী ঃ ইমাম আবু বকর বায়হাকী যেখানেই ইমাম আহমাদের শায়খগণের কথা আলোচনা করেছেন সেখানেই বিশেষ গুরুত্বের সাথে ইমাম শাফেয়ীর কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহ্মাদের মুসনাদ ইত্যাদিতে ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনাই বেশি। ইমাম আহমাদের ওফাতের পর তাঁর রেখে যাওয়া সংগ্রহ ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর নতুন ও পুরাতন দু' ধরনের কিতাবই পাওয়া যায়। ইমাম আবু বকর ইমাম আহমাদের রচনাবলীর মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর বর্ণিত বর্ণনাসমহূকে একত্রিত করে একটি সংকলন করেছেন।

www.pathagar.com

ইমাম আহমাদের মর্যাদার আর একটি বড় দলিল এই যে, ইমাম শাফেয়ী, যিনি তাঁর সামগ্রিক জ্ঞানের উস্তাদের মর্যাদা রাখেন। তিনি যখন দ্বিতীয়বার বাগদাদে আসেন তখন নিজেই ইমাম আহমাদের সাথে দেখা করেন। এটা ১৯৯ হিজরীর পরের ঘটনা যখন ইমাম আহমাদের বয়স তিরিশ বছর। ইমাম শাফেয়ী তাঁর প্রিয় ছাত্রের কাছে এসে বলেন, হেজাজ, শাম, ইরাক অথবা অন্য যে কোনো স্থানের সহীহ্ হাদীস তোমার সংগ্রহে থাকলে আমাকে শোনাও, যেন আমি তার ওপর আমল করতে পারি। আমি হেজাজী ফকীহ্দের মতো নই। যারা নিজেদের শহরের বাইরের অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে থাকা হাদীসসমূহকে অশুদ্ধ মনে করেন এবং তাদেরকে لانصدق ولا نكذب "আমরা একে সত্যায়ণও করিনা আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও করিনা।" বলে ব্যাখ্যা করেন। আমি তো সহীহ্ হাদীসের ওপর চলতে চাই এবং তাই তা খুঁজে বেড়াই। তা সে যে শহরেরই হোক না কেন !

ইমাম শাফেয়ী (রহ) اعلم اهل الارض فى زمانه "আর জেনে রেখো। বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ও জ্ঞানীগণ নিজের যুগেই সেরা" হওয়া সত্ত্বেও হাদীস সংক্রান্ত বিষয়াদিতে ইমাম আহমাদের সাহায্য প্রার্থী ছিলেন।[১] এর ব্যাখ্যা অন্য এক জায়গায় এভাবেও পাওয়া যায় যে, তিনি ইমাম আহমাদ (রহ) কে انتم اعلم بامود الحديث —"হাদিসের নির্দেশনার ব্যাপারে আপনারাই ভাল জানেন" বলেছেন।[২]

১. মুয়াজ্জাম আল মুসান্নেফীন।
২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্

www.pathagar.com

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের উস্তাদবৃন্দ

তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে বাশার বিন আল মুফাজ্জাল, ইসমাঈল বিন আলীয়াহ্, সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্, জারীর বিন আবদুল হামিদ, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ বিন আল কাতান আবু দাউদ আল তিয়ালিসী, আবদুল্লাহ্ বিন নুমায়ের, আবদুর রাজ্জাক, আলী বিন আইয়াশ আল হামসী, শাফেয়ী গান্দার, মু'তামার বিন সুলাইমান ও ওয়াকী বিন আল জিরাহ্ (রহ) প্রমুখ এবং এছাড়া অন্যান্য শায়খুল হাদীসগণও রয়েছেন।

তাঁর সূত্রে বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, আসওয়াদ বিন আমের, শাদান, আবদুর রহমান বিন মাহদী, শাফেয়ী (রহ) এবং ওয়াকী ইয়াহ্ইয়া বিন আদম, ইয়াযিদ বিন হারুন (রহ)ও এঁদের অন্তর্ভূক্ত। এঁরা নিজেদের সংগ্রহ দিয়ে তার সংগ্রহ গ্রহণ করেছেন। কুতাইবাহ্ দাউদ বিন উমর, খাল্ফ বিন হিশাম এঁরা বয়সে তাঁর চাইতে বড়। আহমাদ বিন আবী আল হাওয়ারাহ ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন, আলী বিন আল মাদিনী, হুসাইন বিন মনসুর, যিয়াদ বিন আইয়ুব, রোহাইন, আবু কাদামাহ, আস সুরখী, মুহাম্মদ ইবনে রাফে, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন আবী ছামীনাহ্ (রহ) এঁরা তার সমবয়সী ছিলেন এবং তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং সালেহ তার ঔরশজাত সন্তান হওয়ার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক সন্তানও ছিলেন।[১] অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে জ্ঞানের মানষ পুত্র।

১. তাহযীব আত্ তাহযীব।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের ছাত্র ও শিষ্যগণ

তার দর্শন ও চিন্তাধারার যোগ্য উত্তরসূরী ছাত্র ও শিষ্যগণের নাম ঃ আবু বকর আল আছরাম, হারব আল কিরমানী, বাকী বিন মুখলেদ, হাম্বাল বিন ইসহাক, শাহীন বিন আছ-ছামীদা'আ মাইমুনী (রহ) প্রমুখ এবং সবার পরে আবুল কাসেম আল বাগবী (রহ)। এই মহাত্মনদের সম্পর্ক ইমামের সাথে এমন ছিল, যেমন সম্পর্ক ছিল ইমাম আবু হানিফাহ্র সাথে আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ বিন আল হাসান ও জাফর (রহ)-এর এবং ইমাম মালিকের সাথে কাসেম, ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া, আল মাসুদী, সাহনুন (রহ) প্রমুখের এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর সাথে মুযনী, বুঈতী (রহ) প্রমুখের। কিন্তু হাফেয যুহরী তাযকেরাতুল হুফ্ফাযে ইমাম আহমাদ (রহ)-এর শায়খগণের আরও কিছু নাম সংযোজন করেছেন। হাশিম ইবরাহীম বিন সো'ওদ, ইবাদ বিন ইবাদ, ইয়াহ্ইয়া বিন যায়েদাহ্ (রহ) প্রমুখ।[১]

তব্কাতে হানাবেলাহ্র এক প্রমাণ-পূর্ণ কিতাব "তবকাত ইবনে আবী আল'আলা আল মু'সালা" তে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুযোগ্য ছাত্রদের আরও কিছু নাম যোগ করেছেন। যা ইবনে হাজারের "তাহযীব আত তাহযীব" এবং যুহরীর তাযকেরাতুল হুফ্ফাযে নেই। তারা হলেন ইসহাক বিন মনসুর আল কোসাজ্ আল মাযদারী (ইমামের ভ্রাতুষ্পুত্র), আবু দাউদ সিজিস্তানী, আবু ইসহাক ইব্রাহীম আল হারবী, আবু বকর আল মাযদারী, আবদুল মালিক আল মাইমুনী, হানী আশশাঈ, হারব আল কিরমানী, আবু কাদ'আহ্ ও আবু হাতেম আল রাযিয়ান, আবু যার'আহ্ আল দামেশকী, মুছনা বিন জামে' আল আনবারী, আবু তালেব, আল সিকাঈ, হাসান বিন সাওয়াব ইবনে শীছ, ইবনে বদী আল মু'ছালা, আহমাদ বিন আল কাসেম (রহ)। 'রে'-এর কাযী আহমদ বিন আছরাম আল মুযনী, আলী বিন সাঈদ আন্ নুসুঈ, আবু আলছাকার আল বারাযাতী, বাগবী (বাগবীর নাম তাহযীব আত্তাহযীবেও উল্লেখ করা হয়েছে), শালিনজী, আবদুর রহমান আল মুতাতইয়েব, আহমাদ বিন আল হাসান, আহমাদ বিন আবু উবায়দাহ্, আহমাদ বিন নাসরুল হাকাফ, আহমাদ বিন ওয়াসেল আল মাকরী, আহমাদ বিন হিশাম আল আনতাকী, আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আল হালওয়ানী, আহমাদ বিন মুহাম্মদ আস সায়েহ্ ও আহমাদ বিন মুহাম্মদ সাদকাহ্ (রহ) প্রমুখ।

ইমাম হাম্বাল (র)-এর ফিকাহ্ এবং ইজতিহাদের ভাবশিষ্য ১২০ জনের বেশি। এই মহাত্মনগণই ইমামের ফিকাহ্, ইজতিহাদ ও দার্শনিক চিন্তাধারাসমূহ গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এঁরা না হলে ইমামের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, চিন্তা ও দর্শন তাঁর বুকের মধ্যে থেকে তাঁর সাথেই কবরে দাফন হয়ে যেতো।[২]

১. তায্কেরাতুল হুফফায।
২. তবকাতে ইবনে আবী আল্ আলা'আ আল মুসালা

www.pathagar.com

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বায়হাকী মাযানীর বরাতে ইমাম শাফেয়ীর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) একবার হারুন আর-রশীদের সাথে আলোচনার সময় ইয়েমেনে একজন কাযীর প্রয়োজনের কথা বললেন। হারুন আর-রশীদ বললো, এ নির্বাচন আপনার চাইতে ভাল আর কে করতে পারবে ? ইমাম শাফেয়ী (রহ) বললেন, বেশ দেখি আমি কি করতে পারি! ব্যাপারটা নিয়ে তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের সাথে আলোচনা করলেন এবং বললেন, আপনি ছাড়া একাজের জন্য অন্য কাউকে আমি যোগ্য মনে করি না। এটা ঠিক তখনকার কথা যখন আহমাদ ইবনে হাম্বাল একজন হাদীসের ছাত্র হিসেবে ইমাম শাফেয়ীর দরসগাহে আসা-যাওয়া করতেন। প্রস্তাব শুনে ইমাম আহমাদ অত্যন্ত কঠিন ভাষায় অস্বীকার করে বললেন, আমি আপনার এখানে হাদীসের জ্ঞান নিতে আসি। এজন্য নয় যে, আপনি আমাকে কোথাও কাযীর পদে নিয়োগ পেতে সাহায্য করবেন! ইমাম শাফেয়ী (রহ) জবাব শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকলেন।

বায়হাকী এটাও বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমাদ (রহ) তাঁর চাচা এবং ছেলের পেছনে নামায পড়তেন না এবং তাদের ঘরের কোনো খাবার খেতেন না। কারণ তাঁরা দু'জনই দরবারী চাকুরী গ্রহণ করেছিল।

একবার অভাবের তাড়নায় একটানা তিনদিন প্রায় অভুক্ত কাটিয়েছেন। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিছু আটা ধার করে নিয়ে এসে স্ত্রীর হাতে দিলেন। স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষুধার তীব্রতা বুঝতে পারলেন। একটু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তিনি ছেলের ঘরের জ্বলন্ত চুলায় রুটি সেঁকে নিয়ে এলেন। সামনে রাখতেই ইমাম একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এতো তাড়াতাড়ি কেমন করে হলো ? স্ত্রী বললেন, আপনাকে বেশি ক্ষুধার্ত দেখে 'সালেহ্‌র' ঘরে চুলা জলছিল সেখান থেকে ভেজে নিয়ে এলাম। শান্ত অথচ কঠিনভাবে ইশারা করে বললেন, ওগুলো আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও! আর ছেলের ঘরে যাবার দরজাটা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেবে।

কারণ আর কিছুই নয়, ছেলে মুতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ'র ওখানে দরবারী চাকুরীতে যোগ দিয়েছিল। দ্বিতীয় ছেলে আবদুল্লাহ্ বলেন, বাবা একবার খলিফার সাথে মা'আসকারে কি এক কাজে ১১ দিন কাটিয়েছিলেন, কিন্তু ভুলেও তিনি শাহী খাবারে হাত লাগাননি। ঐ ষোল দিনে মাত্র এক 'মুদ' এর এক চতুর্থাংশ 'ছাতু' খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। থাকতেন খলিফার কাছ থেকে অনেক দূরে। যতোটুকু খাবার তিনি খেতেন তা শুধুমাত্র ইফতারী উপলক্ষে। অর্থাৎ পুরো ১৬ দিন তিনি একরকম না খেয়েই রোযা রেখে কাটিয়েছেন। বাড়িতে ফিরে তিনি এতোটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, দীর্ঘ ছয়মাস লেগেছিল তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে। চোখ দু'টো কোটরে ঢুকে গিয়েছিল আর শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে গিয়েছিল অস্বাভাবিক এলোমেলো।

www.pathagar.com

খলিফা মামুন একবার কিছু 'সোনা' মুহাদ্দিসীনদের কাছে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিল। সবাই তা গ্রহণ করেছিল কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ) তা গ্রহণ করেননি এবং বহনকারীদের মুখের ওপর অত্যন্ত কঠিন ভাষায় অস্বীকার করেছিলেন। সুলাইমান শায কুফী'র বর্ণনা ঃ একবার ইমাম আহমাদ (রহ) একখানি চীনামাটির বড় থালা এক বিধর্মীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। যখন তা ছাড়িয়ে আনতে গেলেন, তখন সে দু'খানি রেকাবী এনে সম্মুখে রেখে বললো, তোমারটা বেছে নাও। রেকাবী দু'খানা একই রকম হওয়াতে তিনি নিজেরটা চিনতে পারছিলেন না। বললেন, এটা তোমার জন্যই হালাল, আমার আর প্রয়োজন নেই বলে ছেড়ে চলে এসেছিলেন।

ছেলে আবদুল্লাহ্'র বর্ণনা, খলিফা ওয়াছেকের সময় আমরা খুব অভাবের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। জীবন ধারনের জন্য সামান্য কিছুও আমাদের কাছে দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। এরকম সময় এক লোক বাবাকে চিঠি লিখে জানালো যে তার কাছে চার হাজার দিরহাম আছে, তিনি যদি দয়া করে তা গ্রহণ করতেন! বাবা পত্রবাহককে সরাসরি নিষেধ করে দিলেন। সে লোক আবার অনুরোধ করে পাঠালো। এবার বাবার অস্বীকারের ভাষা তিরস্কারের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি একটু অনুযোগ করে বললাম, এতো অভাবের মধ্যে টাকাটা নিলে ক্ষতি কি ছিল ? একটু রেগেই গেলেন। বললেন, ক্ষতি আর কি ? টাকাটা নিতাম, গড়গড় করে খরচ করতাম, দু'দিন চারদিন ভাল থাকতাম, তারপর আবার যেই কে সেই!

একবার পরিচিত এক সওদাগর দশ হাজার দিরহামের একটা পুটলি এনে বাবার সামনে রেখে বললো, আমার লভ্যাংশ থেকে আপনার জন্য আলাদা করে রেখেছি। এটা গ্রহণ করুন। বাবা বললেন, তোমার এই মানসিকতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ এবং দো'আ করি আল্লাহ্ তোমার রোজগারে আরও বরকত দিন। কিন্তু আমি তোমার এ টাকা নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আল্লাহ্ তা'আলা এমনিতেই আমাকে বেশ ভাল রেখেছেন। —আলহামদুলিল্লাহ্। আর এক সওদাগর তিরিশ হাজার দিরহাম নিয়ে এসেছিল তার ব্যবসায়ের লভ্যাংশ থেকে বাবার জন্য নিয়ত করে রেখেছে, কিন্তু তাঁর জবাব অস্বীকার ছাড়া অন্য কিছুই হয়নি।

ইমাম আহমাদ (রহ) যখন হাদীস সংগ্রহের জন্য ইয়েমেনে মশগুল ছিলেন তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শায়খ আবদুর রাজ্জাক মুহাদ্দিস (রহ) যখন জানতে পারলেন, তখন এক মুঠি দীনার হাতে দিতে চাইলেন। দেখে খুব বিনয়ের সাথে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছামত আমার প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করে দেন। এর কোনো প্রয়োজন আমার নেই। সেই রকম অভাবের দিনে এরকমও একটা ঘটনা ঘটেছিল যে, পরিধেয় কাপড় ছিঁড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, তা পরে বাইরে বেরুনো আর সম্ভব নয়। ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরেই থাকলেন। লোকেরা খোঁজাখুঁজি করতে বাড়িতে এলে তিনি এক ঘনিষ্ঠজনকে আসল কথাটা বললেন। অনেকেই একথা শুনে সাহায্য করতে চাইলে তিনি সাফ অস্বীকার করলেন। লিখে দেয়ার শর্তে একজনের কাছ থেকে এক দীনার গ্রহণ করেছিলেন এবং সত্যি সত্যিই তাকে একখানি কিতাব তিনি লিখে দিয়েছিলেন।

আবু দাউদ বলেন, আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ)-এর কাছে বসা মানে চেতনাকে পরকালের স্মরণ দিয়ে টইটুম্বর করে ভরে নেয়া। আমি ইমামকে কখনো পার্থিব কোনো বিষয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহী হতে দেখিনি।

www.pathagar.com

বায়হাকী ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর কাছে-'মুত্তাওয়াক্কিল' এবং সংজ্ঞা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে কোনো শক্তি বা উৎসের কাছে কোনো ধরনের কোনো আশা বা নির্ভরতাকে ছিন্ন করে দেয়া। জানতে চাওয়া হলো, এর কোনো দলিল বা উদাহরণ ? বললেন, হ্যাঁ,— হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সাল্লামকে যখন ক্ষেপণা-যন্ত্র দিয়ে ছুঁড়ে মারা হলো তখন শূন্যের ওপরে জিবরাঈল (আ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোনো প্রয়োজন আছে কি ? তিনি বললেন, 'আছে' কিন্তু তোমার কাছে নয়।

জিবরাঈল (আ) বললেন, তাহলে তার কাছেই বলুন, যার কাছে বলতে চান! বললেন, আমার ব্যাপারে আমার কাছে সেটাই ভাল লাগে যেটা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন।

আবু জাফর মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব আসসফা বলেন যে, আমি আহমাদ বিন হাম্বালের সাথে 'সারমান রায়ে' (যা এখন সামেরাহ্ নামে পরিচিত) ছিলাম। একদিন বললাম, আমার জন্য একটু দো'আ করুন। তিনি দো'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمْ اِنَّا نعلم اِنَك لنا على اكثر ماتحت فاجعلنا على ماتحب -

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে জান। আর আমরা জানি যে, তুমি আমাদের জন্য। সুতরাং তুমি যা পছন্দ কর আমাদেরকে তার অনুগত করে দাও।

তারপর চুপ হয়ে গেলেন। বললাম, আরও কিছু বলুন। তখন এই দোয়া শুরু করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ نسئلك بالقدرة التى قلت للسموات ولارض ائتيا طوعًا اوكر هاقالتا اتينا طائعين اَللّٰهُمَّ وفقنالمرضااك اَللّٰهُمَّ لنا نعوذبك من الفقر الااليك ونعوذبك من الذل الااليك اللهم لاتكثر علينا فنطغى ولا تقل علينا فننسي وهب لنامن رحمتك وسعة رزقك مايكون بلا غانى دنياك وغنى من فضلك -

বায়হাকী বলেছেন, আবুল ফজল তামিমী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমাদ সিজদায় এই দো'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ الامة عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ وهو يظن انه على الحق فرده الى الحق ليكون من اهل الحق وكان يقول اللّٰهم ان قبلت من عصاة امة محمد صلى اللّٰهُ عليه وسلم فداء فاجعلنى فدائهم -

হে আল্লাহ্! গুনাহ্‌গার উম্মতে মুহাম্মদীর কোনো মুক্তিপণ যদি তুমি চাও, তাহলে বিনিময় হিসেবে আমাকেই তুমি গ্রহণ করো। অর্থাৎ গুনাহ্‌গার উম্মতে মুহাম্মদীকে তুমি মুক্তি দাও এবং তাদের কৃত সকল গুনাহের আযাব তুমি আমাকে দাও।

পুত্র সালেহ বর্ণনা করছেন, বাবা কাউকে দিয়ে কখনো তাঁর অজুর পানিটুকুও আনাতেন না। নিজের হাতে 'কুয়ার' মধ্যে বালতি ছাড়তেন। যখন বুঝতে পারতেন যে, তা পানিতে ভরেছে,

www.pathagar.com

তখন বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'। বালতিতে পানি ভরলেই আলহামদুলিল্লাহ বলার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম, বললেন, কেন কুরআনে পড়নি ঃ

ان اصبح ماء كم غوراً فمن يأتيكم بماء معين -

যদি তোমাদের পানি ভূ-গর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা।

ইমাম আহমাদ (রহ)-এর এই ধরনের ঘটনা অসংখ্য। আত্মসংবরণ ও কৃচ্ছতা সম্পর্কে তাঁর লেখা একখানা পূর্ণাঙ্গ কিতাবও রয়েছে। যা এ বিষয়ের ওপর অদ্বিতীয় সৃষ্টি। এই রচনাটি ইমাম আহমাদ (রহ)-কে পরবর্তী যুগের আলেমদের কাছে এমন এক মর্যাদার স্থানে তুলে দিয়েছে যেখানে তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনো ব্যক্তিত্বকে দেখা যায় না।

ইসমাঈল বিন ইসহাক আসসিরাজ বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল একদিন আমাকে বললেন, তুমি হারেস মাজাসীকে তোমার বাড়িতে ডেকে একদিন আমাকে দেখাতে পারো ?[১] আমি বললাম হ্যাঁ পারি! ব্যাপারটা আমার জন্য খুব আনন্দেরও বটে! আমি 'হারেসের' কাছে গিয়ে তার সঙ্গী-সাথীসহ আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানালাম। হযরত হারেছ বললেন, আমার সঙ্গী-সাথী কিন্তু অনেক। তুমি তাদের জন্য সামান্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো। রাতের বেলা তারা এলেন এবং শুধুমাত্র এশা'র ফরয নামায আদায় করলেন। সঙ্গীরা হযরত হারেসের আশেপাশেই বসে গেলেন। ইমাম আহমাদ ইতিমধ্যে এক পাশে বসে পড়েছিলেন যা হারেস এবং তার সঙ্গীরা জানতেন না। হযরত হারেসের দল থেকে আর কোনো প্রশ্ন উঠলো না এবং হারেস সংসার ত্যাগ ও তপস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা শুরু করলেন, অত্যন্ত আবেগ-আপ্লুত বক্তৃতায় কিছুক্ষণ পরেই লোকেরা কাঁদতে শুরু করলো। আমি চুপচাপ হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বালের কাছে গেলাম। দেখলাম তিনিও কাঁদছেন। আকুল হয়ে কাঁদছেন। হযরত হারেসের কান্নাজড়িত বক্তৃতাও থামছে না আর উপস্থিত শ্রোতাদের কান্নাও থামছে না। এভাবেই কেটে গেল রাত, ফযরের আযান হলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগলো হারেসের বক্তৃতা ? বললেন, আল্লাহ্র কসম তপস্যা ও আনুগত্যের উপদেশ ওঁর চাইতে কেউ ভাল দিতে পারেন বলে আমার মনে হয় না। তার সঙ্গীদের চাইতে ভাল কোনো দলও আমি আর দেখিনি। তারপরেও আমি মানুষকে তার কাছে যেতে নিষেধ করি।

ইমাম বায়হাকী বলেন, ইমাম আহমাদের নিষেধের কারণ হিসেবে আমার যা মনে হয়, তাহলো হযরত হারেস আবেদ ছিলেন যাহেদ ছিলেন বটে, তবে তিনি বিখ্যাত ছিলেন বক্তা হিসেবে। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ধর্মতত্ত্বের বক্তাদেরকে বিন্দুমাত্র পছন্দ করতেন না। অথবা হযরত হারেস এমন সব কথাবার্তা বলতেন, যা মানুষের বোধ ও চেতনার বাইরে থাকে। কারো কারো মতে হারেসের বক্তৃতায় অতি বৈরাগ্যতার ইন্দ্রজাল রয়েছে যা মানুষকে

১. হযরত হারেস সেই সব ব্যতিক্রমী মানুষদের মধ্যে একজন, যাকে নিয়ে উম্মতে মুহাম্মদী অহংকার করতে পারে, ঠিক যতখানি ইমাম হাম্বালকে নিয়ে করা যায়। নিজের প্রতিটি 'দম'-এর কাছে থেকে হিসেব নিতেন এবং একটি নিঃশ্বাসও আল্লাহ্র স্মরণ ছাড়া বেরিয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতেননা। দমে দমে এই হিসাব নিজেই নিজের কাছ থেকে নিতেন বলে তাঁর উপাধী হয়ে গিয়েছিল 'মুহাসেবী'। ইবনে খালকানও তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন।

www.pathagar.com

বাস্তবতা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তাই তিনি মানুষকে তার কথা শুনতে নিষেধ করতেন। কেননা বৈরাগ্যতার ঐসব কঠিন আচার-আচরণ শরীয়ত বিরোধীও বটে। একারণে মুহাদ্দিস আবু যার'আ হারেসের কিতাব "রেআয়াহ্" পড়ে বলেছিলেন, এর মধ্যে বেদআত রয়েছে। এবং এমন অনেক কথা আছে, শরীয়তে যার অস্তিত্ব নেই। যে তাকে এই কিতাবটি দিয়েছিল তাকে বললেন, তুমি সেই পথেই থাকো যে পথে সাওরী, মালিক, আওযায়ী এবং লাইস বিন সো'ওদ প্রমুখ ছিলেন। হারেসের এই পথ ছেড়ে দাও, এর মধ্যে বেদআত আছে!

হযরত ইমাম আহমাদ (রহ) বলতেন, দারিদ্র্যতার ওপরে ধৈর্য ধারণ করা এমন এক মহান মর্যাদাময় অবস্থান, যা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারে না। তিনি বলতেন, "দারিদ্র্যতা সচ্ছলতার চাইতে উত্তম", কেননা তার ওপর ধৈর্য ধারণ করা অসাধ্য সাধনের নামান্তর এবং তা আল্লাহর কোনো অনুগ্রহ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চাইতেও অধিক মূল্যবান।

ইমাম মুহাম্মদ প্রত্যেকটি ব্যাপারে সংক্ষেপণ পছন্দ করতেন। আখিরাতের হিসেবের ব্যাপারে তিনি সবসময়ই তটস্থ থাকতেন। খোদাভীতি তার মধ্যে এতো প্রকট ছিল যে, একদিন এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আপনি যতোটুকু যা জ্ঞানার্জন করেছেন, তা একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই করেছেন তাই না? তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, ভাই, এতো বড় কঠিন শর্ত! তবে হ্যাঁ, কিছু জিনিস আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করেছি এবং সেগুলোকে আমার বুকের মধ্যে জমা করে রেখেছি।

ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বালের কাছে একদিন এক লোক এসে বললো, আমার মা দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন এবং প্রায় বিশ বছর যাবত তিনি অচল-পঙ্গু। আপনার কাছে দো'আ চাইতে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। রেগে গিয়ে বললেন, আমি নিজেই তো তার দো'আর প্রার্থী। তবু তিনি এই অসহায়ার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করলেন। লোকটি বাড়ি ফিরে দরজার কড়া নাড়লে, কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেল, দেখলো মা তার সামনে দু'পায়ের ওপর দাড়ানো। ছলছল চোখ, খুশীতে আত্মহারা! মা ছেলেকে নিজের পা দু'খানি দেখিয়ে বলছেন, দেখো বাবা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুক্তি দিয়েছেন! এই দেখো আমি নিজে পায়ে হেঁটে এসে তোমার জন্য দরজা খুলে দিয়েছি!

এরকমই আর একটি ঘটনা, কোনো এক লোককে তিনি একটা জিনিস উপহার দিয়েছিলেন। লোকটির বন্ধু জিনিসটি দেখে এবং কে দিয়েছে জানতে পেরে চমৎকৃত হয়ে বললো, তুমি এটা আমাকে দিয়ে দাও। বললো, দেয়া যাবে না। বন্ধু বললো, আমি দাম দিয়ে নেবো। সে বললো, অনেক বেশি দাম! বন্ধু বললো কতো বেশি? যতো দামই হোক তুমি বলো আমি দেবো। লোকটি তখন চিৎকার করে বললো, কোনো মূল্যেই এটা আমি দেবো না। অনেক টাকা দিয়ে তুমি যে 'বরকতে'র আশায় নিতে চাইছো, সে 'বরকত' আমি নিজেই পেতে চাই।

www.pathagar.com

খাল্‌কে কুরআনের ফেত্‌না

পৃথিবী পরিবর্তনের নাগর দোলা। মানুষের ভাবনা-চিন্তা আজ একটা তো কাল আর একটা। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব কিছু কম নয়। 'দ্বীন' তো তার আপন অবস্থানে অনড়, অটল, অবিচল। কিন্তু বক্র চিন্তা এবং অতিবুদ্ধির কিছু নির্বোধ তাকে চিরদিনই কলঙ্কিত করার চেষ্টা পেয়েছে। আব্বাসীয়দের তথাকথিত খেলাফত আমলে সব চাইতে বড় 'ফেতনা' ছিল ই'তেযালের (দল ত্যাগ) যা ছিল গ্রীক দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফসল। হারুনের ছোট ছেলে মামুন খিলাফতে আরোহনের সাথে সাথে ইউনানী (গ্রীক) সাহিত্য-দর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বই-পুস্তক মহাসমারোহে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদ শুরু হয়ে গেল। আরবী ভাষায় অনুবাদ করে বাদশাহ নিজে তার দরবারী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এই দর্শন চর্চায় লিপ্ত হয়। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাহানশাহ্ নতুন দার্শনিক চেতনা লাভ করে আপন দ্বীনের ওপরে হস্তক্ষেপ শুরু করে দেয়। নব্য দর্শনে দীক্ষিত দরবারী আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে মজার মজার আলোচনা ও বিতর্কানুষ্ঠান চলতে থাকে বিলাসী বাদশাহকে ঘিরে। শয়তানী চর্চার চূড়ান্ত পরিণতি যা হবার তাই। ইসলামের সর্বসম্মত মাসায়েলসমূহ নতুন দর্শনের আলোকে সংস্কার হতে থাকে। কোনো কোনোটি সম্পূর্ণ বাতিল বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়। মামুনের খেলাফতের শেষদিকে নব্য চিন্তার দরবারী আলেমরা 'খালকে কুরআন' মাসআলাটি নিয়ে রাষ্ট্রীয় বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পরামর্শ দেয় এবং তাতে নেতৃস্থানীয় আলেমদেরকে আহ্বান করতে বলে। এ উপলক্ষে মামুন বাগদাদের আলেমদের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করে। কুরআন 'সৃষ্ট' 'নতুন প্রবর্তিত' এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে খোদ কুরআন থেকে দলিল দিয়ে চিঠিটি সাজানো হয়।

মো'তাযিলাদের উস্কানিতে মামুন তার এই নতুন মতাদর্শের অনুসারী হতে ভয়ভীতি তথা রাষ্ট্রীয় প্রভাব খাটাতে শুরু করে। অস্বীকার করলে নির্যাতন, বেতন বন্ধ, বেত্রাঘাত, জীবনের হুমকি ইত্যাদি স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমানে চলতে থাকে। যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করেনি তারা নির্যাতনের ভয় ও জীবনের মায়ায় পড়ে আত্মসমর্পণ করে এবং তার খাল্‌কে কুরআনের, তত্ত্বকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যেসব নন্দিত মহাত্মনদের জন্য কঠিন পরীক্ষা এবং সফলতা অপেক্ষা করছিল তাঁরা তাদের দ্বীন নিয়ে অবিচল থাকলেন। এঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও মুহাম্মাদ বিন নূহ্ আল নিসাবুরী প্রমুখ। হবেনই বা না কেন, হযরত ইমামকে আল্লাহ্ তা'আলা যে মর্যাদা দান করেছিলেন এবং আরও যা দেবেন বলে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন তার জন্য পরীক্ষার ঐসব স্তর অতিক্রম করা ছিল অনিবার্য। কেননা মহাবিজ্ঞান আল কুরআন ডেকে ডেকে বলছে ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ -- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ -

www.pathagar.com

আর মানুষ কি এটি মনে করে যে, ঈমান আনয়নের পর তাদেরকে শুধু শুধুই ছেড়ে দেয়া হবে আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না ? আর অবশ্যই আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। সূতরাং আল্লাহ, যারা বিশ্বস্ত তাদেরকে এবং যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে জানাতে চান। (সূরা আনকাবুত ঃ ২৩)

এরকমই এ প্রসঙ্গে রয়েছে রাসূলে কারীম (স)-এর অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস। সুতরাং খোদ ইমাম আহমাদ নিজের সংগ্রহ থেকে হযরত মুয়ায বিন জাবাল থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুয়ায (রা) রাসূল (স)-এর কাছে প্রশ্ন করেন, মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি বিপদ-মুসিবত কার জন্য নির্ধারিত ? রাসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন, "নবী-রাসূলদের জন্য এবং তারপর স্তরে স্তরে আল্লাহ্‌র পথে-চলা মানুষদের পর্যায়ক্রমিক শ্রেণী অনুযায়ী। এভাবে প্রতিটি মানুষই দ্বীনের ক্ষেত্রে তার অবস্থান অনুযায়ী পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। দ্বীনের ওপর যে যতোটা দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইবে তার সামনে ততোটাই কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা এসে দাঁড়াবে। অথচ তারা গুনাহ্‌গার নন।" মুসলিম শরীফেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

হযরত মুয়ায থেকে ইমাম আহ্‌মাদ এ বর্ণনাটিও উল্লেখ করেন যে, দুনিয়া সবসময় বিপদ-মুসিবত ও ফেতনা-ফাসাদ দেখাতে থাকে। এই সময়ের পরে আগত মানুষদের মধ্যে কঠোরতা ও কষ্টদায়ক উপাদান আরো বেশি হবে এবং বিপদ-মুসিবত দিনের পর দিন বাড়তেই থাকবে, তাতে কোনো ধরনের কমতি হবে না।

এইসব সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থিত থাকতে ইমাম আহ্‌মাদের মতো মানুষ যে কোনো বিপদের মুকাবিলার জন্য তৈরী না থেকে পারেন কি ?

বাহ্যিক তাকওয়া ও পবিত্রতা তার মতো লোকের 'দ্বীন ও দুনিয়ার' জন্য যথেষ্ট হতে পারে কি ? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের প্রত্যেকের পরীক্ষা নিয়েছেন। আহ্‌মাদ (রহ)-এর পরীক্ষাও প্রয়োজন ছিল।

ইমাম আহ্‌মাদ নিজের এই পরীক্ষার আগাম সংবাদ অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে পেয়ে গিয়েছিলেন। যা তার পরিপূর্ণ মানসিক প্রস্তুতির জন্য সহায়ক হয়েছিল।

বায়হাকী রবী' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ) একখানা চিঠি নিয়ে আমাকে মিশর থেকে ইমাম আহ্‌মাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে যখন পৌছেছি, তখন তিনি ফযরের নামায শেষ করে ফিরছিলেন। আমি চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম। চিঠিটা হাতে নিয়ে বললেন, তুমি এটা পড়েছো ? আমি বললাম জ্বী না। তিনি পড়তে শুরু করলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখি তিনি কাঁদছেন। আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে ? বললেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ) লিখেছেন— আমি রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি বলছেন, আহ্‌মাদকে আমার সালাম বলবে এবং জানিয়ে দেবে খুব শীঘ্রই 'খালকে কুরআনের' মাসআলা নিয়ে তার পরীক্ষা হবে! সাবধান! সে যেন কিছুতেই ঐ ঘৃণ্য তত্ত্ব স্বীকার না করে। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চর্চিত জ্ঞানকে কেয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবেন। রবী' বলেন, আমি এই সুসংবাদ তাঁকে পৌছে দিয়েছি বলে পুরস্কার হিসেবে গায়ের জামাটি খুলে আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি জামাটা নিয়ে মিশরে ফিরে আসি এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ)-কে সে কথা জানাই। তিনি বললেন, জামাটা তুমিই রেখে দাও আর ওটা চুবিয়ে আমাকে একটু পানি দিয়ে

www.pathagar.com

যেও যেন আমিও একটু বরকতের ভাগী হতে পারি।[১] ইমাম আহমাদের সামনে সবকিছু পরিস্কার ছিল এবং তিনি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। ঠিক এই সময় মু'তাযেলী আলেমদের পরামর্শে মামুন বাগদাদের সকল আলেমদের দাওয়াত করলো। দুর্বল চিত্তের আলেমরা স্বৈরাচারের নির্যাতনের ভয়ে আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়ে 'খালকে কুরআন' তত্ত্বের স্বীকৃতি দিয়ে দিলো। কিন্তু ইমাম আহমাদ এবং মুহাম্মদ বিন নূহ্ নিসাবুরী সরাসরি অস্বীকার করলেন। এঁদের দু'জনকে উটে চড়িয়ে দরবারে আনা হয়েছিল। আসার পথে এক বেদুঈন পুরুষ জাবের বিন আমের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং ইমাম আহ্মাদকে সালাম করলো। বললো, জনাব, আপনার ব্যক্তিত্ব এই সময় মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান এবং এখন আপনি মুমিনদের প্রতিনিধি হয়ে দরবারে যাচ্ছেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি তাদের লজ্জা এবং অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবেন না। আর কোনো অবস্থাতেই 'খালকে কুরআন' তত্ত্বের স্বীকৃতি দেবেন না। আপনি যদি আল্লাহ্র সাথে বন্ধুত্ব রাখেন তাহলে একটু ধৈর্য রাখবেন: "ব্যাস জান্নাত ও আপনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান, শুধু আপনার শহীদ হতে যতোটুকু বাকী"! আর মৃত্যু! সে তো সবার জন্য অবধারিত। এই পরীক্ষায় আপনি যদি উত্তীর্ণ হয়ে যান তাহলে দুনিয়া ও আখিরাত দু'জায়গাতেই আপনি সফলকাম।

ইমাম আহমাদ বলেন, ওর সেই নসীহত আমার অন্তরে যেন লিখিত হয়ে যাচ্ছিল এবং ঐ জঘন্য তত্ত্বের অস্বীকৃতির মানসিকতা আবার নতুন করে যেন শপথ নিলো।

যাই হোক, তাঁরা মামুনের দরবারে নীত হলেন। এক জায়গায় বসতে দেয়া হলো! একটু পরেই মামুনের এক খাদেম কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এসে বললো, আবু আবদুল্লাহ্! সংকট অত্যন্ত মারাত্মক। মামুন খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ফেলেছে আর রাসূল (স)-এর বংশধর হিসেবে শপথ নিয়েছে যে, আহমাদ যদি 'খালকে কুরআনের' স্বীকৃতি না দেয় তাহলে এই তলোয়ার দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। ইমাম আহমাদ শুনলেন। তারপর হাঁটু গেঁড়ে মাটিতে বসে আকাশের দিকে চাইলেন। বলতে লাগলেন, "প্রভু, এই পাপীষ্ঠকে তোমার অনুগ্রহ এমন অন্ধ অহংকারী করে ফেলেছে যে, সে এখন তোমার বন্ধুদের ওপরে তলোয়ার উঠাতেও দ্বিধা করছে না। হে মহান সৃষ্টিকর্তা! যদি 'কুরআন' সৃষ্টি না হয়ে তোমার 'বাণী' হয়ে থাকে তাহলে আমাকে সেই বিশ্বাসের ওপরে অটল রেখো। এই সত্য কায়েম রাখতে যতো কষ্টই আমাকে সহ্য করতে হয় আমি তার জন্য প্রস্তুত।"

ইমাম বলছেন, আমরা অপেক্ষায় আছি। ওদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আতংকে ভরা মুহূর্তগুলো যেন কাটতেই চাচ্ছে না। হঠাৎ চারিদিকে চিৎকার, হট্টগোল, কান্নাকাটি। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে চারিদিকে চাইলাম। কে একজন দৌড়ে যাবার সময় বলে গেল মামুন মারা গেছে। দু'কান শুনছে বটে, কিন্তু মন যেন বিশ্বাস করতে চাইছে না! এও কি সম্ভব! হে, পরওয়ারদিগার! এ যেন সত্যি হয়! এ যেন সত্যি হয়!

সময় বয়ে চলেছে। আমাদের দিকে দেখার কেউ নেই। কিন্তু তবু আমরা আনন্দিত। ধীরে ধীরে সব জানতে পারছি, সত্যি সত্যিই জঘন্য পাপী, স্বৈরাচারী মামুন মরে গেছে।

অনেক পরে, একদল প্রহরী এসে আমাদেরকে বন্দীখানায় নিয়ে গেল। তবু যা হোক একটু স্বস্তি পেলাম। দিন কেটে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে জানতে পারলাম, এরপরে যে সিংহাসনে আরোহণ

---

১. ঘটনাটি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জনের বরাতে বর্ণিত আছে। ইবনে জাওযী মাকরেযী বাইহাকী প্রত্যেকেই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

করছে সে "মোতাসিম" এবং তার প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসছে মুহাম্মদ বিন আবু দাউদ। এই দু'জন ক্ষমতার পরিচালক হলে নাকি অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর হবে। ধীরে ধীরে তার পরিচয়ও পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ একদিন অন্যান্য বন্দীদের সাথে আমাদেরকে নৌকায় তোলা হলো। রওয়ানা বাগদাদের পথে। আমাদের পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী পরানো, হাঁটা-চলাও প্রায় অসম্ভব। ভয়-শংকা শারীরিক কষ্ট মুহাম্মদ বিন নূহ-এর পরীক্ষা বোধহয় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গৃহীত হয়েছে। স্বৈরাচারের শেকলপরা দেহটি ছেড়ে নূহে'র পবিত্র আত্মা তার স্থায়ী নিবাসের পথে পাড়ি জমালেন— ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। নূহের জানাযা পড়লাম এবং দাফন সম্পন্ন করে আমরা আবার বাগদাদের পথে রওয়ানা হলাম।

বাগদাদে পৌঁছে যথারীতি জেলখানায় পুরে দেয়া হলো। শরীর ভীষণ দুর্বল। তবু বেঁচে আছি। রমযান মাস রোযা রেখে চলেছি। বন্দীদের নিয়ে নামায আদায় করছি। দিন কাটছে।

বন্দীদশার সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে— কারো কারো মতে ১০ মাস, আবার কারো মতে ৩০ মাস। সে যাই হোক, এই পুরো সময়টাতে পায়ের ডাণ্ডাবেড়ী আর খোলা হয়নি।

সময় তার নতুন বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। মু'তাসিমের তলব এসেছে। সত্য-ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক তাঁর মুখ থেকে 'একটি মিথ্যার স্বীকৃতি' দেবেন বলে দরবারে যেতে হবে! যে কারণেই হোক জিন্দানখানার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ)।

পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী তার সাথে লম্বা শেকল। ওগুলো পরানোই হয় বন্দী যেন চলতে না পারে! তবু চলতে হবে! ইমাম বলছেন, ডাণ্ডাটা কোমরের সাথে বেঁধে শেকল গুটিয়ে হাতে নিয়ে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে এসে দাঁড়ালাম সওয়ারীর পাশে। একদিকে বেড়ী-শেকলের বোঝা অন্যদিকে সওয়ারীতে চড়ার জন্য নেই কোন অবলম্বন। তবু চড়তে হবে। কতোবার যে চেষ্টা করেছি মনে নেই, তবে মনে হয়েছে হাজার বার। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমায় সফল করেছেন। আমি উঠতে পেরেছিলাম এবং দরবারে এসে পৌঁছালাম। এখানেও আমাকে এমন এক কামরায় রাখা হলো যেখানে কোনো আলো নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মনে হলো নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে পা বাড়াচ্ছি আর অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। হঠাৎ কি যেন একটা হাতে লাগলো। নাড়া দিয়ে দেখি পানিভরা সোরাহী। আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবাণীর ধরন দেখে মনে মনে কৃতজ্ঞতায় মাথানত করলাম, বললাম, সোবহানাল্লাহ্। অজু করে উঠে দাঁড়ালাম, কোনদিকে কেবলা জানি না। নির্ধারণ আল্লাহ্র ওপর ছেড়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে নামাযে দাঁড়ালাম। নামায শেষ। দরজা খোলার শব্দ পেলাম। বললো, দরবারে যেতে হবে। চললাম। দরবারে ঢুকেছি, ইবনে আবু দাউদ আমাকে দেখেই খুব বিশ্রিভাবে বললো, আমীরুল মুমিনীন আমি তো ভেবে রেখেছিলাম হাট্টাগাট্টা জোয়ান হবে! এতো দেখছি দুর্বল এক আধবুড়া! যাই হোক, মুতাসিমের সামনে এসে দাঁড়ালাম। চোখের ইশারায় সে আমাকে তার আরো কাছে যেতে বললো। আমি আরো এগিয়ে গিয়ে সালাম দিলাম। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মুতাসিম আমার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে! সে দৃষ্টি যেন বলছে ডাণ্ডাবেড়ী কেমন লাগছে? হঠাৎ আমার গোটা অন্তর জুড়ে দুঃসাহসের এক ঝড় বইতে

শুরু করলো। ডাণ্ডাবেড়ীর চিনচিনে ব্যাথা সেই মুহূর্তে ঝড়ের প্রচন্ডতা যেন আরও তীব্র আকার ধারণ করলো। আমার মুখ খুলে গেল। দ্বীধাহীন শংকাহীন কণ্ঠ আমার, আমি বলছি— আমীরুল মুমিনীন! তোমার চাচার ছেলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদেরকে কোন জিনিসের দিকে আহ্বান করেছিলেন ? মু'তাসিম বললো, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ এক এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। তারপরে আমি ইবনে আব্বাসের বর্ণিত, প্রতিনিধি আবদুল কায়েসের প্রতি বলা রাসূল (স)-এর পুরো হাদীসটি শোনালাম। বললাম, এইসব জিনিসই তো ছিল তাই না ? যার শিক্ষা রাসূলুল্লাহ (স) সেই প্রতিনিধিদলকে দিয়েছিলেন ? বললো হ্যাঁ। এরপরে আবু দাউদ এমন কিছু কথাবার্তা বললো, যা আদৌ আমি বুঝতে পারিনি। আর আসল কথা হলো ওগুলো আমি বুঝতেও চাইনি। এরপরে মু'তাসিম বললো ঃ আহমাদ! তুমি যদি আমার আগের খলিফার বন্দী না হতে তাহলে আমি তোমার সাথে বাদানুবাদ করতাম না। আমার তো ইচ্ছা করে যে, আমি তোমাকে এই নির্যাতন থেকে মুক্তি দেই। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্ এর চাইতে বড় কথা আর কি হতে পারে ? এতো গোটা মুসলিম জাতির জন্য বিরাট এক আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মু'তাসিম আবদুর রহমানের (এক মুতাযেলী) দিকে তাকিয়ে বললো ঃ জিজ্ঞেস করো তোমার কি জানার আছে ?

আবদুর রহমান বললো, কুরআনের ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

আমি কোন জবাব দিচ্ছিলাম না। মু'তাসিম আমাকে নাড়া দিলো। তখন আমি আবদুর রহমানকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সম্পর্কে তোমার মতামত কি ? চুপ করে বসে রইল, কোন জবাব দিলো না। আমি বললাম, কুরআন আল্লাহ্র জ্ঞান। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানকে যে মাখলুক (সৃষ্টি) বললো, সে কুফরী করলো। সে আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে 'কুফর' শব্দটি নিয়ে তার দলের লোকদের এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলাবলি করলো, তারপর সোজা মুতাসিমের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, দেখলেন! আমিরুল মু'মিনীন ও আপনাকেসহ আমাদের সবাইকে কাফির বানিয়ে দিয়েছে! একথায় মু'তাসিম ভ্রুক্ষেপও করলো না। আবদুর রহমান এতো বড় অস্ত্র চালিয়ে খলিফাকে উত্তেজিত করতে না পেরে একটু হতাশ হলো। তারপর নিজেই আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা! একটা সময় ছিল যখন শুধু আল্লাহ্ ছিলেন এবং কুরআন ছিল না। আমি এবারেও পাল্টা প্রশ্ন করলাম, এমন কোনো সময় ছিল কি যখন আল্লাহ্ ছিলেন এবং তাঁর জ্ঞান ছিল না ? আবদুর রহমান নিরুত্তর। ওর দলের মধ্যে কি নিয়ে যেন কানাঘুষা চলছিল। আমি সেসবকে উপেক্ষা করে খলিফার দিকে তাকিয়ে বললাম, যে কোনো কথা বলবে, আল্লাহ্র কিতাব এবং নবীর (স) হাদীস থেকে তার দলিল আনতে হবে। এতোক্ষণ পরে প্রধানমন্ত্রী আবু দাউদ মুখ খুললো। বললো, বিতর্ক চলবে। 'আকল' (বুদ্ধিবৃত্তিক) এর ওপরে, 'নকল' (লিখিত কোনো কিছু)-এর ওপর ভিত্তি করে নয়! ইমাম সাহেব বললেন, আমাদের দ্বীনের বুনিয়াদ কিতাব এবং হাদীস ছাড়া অন্য কিছুর ওপরে হতে পারে কি ? তাহলে আমি একটু জেনে নিতাম!

এরপর ওরা 'কুরআন সৃষ্ট এবং নতুন প্রবর্তিত' এই তত্ত্বের স্বপক্ষে বিভিন্ন দলিল পেশ করলো, কিন্তু ইমাম সাহেব প্রত্যেকটি কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন। ইমামের এই আক্রমণাত্মক চেহারা দেখে মু'তাযেলাদের সবচাইতে কুটিল পৃষ্ঠপোষক, প্রধানমন্ত্রী আবু দাউদ

www.pathagar.com

মু'তাসিমকে উত্তেজিত করার জন্য বললো, আমিরুল মু'মিনীন, এই লোকটি পথভ্রষ্ট আর অন্যকেও সে ভ্রষ্ট করে দেবার ক্ষমতা রাখে, আপনার সামনেই বসে আছে আপনার রাষ্ট্রীয় ফকীহ্ ও বিচারকবৃন্দ। আপনি এদের কাছেই জিজ্ঞেস করুন, দেখুন তারা কি বলে?

তারা যা বলবে তা তো পরিষ্কার! তারা সবাই এক বাক্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালকেই 'গুমরাহ' ও পথভ্রষ্ট বলে ফতোয়া দিয়ে দিল। মুতাসিম সব দেখে-শুনে সেদিনের জন্য বিতর্কানুষ্ঠান মুলতবী ঘোষণা করলো।

দ্বিতীয় দিন যথারীতি বিতর্ক হলো তুমুলভাবে, কিন্তু কথা অসমাপ্ত রেখেই মুলতবী হলো। তৃতীয় দিন শেষবারের মতো বিতর্ক চললো। আল্লাহ্ তা'লার 'শান' যে, এতোগুলো দরবারী আলেমের বিপক্ষে ইমাম সাহেবের একটি কণ্ঠই সবার স্মৃতিতে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। তার যুক্তি এবং অকাট্য সব দলিলসমূহ দরবারী আলেমদের মুখে পেরেক ঠুকে দিচ্ছিল। অসহায়ের মতো এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। ফেরাউনের ডেকে আনা যাদুকরদের বড় বড় যাদুকে মূসা (আ)-এর লাঠি যেভাবে অসহায় করে দিয়েছিল, ঠিক সেই রকম প্রধানমন্ত্রী দাউদের যোগাড় করা দরবারী আলেমদের চূড়ান্ত পরাজয় সম্মুখে দেখতে পেয়ে নিজেই আবোল তাবোল বকতে শুরু করলো।

ইমাম আহমাদ (রহ) বলেন, 'বহসের' সময় আমি ওদের কারো কারো মুখে এমন কথাও শুনেছি যা জ্ঞান ও জ্ঞানীদের জন্য চরম অপমানজনক। আমি এতোটা অবাক হয়েছি যে, আমার শুধু একটা কথাই মনে হয়েছে— অতি সাধারণ নির্বোধ-মূর্খ লোক বলে আমরা যাদের মনে করি তারাও তো এই ধরনের কথা বলে না! আল্লাহ্ তা'আলার অবয়ব, তাঁর সাক্ষাতকার ইত্যাদি প্রসঙ্গ। তারপরে সাহাবাগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাঁদের কাজকর্মের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমার জবাব ওদের বিতর্কের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দিচ্ছিল। কোনো কিছুতেই যখন কিছু হচ্ছিল না, তখন আব্বাসী খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আহমাদ! তুমি আমার এই মত গ্রহণ করো, আমি তোমাকে আমার দরবারে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়ে দেবো, তখন তুমি এমন লোকদের সাথে উঠা-বসা করবে, যারা এই দামী কার্পেটের ওপর হাঁটতে পেরে গর্ববোধ করে। ইমাম সাহেব বললেন বেশ, আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম, কিন্তু আমাকে আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূল (স)-এর হাদীস থেকে আপনাকে সমর্থনের দলিল দিতে হবে।

অবস্থা বেগতিক দেখে মুতাযেলারা ভয় পেয়ে গেল। ওরা ভাবলো না জানি খলিফাই তার মত পাল্টে ফেলে ! তখন সবাই একসাথে হৈ হৈ করে বলে উঠলো, আমীরুল মুমিনীন এই লোকটি কাফির, পথভ্রষ্ট, এ সবাইকে ভ্রষ্ট করে দেবে। এদের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ইসহাক বিন ইবরাহীম বলে উঠলো, আমীরুল মুমিনীন! লোকটাকে আপনি ছেড়ে দেবেন না! ওকে কঠিন শাস্তি দিন। এটা বর্তমান এবং অতীত খলিফা ও খিলাফতের অপমানকর হবে। মুতাসিম জেগে উঠলো, তাছাড়া সত্য প্রকাশিত হবার পর নিজেদের তত্ত্বের এই ভূলুণ্ঠিত দশা দেখে নিজেও অপমানিত বোধ করলো। সর্বোপরি শয়তানের উস্কানিতো সব সময়ই কার্যকর! পড়ে গেল সে শয়তানের পাল্লায়। সত্যের প্রতি মাথানত করে বিনয় অবলম্বনের বদলে ক্ষমতার অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললো, আহমাদ! আল্লাহ্ তোকে ধ্বংস করুন, আমি তোকে বড় করে আমার কাছে আনার বহু চেষ্টা করলাম, কিন্তু তোর একগুয়েমী আর

মূর্খতা তোকে তোর জায়গাতেই রেখে দিল। এ-ই! কে আছো! ওকে আবার হাতপায়ে বেড়ী পরিয়ে দোররা মারো তাহলেই ওর বুদ্ধি ফিরে আসবে। তারপর সত্যি সত্যিই আমার পায়ে বেড়ী পরানো হলো, হাত দু'টো বেঁধে বেত্রাঘাতকারীকে খবর দেয়া হলো। এসব নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা ছিল না। কষ্টে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল যখন ঐ পাপীষ্ঠরা আমার এতোদিনের বুকের ধন আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র রাসূল (স)-এর দাড়ি মোবারকের কিছু অংশ আমার কাছে ছিল তা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর বেত্রাঘাতকারী সামনে এসে দাঁড়ালো। তখন আমি উচ্চস্বরে বলতে লাগলাম, আমীরুল মুমিনীন! হায় আল্লাহ্! এ আমি কি দেখছি? আল্লাহ্র রাসূল (স) কি এটা বলেননি যে, তিনটি অপরাধ সংঘটন ছাড়া কোনো মুমিনের রক্ত ঝরানো হারাম! তারপর সে তিনটির কথা বললাম। বললাম, আল্লাহ্র রাসূল (স) বলেন, আমাকে মানুষের সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে, যতোক্ষণ না তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে। কিন্তু তারপর তাদের জান এবং মাল সংরক্ষিত। আল্লাহ্র রাসূল (স)-এর এই সুস্পষ্ট আদেশ থাকার পরেও কেন আমার রক্ত ঝরানো হবে? আমি কি মুসলিম নই? রাসূল (স)-এর এই হাদীসের সত্যায়নকারী নই? আমীরুল মুমিনীন, কাল-কিয়ামতের দিনকে স্মরণ করুন! যেদিন সত্যিকারের প্রতিশোধ গ্রহণকারীর সামনে আপনি ঠিক এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, যেভাবে আজ আমি আপনার সামনে দাঁড়ানো। সেদিন আপনি আমার এই রক্ত ঝরাবার কি কারণ দেখাবেন? কি জবাব দেবেন? কথাগুলো মু'তাসিমকে তীরের মতো বিদ্ধ করছিল, আমি তার মুখে সুস্পষ্ট যন্ত্রণার আভাস দেখতে পাচ্ছিলাম! মনে হচ্ছিল এক্ষুণি সে আমাকে মুক্ত করে দেবার আদেশ করবে! কিন্তু হায় শয়তানী চক্র! আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো চারিদিক থেকে, শয়তানগুলো বলতে লাগলো, আমীরুল মুমিনীন! এ লোকটা কাফির! ভ্রষ্টকারী! কিছুতেই আপনি ওকে ছেড়ে দেবেন না। ও আপনার খিলাফতের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি! আপনি সাবধান হন! মুহূর্তের জেগে উঠা ঈমান বিদ্যুৎ চমকের মতো জ্বলে উঠে আবার বেঈমানীর কালো মেঘের ঘনঘটায় বিলীন হয়ে গেল। সোজা হয়ে বসে বেত্রাঘাতকারীকে ইশারায় তার কাজ করতে বলল।

যখন প্রথম আঘাত করলো আমি বললাম 'বিসমিল্লাহ'! দ্বিতীয় আঘাতে বললাম, "লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। তৃতীয় আঘাতে বললাম, "আল কুরআনু কালামুল্লাহ গাইরা মাখলুক"। চতুর্থ আঘাতের পর বললাম, কুল লান ইউছিবুনা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা"। বেত্রাঘাতকারী আমার কথাগুলোকে ঢেকে দেবার জন্য চিৎকার করে বলছিল— তোর ধ্বংস হোক! তোর নাফরমানীর বদলা দেখ! দেখ! কেমন লাগে তার মজা। এরপর কতোক্ষণ মেরেছে আমি জানি না। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম মারছে না! মু'তাসিম চিৎকার করে বললো, এখনো আমার কথা মেনে নাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। ওর একথার কোন জবাব আমার কাছে ছিল না। আমি চুপ করে থাকলাম। খলিফার কথা শুনতে পাচ্ছ না! তার কথা মানছ না! জল্লাদ পাগলের মতো একথা বলছে আর ওর গায়ের যতোশক্তি আছে সব একত্রিত করে মারছে। মু'তাসিম হাতের ইশারা করলে থামে, তখন সে জিজ্ঞেস করে, কি আহমাদ, এখনও আমার কথা শোন, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। কিন্তু আমার কোনো কথা নেই। এভাবে বেশ কয়েকবার সে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে এবং তার জল্লাদ আমার মুখ দিয়ে কিছুই বের করতে পারেনি। মু'তাসিম

বোধহয় কিছু একটা বলছিল, কিন্তু বিষাক্ত বেতের আঘাতে তখন আমার চেতনা জবাব দিয়ে দিয়েছে।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখি রাজকীয় এক কামরায় শুয়ে আছি। হাতে-পায়ে বেড়ী নেই। এ ঘটনা ২২১ হিজরীর ২৫ রমযানের। ইমামকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেবার আদেশ দেয়া হয়েছিল। বেত্রাঘাতের সংখ্যার ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন ৩০টা আবার কেউ বলে পুরো ৮০টি। সে যাই হোক, ইমাম ছিলেন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত।

বাড়ি ফেরার পথে ইবরাহীম বিন ইসহাকের বাড়ি যাত্রা বিরতি হয়েছিল। ইবরাহীম কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু ইমাম রোযা আছেন বলে খেতে অস্বীকার করলেন। ঐ অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেও রোযা ভাঙ্গেননি। যোহরের নামাযের সময় জামা'আতে নামায আদায় করলেন। কাযী ইবনে সামাআতা আপত্তি করে বললো, রক্ত ঝরছে আর আপনি নামায পড়লেন? হ্যাঁ, হযরত উমর (রা) এ অবস্থায় নামায আদায় করেছেন। তাঁর জখম থেকে স্রোতের মতো রক্ত ঝরছিল, তবু নামায ছাড়েননি।

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বেত্রাঘাত করার জন্য ইমামকে যখন দাঁড় করানো হয়েছিল তখন হঠাৎ তাঁর পাজামার ফিতা খুলে গিয়েছিল। হাত-পা বাঁধা। কোন উপায় না দেখে বাধা হাত দু'টো পেটে চেপে ধরে দো'আ করলেন, ياالہ العالمين ياغياث المستغيثين —হে আল্লাহ্, আমি যদি তোমার সত্যের জন্য এই আযাব সহ্য করে থাকি, তাহলে আমার সতর রক্ষা করো। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে দেখলেন পাজামা আর পড়ছে না।

সে দিনের পর থেকে মু'তাসিম আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনি। তীব্র অনুশোচনা আর বিচিত্র দুঃস্বপ্নে সে প্রায় অর্ধ উন্মাদ। বার বার লোক পাঠিয়ে ইমামের অবস্থা জানতে চাইছে। ধীরে ধীরে ইমাম সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু দুই হাত এবং দুই ঠোঁটে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর এই সমস্যাটা ছিল। মু'তাযিলা ছাড়া অন্য সবাইকে ইমাম ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কেউ একজন প্রশ্ন করলে এই আয়াত আবৃত্তি করলেন ঃ

وليعفوا وليصفحوا الاتحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم -

আর তাদের উচিৎ ক্ষমা করে দেয়া মার্জনা করে দেয়া কিন্তু তোমাদের পছন্দ আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

তিনি বলতেন, কোন মুমিন ভাইকে নিজের জন্য কষ্ট দেয়া ঠিক নয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন মানুষকে ডাকবেন তাদের কৃতকর্মের বিনিময় দেবার জন্য, তখন তারাই অগ্রগামী হবে যারা পৃথিবীতে কারো অন্যায়কে ক্ষমা করে দিয়েছে।

ইমাম সাহেবের সাথে যারা বন্দী হয়েছিলেন তারা হলেন— মুহাম্মদ বিন নূহ আল-নিসাবুরী, নাঈম বিন হামাদ আল খামায়ী, আবু ইয়াকুব আল ইউরতী। মুহাম্মদ বিন নূহ মামুনের মৃত্যুর পর বন্দী অবস্থায় বাগদাদে ফেরার পথেই ইন্তেকাল করেন। নঈম বিন হামাদ মু'তাসিমের সময়ে জেলখানায় ইন্তেকাল করেন এবং ইয়াকুব ওয়াছেকের নিষ্ঠুর নির্যাতনে কয়েদখানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১]

১. তবকাতে শাফেয়ীয়াহ্ আল কুবরা।

www.pathagar.com

ইসলামী জগতের মূল্যায়ন

ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের ওপরে এই অমানবিক নির্যাতনের কথা যখন বসরায় পৌছাল তখন আমি আবুল অলীদ তিয়ালিসীকে বলতে শুনেছি— আহমাদ ইবনে হাম্বাল যদি ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে খুব শীঘ্রই তিনি নবী হয়ে যেতেন। ইসমাঈল বিন আল খলিফা বলেন, একথাটা আমারও অন্তরের উপলব্ধি। মুযনী'র ভাবনা অনুযায়ী পৃথিবীতে পাঁচ ব্যক্তি কঠিন পরীক্ষার সময় দৃষ্টান্তমূলক আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) আহলে রদ্দাহ'র মুকাবিলায়। হযরত উমর (রা) বনী ছাকীফাহর সময়। হযরত উসমান (রা) তার মরণাপন্ন অবস্থায়। হযরত আলী (রা) সিফ্ফীনের সময় এবং আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ) 'খালকে কুরআনের' মাসাআলায়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, আমি গোটা ইরাকে আহমাদ ইবনে হাম্বালের চাইতে বড় আলেম, ফাযেল, মুত্তাকী ও পরহেযগার আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আলকাতান বলেন, ইরাক থেকে আগত আর কেউ আমার এতো কাছের বন্ধু হতে পারেনি। বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ কুতাইবাহ বলেন, সুফিয়ান সাওরী ইন্তেকাল করেছেন তো তাকওয়া মরে গেছে। শাফেয়ীর ওফাতের সাথে সাথে সুন্নতও মরে গেছে। এখন আহমাদ ইবনে হাম্বালের মৃত্যুর পরে মূল দ্বীন মরে গিয়ে বেদআতের রাজত্ব কায়েম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কুতাইবার আর একটি বর্ণনা রয়েছে। বলেছেন, আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ) এই উম্মতের মধ্যে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর পথে এই রকম নির্যাতন ভোগ করা, তা শুধু নবীদেরই কাজ ছিল। আবু উমর বিন আলমুখাস একদিন ইমাম আহমাদের কথা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তাঁর সহায় হোন। দ্বীনের ওপর তাঁর অটল অবস্থান, যা কেবল শ্রেষ্ঠতম সাহাবাগণ এবং তাবেয়ীনগণের সাথেই তুলনা করা যায়। পৃথিবী তার সামনে এনে দেয়া হয়েছে। তিনি অস্বীকার করেছেন। একইভাবে দ্বীনকে এক নতুন রূপে তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছে তিনি তাকেও অস্বীকার করেছেন এবং মূল দ্বীনকে নিয়ে অবিচল থেকেছেন। হযরত বাশার বিন আল হারেস বিন হানী (সেকালের অনেক বড় সুফী সাধক) ইমাম আহমাদের সে পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, আহমাদ নিজের এই পরীক্ষায় খাঁটি প্রমাণিত হয়েছেন। যেভাবে 'সোনা' পরীক্ষা করার পর খাঁটি অখাঁটি প্রমাণ হয়। সেভাবেই আহমাদ যে আসলেই 'আহমাদ' তা তাঁর পরীক্ষার পরেই প্রমাণ হয়েছে। মাইমুনির বর্ণনা, আলী বিন মাদিনী বলেছেন, আহমাদ ইসলামের জন্য যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। আমি এটা শুনে আশ্চর্য হয়েছি এবং আবু উবায়েদ আল কাসেম বিন সালামের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলেছি। শুনে তিনি বললেন, ইবনুল মাদিনী ঠিকই বলেছেন, আবু বকর তো 'রিদ্দার' সময় অনেক সাহায্য-সহায়তাকারী পেয়েছিলেন, কিন্তু আহমাদের সাথে তো একজন সহযোগীও ছিল না। আবু ওবায়দাহ ইমাম আহমাদ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথাই বললেন। শেষে বললেন, তার

www.pathagar.com

চাইতে বড় ইসলামী ব্যক্তিত্ব আমি অন্য কাউকেই মনে করি না। (এই কথাগুলো এবং এই ধরনের কথাবার্তা অধিকাংশই অতিরঞ্জনের মধ্যে পড়ে যায়)। ইমাম আহমাদ নিঃসন্দেহে উম্মতের শিরোমনি। কিন্তু তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে এমন কিছু অতিরঞ্জিত প্রশংসাও করা হয়েছে, যা বাহ্যত সত্য মনে হয় না। (আল্লাহ্ই ভাল বলতে পারেন! —লেখক)।

ইসহাক বিন রাহোইয়াহ বলেন ঃ আরে আহমাদ বিন হাম্বাল! সে তো আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে সম্পর্কের সুস্পষ্ট প্রমাণ! কোন মাসআলায় আমি যদি তাঁর রায়টি পাই তাহলে নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তে তার ওপর আমল করি এবং আমি আদৌ পরোয়া করি না যে, তাকে আমার এবং আল্লাহ্র মাঝখানে যোগসূত্রের স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছি কি না। তারপর বলেন, আবু আবদুল্লাহ্ আহমাদ বিন হাম্বালের মুকাবিলা কে করতে পারে ? তাঁর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য কোনো আলেমের মধ্যে আমি দেখি না। মুহাদ্দিস, হাফেয, আলেম, সংযমশীলতা, একনিষ্ঠ সাধনা— কি নেই তার মধ্যে ?

ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেন, মানুষ স্বপ্ন দেখে যে, আমরাও আহমাদের মতো হয়ে যাই! কিন্তু আহমাদের মতো কে হতে পারে!

মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন আয্যহলী বলেন, আহমাদ আমাদের এবং আল্লাহ্র মাঝখানের যোগসূত্র।

হাম্বাল বিন আলা'আ আর-রকী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের ওপরে চারজন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে অসীম অনুগ্রহ করেছেন। এক ঃ শাফেয়ী (রা) যে হাদীসে রাসূল (স)কে ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর তার সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত, বিশেষ, সাধারণ, নাসেখ মনসুখ সম্পর্কে বলেছেন। দ্বিতীয় ঃ আবু ওবায়দাহকে— দুর্লভ এবং বিরল হাদীসসমূহের সন্ধান দিয়ে। তৃতীয় ঃ ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈনকে— মিথ্যা হাদীস সম্পর্কে জাতিকে সজাগ করে এবং চতুর্থ ঃ আহমাদ ইবনে হাম্বালকে দিয়ে— যে, ঈমানের কঠিন পরীক্ষার সময় কেমন করে অবিচল থাকতে হয়। এই চারজন মহাত্মন না থাকলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতো।

বকর বিন আবু দাউদের মতে ইসলামী উম্মাহর আহমাদ (রহ)-এর সমসাময়িকদের মধ্যে যারা লেখা পড়ার সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আহমাদ বিন হাম্বাল অগ্রগামী।

রাযী বলেন, এই বাদামী রঙের মানুষটির চাইতে বিচক্ষণ ফকীহ্ আমি অন্য কাউকে পাইনি এবং তারপরে সে এই হাদীস পড়লেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরদিনই সত্যের ধারক হয়ে থাকবে। না তাদের কেউ অপমানিত করতে পারবে! না কোনো ক্ষতি। এটা কেয়ামত পর্যন্ত ব্যাপৃত। তারপর বলেন, আবদুল্লাহ্ বিন আল মুবারক (রহ) এবং আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ) ঐ হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য।

www.pathagar.com

রাজতন্ত্রের সাথে সংঘর্ষ এবং তার প্রতিক্রিয়া

বেত্রাঘাতের ঘটনার পর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ) বাড়িতে এসে তাঁর ক্ষতস্থানগুলোর চিকিৎসা শুরু করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিরাময় দান করলেন। কিন্তু তিনি সেই যে গৃহে প্রবেশ করলেন আর বেরুলেন না। এমনকি জুম'আর জামায়াত, দরসে হাদীস সব বন্ধ হয়ে গেল। জীবন যাপনের জন্য সামান্য একটু জমি, যার আয় মাসিক মাত্র সতের দীনার, তার ওপরেই তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে দিন গুজরান করে যাচ্ছিলেন। মু'তাসিম এবং তারপর ওয়াসেক মুহাম্মদের খিলাফতকালটা এভাবেই কেটেছে। যখন মুতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ সিংহাসনে আরোহণ করে, তখন মানুষ একটু স্বস্তি বোধ করল। কেননা সে মু'তাযেলী নয়, আহলে সুন্নতের অনুসারী ছিল। সে গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করে দেয় যে, খালকে কুরআনের মাসআলা নিয়ে কেউ কোথাও আলোচনাও করতে পারবে না। এই মাসআলা নিয়ে যারা বিদ্রোহ করে বন্দী হয়েছিল তাদের সবাইকে মুক্তি দেয়া হলো। তারপরে বাদশাহর নায়েব ইসহাক বিন ইবরাহীমের কাছে চিঠি লিখলো যেন ইমাম আহমাদকে অত্যন্ত সম্মান ও যত্নের সাথে বাগদাদে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় প্রশাসক ইসহাক বিন ইবরাহীম ইমামকে ডেকে পাঠালো। ইমাম এলে ইসহাক খলিফার আদেশ অনুযায়ী যথেষ্ট সম্মান দেখালো এবং বললো, খলিফার আদেশ তার সাথে রাজধানীতে যেতে হবে। ইমাম সাহেব ভাল কিছুর আশায় রাজী হলেন এবং যথারীতি রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটলো যাতে ইসহাকের সাথে ইমামের মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল। ইমামের সাথে তর্কে পরাজয়ের ক্ষোভ ইসহাকের মধ্যে আবার জেগে উঠলো। সামেরায় পৌঁছে ইসহাক ইমাম সাহেব সম্পর্কে খলিফার কাছে উল্টোপাল্টা কি সব নালিশ জানালে খলিফা কিছু বিচার-বিবেচনা না করেই ইমাম সাহেবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিলো।

নিষ্ফল অপমানজনক দীর্ঘ এই পথ যাত্রা, ইমাম সাহেব দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাগদাদে ফিরে এলেন। এরপরে এক ভ্রষ্টাচারী ইবনে ছাল্যী ইমাম সাহেব সম্পর্কে খলিফার কাছে ষড়যন্ত্রমূলক এক গল্প ফেঁদে বসলো। যে বিদ্বেষের ওপর খলিফাদের গোটা অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত সেই 'আলী (রা)'-এর বংশের লোকদের সাথে ইমামের হরদম মেলামেশা এবং তাদেরই এক লোক খিলাফতের জন্য ইমাম সাহবের হাতে লোকদেরকে ডেকে ডেকে বাইয়াত করাচ্ছে।

রাজধানী থেকে ইমাম সাহেবের বাড়ি তল্লাশীর ফরমান জারী হলো। রাতের বেলা সরকারী বাহিনী ইমামের বাড়ি ঘিরে ফেললো। ইমাম সাহেব কিছুই জানেন না। চারিদিকে মশালধারী লোকজন। ইমাম সাহেব উঠানে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসেছিলেন। বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছেন বলে গোপান খবরের ভিত্তিতে তারা এসেছে বলে জানালো। ইমাম সাহেব তো অবাক বিস্ময়ে ওদের মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। বললেন, খলিফার জন্য আমি যেখানে দিন-রাত আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে থাকি যে, আল্লাহ্ যেন তাকে তাঁর পথে থাকার তৌফিক দেন। তার শক্তি-সামর্থ্য বাড়িয়ে দেন। সেই আমাকে বলা হচ্ছে আমি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি ?

www.pathagar.com

আল্লাহ্! কিন্তু তল্লাশী দল সাবধানতা এবং তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনে তৎপর। তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেও বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছেন এমন কোনো লোক বা বস্তুর সন্ধান তারা পেলো না। বাস্তবতা খলিফাকে জানানো হলো।

রাষ্ট্রীয় আনুগত্য এবং ইমামের স্বেচ্ছা নির্জনবাসের যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে যখন খলিফা পুরোপুরি অবগত হলো তখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কতিপয় লোক ইমামের মহত্বকে সহ্য করতে না পেরে তারাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। নিরীহ এই মানুষটির বিরুদ্ধে খিলাফতের এই বাড়াবাড়ি খলিফা মুতাওক্কালকে মারাত্মক লজ্জার মধ্যে ফেলে দিল। ইমাম সাহেব সম্পর্কে তার মনে শ্রদ্ধা-ভক্তি আবার নতুন করে জাগ্রত হলো। ইয়াকুব বিন ইবরাহীম নামের এক প্রহরীকে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে বলে পাঠালো যে, টাকাটা শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্য। আবু ইয়াকুব টাকা নিয়ে এসে ইমাম সাহেবের কাছে খলিফার নিবেদন পৌছালো, ইমাম সাহেব স্বভাবসুলভভাবে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। আবু ইয়াকুব তখন বললো, টাকা দিয়ে আপনি যাই করুন কিন্তু আল্লাহ্র ওয়াস্তে ফিরিয়ে দিবেন না। তাহলে খলিফা আবার আপনাকে ভুল বুঝবে এবং সে অনেক দুঃখ পাবে। ইমাম সাহেবের সামনে গোটা প্রেক্ষাপট পরিষ্কার, ব্যাপারটা তিনিও অনুধাবন করতে পারলেন। যাই হোক টাকাটা তিনি গ্রহণ করলেন। রাজদূত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনজনদের ডাকলেন। বললেন, বাগদাদের গরীব মুহাদ্দিস এবং আলেমদের একটা তালিকা তৈরী করো এবং ঠিক পরিমাণ মতো এই সমুদয় টাকা তাদের মধ্যে বন্টন করে এসো। দেখো, ঠিক আজকের মধ্যে শেষ হওয়া চাই, নইলে রাতের ঘুম আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে! রাতারাতি সে নির্দেশ পালিত হলো। অথচ আপন পরিবারের চরম দারিদ্র্যতার মধ্যেও একটি পয়সা কাউকে ছুঁতে দিলেন না। শুধু তার নাতী একটা দিরহাম তুলে নিয়েছিল, সে জন্য তাকে তিনি কিছু বলেননি।

একথাও খলিফার কানে যেতে বাকী থাকলো না যে, সমুদয় টাকা বন্টন করে দেয়া হয়েছে। এমনকি টাকার থলেটা পর্যন্তও একজনকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে দরবারে বসে একজনার সাথে আলাপ করছিল। সে বললো, আমীরুল মু'মিনীন! আহমাদ আপনার কাছ থেকে পাওয়া উপহার গ্রহণ করেছিলেন এবং তারপর সব অন্যান্য গরীব আলেমদের মধ্যে সে বন্টন করে দিয়েছে। আসল কথা কি জানেন! আহমাদের মতো মানুষ এই দীনার দেরহাম দিয়ে কি করবে ? দুবেলা দু'টো রুটি হলেই যে সন্তুষ্ট! খলিফা বললো, তুমি ঠিকই বলেছো।

ইসহাক বিন ইবরাহীম ও তার ছেলে মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ্ বিন ইসহাক বাগদাদের প্রশাসক নিযুক্ত হলো। খলিফা তাকে একটা চিঠি লিখলো, তুমি ইমাম আহমাদকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আমার কাছে নিয়ে এসো। সে এসে ইমাম সাহেবের কাছে বার্তা পৌছাল। ইমাম সাহেব তাঁর বার্ধক্য এবং দুর্বলতার কথা বলে বললেন, তিনি যেতে সক্ষম হবেন না। আবদুল্লাহ্ ইমামের অক্ষমতার কথা খলিফাকে জানিয়ে দিল। খলিফা সে কথা অগ্রাহ্য করে আবার বলে পাঠালো যে, সে যেন ইমাম সাহেবকে গিয়ে বলে যে, আপনি খলিফার কাছাকাছি থাকলে রাষ্ট্র পরিচালনায় তার সুবিধা হবে তাই সে আপনাকে রাজধানীতে দেখতে চায়।

একথার পরে ইমাম সাহেব আর দ্বিধা করেননি। পরিবার-পরিজন নিয়ে বাগদাদ থেকে রওয়ানা হলেন। মা'আসকারে যখন পৌঁছালেন তখন খলিফার খাদেম এসে অনেক জাঁকজমকের সাথে স্বাগতম জানালো। সালাম বিনিময়ের পর খাদেম খুব উল্লাসের সাথে জানালো, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করেছেন আপনার জানী দুশমন দাউদ আর নেই। শুনে ইমাম সাহেব চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু ইমামের ছেলে খলিফা এবং তার রাজন্যবর্গের জন্য দো'আ করলো। অতঃপর 'সামেরাহ'তে পৌঁছালেন। ইমাম সাহেবকে একটা বাড়িতে থাকতে দেয়া হলো। যখন শুনলেন এই বাড়ির মালিকানা নিয়ে গণ্ডগোল আছে, সাথে সাথে সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য এক ভাড়ার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

বসবাস ঠিকঠাক হতেই পাড়া-প্রতিবেশীর আনাগোনা শুরু হলো। শহরের গণ্যমান্য লোকেরাও আসতে শুরু করলো। ভাল কাপড় বলতে যা বোঝায় সে রকম দু' একটা জামা ইমামের ছিল। অচেনা জায়গায় একেবারে হতদরিদ্র হিসেবে পরিচিত হতে ইমামের আত্মসম্মানে লাগলো। তাই তিনি ভাল কাপড় পরেই থাকতেন।

উন্নতমানের আসবাবপত্র এবং খাবার-দাবারে ঘর ভরে গেল। খলিফা ভাবছিল ইমাম সাহেব তা ভোগ করছেন। কিন্তু না ইমাম সাহেব সম্পূর্ণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েও জ্ঞান হারাননি। তিনি যথারীতি রোযা রেখেই কাটাচ্ছেন। খলিফা বলে পাঠালো আমি আপনার খেদমতে যা কিছু পাঠাচ্ছি, এভাবেই তা যেতে থাকবে, আপনি নিশ্চিন্তে আগের মতো দরসে হাদীসের মজলিস চালু করে দিন। ইমাম সাহেব তাঁর বার্ধক্য এবং প্রচণ্ড দাঁতের ব্যথার কথা জানালেন।

খাবার-দাবার যতোই আসতে লাগলো ইমাম সাহেবের কৃচ্ছতা ততো বেড়ে যেতে থাকলো। একবার লাগাতার তিনদিনের রোযায় প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করা হলো, কিন্তু কিছুতেই তিনি কোনো খাবার স্পর্শ করছিলেন না। শেষে ছেলের কসম দেয়াতে সামান্য ছাতু গুলে দিতে বললেন।

ইয়াহ্ইয়া বিন খাকান একবার খলিফার পাঠানো অনেকগুলো টাকার একটা থলে নিয়ে হাজির। ইমামকে তা গ্রহণ করতে বলায় তিনি ক্ষেপে গেলেন। তক্ষুনি টাকা নিয়ে বেরিয়ে না গেলে তিনি আরো রাগ হবেন। ফলে খাকান টাকা ফিরিয়ে নিয়ে গেল। খলিফা টাকাটা তার ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিল। তার ওপর ছেলে এবং পরিবারের জন্য মাসিক চার হাজার দেরহাম ভাতা বরাদ্দ করে দিল। কিন্তু ইমাম আহমাদ এসবের থেকে কোনো কিছুই কখনো স্পর্শ করেননি। ছেলেদের ডেকে বললেন, আমার জীবনের আর অল্প ক'টা দিনই বাকী ছিল তাকে যেতেও দিলে না! এর মধ্যেই জমিদারী জীবন গ্রহণ করে নিলে! আমি জানি না আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কল্যাণ করবেন না জাহান্নামের ইন্ধন বানাবেন! তারপর দুই ছেলেকে অনেক করে বোঝালেন। অনেক দলিল দিলেন। কিন্তু তারা বাবার সেসব নসীহত গ্রাহ্য করেনি।

দুর্বলতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। খুব খারাপ অবস্থার কথা শুনে খলিফা দরবারী চিকিৎসক ইবনে মাসুইয়াকে পাঠালো। চিকিৎসক দেখে-শুনে খলিফাকে জানালো যে, তার কোনো রোগ নেই। রোগ একটাই, তিনি কোনো খাবার খান না। অবিরাম রোযা এবং কঠিন ইবাদতের ফলে তাঁর শরীর এতোটা দুর্বল হয়ে গেছে। খলিফা কতোক্ষণ গুম হয়ে থাকলো।

খলিফার মা ইমাম সাহেবকে দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করে ছেলেকে খবর পাঠালো। খলিফা মায়ের ইচ্ছার কথা জানিয়ে তার ছেলে 'মু'তাজ'-এর বাড়িতে আসার জন্য ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করে পাঠালো। ইমাম সাহেব প্রথমে অস্বীকার করেই বসেছিলেন, হঠাৎ মনে হলো তার বাড়ি ফিরে যাবার কথাটা তিনি সেখানে বলার সুযোগ পেতে পারেন। রাজী হলেন। খলিফা তার নিজের বাহন এবং রাজকীয় পোশাক পাঠিয়েছিল। কাপড় তো পরলেনই না বাহনেও চড়লেন না। বললেন, বাহনের আসনের কাপড়ে বাঘের ছবি আঁকা আছে। তখন পরিচিত এক ব্যবসায়ীর গাধার পিঠে চড়ে তিনি মু'তাজের বাড়িতে এলেন। খলিফা ও তার মা একটা পর্দার আড়ালে বসেছিল। ইমাম সাহেব বাড়িতে ঢুকতেই খলিফা দু'হাত বাড়িয়ে আবেগপূর্ণ স্বাগতম জানালো। ইমাম সাহেব বাড়ির সবার উদ্দেশ্যে একটা সালাম দিয়ে বসে পড়লেন।

পর্দার আড়াল থেকে মা আল্লাহ আল্লাহ্ বলে আর্তনাদ করে উঠলো। বললো, বাবা তুমি এই রকম একজন লোককে বিদ্রোহী সন্দেহ করেছো ? ছিঃ বাবা, আমার ইচ্ছা ওনাকে আর কষ্ট না দিয়ে ওনার বাড়িতে পৌঁছে দাও। খলিফা মুগ্ধদৃষ্টিতে ইমাম সাহেবকে দেখছিল। তারপর মাকে উদ্দেশ্য করে বললো, মা দেখ। সারাঘর কেমন আলোকিত হয়ে গেছে! একেই বোধহয় খোদায়ই 'নূর' বলে।

খাদেম এসে রাজকীয় কাপড় পড়ালো। ইমাম সাহেব মুখ গোমরা করে বসেছিলেন। দেখেই মনে হচ্ছিল উনি খুশী নন। ইমাম সাহেব বলছেন, কাপড় পরা শেষ হলে আমি মু'তাজের পাশে বসবো বলে সেখানে যেতেই খলিফা বললো, উনি এখন থেকে তোমার শিক্ষক। শিশু মু'তাজ ইমামের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি আমাকে শেখাবেন ! ইমাম সাহেব বলেন, ওর এই শিশু সুলভ পবিত্রতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। যাই হোক সেখান থেকে বেরিয়ে ইমাম সাহেব শত শত ইসতেগফার করতে থাকলেন।

কিছুদিন পরে ইমাম বাগদাদে যাবার অনুমতি পেলেন এবং তার জন্য একটি নৌ যুদ্ধ জাহাজ ঠিক করা হলো যেন তিনি সহি সালামতে বাগদাদ পৌঁছাতে পারেন। তিনি সরকারি প্রত্যাখ্যান করে সাধারণ একটি নৌকায় বাগদাদে পৌঁছালেন। বাড়িতে এসে সর্বপ্রথম যে কাজটি তিনি করলেন তাহলো, রাজকীয় পোষকটি বিক্রি করে যা পাওয়া যায় তা গরীব-মিসকিনদের দিয়ে দেবার জন্য লোক পাঠালেন। সারাদিনই মাথা নেড়ে ছিঃ ছিঃ করতেন আর বলতেন, আফসোস, সারাজীবন যাদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করলাম, এই শেষকালে এসে তাদের সাথেই মিশতে হলো! বাগদাদে এসে ইমামের সেই আগের মতোই অনাহারে-অর্ধাহারে কাটানোর দিন আবার শুরু হলো।

ওদিকে খলিফার রাজন্যবর্গ ইমামের চলে যাবার পর তাকে নিয়ে জোর আলোচনা শুরু করলো। তারা খলিফাকে জানালো আপনার পাঠানো কোনো খাবার ইমাম কখনো স্পর্শ করতেন না। মুতাওয়াক্কিল জবাব দিল আল্লাহ্‌র কসম, মু'তাসিমও যদি আবার কবর থেকে উঠে ইমাম সাহেব সম্পর্কে কিছু বলে আমি তা বিশ্বাস করবার নই।

এই বিশ্বাস তার বরাবরই কায়েম ছিল। লোক পাঠিয়ে ইমামের খবর নেয়া তার আলাদা একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইবনে আবী দাউদের বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে খলিফা অনেকবারই ইমামের কাছে প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু ইমাম এ ব্যাপারে একবারও মুখ খোলেননি। ইবনে আবু

দাউদ যখন বুঝতে পারলো তার ওপর বিপদ আসছে, তখন সে 'সামেরাহ' থেকে বাগদাদে ছুটে এসেছিল, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। ইমামকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করার দায়ে তার সকল বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারী হয়ে গিয়েছিল।

ছেলে আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনা

বাবা যখন সামেরাহ থেকে ফিরে এলেন তখন তার শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। চোখ ধ্বসে গিয়েছিল আর শ্বাসকষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতো কষ্টের মধ্যেও আমাদের যেসব আত্মীয়-স্বজন শাহী-ভাতাভোগী ছিল তাদের কারো বাড়ি থেকে এক বালতি পানি আনতেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রীয় কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পরামর্শের প্রয়োজন হলেই খলিফা তাঁর কাছে বিশেষ দূত পাঠিয়ে পরামর্শ জেনে নিতো। খলিফা বাগদাদে এলে এক হাজার দীনার নিয়ে ইবনে খাকানকে ইমামের কাছে পাঠালো। কিন্তু বরাবরের মতো ইমাম তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবার বিশেষ কয়েকটি কথা জানিয়ে দিলেন যে, খলিফাকে গিয়ে বলবে আমার জন্য কষ্টদায়ক এমন সব কিছু থেকেই সে আমায় মুক্ত করেছে, বাকী এই 'হাদিয়া', এটা আমি সবচাইতে বেশি অপছন্দ করি, কাজেই সে যেন দয়া করে এ থেকেও আমায় মুক্তি দেয়।

কে যেন একটা গোপন চিঠিতে খলিফাকে জানায় যে, ইমাম আহ্‌মাদ আপনার বাপদাদাকে 'জিন্দিক' (নাস্তিক) বলে। মুতাওয়াক্কাল তার জবাব লিখিয়েছিল যে, মামুন বিচিত্র সব লোকদের সাথে মেলামেশা করতো। একসময় সেইসব লোকেরা তার বুদ্ধি-বিবেককেও হরণ করেছিল। ঠিক সেভাবেই আমার বাবা মু'তাসিম ছিল এক জঙ্গী মানুষ, ইল্‌মে দ্বীনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাংঘর্ষিক যে কোনো ব্যাপারেই সে আনন্দ পেতো। আর আমার ভাই ওয়াছেক নিঃসন্দেহে জিন্দিক ছিল। এই চিঠি দিয়ে পত্রবাহককে বললো, চিঠি দিয়ে ওকে ধরবে এবং এখানে এনে একশ' চাবুক লাগাবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম একশ' এর জায়গায় পাঁচশ' ঘা বেত মেরেছিল। খলিফা শুনে তাকে কৈফিয়ত তলব করলে সে বললো, দু'শ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য। দু'শ আপনার আনুগত্যের জন্য আর একশ' ঐ মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে হাম্বালের বিরুদ্ধে গীবত করার জন্য। খলিফা শুনে জোরে হেসে উঠলো, বললো, ঠিক করেছো।

"খালকে কুরআনের" সম্পূর্ণ বিষয়টা ভাল করে বোঝার জন্য খলিফা ইমামের কাছে একখানা বিনীত নিবেদন পাঠিয়েছিল। ইমাম সাহেব তার জবাবে সকল দলিল-প্রমাণ এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণযোগ্য ইতিহাসসমূহ দিয়ে মোটামুটি ছোটখাট একখানা পুস্তিকা লিখে পাঠিয়েছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবের আকীদা-বিশ্বাস

আবুল ফারাহ ইবনুল জাওযী তার নিজের বরাত দিয়ে হযরত ইমাম ইবনে হাম্বালের একটা চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। যে চিঠি ইমাম সাহেব তাঁর ছাত্র মাসদাদ ইবনে মুছারহাদের এক চিঠির জবাবে লিখেছিলেন। যা পড়লে বোঝা যায় যে, আসলে ইমাম সাহেবের গোটা অস্তিত্ব কোনো বিশ্বাসের ওপর এতো শক্তভাবে দাঁড়ানো।

আবু বকর আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল বুরদাঈ আল তামিমী, যে ইবনে জাওযীর সনদের সর্বশেষ বর্ণনকারী, তিনি বলছে যে, মাসদাদ ইবনে মুছারহাদ রাফেযী (হযরত আলীর পক্ষত্যাগী) কাদারীয়াহ (ভাগ্যে অবিশ্বাসী) এবং মু'তাযিলাদের সাথে প্রতিনিয়ত 'বহসে' হিমশিম খাচ্ছিল। তার ওপরে খালকে কুরআনের মাসআলা, এক কথায় সে যখন প্রায় দিশাহারা তখন উস্তাদ ইমাম ইবনে হাম্বালের কাছে এইসব ফেতনার যথোপযুক্ত জবাব দেবার দলিল-প্রমাণ চেয়ে এই চিঠি লেখে।

চিঠিখানি পড়ে ইমাম কেঁদে ফেললেন, বললেন, এই বসরী (মাসদাদ ইবনে মুছারহাদ) মনে করে যে, রাসূল (স)-এর সহীহ্ সুন্নত জানার জন্য আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছি। অথচ আমার অবস্থা এই যে, আমি তার কতোটাকুই বা জানি! কিন্তু তবু আমার ছাত্র। যতোটুকু আমি জানি, তা জানানো আমার কর্তব্য।

হামদ ও না'তের পরে সম্বোধন করে লিখছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এবং তোমাকে এমন সব জিনিসের তওফিক দিন যা যা তিনি পছন্দ করেন এবং এমন সব জিনিস থেকে তিনি রক্ষা করুন যা তিনি পছন্দ করেন না এবং এমন ব্যক্তিবর্গের মতো আমল করার তওফিক দিন যাঁরা তাঁকে সত্যি সত্যিই ভয় করে, কেননা সেটাই অনুসরণযোগ্য। আমি আমার নিজেকে এবং তোমাকে তাকওয়া ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের নীতির অনুসরণ করতে অসীয়ত করছি। কারণ সুন্নতের অস্বীকারকারীদের শাস্তি ও সুন্নতের অনুসরণকারীদের পুরস্কার দু'টোই তোমার জানা। এক হাদীসে আমার কাছে পৌঁছেছে যে, বান্দা সুন্নতের ওপর আমল করলে জান্নাতে যাবে। তাই আমি তোমাকে শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কুরআনের ওপরে কোনো জিনিসকে প্রাধান্য দেবে না। জানবে, তা আল্লাহ্র কালাম— 'সৃষ্টি' নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কালামে অতীত জাতিগুলোর যেসব অবস্থা গল্পের আকারে বর্ণনা করেছেন তাও 'সৃষ্টি' নয়। লওহে মাহফুযে যা আছে তাও 'সৃষ্টি' নয়। যে তাকে 'সৃষ্টি' বললো সে কাফির হয়ে গেল এবং যে তাদেরকে কাফির বলবে না, সেও কাফির।

আল্লাহ্র এই কালামের পরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের অবস্থান এবং তাঁর হাদীসের সাথে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের কর্ম প্রক্রিয়াও গ্রহণযোগ্য। রাসূল (স) যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তার সত্যতা স্বীকার এবং তিনি যে কর্ম পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন তার হুবহু অনুসরণই মুক্তির একমাত্র উপায়। এটাই সকল পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীগণের নীতি ও রীতি। 'জাহাম'-এর মতামত থেকে দূরে থাকবে কেননা তারা ঝগড়াটে মানুষ। জাহমিয়াহ্দের

www.pathagar.com

ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে পূর্বসূরীদের কাছ থেকে শুনেছি যে, ওদের তিনটি দল। প্রথম ঃ যারা কুরআনকে আল্লাহ্র কালাম, কিন্তু তা মাখলুক (সৃষ্টি) বলে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয় ঃ যারা কুরআনকে আল্লাহ্র কালাম মানে তবে তা মাখলুক অথবা মাখলুক নয় এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে না। তাদেরকে 'ওয়াক্বেফাহ্' বলা হয়। তৃতীয় ঃ যারা বলে الفاظنا بالقران مجلوقة। অর্থাৎ আমাদের জন্য কুরআনের যে বাণীসমূহ তা মাখলুক। এরা সবাই জাহমিয়াহ। পূর্বসূরীগণ এ ব্যাপারে 'ইজমা' করে নিয়েছেন যে, এসব লোকেরা যদি তাদের মানসিকতা থেকে তওবা না করে তাহলে তাদের কোনো স্বাক্ষ্য যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি তাদের কোনো জবাইও হালাল নয়। "ঈমান কথা এবং কাজের সমন্বয়ের নাম"। পূন্য কর্মে তা বাড়তে থাকে এবং মন্দ কাজে তা খেটে যায়। মানুষ অনেক সময় ঈমান থেকে বেরিয়ে ইসলামের দিকে চলে আসে। তখন যদি তওবা করে নেয়, তাহলে তার মধ্যে আবার ঈমান ফিরে আসে এবং ইসলাম থেকে (শিরক ছাড়া অথবা আল্লাহ্র নামসমূহের মধ্যে থেকে কোনো একটির অবশ্যকতাকে অস্বীকার করা) অন্য কোনো কিছু খারিজ করে দেয় না। কোনো লোক যদি কোনো 'ফরজকে' ঢিলেমী অথবা অবহেলায় উপেক্ষা করে তাহলে তা আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ার— হয় ক্ষমা করে দেবেন অথবা শাস্তি দেবেন।

মু'তাযিলাদের সম্পর্কে পূর্বগামী সকল আলেমদের কাছ থেকে আমি এটাই শুনেছি যে, তারা গুনাহকে কুফরীর 'পরিণাম' মনে করে। তাহলে হযরত আদম (আ) এবং ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের সব ভাই কাফির হিসেবে গণ্য হবে। এজন্য যে, হযরত আদম আলাইহিস সাল্লাম আল্লাহ্র সীমা লংঘন করেছিলেন এবং ইউসুফের ভাই যারা তাদের বাবার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে।

মু'তাযিলারা ইজমা করে নিয়েছে যে, একটি শস্যদানা যে চুরি করেছে সে জাহান্নামী। তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং হজ্ব করে থাকলে তা বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় হজ্ব করতে হবে। এসব কথা যারা বলে তাদের কাফির হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। এদের জবাই করা কোন কিছু খাওয়া উচিত না। এমনকি এদের সাথে কথাবার্তাও বলা উচিত নয়।

রাফেযীদের ব্যাপারে পূর্বসূরীদের কাছ থেকে শুনেছি। তারা হযরত আলীকে হযরত আবু বকরের ওপরে মর্যাদা দেয় এবং তাঁর ঈমানকে আবু বকরের পূর্বের ঈমান বলে থাকে। এখন যে ব্যক্তি এটা মনে করে যে, হযরত আবু বকরের চাইতে আলী 'উত্তম'— তারা তাহলে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের (স) সুন্নাতকে 'নাকচ' করে দিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ "মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র রাসূল ও তার সাথীরা" এ আয়াতের তাৎপর্য আবু বকর— আলী নয়। সুতরাং আবু বকর কুরআনের দৃষ্টিতেও আলীর চাইতে উত্তম। এবার রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ যদি কাউকে বন্ধু বানাতেন তাহলে আবু বকরকে বানাতেন! কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেই তাঁর বন্ধু নির্বাচন করেছেন।

যে মনে করে আলী (রা) আবু বকরের পূর্বে ঈমান এনেছে সে ভুল করেছে। কেননা হযরত আবু বকর ৩৫ বছর বয়সে ঈমান এনেছিলেন যে সময় হযরত আলীর বয়স মাত্র সাত বছর। যে সময় তার ওপরে কোন হুকুম-আহকামও ফরয হতে পারে না। আমাদের ঈমান, জীবন ও তকদীর, ভাল ও মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত ও জান্নাত বাসীদের এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করার আগেই সৃষ্টি করেছেন এবং জান্নাতের

www.pathagar.com

সকল নিয়ামত স্থায়ী। যে এটা মনে করলো যে, তা একদিন ফুরিয়ে যাবে, সে কুফরী করলো। একইভাবে জাহান্নাম ও জাহান্নামবাসীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তার আযাবও চিরস্থায়ী। কখনো শেষ হবার নয়। রাসূল (স)-এর সুপারিশে একটি দল জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে জান্নাতে যাবে এবং জান্নাতবাসী নিশ্চিতভাবে নিজের চোখে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস সাল্লামের সাথে কথা বলেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লামকে নিজের বন্ধু বানিয়েছেন। এছাড়া মীযান সত্য। সিরাত সত্য। রাসূলগণ সত্য। ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রাসূল। হাওযে কাওসার, শাফাআত, আরশকুরসী ও মালিকুল মওতের রূহ কবয করার ওপরে ঈমান এবং এই রূহ পরে আবার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয় তারপর তার কাছে তওহীদে রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। শিঙ্গায় ফুঁক সত্য যা ইসরাফিল ফুঁকবেন।

মদীনায় যে কবর তা রাসূল (স)-এর কবর এবং তার সাথে হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর কবরও আছে। মানুষের অন্তর (কলব) আল্লাহ্ তা'আলার পর্যবেক্ষণের আওতায় রয়েছে। দাজ্জাল এই উম্মতের থেকেই বের হবে এটা নিশ্চিত। ঈসা ইবনে মারইয়াম এই পৃথিবীতে আবার জন্ম নেবেন এবং তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

যেসব জিনিস আহলে সুন্নতের আলেমগণ নিষেধ করেছেন তা নিষিদ্ধ এবং সাধারণ বেদ'আত থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে। এটাও আমার ঈমান যে, রাসূল (স)-এর পরে কোনো চোখ আবু বকরের মত কাউকে দেখেনি এবং আবু বকরের পরে উমরের মতো কেউ এবং উমরের পরে উসমানের মতো কেউ। ইবনুল জাওযী বলেন, ইমাম আহমাদ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে যে হাদীসে এই ফযিলত বর্ণিত আছে সে অনুযায়ী বলেছেন। এখানে হযরত আলীর ব্যাপারে কোনো কথা না বলে পরে আবার বলছেন আল্লাহ্‌র কসম এই চারজন খোলাফায়ে রাশেদ সত্যিকারের পথ প্রদর্শক। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই দশজন নিশ্চিত জান্নাতী, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের সো'ওদ, সাঈদ আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) এবং আবু ওবায়দাহ্। 'আল জেরাহ', তাকেও আমি জান্নাতী এজন্য বলেছি যে, রাসূল (স) তাকে জান্নাতী বলেছেন।

নামাযে রাফা 'ইয়াদাইন' ও উচ্চস্বরে আমিন বলা। মুসলিম নারীদের দো'আও সহযোগিতার মধ্যে পড়ে। তাদের বাইরে যাওয়া এবং কোনো গণ্ডগোলে অংশ নেয়া নিষিদ্ধ। ঐ দশজন ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ মুসলিম ব্যক্তিকে নিশ্চিত জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা ঠিক না। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যকে নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন তাকে সেভাবেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করো এবং নিজ সত্ত্বার সাথে যা কিছু নেতিবাচক করেছেন তাকে তুমিও নেতিবাচক ভাবো। আত্মপূজারী লোকদের সাথে ঝগড়া থেকে এড়িয়ে চলো।

রাসূলে কারীম (স)-এর আসহাবগণের দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা বা তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘঠিত বিতর্ক নিয়ে তুমি আলোচনা করবে না; বরং তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করো। বদ-আত্মীয়দের সাথে কোনো পরামর্শ বা তাদের সাথে চলাফেরা করবে না। অভিভাবক এবং উভয় পক্ষের সমান সম্মতি ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ নয়। 'মু'তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। জুম'আ ঈদ অথবা যে কোনো নামায ভাল বা মন্দ যে কোনো লোকের পেছনে জায়েয। কেবলানুসারী এমন প্রত্যেকের জানাযা নামায পড়বে। তাদের বিচার আল্লাহ্ করবেন। প্রত্যেক ইমামের সাথে

www.pathagar.com

জিহাদ এবং এতে অংশগ্রহণ করা জরুরী। জানাযার চার তাকবীর, কিন্তু ইমাম যদি পাঁচ তাকবীর দেয় তুমিও দেবে। যেমন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব করেছেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ যেমন বলেছেন, ইমাম পাঁচ তাকবীর বললে তুমিও পাঁচ তাকবীর বলবে। কিন্তু শাফেয়ী এই মাসআলায় আমার সাথে দ্বিমত করেছে। সে বলেছে, যদি ইমাম পাঁচ তাকবীর বলে ফেলে তাহলে নামায আবার পড়তে হবে। রাসূল (স) জানাযার নামায পড়েছেন এবং চার তাকবীর বলেছেন। মুসাফিরের জন্য তিন রাতে দিন এবং মুকীমের জন্য এক রাত এক দিন। রাত এবং দিনের সকল সুন্নত দুই রাকাত করে। ফযরের নামায এবং ঈদের নামাযের মাঝখানে অন্য কোন নামায নেই। মাসজিদে প্রবেশের পরে তাহিয়াতুল মাসজিদ পড়া প্রয়োজন। বেতের এক রাকাআত। একামাত একবার করে আহলে সুন্নতের কাছে পছন্দনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এবং আমাকে আহলে সুন্নতের ওপর রেখে মৃত্যু কবুল করুন। জ্ঞানার্জন করার তওফিক দিন এবং তাঁর সন্তোষ অর্জন করার সামর্থ্য দিন।

এরপরে ইবনুল জাওযী নিজ সনদে আবদুল ইবনে মালিক আল আততাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে শুনেছি, সুন্নতের মূলনীতি আমাদের কাছে তা-ই, আসহাবে রাসূল (স) যার ওপর ছিলেন এবং তাঁদেরই অনুসরণ করা উচিত। বেদআতকে সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত, কেননা সকল বেদআত ভ্রষ্ঠতার উৎস। একইভাবে প্রদর্শনীমূলক কাজ অর্থাৎ কপটতা, কৃপণতা এবং অহেতুক ঝগড়াঝাটি দ্বীনের মধ্যে ঢুকতে দেয়া উচিত না। রাসূল (স)-এর কর্ম প্রক্রিয়া আমাদের কাছে সুন্নত এবং সুন্নত রচনাকারী "কুরআন" এবং নামাযের পথ "কুরআন"। দ্বীনে কিয়াসের কোনো স্থান নেই।

এরপরে পরের চিঠির কিছু কথা আছে, কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম এবং তা সৃষ্টি নয়। কুরআন সৃষ্টি নয় একথা বলতে এতোটুকু দ্বিধা করবে না। কেননা আল্লাহ্র কালাম মাখলুক হতে পারে না। যারা তাকে মাখলুক বলে অথবা আল্লাহ্র কালাম বলে বটে, কিন্তু সৃষ্টি না সৃষ্টি নয় সে ব্যাপারে নীরব থাকে। অথবা কুরআনের বাণী সৃষ্টি এসব কথা যারা বিশ্বাস করে তাদের সাথে বিতর্ক এড়িয়ে চলবে। কেননা এরা সবাই একই রকম বেদআতী।

দাজ্জাল যে এই উম্মতের মধ্যে জন্ম নেবে তার দুই চোখের মধ্যখানে কাফের লেখা থাকবে। দাজ্জাল প্রসঙ্গটি পরের চিঠিতে নেই। যে লোক ইচ্ছা করে নামায ছেড়ে দিল সে কুফরী করলো। নামায ছাড়া অন্য কোনো আমল ছেড়ে দিলে কুফরীর অভিযোগ পড়ে না। মুমিনদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সে-ই, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। চোর ও দল ত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ 'জায়েয' কেবল তখন, যখন তাদের দিক থেকে নিরাপত্তাহীনতার আশংকা দেখা দেবে। কিন্তু তারা যদি কোনো কষ্ট দেয়া ছাড়া এমনিতেই পালিয়ে যায় তাহলে তাদের পেছনে ধাওয়া করা ঠিক নয়। কেননা তা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যেমন কারো হাতে চোর ধরা পড়লে তাকে শাস্তি দেবার অধিকারও তার নয়— তা রাষ্ট্রের।

ভাল হোক মন্দ হোক, রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য। যাকে খলিফা বানানো হয়েছে অথবা নিজ যোগ্যতায় খলিফা হয়ে গেছে সে খলিফাতুল মুসলিমীন। আমীর ফাসিক হোক ফাযির হোক তার সাথে জিহাদে অংশ নিতে হবে। কোন আমীরের অপকর্মের কারণে তার সাথে ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদে অংশগ্রহণ না করা ঠিক নয়। মালে গণিমতের বণ্টন এবং শরীয়তের বিধান প্রতিষ্ঠা এসব আমীরের কাজ। এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। যাকাত ও দান-খয়রাত ফাসিক ফাজের ইমামকে দিলেও আদায় হয়ে যাবে। যে কোনো

www.pathagar.com

ফাসিক ফাজের ইমামের পেছনে জুম'আ জায়েয। যে এরকম করবে না বা নিজে আবার পুনরাবৃত্তি করবে সে সম্পূর্ণ ভুলের ওপর রয়েছে, সে কিছুতেই জুম'আর কল্যাণ পাবে না। কোন ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া নীতিগতভাবে ঠিক নয়, সে জোর করে ইমামত দখল করলেও না। যে এরকম করলো সে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলো এবং রাসূল (স)-এর সুন্নতের বিরোধিতা করলো। সে লোক যদি সে অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে। সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কারো জন্যেই জায়েয নয়। যে এটা করলো সে কঠিন বেদআত করলো এবং রাসূল (স)-এর সুন্নতের বিরোধিতা করলো।

এরপরে ইবনুল জাওযী ইমাম সাহেবের আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। ইবনুল জাওযীর সনদের সর্বশেষ বর্ণনাকারী হাসান বিন ইসমাঈল আর রব্‌ঈ। এ বর্ণনাটির মধ্যেও প্রথম চিঠির মতো অনেক কথা আছে। এখানে বাড়তি যেটুকু তাহলো আমীরের সাথে বিদ্রোহ করা উচিত না। সে জালিম হলেও না। আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী কাউকে কাফির বলা যাবে না, সে কবীরা গুনাহর সংগঠক হলেও না। রাসূল (স)-এর আসহাবগণের পারস্পারিক মতবৈষম্য নিয়ে আলোচনা ঠিক নয়। রাসূল (স)-এর পরে উত্তমতম ব্যক্তিত্ব হযরত আবু বকর, উসমান ও রাসূল (স)-এর চাচার ছেলে আলী (রা)। রাসূল (স)-এর সকল পবিত্রা স্ত্রীগণ, সন্তান-সন্ততি, জামাতা, আত্মীয়-স্বজনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। এটাই মূল সুন্নত। এটা প্রতিষ্ঠিত রাখলে মানুষ মুসলিম থাকে এবং ছেড়ে দিলে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

এইসব আলোচনার পরে আমি "খালকে কুরআনের" মাসআলা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে চেয়েছিলাম যেন গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু সকল দলিলাদি একত্রিত করার পরে যা দেখলাম তা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক ছিল। আসল কথা হলো এই— ব্যাপারটা সাধারণ বুঝ ও উপলব্ধির বাইরে চলে গিয়েছিল এবং কথার মারপ্যাচ ছাড়া তার মধ্যে আর কোন সারাংশ ছিল না।

তারপরে হাম্বালী মতাবলম্বীদের শেষদিকে আশায়েরা ও মাতুরিদ এবং এই মুতাযিলাদের ঝগড়াগুলোর কারণ মারাত্মক উগ্রতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং এই বিতর্ক মাসআলার আসল প্রকৃতিকেই বিকৃত করে ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মতামত হাম্বালীদের থেকে ভিন্ন।

এ কারণেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের জীবন চরিতের সাথে এমন কোনো বিতর্ক জড়ানো সঙ্গত মনে করছি না যা তাঁর চিন্তা-বিশ্বাসের পরিপন্থী প্রমাণ হবে। যদিও আমি হযরত ইমামকে সেই সব বক্তব্য থেকে যা ঐ ফেতনার পরেও প্রকাশ হচ্ছিল (যেমন বাণী সংকলিত কুরআনের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর এবং প্রতিটি নুকতাহ্ আদি) তার থেকে খারাপ মনে করি এবং হযরত ইমামের কাছ থেকে এই ধরনের কোনো ব্যাখ্যাও অনূদিত হতে পারেনি। কিন্তু তারপরেও সম্মানার্থে এ পর্যায়ে আমি সেই বিতর্ক থেকে বিরত থাকলাম। দ্বিতীয়তঃ এই ধরনের জীবন চরিতের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিপূর্ণ দ্বীনদারী, মানবতার সেবা, দৃষ্টান্তমূলক কর্ম-তৎপরতা, এসবই হয়ে থাকে। কেননা সাধারণ-অসাধারণ সবশ্রেণীর কল্যাণমূলক কর্ম-সংস্কার এভাবেই হয়ে থাকে। থাকলো এই ধরনের মাসায়েলের প্রসঙ্গ ঃ তার সম্পর্ক তো বিশেষ একটা দল বা গোষ্ঠীর সাথে যারা প্রত্যেক জিনিসকে তার "কার্য-কারনের" সাথে দেখতে চায়। এর প্রেক্ষাপট আমার দৃষ্টিতে কোনো জীবন-চরিত নয় বরং তার জন্য সেই বিষয় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রচনার প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের রচনাবলী

হযরত ইমাম ইবনে হাম্বালের রচনাবলী অনেক, কিন্তু তার মধ্যে যেসব রচনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ তাদের নাম উল্লেখ করা হলো।

(১) কিতাবুল আমল, (২) কিতাবুত তাফসীর, (৩) কিতাবুন নাসেখ ওয়াল মানসুখ, (৪) কিতাবুয যুহুদ, (৫) কিতাবুল মাসায়েল, (৬) কিতাবুল ফাযায়েল, (৭) কিতাবুল মানাসিক, (৮) কিতাবুল ঈমান, (৯) কিতাবুল আশরাবাতুছ ছাগীর (১০) কিতাবুল ই'তেকাদ।

ইমাম হাম্বাল (রহ)-এর থেকে এ বর্ণনা আবদুল ওয়াহেদ আল তামিমী করেছেন। 'কিতাবুল ঈমান' এই কিতাবখানি সম্পর্কে কিতাবুয যুহুদে লিখেছেন, বইখানি এ বিষয়ের অদ্বিতীয় সৃষ্টি। ইবনে তাইমিয়ার মতও তাই। মানাকিবে আলী ইবনে আবী তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহুশ শারীফ। কিতাবুল মুসনাদ। কিতাবুস সালাত। কিতাবুল ওয়ারা'আ এসব কিতাব এখন সহজলভ্য।

কিতাবুল আমল সম্পর্কে জানা যায় যে, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আবদুল্লাহ্ আর রুশ্দী বাগদাদী আবু বকর আল আছরুম থেকে এর বর্ণনা করেছেন। কারণ সামআনী নিসবতে রাশেদীতে এর উল্লেখ এভাবেই করেছেন। ইমামের আর একখানি কিতাব 'কিতাবুত তারিখ' নামে আছে বলে সন্ধান পাওয়া গেছে। সামআনী রাবিওযী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আবু মুহাম্মদ আল ফজল মুহাম্মাদ বিন আল মুসাইয়্যিব-এর নাম উল্লেখ করে লিখেছেন যে, তিনি ইমামগণের কাছ থেকে এমন কিছু বিরল বর্ণনা করেছেন যা সাধারণভাবে অন্যরা করেননি। ইমাম আহমাদ (রহ) থেকে কিতাবুত তারীখও তিনিই বর্ণনা করেছেন। এতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ইমামের সাথে বহুদিন কাটিয়েছেন এবং তার জ্ঞানগত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

হযরত ইমামের মহত্তম কিতাব 'কিতাবুল মুসনাদ' সম্পর্কে হাফেয আবু মূসা ইস্পাহানী বলেন ঃ তা হাদীস চর্চাকারীদের জন্য মূল ও শুদ্ধতার কেন্দ্র স্বরূপ। ইমাম সাহেব ওর মধ্যে অনেক হাদীস এবং বেশ কিছু জনশ্রুতি সংকলন করেছেন। ইবনুল মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী প্রায় তিনশত হাদীস "ছ্যালাছিয়াতুল ইসনাদ" (অর্থাৎ তিনটি করে বিশ্বস্ত সূত্রে) এবং শুদ্ধ ও উত্তম মর্যাদার যত হাদীস ছিল সব একত্রিত করেছেন। হাম্বাল বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, আমার চাচা ইমাম আহমাদ বলতেন যে, আমি ওর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার সাতশ'রও বেশি হাদীস জমায়েত করেছি। মুসলমান যদি রাসূল (স)-এর কোনো হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তারা ঐক্যতার সন্ধান করলেই তা পেয়ে যাবে। যদি পেয়ে যায় তো শুদ্ধটাই পাবে, না পেলে নেই! পুত্র আবদুল্লাহ্র বর্ণনা, বাবা দশ হাজার হাদীস লিখে শেষ করতে না করতে তা সব আমি মুখস্ত করে ফেলেছি। একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি তো হাদীস লেখাকে অপছন্দ করতেন, তাহলে এখন লিখছেন কেন ? বললেন, লোকেরা যদি রাসূলের (স) হাদীস নিয়ে বির্তক করে তাহলে তারা এর মধ্যে খুঁজলেই তা পাবে। আবদুল্লাহ্ আরো বলেছেন যে,

www.pathagar.com

বাবা প্রায় সাত লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে এই 'মুসনাদ' তৈরী করেছেন। হযরত ইমামুল মুত্তাকী হিন্দির মতে মুসনাদে আহমাদে যা কিছু আছে তা গ্রহণযোগ্য। কারণ তার দুর্বল হাদীসটিও হাসান (উত্তম)-এর কাছাকাছি।

হাফেয শরফুদ্দিন নূদী'র মতে মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বাল, আবু দাউদ ও তিয়ালিসী ইত্যাদি মুসনাদসমূহ "উসূলে খাম্ছাহ্"-এর সমমানের হতে পারে না। কিন্তু সুয়ূতী তার ব্যাখ্যায় মুসনাদে আহমাদ সম্পর্কে এতোটুকু বলেছেন যে, ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে শুদ্ধতার প্রতি বেশ সজাগ ছিলেন।

ইরাকীর মতে আবু মূসা আল মাদিনীর বর্ণনায় ইমাম আহমাদ বলেন, মুসনাদে যে হাদীস আছে তা দলিল, আর যা নেই তা দলিল নয়, শুদ্ধ নয়। বরং ইমামের কথার তাৎপর্য এই যে, যা ওর মধ্যে নেই তা তো দলিল হতেই পারে না। কিন্তু যা ওর মধ্যে আছে তা দলিল। এটা সত্যি নয়। তারপর বলেন, এটাই বা কি করে বলা যায় কিছু বর্ণনা মুসনাদে নেই এই জন্য সত্যিই নেই! যেমন হযরত আয়শার হাদীস 'উম্মে যারা'আর' গল্প এবং আরও দুর্বল ও মওযু হাদীস ওর মধ্যে অবশ্যই আছে। বিশেষ করে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্ কিছু বাড়াবাড়ি করেছে যে কারণে ওর মধ্যে দুর্বল ও মওযু প্রবেশ করেছে। ইরাকীর বক্তব্য এতোটুকুই।

শাইখুল ইসলাম হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী একথার সমর্থনে "আল কাওলুল মুসাদ্দাদ" লিখেছেন। তার প্রারম্ভে বলেছেন যে, কতিপয় আলেমের কাছ থেকে বিষয়টা জানা গেছে যে, তারা মুসনাদের কিছু হাদীসকে 'মওযূ' বলেছেন, হাদীস চর্চাকারীদের একান্ত নির্ভরযোগ্য একখানি কিতাব সম্পর্কে এই মন্তব্য অপমানজনক। ইরাকী যে হাদীসসমূহকে 'মওযূ' বলেছেন তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি, তার সংখ্যা নয় এবং ইবনুল জাওযী যেগুলোকে তার মওযুয়াতে ঢুকিয়েছেন তার সংখ্যা পনের ছিল, সব একত্রিত করে তাদের জবাব দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও হাফেয ইবনে হাজারকে তার কিতাব "তাজীলুল মুনফা'আত বারজানুল আর বাআ"তে এটা বলতে হয়েছে যে, মুসনাদে তিন অথবা চারটি হাদীস এমন রয়েছে যার মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কারণ হয়তো এই যে, ইমাম আহমাদ যখন ঐ কিতাবের সম্পাদনা করছিলেন সেই সময়ই তাঁর ওপরে সেই বেত্রাঘাতের ঘটনা ঘটে। ফলে তিনি হয়তোবা এতোটুকু অসতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন ! কেউ কেউ আবার এটাও বলেন যে, কিছু হাদীস তাকে মেরে মেরে লিখানো হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

তাইছীমী তার কিতাব "যাওয়ায়েদ"-এ লিখেছেন, মুসনাদসমূহের মধ্যে আহমাদের মুসনাদের চাইতে ভাল আর কোনোটা নয়, কিন্তু অনেক হাদীসই তার মধ্যে নেই এবং প্রায় দুইশত সাহাবাগণের একটি জামায়াত এমন আছে যাঁদের বর্ণনা বুখারী মুসলিমে আছে, কিন্তু মুসনাদে নেই। (হাসিনী) কিতাব "আত্ তাযকেরাহ্ ফী রিজ্জালুল আশারাহ"তে বলেছেন, মুসনাদের হাদীস পুনরাবৃত্তিসহ চল্লিশ হাজারের মতো। এবং সরাসরি সাহাবাগণের থেকে যেসব বর্ণনা হয়েছে তার সংখ্যা সাতশ'র মতো। মুসনাদের বর্তমান সংকলনের বর্ণনাকারী আবু বকর বিন জাফর বিন মালিক আল মা'রূফ।

www.pathagar.com

যখন বিদায় নিলেন

পুত্র সালেহ বলছেন, বাবা আহমাদ বিন হাম্বাল ২৪১ হিজরীর প্রথমদিকে রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হন। আমি বাড়িতে এলাম। পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু খাবেন ? বললেন, মটরশুটি ছাড়া আর কিছুই খেতে পারি না এবং খুব কষ্টের সাথে বললেন, আমার কাছে বড় ছোট অনেক লোক আসে! আমি বুঝলাম এতো লোকের আনাগোনা তাঁর কষ্টের কারণ।

ইমাম সাহেব তাঁর মৃত্যুশয্যায় একটি অসীয়তনামা লিখেছিলেন যার ভাষা এই রকম ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما واصى احمد بن محمد حنبل اوصى انه يشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له وان محمداً عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشر كون واوصى من اطاعةً من اهله وقرابته ان يعبد والله فى العابد ين وان بحمده وفى الحامدين وان ينصحو الجما عة المسلمين واوصى انى قدرضيت بالله رباوبالاسلام دينا ومحمد نبيا -

পরম করুনাময় অতি দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। ইহা তাই যা ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল অসীয়ত করেছেন। আর তাহলো যে, নিশ্চয়ই সে এই বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো অংশীদারিত্ব নেই। আর মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ তাকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ দ্বীনের পূর্ণাঙ্গের ওপর প্রকাশ করতে পাঠিয়েছেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। আর রাসূল (স)-এর পরিবারের আনুগত্য ও তাঁর নিকটআত্মীয়র প্রতি আনুগত্যের অসীয়ত করেছেন। লোকদেরকে ইবাদতকারীদের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করতে ও প্রশংসাকারীদের সাথে আল্লাহ্ প্রশংসা করতে এবং মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধতার জন্য পরামর্শ দিতে অসীয়ত করেন। আর তিনি এই বিষয়ের প্রতি অসীয়ত করলেন যে, আমি আল্লাহ্কে প্রভূ হিসেবে, দ্বীন হিসেবে ইসলামকে ও নবী হিসেবে মুহাম্মদ (স)-কে আত্মতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করলাম।

এরপরে আরও কিছু অসীয়ত ছিল এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তারপর বাচ্চাদের ডাকলেন, আদর করলেন, দো'আ করলেন। তাঁর এক সন্তান তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ দিন আগে জন্মগ্রহণ করেছিল। অন্যটি তার চাইতে একটু বড়।

মৃত্যু এগিয়ে আসছিল। বাচ্চাদের আদর করতে করতে বললেন, তোমরা আমার সন্তান, আমার এই সময় তোমরা আমার জন্য কি করতে পারো? পাশে থেকে একজন বললো, আপনি

www.pathagar.com

চলে গেলে ওরা আপনার জন্য দো'আ করবে! বললেন, তাহলে ঠিক আছে। শারীরিক কষ্টে তিনি খুব কাতরাচ্ছিলেন এবং বিলাপ করছিলেন।

কে একজন বললো, 'তাউস' (মক্কার বড় আলেম) রোগশয্যায় বিলাপ করতে নিষেধ করেন। সাথে সাথে তা বন্ধ হয়ে গেল। এর পরে তার মুখে কোনো কষ্টের কথা কেউ শোনেনি।

সালেহ্ এবং আবদুল্লাহ্ উভয়ের বর্ণনা, মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি হঠাৎ জোরে বলে উঠলেন, দূর হ! দূর হ! কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে ? কাকে বলছেন ? বললেন, ইবলিস ঐ ঘরের কোণায় বসে আছে, দাঁতে আঙ্গুল চেপে বলছে, আহমাদ! আমার কথা একটু ভাব না! আমি বলছি কক্ষণও না! তুই দূর হ! আমার রূহ যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহ থেকে আল্লাহ্র স্মরণ নিয়ে বেরিয়ে না যাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও আমি তোর ব্যাপারে অসতর্ক হবো না।

এরপর নড়ে উঠে বললেন, আমাকে অজু করাও। শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গা বার বার ধুইতে বললেন। তারপর বললেন, পায়ের আঙ্গুলগুলোতে খিলাল করো। ভাল করে খিলাল করো। মুখে বিরামহীনভাবে আল্লাহ্র 'যিক্র' চলছে, মনে হয় যেন এই অজুটুকুর জন্যই রূহ অপেক্ষা করছিল। অজু করানো শেষ হওয়ার সাথে সাথে পবিত্র রূহ রওয়ানা হয়ে গেল তার মালিকের দরবারে হিসেব-নিকাশের মুখোমুখি হতে। দিনের তখন প্রথম প্রহর, বার জুম'আ।

গোটা বাগদাদ নগরী যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বাগদাদে খলিফার প্রতিনিধি কয়েকজন গোলামকে কাফনসহ বলে পাঠালো যে, খলিফা নিজে থাকলে যা করতেন আমি তার হয়েই তা করলাম।

ছেলেরা তা সব ফেরত পাঠিয়ে দেবার সময় বলে দিলো যে, ইমাম বেঁচে থাকতেই আমীরুল মু'মিনীন সবসময়ই চেষ্টা করেছেন তাঁর জন্য কষ্টদায়ক তাঁর অপছন্দনীয় এমন সব কিছু থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাই তাঁর মৃত্যুর পরেও সেইসব থেকে তাঁকে রক্ষা করাই উচিত!

শেষে তাঁর নাবালেগ মেয়েরা যা পরতো সেই কাপড় দিয়ে তাঁর কাফন পরানো হয়। গোসলের প্রতিটি সামগ্রী, এমনকি পানি পর্যন্ত ইমামের যৎসামান্য পয়সা দিয়ে কিনে আনা হয়। ছেলেদের ঘরের পানিও ব্যবহার করা হয়নি। কারণ ছেলেরা বাদশাহী ভাতা গ্রহণ করেছিল বলে তিনি তাদের ঘরের সবকিছুকে বর্জন করেছিলেন। তাই মৃত্যুর পরেও তাঁর অপছন্দনীয় কোনো কিছু তাঁকে স্পর্শ করানো হয়নি। গোসলের সময় প্রায় শ'খানেক বনী হাশেম শহর থেকে এসেছিল, তারা প্রত্যেকেই তার কপালে চুমু খাচ্ছিল আর ক্রন্দনরত অবস্থায় দো'আ করছিল।

জানাযার খাট বেরুনোর সাথে সাথে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এক বিশাল মিছিল চললো তার সাথে। সহকারী নগর প্রশাসক মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন তাহের জানাযার নামায পড়িয়েছিল। লোক সমাগমের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা শোনা যায়— কারো মতে চার লাখ, কারো মতে সাত লাখ। কেউ কেউ বলেন আরও বেশি।

বায়হাকী হাকেম থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, আবদুল ওয়াহাব আল আওয়াক এর কাছে যে বর্ণনা পৌঁছেছে তাতে বলা হয়েছে যে, জাহিলিয়াত ও ইসলামের কোনো যুগেই কারো জানাযায়

www.pathagar.com

এতো লোকের সমাগম হয়নি। ইমাম আহমাদের প্রতিবেশী 'কাফী' বলেন, ইমাম আহমাদের মৃত্যুর দিন প্রায় বিশ হাজার ইয়াহূদী-খ্রীস্টান এবং অগ্নিপূজক মুসলমান হয়েছে। বায়হাকী হাজ্জায বিন মুহাম্মদ আছ্ছায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আহমাদের জানাযায় শরিক না হয়ে আমি কোনো জিহাদে শরিক হয়ে শহীদ হবার সুযোগও গ্রহণ করবো না। বায়হাকী আরও বলেন, কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা বলতেন, আহমাদ যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে সেদিন সেই ষষ্ঠ ব্যক্তিও চলে গেছেন যিনি আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রা) এবং উমর ইবনে আবদুল আযীযের পরে এই পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

رحمة الله وجعل الجنة مثواه –

তাকে আল্লাহ রহম করুন এবং জান্নাতে উত্তম আবসস্থল করে দিন।

হযরত ইমাম যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স ৭৭ (সাতাত্তর) বছর এবং এক মাসের কিছু কম ছিল।[১]

১. তবকাতে শাফেয়ীয়াহ্ আল-কুব্‌রা, ইবনে খাল্লকান, তাহ্যীব আত তাহযীর

www.pathagar.com

একনজরে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ)-এর ব্যক্তিত্ব

তিনি বলতেন, আমি পাঁচবার হজ্ব করেছি। যার মধ্যে তিনবার পায়ে হেঁটে। তাঁর সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মন্তব্য ঃ ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি বাগদাদে আহমাদ ইবনে হাম্বালের চাইতে বড় কোনো ফকীহ্, যাহেদ, মুত্তাকী এবং আলেম দেখিনি। ইয়াহ্ইয়া বিন মঈন বলেন, আমরা যদি এক বৈঠকে তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে চাই, তাহলে তা সম্ভব নয়। ইমাম আজালী বলেন, ইমাম আহমাদ বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য। হাদীস বিষয়ে মূল সুন্নত ও সাহাবাগণের ঐতিহ্যের একনিষ্ঠ সংরক্ষক। পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, বাবা দিনে-রাতে তিনশ' রাকাআত নফল নামায পড়তেন। ইমাম হাম্বাল বিন আলী'আ (রহ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর ওপরে এই চার ব্যক্তির জন্ম দিয়ে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীকে সৃষ্টি করেছেন— তিনি রাসূল (স)-এর হাদীস থেকে সঠিক ফিকাহ্ উদ্ভাবন করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে সৃষ্টি করেছেন— তিনি দৃঢ়তা ও অবিচলতার চূড়ান্ত পরীক্ষার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মঈনকে সৃষ্টি করেছেন— তিনি শুদ্ধ বর্ণনাসমূহের মানদণ্ড নির্ণয় করে হাদীস বিজ্ঞানকে মহিমান্বিত করেছেন। ইমাম আবু ওবায়দাহকে সৃষ্টি করেছেন— তিনি দুর্লভ হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী বিন মাদিনী (রহ) বলেন, হাদীসের পণ্ডিতদের মধ্যে সবচাইতে বড় হাফেয আহমাদ ইবনে হাম্বাল। ইমাম দারে কুতনী (রহ) এক বর্ণনায় দেখিয়েছেন যে, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ)-এর ওফাতের পরে সুন্নাতে রাশেদার প্রচার-প্রসারে এতো বড় পণ্ডিত আর দেখিনি। তাঁর ওফাতের পরে 'বেদআতীদের' উৎপাত এতো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যা এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি।

তিনি এক লাখ হাদীস থেকে ছাঁটাই-বাছাই করে মুসনাদ রচনা করেছেন। যার মধ্যে কয়েক হাজার হাদীস রয়েছে। এছাড়া তাঁর অসাধারণ তিনখানি রচনা রয়েছে–"তাআতুর রাসূল (স)", 'নাসেখ ওয়াল মানসুখ" ও 'কিতাবুল আলাল"। তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের মধ্যে তিনজন অত্যন্ত বড় মাপের আলেম রয়েছেন।

১. আছরাম হিসেবে খ্যাত, আবু বকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হামিদ (রহ)। তিনি হাম্বালী ফিকাহ্র মধ্যে "কিতাবুস সুনান" রচনা করেছেন।

২. আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন আলহাজ্ব আল মারুযী (রহ)। তিনি হাদীসের প্রত্যক্ষ দলিলসহ ফিকাহ্র একখানি কিতাব "কিতাবুস্ সুনান" রচনা করেছেন।

৩. ইসহাক বিন ইবরাহীম আল মারুযী (রহ)। ইসহাক বিন রাহোইয়া হিসেবে খ্যাত। তিনিও হাম্বালী ফিকাহ্র আর একখানি 'কিতাবুস সুনান' রচনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ফিকাহ্র মূল শিক্ষা ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর কাছ থেকে পেয়েছেন। কিছু কিছু মাসআলায় আংশিক ইজতিহাদ নিজেও করেছেন।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইমাম আহমাদকে খুব বেশি ভালবাসতেন এবং তাঁর ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতেন। প্রায়শঃ বলতেন, দেখ আহমাদ, আমার ইজতিহাদ এবং রায়ের বিপক্ষে যখনি কোনো হাদীস পাবে সাথে সাথে আমাকে জানাবে যেন আমি আমার মত বাদ দিয়ে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। কেননা রাসূল (স)-এর কথার বাইরে আমি যদি কোনো মত পোষণ করি তাহলে কোন সে জমিন আর কোন সে আকাশ যে আমাকে আশ্রয় দেবে।

ইমাম আহমাদ (রহ) তাঁর এই উস্তাদকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সাথে কাটানো সময় এবং মুহূর্তগুলোকে তিনি 'ঐশ্বী নেয়ামত' হিসেবে গণ্য করতেন। ইমাম বায়হাকী (রহ) একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ (রহ)-এর কাছে ইমাম মালিক (রহ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তাঁর হাদীস তো শুদ্ধ কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তমূলক মতামত দুর্বল। তারপরে ইমাম আওযায়ী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বললেন, তাঁর হাদীসও দুর্বল মতামতও দুর্বল। এরপরে ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে জানতে চাইলে, বললেন, তাঁর হাদীসও শুদ্ধ এবং তাঁর মতামতও গ্রহণযোগ্য। এরপরে কুফার অন্যান্য আলেমদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বললেন, তাঁদের হাদীসও কিছু নয় আর মতামতেরও কোনো মূল্য নেই।

ইমাম বায়হাকী (রহ) ইমাম আহমদ (রহ)-এর এই কথার এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হযরত ইমাম মালিক (রহ)-এর বর্ণনাসমূহ বিশুদ্ধতম এবং নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য এবং সবদিক থেকে তা প্রমাণিত, কিন্তু তিনি কিছু কিছু ব্যাপারে শুধুমাত্র মদীনার বিশেষজ্ঞগণের কর্মপ্রণালীকে সবার ওপরে প্রাধান্য দিতেন এবং তাঁদের 'ইজমা'কেই তিনি একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনে করতেন অথচ কোনো একটি শহরের আলেমগণের ইজমাকে 'ইজমা' বলা যেতে পারে না।

ইমাম আওযায়ী (রহ) সম্পর্কে ইমাম আহমাদ যা বলেছেন তাহলো তিনি কোনো কোনো মাসআলায় মাক্‌তু এবং মুরসাল বর্ণনার ওপরে আমল করেন এবং এই ধরনের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে কিয়াস করে ফতোয়াও দেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) সম্পর্কে যা বলেছেন তার কারণ হলো, তিনি শুদ্ধ হাদীসের সন্ধানী। হোক না তা ইয়েমেনের অথবা মিশরের! বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হলেই তিনি তাকে গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন। ইতিপূর্বে সে ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব কোনো ইজতিহাদ থাকলে তা তিনি বাতিল করে দেন এবং হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

কুফা এবং ইরাকের আলেমদের সম্পর্কে তাঁর যে মন্তব্য! তার কারণ হলো ঃ তাঁরা মুনকাতে', মুরসাল এবং মাজ্‌হুল বর্ণনাগুলোকেও গ্রহণযোগ্য মনে করেন এবং নিজেদের শহরের নিত্যান্ত দুর্বল বর্ণনাগুলোকেও অন্যান্য শহরের শুদ্ধ বর্ণনার ওপরে প্রাধান্য দেন।

তবকাতে শাফেয়ী প্রথম খণ্ডের ২০৫ পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটি লেখা আছে। ইমাম রবী' বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ) যখন মিশর যাচ্ছিলেন তখন আমাকে বললেন, রবী, আমার এই চিঠিটা নিয়ে তুমি বাগদাদে গিয়ে আহমাদ ইবনে হাম্বালকে দিবে, তারপর তিনি যে জবাব দেবেন তা নিয়ে ফিরে আসবে।

চিঠি নিয়ে আমি বাগদাদে পৌছলাম। তিনি তখন ফযরের নামায শেষ করে ফিরছিলেন। চিঠিটা হাতে দিয়ে বললাম, ইমাম শাফেয়ী আপনাকে দিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি পড়েছো ? বললাম জ্বী না। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি টপ্‌

www.pathagar.com

টপ্ করে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার! আপনি কাঁদছেন ? বললেন, ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন যে, তিনি রাসূলে কারীম (স)কে স্বপ্নে দেখেছেন, রাসূল (স) তাঁকে বলছেন, তুমি আহমাদ ইবনে হাম্বালকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও যে, খুব শীঘ্রই তুমি 'খালকে কুরআনের' ফিত্নায় জড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে অবিচল রাখবেন এবং তোমার জ্ঞান চর্চা কিয়ামত পর্যন্ত ছড়াতে থাকবে! আমি বললাম, আপনার ওপর আল্লাহ্র রহম হোক।

তিনি চিঠির উত্তর লিখলেন এবং তাঁর গায়েব জামাটা খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এ দু'টো ইমাম শাফেয়ীকে দেবে। মিশরে পৌঁছে যথারীতি চিঠি এবং জামা ইমামের হাতে দিলাম। জামাটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এটা কি ? বললাম আপনার জন্য উপহার। ইমাম বললেন, এটা পানিতে চুবিয়ে পানিটা আমাকে দাও আমি তা বরকতের জন্য ব্যবহার করবো। আর জামাটা তুমি নিয়ে নাও।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) ইমাম আহমাদের জন্য প্রতি নামাযে সেজদায় পড়ে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন। এবং তাঁর প্রসঙ্গ এলেই তিনি বলতেন, আমার শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ী যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সেভাবেই আমল করছি।

তৃতীয় শতকের শুরুতেই যখন বেদআতী মু'তাযিলাদের ফিত্না মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং একাধারে তিনজন ক্ষমতাশালী বাদশাহ মামুন, মু'তাসিম ও ওয়াসেক বিল্লাহ তলোয়ার, স্বৈরাচার ও ক্ষমতার ভয়ঙ্কর ভাবমূর্তি নিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করল। তখন বাশার মারিসী ও কাযী ইবনে আবু দাউদের মতো কট্টর মু'তাযিলার ক্ষমতাসীন প্রভাব ও বল প্রয়োগ সত্যপন্থী আলেমদের সামনে দু'টি পথ খোলা রাখল— হয় তারা এই বেদআতীদের সামনে মাথানত করে দেবে এবং তাদের তত্ত্ব 'খালকে কুরআনের' ওপর ঈমান এনে চিরদিনের জন্য একথা প্রতিষ্ঠিত করে দেবে যে, শরীয়তে শুধুমাত্র রাসূল (স)-এর কথাই যথেষ্ট নয়, তাছাড়াও অনেক কিছু আছে এবং অনেক কিছু করতেও হবে। শাসক ও রাজন্যবর্গের সন্তুষ্টি সবার ওপরে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, খেয়াল-খুশীর একটা ভূমিকা আছে এবং আমাদের প্রতিটি দর্শন শরীয়তকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এ পথ যদি গ্রহণ করো, ভাল আর নইলে, জিন্দানখানার বন্দীত্ব গ্রহণ করো আর প্রতিদিন বেত্রাঘাত খাও। সূর্যের আলো যেখানে পৌঁছায় না সেই রকম বন্দিশালায় ডাণ্ডাবেড়ী আর শিকল পরে জীবন কাটাও।

এসব কথা শুনে অনেকেই আত্মসমর্পণ করল এবং প্রথম প্রথম যারা অত্যন্ত কঠিন মনোভাব প্রকাশ করেছিল তারাও শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্ধত মস্তক ক্ষমতার মদমত্ততার সামনে নত করে দিল। কেউ কেউ তখন এমন কথাও বলতেন ঃ

ليس هذا زمان حديث انما هذا زمان بكاء وتضرع ودعاء كدعاء الغريق –

এ সময়টা শিক্ষাদান ও প্রচারের নয় বরং এটাতো সেই সময়কাল যেভাবে সাগরে ডুবে যেতে যেতে কেউ দো'আ করে ঠিক সেভাবেই আল্লাহ্র কাছে কাকুতি-মিনতি করে দো'আ করতে থাকো।

কেহ কেহ বলেন, এখনকার সময়টাতো চুপ করে থাকার যুগ! এসময় নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করাই ভাল। ঈমানের এই মহাসংকটকালে যখন বড় বড়

www.pathagar.com

আলেম-ওলামাগণ নীরব হয়ে গেলেন তখন আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের দ্বীন এক নজীরবিহীন কুরবানীর অপেক্ষায় ছিল। কে হবেন সেই যুগশ্রেষ্ঠ মহান সাক্ষীদাতা। এ নির্বাচন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার। কাকে তিনি এই জীবন্ত শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করবেন ? তিনি সেই ব্যক্তি যে জীবনে কোনোদিন কোনো বাদশাহর সম্মুখে মাথানত করেননি, না কোনো দুনিয়াদার আলেমের সাথে সৌজন্যমূলক সম্পর্কটুকু রেখেছেন। বরং সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠার পথে আপন অস্তিত্বকে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং আগামী দিনের মানুষের সামনে সত্য দ্বীনের পথে যে কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হবার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এই মহাত্মন আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল। পরীক্ষা এসেছে, তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন দোর্দন্ত প্রতাপের অত্যাচারীর সামনে ঠিক যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন বিশেষ মাহাত্মপ্রাপ্ত রাসূলগণ। অন্ধ কারাগারে বন্দী হয়েছেন, পরিয়ে দেয়া হয়েছে চার চারটি ভারী শেকল তার হাতে-পায়ে। সেই অবস্থায় বাগদাদ থেকে তারতুস নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রমযানের শেষ দশক চলছে তখন। শিকলের ভারী বোঝা নিয়ে যেখানে এতোটুকু নড়াচড়া সম্ভব নয়, সেখানে এই রোযাদার বন্দীকে খর রৌদ্রতপ্ত পাথরের ওপরে বসিয়ে রাখা হয়েছে ঘন্টার পর ঘণ্টা। নবুয়তী জ্ঞানের ভাণ্ডার যে বুকের মধ্যে থরে থরে সাজানো তারই পিঠে মারা হয়েছে শক্তিশালী জাল্লাদের হাতে বিষাক্ত বেতের আঘাত। আঘাতের পর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়া হয়েছে পিঠ, ক্লান্ত হয়েছে জল্লাদ, কিন্তু আদায় করতে পারেনি খিলাফতের পবিত্র উপাধী ধারণকারী মুসলিম নামের নরপিশাচ তার মতলবের স্বীকারোক্তি। জল্লাদের আঘাতে অস্ফুষ্টে মুখ থেকে যে আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল তা না কোনো দুঃখ বা ব্যথার, না আহাজারী বা বিলাপ। সেই আর্তচিৎকারের ভাষা তা-ই ছিল, যে কারণে চলছিল এই অমানসিক নির্যাতন— পিঠে আঘাত পড়ছে আর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে— আল কুরআন কালামুল্লাহ, আল কুরআন মাখলুক নয়। খোদ মু'তাসিম বিল্লাহ যার প্রতাপ ও দাপটে রোম সম্রাট কাইজারের হৃদকম্পন হয়, চিৎকার করে বলছে, আহমাদ! আল্লাহ্র কসম, যেভাবে আপন পুত্রকে ভালবাসী, ঠিক সেভাবেই তোমাকেও ভালবাসবো। খালকে কুরআন স্বীকার করে নাও। আমি নিজের হাতে তোমার শিকল খুলে দেব। কিন্তু সত্যের সাধক আল্লাহ্র এই প্রিয় বান্দার উত্তর হয়ে যা বেরুলো তা এই যে, কুরআন এবং হাদীস দিয়ে তোমার কথা প্রমাণ করে দাও আমি মেনে নেব। ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে মু'তাসিম কাযী আবু দাউদকে ডেকে বললো, ডাকো সব আলেমদের, আহমাদের সাথে বহস করে প্রমাণ করো। শাহানশাহের যথাআজ্ঞা! আলেমরা এলো দরবারী হালুয়া-রুটির ফরয আদায় করতে। তর্ক শাস্ত্রীয় মারপ্যাঁচের উদ্ভট সব দার্শানিক যুক্তি দেখালো। ইমাম সাহেবের একই কথা, এসব অর্থহীন কথা আমার সাথে বলে কোন লাভ নেই। আমার মাথায় ঢোকার জন্য এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র দু'টি জিনিসই আছে— এক আল্লাহর কিতাব আর দ্বিতীয় রাসূল (স)-এর কোনো প্রমাণিত হাদীস। আর যা কিছু তোমরা আমায় বলছো, তার কোনো মূল্যই আমার কাছে নেই।

কোতওয়াল ইবরাহীম বিন মুসআব বলছে, আহমাদের মতো মানুষ আমি জীবনে দেখিনি! আমরা তো কোন ছার! আমার কাছে খোদ বাদশাহকে তাঁর সামনে মশা-মাছির মতো মনে হয়েছে।

আল্লামা ইবনে জাওযী হাফেয রক্তী'র কথা বর্ণনা করছেন, সে বলছে, ইমাম যখন বন্দী ছিলেন তখন আলেমদের একটি দল তাঁর কাছে গেল। তারা এমন সব বর্ণনার উদ্ধৃতি দিতে শুরু করলো যাতে জুলুমের ভয়ে সত্য গোপন করার অনুমতি আছে বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম

সাহেব বললেন, যখন সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (স)-এর কাছে কাফিরদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেছিলেন তখন রাসূল (স) বললেন, শোন! তোমাদের পূর্বে এমন সব লোকেরা চলে গেছেন যাঁদের মাথার ওপরে করাত চালানো হয়েছে। শরীরের মাংস ফালি ফালি করে কাটা হয়েছে। কিন্তু এসবের কোনো কিছুই তাদের মুখ থেকে সত্য ছাড়া অন্য কিছুই বের করতে পারেনি।

আবু আব্বাস বলেছেন, আমি এই জবাব শুনে চুপচাপ চলে এসেছি। ইমাম সাহেব বলছেন, রোযা অবস্থায় আমাকে এমনভাবে মারা হয়েছে যে, সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে। আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। যখন জ্ঞান ফিরে এসেছে, তখন কে একজন পানি নিয়ে এসে বলছে নাও খেয়ে নাও। আমি বললাম না! আমি রোযাদার! রোযা ভাঙবো না।

সেখান থেকে আমাকে ইসহাক বিন ইবরাহীমের বাড়িতে নিয়ে গেল। যোহরের নামাযের সময় ছিল। ইবনে ছামা'আ ইমামতি করছিল। আমিও পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে ইবনে ছামা'আ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নামায হলো কেমন করে ? শরীর থেকে তো রক্ত ঝরছে! কাপড়-চোপড় সব রক্তে ভেজা। আমি জবাব দিলাম, হযরত উমর (রা)-এরও নামাযের মধ্যে জখম থেকে দর দর করে রক্ত ঝরছিল, কিন্তু তিনি নামায ছাড়েননি।

ইমাম সাহেবের ছেলে আবদুল্লাহ বলছেন, সবসময় বাবা একজন লোকের জন্য দো'আ করতেন। হে আল্লাহ্ আবুল হাছিমকে তুমি ক্ষমা করে দাও! তার ওপর তুমি বিশেষ রহমত নাযিল করো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই আবুল হাছিম কে ? বললেন, শোন! যেদিন রাজার লোকেরা আমাকে ধরে দরবারে নিয়ে যাচ্ছিল সেদিন পথে এই লোকটির সাথে দেখা। সে বললো, আমাকে চেনেন ? আমি বললাম না। সে বললো, আমি বিখ্যাত ডাকাত আবুল হাছিম হাদ্দাদ। আমার নাম দরবারের অপরাধীদের খাতায় একনম্বরে লেখা। আমার পিঠে যতো বেত পড়েছে তার হিসেব করলে আঠারো হাজার ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু বেত যতোই পড়ছে আমি আমার কাজে ততোই পাকা হয়ে উঠছি। যখনই ছাড়া পাচ্ছি! এসেই আবার শুরু করে দিচ্ছি আমার কাজ। শোন, তোমাকে বলছি! এই দেখো আমাকে! শয়তানের আনুগত্যে আমার দৃঢ়তা দেখ কোন পর্যায়ের! আল্লাহ্‌র পথে তোমার অবস্থান যদি এতোটুকু নড়ে যায় তাহলে সে দুঃখ রাখার জায়গা এই পৃথিবীর কোথাও নেই।

সেদিন ঐ ডাকাতের কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে তীরের মতো বিঁধেছিল। প্রচণ্ড শক্তি যুগিয়েছিল ঐ অমানুসিক নির্যাতন সহ্য করার সময়। তাই আমি ওর জন্য প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ প্রার্থী হই।

বাবার কাছে রাসূল (স)-এর তিনগাছা পবিত্র দাড়ি ছিল। তিনি আমাকে অসীয়ত করে গেছেন যে, তার এক গাছি ডান চোখের ওপর, একগাছি বাম চোখের ওপর এবং আর একগাছি তোমার জিহ্বার ওপর রেখে আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর স্পর্শ অনুভব করবে।

আল্লামা ইবনে জাওযী ইবরাহীম আরাবীর বরাত দিয়ে বলছেন, আমি হযরত বাশার হানী (রহ)-কে স্বপ্নে দেখেছি। দেখি তাঁর পকেটের মধ্যে কি যেন নড়াচড়া করছে। জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কিভাবে নিয়েছেন ? বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপর প্রশ্ন করলাম, পকেটে কি ? বললেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের ওপর হীরামতি উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখান থেকে আমিও কিছু কুড়িয়ে এনেছি।

www.pathagar.com

আল্লামা ইবনে জাওযী বলেন, আবু বকর মারুযী তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন যে, তিনি সবুজ পোশাকে একটি আলোকিত আসনে বসে আছেন। তাঁর মাথায় একটি মুকুট। তা থেকে এমন আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল! মনে হচ্ছিল খোদ আল্লাহ্‌র নূর! এরপরে তিনি উঠে হাঁটছিলেন, সে চলার ধরন ছিল রাজসিক। জিজ্ঞেস করলাম, এভাবে হাঁটছেন? বললেন, এটা দারুস্‌সালামের খাদেমদের চলার ধরন। এই যে তাজ দেখছ! আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছ থেকে খুব সামান্য হিসেব নিয়ে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। বলেছেন, এটা মর্যাদার মুকুট, যে ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে তুমি আমার কালামকে 'মাখলুক নয়' বলে দাঁড়িয়েছিলে! এটা তারই পুরস্কার।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) 'তাহযীব আততাহযীব'-এর প্রথম খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আবুল হাসান যাগাওয়ানী বলেছেন যে, যখন শরীফ আবু জাফর বিন আবী মুসার জন্য ইমাম আহমাদ (রহ)-এর পাশেই কবর খোঁড়া হচ্ছিল, তখন তাঁর কবরের পাশের মাটি ধসে পড়েছিল। দেখা গেল তাঁর কাফনসহ পবিত্র দেহখানি একই রকম শুয়ে আছে, কোথাও এতোটুকু বিকৃতি নেই। এই ঘটনা তাঁর ইন্তেকালের দুইশ' তিরিশ বছর পরের কথা।

সু-সংবাদসমূহ

হাদীস শরীফে আছে "নবুয়তের উপাদানসমূহের মধ্যে নিরেট 'সত্য স্বপ্ন' ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই, যা মু'মিন হয় নিজে দেখে অথবা অন্যে তাঁর ব্যাপারে দেখে"। বায়হাকী নিজের সনদে বলছেন, তিনি মুসলিমা বিন মুসাইয়্যিব নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছেন, সে বলতো, আমি একদিন আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় একজন বৃদ্ধ লাঠিভর দিয়ে এসে আমাদের উদ্দেশ্য করে বলছে, তোমাদের মধ্যে আহমাদ কে? ইমাম বললেন, আমিই আহমাদ, বলুন কি ব্যাপার? বলছেন, চারশ' ক্রোশ দূরের পথ পার হয়ে শুধু তোমাকে জানাতে এসেছি যে, আমি রাসূল (স)কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বলেছেন, আহমাদের কাছে যাও, তাকে বলো যে, তুমি আরশের অধিবাসী এবং ফেরেশতাকুল তোমার ওপর সন্তুষ্ট এবং তারা খুশী এই জন্য যে, তুমি আল্লাহ্‌র পথে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছো।

আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন খুযাইতাহ্ আল ইসকান্দারানী'র বর্ণনা, আহমাদ ইবনে হাম্বালের মৃত্যু সংবাদ আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। একদিন আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। দেখি অত্যন্ত রাজসিক চালে হাঁটছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম এইভাবে হাঁটছেন? বললেন, দারুস্‌সালামের অধিবাসীদের চাল-চলন এরকমই। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কি রকম আচরণ করেছেন? বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাকে সোনার জুতা পরতে দিয়ে বলেছেন, আহমাদ তুমি আমার কালামকে 'মাখলুক নয়' বলে যে নির্যাতন ভোগ করেছ তার জন্য এটা আলাদা পুরস্কার।

তারপরে আমি বললাম, হে আহমাদ! তুমি আমার জন্য ঠিক সেভাবে দো'আ করো যেভাবে সুফিয়ান ছাওরী তোমার জন্য করেছিলেন এবং তুমি পৃথিবীতে থেকে করেছিলে। আহমাদ (রহ) বললেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছি, হে পরোওয়ারদিগার! তোমার সর্বশক্তিমান সত্তার কসম! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আর আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আহমাদ এটা জান্নাত— তুমি তাতে প্রবেশ করো। সেখানে গিয়ে

www.pathagar.com

আমি সুফিয়ান ছাওরীকে দেখেছি। তিনি দু'টি সবুজ ডানায় ভর করে উড়ে বেড়াচ্ছেন আর মুখে বলছেন ঃ

الحمد الله الذى صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم اجرالعلمين - (الزمر)

তারা বলবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার।

তার কাছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাশার হানীর অবস্থা কি ? তিনি কেমন আছেন ? বললেন, বাশারের কথা বলছো! তার সাথে কার তুলনা চলে বলো! আমি তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে রেখে এসেছিলাম। আবার গিয়ে দেখি, তাঁর সামনে এক বিশাল দস্তরখানে কতো রকমের খাবার সাজানো! খোদ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, খাও হে আমার বান্দা! যে পৃথিবীতে খাবার পেয়েও আমার জন্য খাওনি! পান করো যতো খুশী, এখানে কোন বাধা নেই! আরাম করো তোমার যেভাবে মন চায়!

মুহাম্মদ বিন আবী হাতেম মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন দারাহ্ থেকে বর্ণনা করছেন, আবু যার'আ ইন্তেকাল করলেন, তার কিছুদিন পরে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন আপনি ? বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার ব্যাপারে আদেশ করলেন, ওকে আবু আবদুল্লাহ্, আবু আবদুল্লাহ্ এবং আবু আবদুল্লাহ্র সাথে মিলিয়ে দাও! অর্থাৎ মালিক (রহ), শাফেয়ী (রহ) ও আহমাদ (রহ) এঁদের তিনজনই আবু আবদুল্লাহ্ নামে পরিচিত।

উসমান বিন খারায ওয়াল ইনতাসী'র বর্ণনা, আমি স্বপ্নে দেখি কিয়ামত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ফয়সালার জন্য তাঁর আরশে বসেছেন। এমন সময় আরশের নীচ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে ঃ

মালিক শাফেয়ী এবং আহমাদ কে জান্নাতে পৌঁছে দাও। আমার পাশে দাঁড়ানো একজন ফেরেশতার কাছ থেকে এই ব্যাপারে বুঝে নিলাম।

আবু বকর বিন খাদিমাহ্ ইয়াহ্ইয়া বিন আইউব আল মাক্দাসী থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসূল (স)-কে আমি স্বপ্নে দেখেছি। তিনি হাম্বাল ও আবী দাউদের দলের মধ্যখানে বসে আছেন এবং এই আয়াত পড়ছেন ঃ

أُليك الذين ايتنا هم الكتاب والحكمة والنبوة فالق يكفر بها هؤالاءك

এখানে হা উলায়ে দ্বারা আবী দাউদের দলকে বোঝাচ্ছেন। তারপরে فقد وكنابها قومًا ليسو পড়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের (রহ) দিকে ইঙ্গিত করছেন।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক
ইমাম আবু হানিফা
ইমাম শাফেয়ী
ইমাম হাম্বল

খায়রুন প্রকাশনী

www.pathagar.com